বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

একাদশ খণ্ড

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১ মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

'ভারতবর্ষে যখন সরকারের অর্থের প্রয়োজন হ্ত তখন বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হত যে, বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট হারে এবং তাতে প্রদত্ত শর্তাধীনে কোষাগার খোলা থাকবে ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করতে। যত দিন ঋণ গ্রহণের বিষয়টি খোলা থাকত, ততদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জনগণকে তাদের খুশিমতো অর্থ প্রদানের অনুমতি দেওয়া হত এবং স্বীকৃতি হিসাবে তাদের দেওয়া হত যাকে বলা হয় ঋণপত্র, এবং এটা যে কোনও পরিমাণের অর্থ হতে পারত। ঋণ হিসাবে গৃহীত সব অর্থই ভারতবর্ষ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।'

ড. ভীমরাও আম্বেদকর

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিত্ত ও প্রশাসন ব্যবস্থা

AMBEDKAR RACHANA-SAMBHAR
(Collected Works of Dr. Ambedkar in Bengali)
Volume-11
Total No. of Pages : 392 including 4 pages Index

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯৯

First Published : November, 1999

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি -১১০ ০০১

Published by
Dr. Ambedkar Foundation,
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India,
New Delhi - 110 001

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ৪০ টাকা (Rs. 40/-)
শোভন সংস্করণ : ১০০ টাকা (Rs. 100/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরামর্শ পরিষদ

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
মাননীয়া সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী, ভারত সরকার

আশা দাস, আই. এ. এস
সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

শ্রী এস. কে. বিশ্বাস, আই. এ. এস
অতিরিক্ত সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

ড. এম. এস. আহমেদ, আই.এ.এস.
যুগ্ম সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার
সদস্য সচিব, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

শ্রীমতী কৃষ্ণা ঝালা, আই. এ. এস
সচিব, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী
কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ড. ইউ. এন. বিশ্বাস, আই. পি. এস
যুগ্ম নির্দেশক (পূর্ব) এবং স্পেশাল আই. জি. পি
কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, ভারত সরকার

কৃষণ লাল
নির্দেশক, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়
বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়
অতীন্দ্র মোহন ঘোষ

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়
আশিস সান্যাল

মুখবন্ধ

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ভারতের দলিত শ্রেণীর মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। জাত-পাতের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন তীব্র জেহাদ। ব্রাহ্মণ্যবাদ যে জাত-পাতের ধারক ও বাহক, বেদ-পুরাণ-স্মৃতি ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে তিনি এই সমস্যার মূল কোথায়, তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে গেছেন। এই খণ্ডে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিত্ত ও প্রশাসন ব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক বিত্তের বিবর্তন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। ভারতীয় সমাজ-প্রগতি ও বিত্ত ব্যবস্থার ইতিহাসে তাঁর এই পর্যালোচনা খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা-বিভাগ ইংরেজিতে আম্বেদকর রচনা-সম্ভার প্রকাশের সময় গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করে এগুলি সংকলনভুক্ত করেছেন। কোম্পানির আমল ও ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন বিত্ত ব্যবস্থা ও প্রশাসন বিষয়ে আগ্রহী যে-কোনও ব্যক্তির কাছে খণ্ডটি খুব-ই প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।

অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটি প্রকাশের ব্যাপারে অনুবাদক, অনুমোদক, পরামর্শ-পরিষদ এবং ড. আম্বেদকর ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই বাংলা সংস্করণের সম্পাদক অধ্যাপক আশিস সান্যালকে। আশা করি, অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।

মেনকা গান্ধী

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
নভেম্বর, ১৯৯৯

সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হল :—

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয় স্থাপন, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি প্রদান, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করা, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ করা, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান এবং (৭) দিল্লির ২৬ আলিপুর রোডে ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক প্রতিষ্ঠা করা।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মাননীয়া কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সচিব আশা দাস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার প্রয়াসে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই ফাউন্ডেশনের নির্দেশক কৃষণ লালকে। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরও যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ড. এম. এস. আহমেদ
সদস্য-সচিব
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

নতুন দিল্লি
নভেম্বর, ১৯৯৯

সম্পাদকের নিবেদন

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অধ্যয়নকালে ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর অর্থনীতি বিষয়ে এমন কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল। প্রশংশিত হয়েছিলেন তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য এবং বিশ্লেষণ দক্ষতার জন্য। বর্তমান খণ্ডে তাঁর এ-রকম দু'টি অসামান্য প্রবন্ধ সংকলিত হল।

তাঁর 'ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক বিত্তের বিবর্তন' বিষয়ক সুদীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধটি বেশ কয়েক বছর বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল না। 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিত্ত এবং প্রশাসন ব্যবস্থা' ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর একটি অসামান্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে ১৯১৫ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর উপাধির জন্য অবশ্য পালনীয় শর্তের আংশিক পরিপূরণার্থে তিনি এটি রচনা করেছিলেন। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য পৌঁছে দেবার জন্য সংকলনভুক্ত প্রবন্ধ দু'টি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই খণ্ডটি প্রকাশের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধীর সক্রিয় সহযোগিতার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ জানাই ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের নিদেশক কৃষণ লালকে। অনুবাদক ও অনুমোদকের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে বলেই আমার মনে হয়। পরবর্তী খণ্ডগুলি আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য পাঠকের মতামত আহ্বান করছি।

কলকাতা
নভেম্বর, ১৯৯৯

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

কৃতজ্ঞতা

Λ মহামহিম মহারানির সরকার, ইউ. কে

Λ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক

Λ লন্ডন স্কুল অফ ইকনোমিক্স অ্যান্ড
পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইউ. কে

Λ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থাগার

Λ বিধান পরিষদ গ্রন্থাগার, মুম্বাই

Λ মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Λ ড. আম্বেদকর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নাগপুর

Λ গোখলে ইনস্টিটিউট অফ পলিটিকস্
অ্যান্ড ইকোনমিকস্, পুনে

Λ সিদ্ধার্থ কলেজ গ্রন্থাগার, মুম্বাই

সূচিপত্র

প্রথম অংশ

দ্বিতীয় অংশ

ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক বিত্তের বিবর্তন

ভাগ - I

প্রাদেশিক বিত্ত : এর উৎস

ভাগ - II

প্রাদেশিক বিত্ত : তার বিকাশ

ভাগ - III

প্রাদেশিক বিত্ত : তার কার্য সাধনের বন্দোবস্ত

ভাগ - IV

১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইনের অধীনে প্রাদেশিক বিত্ত

প্রথম অংশ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিত্ত
এবং
প্রশাসন ব্যবস্থা

কলা বিভাগের স্নাতকোত্তর উপাধির জন্য
অবশ্য পালনীয় শর্তের আংশিক
পরিপূরণার্থে প্রেষিত
১৫ মে, ১৯১৫

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিত্ত এবং প্রশাসন-ব্যবস্থা

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের প্রতিলিপি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করেছিলেন ড: ফ্রাঙ্ক এফ. কোনলন (Frank F. Conlon), এবং ১৯৭৯ সালে নাগপুরস্থিত ড: আম্বেদকর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শ্রী বসন্ত মুনকে উপহার দিয়েছিলেন।

তাঁদের মালিকানায় এবং দখলে থাকা এই অপ্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অনুগ্রহ করে প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য সম্পাদকবৃন্দ কৃতজ্ঞ। সম্পাদকবৃন্দ ড: কোনলনের এই বদান্যতায় দৃষ্টিভঙ্গিটিকেও যথোচিত মর্যাদা দিচ্ছেন এবং এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি ছাপার জন্য মহারাষ্ট্র সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নাগপুরস্থিত ড: আম্বেদকর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তাকেও যথোচিত মর্যাদা দিচ্ছেন।

I

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঐতিহাসিক বিবর্তনের ব্যাপারে গভীর অলোচনায় না গিয়ে এর প্রশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাচ্ছন্দে বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে এই ভাবে :

১। মালিকবর্গের সমিতি (Court)

এই সমিতি গঠিত হয়েছিল 'এক নির্দ্ধারিত পরিমাণে ইস্ট ইন্ডিয়া সংভারের অংশীদারদের নিয়ে, যারা নিজেদের নিজস্ব গোষ্ঠী থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিদের (চব্বিশ) নির্বাচিত করে ভোটপত্রের মাধ্যমে, যাঁদের উপর দায়িত্বভার অর্পিত কর্তৃপক্ষের ব্যবহারিক প্রক্রিয়াগুলির (Proceedings) উপর সীমিত নিয়ন্ত্রণ ও কড়া নজরদারির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখে ভারতের ও ইংল্যান্ডের স্বার্থের পক্ষে যা অত্যন্ত হিতকর বলে বিবেচিত হতে পারে এমন সব রকমের ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা করা ও কার্যকর করার ভার ন্যস্ত করছে মালিকবর্গ।'

এই সমিতিতে আসন ও ভোটের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি নিম্নরূপ :

৫০০ পাউন্ড সংভারের মালিক এই সমিতিতে একটি আসনের অধিকারী ১০০০ পাউন্ড সংভারের মালিক একটি ভোটের অধিকারী ৩০০০ পাউন্ড সংভারের মালিক দুইটি ভোটের অধিকারী ৬০০০ পাউন্ড সংভারের মালিক তিনটি ভোটের অধিকারী ১০০০০ থেকে ১০০০০০ পাউন্ড এবং তার বেশি সংভারের মালিক চারটি ভোটের অধিকারী।

এছাড়া ভোটদানের অন্তত এক বছর আগে থেকে সংভারের দখলে থাকা অত্যাবশ্যক ছিল। পরিবর্ত ব্যক্তির দ্বারা (Proxy) ভোট ব্যবস্থা ছিল না এবং নাবালকরা আইনের মাধ্যমে ভোটদানের অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল।

অভিজাত সম্প্রদায়, লর্ড, সাধারণ মানুষ, নারী, যাজকমণ্ডলী, সম্রাট ও কোম্পানির উভয়ের-ই সামরিক ও অসামরিক আধিকারিকরাই ভোটদাতা বলে গণ্য হতেন।

মালিক-সমিতির অধিবেশন প্রতি তিন মাস অন্তর—মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বরে হয় তার ব্যবস্থা ছিল। সমিতির বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন ৯ জন মালিক-ই পর্যাপ্ত সংখ্যা। পদাধিকার বলে অধ্যক্ষ হতেন সভাপতি, যিনি অধিবেশন পরিচালনা করতেন। সমিতির অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তাব উপস্থাপিত করতেন এবং কোম্পানির ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব-পত্র সদস্যদের সামনে পেশ করতেন।

মালিক-সমিতিকে অধিকার দেওয়া হয়েছিল—

১। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা যাতে পরিচালক বর্গের সমিতি বলতে যা বুঝায় তা গঠন করা সম্ভব।

২। নির্দিষ্ট সংসদীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে পুঁজি সংভারের ওপর লভ্যাংশ ঘোষণা করার।

৩। সংসদের বিধিবদ্ধ আইনগুলির সঙ্গে বিরোধে না যাওয়ার শর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৎ শাসনে বাধা সৃষ্টিকারী সেই সব উপ-নিয়মাবলি রচনা করা, পরিবর্তন করা বা রদ করার।

৪। বেতন বা বার্ষিক ২০০ পাউন্ডের ওপর অবসরভাতা বা ৬০০ পাউন্ডের অধিক কোনো আনুতোষিক (Gratuity) সাধারণ ভাবে বৃদ্ধির ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ করার।

৫। উৎকৃষ্ট পরিষেবার জন্য আর্থিক পুরস্কার প্রদান করার।

২। পরিচালক বর্গের সমিতি

এর সদশ্য সংখ্যা চব্বিশ। এর পরিচালকরা নির্বাচিত হতেন সেই সব মালিকদের দ্বারা যাঁদের ভোটাধিকার যোগ্যতা ছিল। পরিচালক বর্গের সমিতির জন্য প্রার্থীর যোগ্যতাগুলি হল:

১। প্রার্থীকে অবশ্যই গ্রেট ব্রিটেনের জন্মগত বা নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত (Naturalised) প্রজা হতে হবে।

২। তাঁকে অবশ্যই ২০০০ পাউন্ডের সংভারের অধিকারী হতে হবে (তা যে কোনও পূর্ববর্তী সময়ের-ই হোক না কেন)।

৩। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড অথবা সাউথ সি কোম্পানির পরিচালক হওয়া চলবে না।

৪। সমিতিতে পদ প্রাপ্তির পর দু বছরের জন্য তাঁকে ইংল্যান্ডের অধিবাসী হতে হবে।

৫। তাঁর প্রস্তাবিত নির্বাচনের দু'বছর আগে কোম্পানির কৃত্যকে (Service) কোনও প্রকারের নৌ-বাহিনীতে ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে পদের অধিকারী অবশ্যই থাকতে পারবেন না।

৬। তিনি কোনও রকমের অজুহাত দেখিয়ে বা যে কোনও প্রকারের মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে পরিচালক হবার জন্য নিজের বা অন্য কোনও ব্যক্তির নির্বাচনের জন্য প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ভোট পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারবেন না।

৭। তাঁকে অবশ্যই শপথ নিতে হবে :

(ক) কোনও ব্যক্তিগত ব্যবসা করব না।

(খ) স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে ছাড়া অন্য কোনও ভাবে কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখব না।

(গ) সম্রাটের অধীনে ভাতাদি সহ বেতন বিশিষ্ট কোনও কর্ম বা পদের অধিকারী হতে পারব না।

নানাবিধ দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্য কতিপয় সমিতির ওপর কার্যভার অর্পণ করা হয়েছিল। সমিতি উপ-বিভাজিত হয়েছিল ঐসব সমিতিতে। সেগুলি ছিল—

১। গুপ্ত সমিতি

২। পত্রাচার সমিতি (Correspondence)

৩। কোষাগার সমিতি

৪। সরকারী সেনাদল ও খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র ভাণ্ডার সমিতি

৫। আইনের সাহায্যে প্রতিবিধান ব্যবস্থা সমিতি

৬। সামরিক আইনঘটিত বিষয় সম্পর্কিত সমিতি

৭। হিসাব-নিকাশ সমিতি

৮। ক্রয় (Buying) সমিতি

৯। পণ্যাগার (Warehouse) সমিতি

১০। ইন্ডিয়া হাউস সমিতি

১১। জাহাজ সমিতি

১২। বেসরকারি ব্যাপার (Trade) সমিতি

১৩। অসামরিক মহাবিদ্যালয়

১৪। সামরিক মহাবিদ্যালয়।

কেরানি, সমর শিক্ষার্থী (Cadet) এবং সহকারী শল্যচিকিৎসক ইত্যাদির মত সকল প্রকারের নিযুক্তিকরণের কাজটি করতেন পরিচালকরা। অসামরিক ও সামরিক কৃত্যক গুলিতে নিয়োগ করা হত উভয় মহাবিদ্যালয়ের স্নাতকদের মধ্যে থেকে, যে মহাবিদ্যালয়গুলি কোম্পানির রাজস্বের ওপর নিছক বোঝা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

৩। ভারত বিষয়ক কমিশনারদের পর্যদ্ (নিয়ন্ত্রণ পর্যদ্)

পর্যদের ক্ষমতাগুলি নিম্নরূপ:

১। 'ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত দেশ ও দ্বীপগুলির ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলগুলির ওপর এবং ঐ স্থানগুলিতে বাণিজ্যরত বণিকদের সঙ্ঘবদ্ধ কোম্পানির কাজকর্মের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ রাখা।'

২। 'অতঃপর নির্দেশিত পদ্ধতিতে ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলির অসামরিক বা সামরিক সরকার বা রাজস্বাদির সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জড়িত সব ধরনের কর্ম, ক্রিয়াপ্রণালী (Operation) এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধান, নির্দেশদান এবং নিয়ন্ত্রণ করা।'

'উক্ত পর্যদের সকল সদস্য, সব রকমের সুযোগ সুবিধা মতো সময়ে উক্ত সঙ্ঘবদ্ধ কোম্পানির সকল চৌহদ্দিতে (Palers) এবং স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত দলিল পত্রাদির নাগাল পেতে পারবেন এবং তাঁরা তাঁদের প্রয়োজন মতো সেগুলির অংশ বিশেষ বা প্রতিলিপি পাবেন। পরিচালক সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত দেশ ও দ্বীপপুঞ্জের ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত অঞ্চল গুলির অসামরিক বা সামরিক সরকার অথবা রাজস্বাদি সংক্রান্ত পরিচালক সমিতির এবং কোম্পানির মালিকদের সাধারণ অথবা বিশেষ সমিতিগুলির সব রকমের সভার কার্যবিবরণী, নির্দেশাবলি, প্রস্তাব ও অন্যান্য ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার প্রতিলিপি ঐ ধরণের নিজ নিজ সভা অনুষ্ঠিত হবার আট দিনের মধ্যে পর্যদের হাতে তুলে দেবে এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ তাঁদের কোনও কর্মচারীর কাছ থেকে পাওয়া সব সরকারি কাগজপত্রের প্রতিলিপিও দেবেন সেগুলি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে; এবং ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চলের অসামরিক ও সামরিক সরকার বা রাজস্বাদি সংক্রান্ত সব রকমের চিঠি-পত্র, নির্দেশ (Instruction) ও অনুজ্ঞার প্রতিলিপিগুলি যা ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে কোম্পানির যে-কোনও কর্মকারীকে পরিচালক সমিতি পাঠাবার অথবা ডাক যোগে প্রেরণের ইচ্ছা পোষণ করে সেগুলিও দিতে হবে এবং ভারতবর্ষ

ও তৎসন্নিহিত দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলির সামরিক ও অসামরিক সরকার ও রাজস্বাদি, সংক্রান্ত যে-সব আদেশ ও নির্দেশাবলি যা তাঁরা মাঝে মাঝে পাবেন, পর্যদ থেকে সেগুলির দ্বারা পরিচালক সমিতি শাসিত হবেন ও বাধ্য থাকবেন এবং যথোচিত আনুগত্য প্রদর্শন করবেন।'

'তলব করার পর ১৪ দিনের মধ্যে যে কোনও বিষয়ে তাঁদের অভিপ্রেত সরকারি সংবাদ পর্যদকে পাঠাতে পরিচালক সমিতি যখন-ই অবহেলা করবে, তখন-ই পর্যদের পক্ষে (উপর্যুক্ত মতে উক্ত পরিচালক সমিতি কর্তৃক প্রেরিতব্য সরকারি সংবাদের প্রতিলিপি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই) বৈধ হবে ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলগুলির সামরিক বা অসামরিক সরকার সংক্রান্ত উপর্যুক্ত প্রেসিডেন্সিগুলি অথবা অন্য যে কোনও সরকারকে প্রদত্ত কোনও আদেশ অথবা নির্দেশগুলির প্রতিলিপি তৈরি করা ও পাঠানো পরিচালকদের কাছে এবং পরিচালকরা বাধ্য থাকবেন, প্রচলিত নিদর্শ পত্রে (Form), সরকারি সংবাদ পাঠিয়ে দিতে (তাঁদের নিকট প্রেরিতব্য উক্ত আদেশ ও নির্দেশগুলি মর্ম অনুসারে) ভারতবর্ষস্থিত যথাক্রমে সরকার ও প্রেসিডেন্সিগুলিকে, যদি না উক্ত আদেশ ও নির্দেশ সম্বন্ধিত কোনও ব্যাপারে পরিচালক কর্তৃক পর্যদের কাছে করা কোনও নিবেদনের ভিত্তিতে পর্যদ সেগুলিতে কোনও অদল বদল করার নির্দেশ দেন, সেই নির্দেশাবলি পরিচালক সমিতি অনুমোদন করতে বাধ্য থাকবেন।

নিয়ন্ত্রণ পর্যদ উপ-বিভাজিত হয়েছিল ছয়টি বিভাগে তাদের কাজকর্মের উপযোগী হয়ে ওঠার জন্য: (১) হিসাব-নিকাশ, (২) রাজস্ব, (৩)বিচার বিভাগীয়, (৪) সামরিক, (৫) গুপ্ত এবং রাজনৈতিক, (৬) পররাষ্ট্র ও জনসাধারণ।

ভারতবর্ষে স্থানীয় শাসন প্রণালী ছিল এই রকমের :

দেশটি তিনটি প্রেসিডেন্সিতে বিভক্ত হয়েছিল। যথা বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই। সরকারের অবস্থান স্থল ছিল যথাক্রমে ফোর্ট উইলিয়াম, ফোর্ট সেন্ট জর্জ এবং খোদ বোম্বাইতে।

গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ স্থানীয় প্রশাসন বিভাজিত ছিল এই তিনটি সরকারের মধ্যে প্রত্যেকেই সমশ্রেণীর মর্যাদা পেত। কেন্দ্রীভূতকরণের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ স্থানীয় প্রশাসনভার ন্যস্ত হয়েছিল বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়ামের লাট সাহেবের হাতে, অন্য দুজন লাটকে বাংলাদেশের লাটের অধীনস্থ করে এবং বাংলাদেশের লাটকে ভারতের বড়লাট করে।

সম্রাটের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালক সমিতি বড়লাটকে নিযুক্ত করতেন। বড়লাটকে সাহায্য করত এক পরিষদ, যা সর্বোচ্চ পরিষদ নামে পরিচিত ছিল। মূলত চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেটি, তাঁদের মধ্যে তিনজনকে অবশ্যই কমপক্ষে দশ বছরের জন্য ভারতবর্ষে কোম্পানির কর্মচারী হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। চতুর্থজন কোম্পানির পরিষেবাভুক্ত নাও হতে পারতেন। ভারতবর্ষে সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন বড়লাটের দপ্তরের একজন পদাধিকার বলে হওয়া সদস্য। ১৮৫৩ সালে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এই সর্বোচ্চ পরিষদ সম্প্রসারিত হয়েছিল দু'জন বিধানিক (Legislative) সদস্যকে যুক্ত করে যাঁদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল আইন ও প্রবিধান (Regulative) রচনা করার ব্যাপারে সভায় সরকারিভাবে আসন গ্রহণ করতে এবং ভোট দিতে। এই ছ'জন বিধানিক সদস্যদের মধ্যে চারজনকে হতে হবে বোম্বাই, মাদ্রাজ, বঙ্গদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোম্পানির জনপালন কৃত্যকের পদাধিকারী বাকি দুটি পদ পূরণ করা হত কলকাতার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি এবং অন্য একজন বিচারপতির দ্বারা। এগারো সদস্য বিশিষ্ট এই পরিষদে ভিক্টোরিয়া অধ্যায় ৯৫, ১৬ এবং ১৭ সংবিধির (Statute) ২২ নং ধারা অনুসারে আরও দুইজন সদস্যকে যুক্ত করার অধিকার বড়লাটের ছিল। কিন্তু বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত অন্তত এই ক্ষমতার প্রয়োগ করা হয় নি।

আইন পরিষদের কার্যাবলির জন্য বারোজন সদস্য এবং কার্যনির্বাহি সরকারের কার্যাবলির জন্য বড়লাট এবং সর্বাধিনায়ক সহ ৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই সর্বোচ্চ পরিষদ আপেক্ষ সংখ্যা (Quorum) গঠনের জন্য সাতজন সদস্যকে পর্যাপ্ত গণ্য করা হত।

বড়লাটের ক্ষমতা এতই অধিকমাত্রায় ছিল যে তিনি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলেন। পরিষদে সব রকম আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি যে শুধু প্রতিষেধ (Veto) প্রয়োগ করতে পারতেন তা নয়, সেই সঙ্গে পরিষদকে বাদ দিয়েই ব্যবস্থাগ্রহণের উদ্যোগ নিতে এবং তা কার্যকর করতে পারতেন। দেশীয় রাজ্য গুলিতে ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং অ-নিয়ন্ত্রিত প্রদেশগুলিতে কমিশনার নিযুক্ত করা সহ সকল প্রকারের 'রাজনৈতিক' নিয়োগগুলি করতেন তিনি নিজে। তিনি নিম্নআদালতের বিচার এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও বঙ্গদেশের উপ-লাট (Lieu-tenant Governor) নিয়োগ করতে পারতেন এবং বঙ্গদেশ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সামরিক পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়টিও নিয়ন্ত্রণ করতেন।

চারটি অধীনস্থ সরকারের কোনও একটির চৌহদ্দির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সব জেলা সপরিষদ বড়লাটের প্রত্যক্ষ অধিক্ষেত্রের (Jurisdiction) অধীনস্থ ছিল, যিনি দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর সেই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, যা তাঁর উপর বর্তে ছিল সন্ধিপত্রের শর্তাদি অনুসারে। বড়লাটের সরকারি কর্মচারিবৃন্দ বিভক্ত ছিল চার বিভাগে। প্রত্যেকটির প্রতিনিধিত্ব করতেন একজন সচিব। ঐ বিভাগগুলি ছিল:

১। পররাষ্ট্র বিভাগ (দেশীয় রাজ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র)।

২। স্বরাষ্ট্র বিভাগ, বিচার বিষয়ক ও রাজস্ব সংক্রান্ত পত্রাদি লেখা-লিখির ব্যাপার দেখাশোনা করা।

৩। বিত্তীয় বিভাগ

৪। সামরিক বিভাগ

এর অতিরিক্ত রাজনৈতিক ও বিত্তবিভাগের সচিবদের নিজস্ব আলাদা আলাদা গুপ্ত বিভাগ ছিল। তাঁদের ওপর গোপন সরকারি সংবাদাদির দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকত।

মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের অধীনস্থ সরকারগুলি প্রশাসিত হত এইভাবে:— প্রত্যেকের নিজ নিজ লাট এবং তিন সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ ছিল (যার মধ্যে সর্বাধিনায়ক অন্তর্ভুক্ত থাকতেন)। উভয় প্রদেশের লাটসাহেব এবং পরিষদ সদস্যদের নিয়োগ করত পরিচালক সমিতি। বঙ্গদেশ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি শাসিত হত বড়লাট কর্তৃক নিযুক্ত উপ-লাটদের দ্বারা। অধস্তন সরকারগুলিকে আইন প্রণয়নের বা নতুন পদ সৃষ্টি করার বা 'সপরিষদ ভারতের বড়লাটের পূর্বানুমোদন ছাড়া কোনও রকম বেতন, আনুতোষিক (Gratuity) বা ভাতা দিতে পারার' ক্ষমতা প্রদান করা হয় নি। আইনের প্রয়োজন হলেও এই চরম কঠোর নিয়মানুবর্তিতা কিন্তু প্রথার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ছিল না; বড়লাটের ওপর অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা না চাপাবার জন্য ছোটখাট কাজগুলি লাটসাহেব-ই সম্পাদন করে নিতেন এবং ঐ বিষয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পাঠাতেন, যে কর্তৃপক্ষ কার্যত তা পুনর্বিবেচনা করতেন এবং অনুমোদন করতেন। বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছিল বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারদের পরিচালক সমিতির সঙ্গে সরাসরি সংবাদ আদান-প্রদানের এবং তারা তাদের কর্ম-প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত-সার পাঠিয়ে দিত সমিতি ও ভারত সরকারকে। ভারত সরকারের সহায়কসংস্থাগুলি ভূষিত ছিল যা অসামরিক

চুক্তিবদ্ধ বা চুক্তিবদ্ধ নয়), সামরিক, নৌবাহিনী এবং গির্জা ও যাজক সম্প্রদায়ের কৃত্যক নামে পরিচিত ছিল ও আছে। রাজস্ব আদায় ও বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল জনপালন কৃত্যকে।

অসামরিক ও সামরিক বিভাগে নিয়োগের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডে দুটি মহাবিদ্যালয় চালাত (১) হেইলবার্গ (Heileburg) মহাবিদ্যালয় এবং (২) অ্যাডিস কম্বে অ্যাকাডেমি (Adis Combe Academy) প্রতিটি ছাত্রের প্রশিক্ষণ কালের জন্য কোম্পানিকে প্রায় বার্ষিক ৯৬ পাউন্ড দিতে হত।

সব রকমের রাজস্ব আদায় করা হত সর্বোচ্চ ভারত সরকারের নামে এবং তা হস্তান্তরিত করা হতো সর্বোচ্চ কোষাগারে, যার দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিতও হত। রাজস্ব বিষয়ে, স্থানীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। একটা প্রদেশের ঘাটতি পূরণ করা হত অন্য প্রদেশের উদ্বৃত্ত দিয়ে এবং কোনও বিশেষ একটি প্রদেশে যুদ্ধবিগ্রহাদির জন্য গৃহীত ঋণের উত্তর দায়িত্ব থাকতো সমগ্র ভারতবর্ষের রাজস্বের ওপর সংক্ষেপে, বিত্ত এবং প্রশাসন উভয়েই সম্পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল প্রাচীন শাসন প্রণালী বিশিষ্ট, ফ্রান্সে যেমনটি ছিল তার মতো।

প্রশাসনের বিশুদ্ধ পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানেই শেষ করা হচ্ছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আসা পর্যন্ত আমরা এর সমালোচনা মুলতুবি রাখছি।

ভারতবর্ষকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পশ্চিম ইউরোপ কেন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষত এবং কি ভাবে করতো তা অবশ্যই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। নিয়তির চূড়ান্ত বিচারে ইচ্ছামতো বেছে নেওয়ার ব্যাপারে করণীয় বলতে খুব-ই কম ছিল। ক্রমশ জনগণ অধ্যুষিত দেশের জন্য সংগ্রামরত কামারা (The Cama), আলবুকার্করা, বুসিরা (The Busseys), লালিরা (The Lallys), ক্লাইভরা (The Clives), ম্যালকমরা। আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন নেতাদের সেনা বাহিনীগুলির অনুগামী হয়েছি আমরা ব্যাঙ্কুয়ো (Banquo) বংশের প্রেতাত্মাদের ধারাটিকে যেন অনুকরণ করে, যা শেক্সপিয়রের ম্যাকবেথকে ক্রমশ আতঙ্কিত করেছিল যে তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

II

এই অধ্যায়ে আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করতে চলেছি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে রাজনৈতিক শাসক হিসাবে ও তার আর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং কি ভাবে কোম্পানি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক শাসকে পরিণত হয়ে উঠেছিল

তা সর্বস্তরে বর্ণনা না করে।

এ ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে ভারতের ওপরে সর্বভৌম কর্তৃত্ব স্থাপনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সফল হয়েছিল যা আমাদের অতীতের আলোচনা থেকে পরিলক্ষিত হতে পারে। বিভিন্ন প্রদেশে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পর কোম্পানি তার শাসন সম্প্রসারিত করেছিল সমগ্র উপদ্বীপে এবং আইনগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার নামে পরিচিত অন্যভাবে বললে বলা যায়, যে তা সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল ও যৌথভাবে পরিচালিত করছিল রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম। এই যৌথ কর্মতৎপরতার ফলে ভারতে কোম্পানির রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রশাসন হয়ে উঠেছিল এক জটিল ব্যাপার। বাণিজ্যিক এবং রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত লাভগুলি পৃথক করে রাখার চেষ্টা না করেই এক সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়েছিল। আর্থ- ব্যবস্থার যে কোনও শিক্ষার্থীকে অতএব ১৮১৪ সালের শেষ পর্যন্ত সময়কালটিকে উপেক্ষা করে যেতে হবে, যে বছরটিতে সংসদের একটি, আইনের বলে কোম্পানি বাধ্য হয়েছিল আর্থিক ও বাণিজ্যিক হিসাবপত্র আলাদা আলাদা করে রাখতে।

এই কথা মনে রেখে এবার আমরা রাজস্বের হিসাবের খাতগুলির ওপর নজর দেব।

(১) ভূমি রাজস্ব

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে খুব তাড়াতাড়ি শিল্পায়ন হওয়া সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে দেশটিকে কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং আগেকার যুগের মতো এখনও জমিই সরকারের রাজস্বের প্রধান অংশ যোগাত।

সঙ্গতভাবেই হোক বা অন্যায় ভাবেই হোক ব্রিটিশ সরকার সরকারি ভূমি মালিকানার নীতি বনাম বেসরকারি সম্পত্তির নীতিটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল ঐ কার্যধারার (Policy) সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এর ভূমিরাজস্ব পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

ভারতবর্ষে ভূমি রাজস্বের বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল ইংল্যান্ডের সংসদীয় বিবরণী পুস্তকের ভাষায় সেগুলির বর্ণনা দেওয়াই ভাল।

১। কর্নওয়ালিশের জমিদারি বন্দোবস্ত

এই পদ্ধতিতে সুবিধার সবচেয়ে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যটি হল আদায়ের সহজসাধ্যতা, কারণ একটা বড় জেলার রাজস্ব কিছু পরিমিত সংখ্যক জমিদার বা করদাতার কাছ

থেকে পাওয়া অত্যন্ত সহজ, সরকারের নিজস্ব আধিকারিকদের দ্বারা খুটিনাটি ভাবে আদায় করার তুলনায়, এবং অপর সুবিধাটি হল ১৮৩১ সালের সি-৩৩৩৯-এর ফলাফলে অনেক বেশি মাত্রার নিশ্চয়তা।

জমির রায়তী স্বত্বের (Tenure) এই পদ্ধতিটির উদ্ভব হয়েছিল এই ভাবে: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বঙ্গদেশ, বিহার এবং ওড়িশার দেওয়ানির রাজস্ব নিজেদের দখলে পেল, তখন তারা দেখল যে মুসলমান শাসন ব্যবস্থার অধীনে রাজস্ব আদায় হচ্ছে আধিকারিকদের সুবেদারগণ্য মধ্যস্থতায়, যারা জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি বিবিধ খেতাব বিশিষ্ট হয়ে কখনও বেশি, কখনও কম আয়তনের জেলাগুলির ভারপ্রাপ্ত ছিল, এবং যারা এক লপ্তে কোযাগারে রাজস্ব জমা দিত, যার জন্য তাদের দেখা যেত পর্যাপ্ত সংখ্যক জেলা পরিচালনা করতে এবং তাদের উত্তরদায়িত্ব ছিল শুধু প্রতিবছর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারকে দেওয়ার। তাদের মধ্যে অনেকে উত্তরাধিকারের শর্তে জেলা অথবা তালুক গুলিকে (Estate) নিজেদের দখলে রাখত। [২। তুলনীয় সি ৩১১৪, ৩১১৫, ৩২১৫] বঙ্গদেশ রাজ্যটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে আসার পর চরম অপব্যবহারের প্রচলন দেখা গেল এবং তার প্রয়োগ করতো রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত নানা ধরনের মানুষ। কাজের ফিরিস্তি এতই বিশাল ছিল যে তা লর্ড কর্নওয়ালিশ এবং তৎকালীন সরকারকে শঙ্কিত করে তুলল এবং তাঁরা চিন্তা করে দেখলেন যে রায়ত বা ক্ষুদ্র চাষীদের রক্ষা করতে হলে এক জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনও ভাল পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যাবে না, যে জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে অনেক বেশি লাভের আশা তাঁরা করেছিলেন: যে উপযুক্ত কারণের ভিত্তিতে তাঁরা নীতিগতভাবে এগোতে চেয়েছিলেন তা হল এই যে, ঐ সব জমিদাররা, যাঁরা তাঁদের পাওয়া জমিতে স্থায়ী স্বত্ব থাকার দরুন রায়তদের সমৃদ্ধিতে তাদেরও স্বার্থ থাকতে পারে যেভাবে ইংল্যান্ডের ভূস্বামী তার রায়তের স্বার্থ সম্বন্ধে চিন্তা করে। আশা করা হয়েছিল, এ থেকে দুটি সুফল পাওয়া যাবে, দেশে অভিজাত সম্প্রদায়ের ভূস্বামী সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি রায়ত অথবা ক্ষুদ্র চাষিদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এক পিতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে যা জমিদারদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। [১, তুলনীয় সি ৩১৩৬] কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত সব মানুষের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং অত্যন্ত সদিচ্ছা নিয়ে ১৭৯৩ সালে জমিদারদের, তারা জেলাগুলির প্রকৃত অর্থে ভারপ্রাপ্ত চাষি বা আধিকারিক হিসাবেই হোক বা বংশানুক্রমেই হোক অথবা বিশেষ নিযুক্তির দ্বারাই হোক, তাদের দেশের ভূস্বামী হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার ফলে জমিতে মালিকানা তাদের উপর বর্তেছিল প্রায় যে অর্থে ইংল্যান্ডে নিঃশর্ত ভাবে অধিকারপ্রাপ্ত

দখলিকাররা পেয়ে থাকত। যে পরিমাণ অর্থ জমিদাররা দিতে অভ্যস্ত ছিল তা নির্ধারিত হত বিগত কয়েক বছরের ওপর নজর রেখে, কর অথবা নির্ধারণ (Assessment) চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং চুক্তি হয়েছিল ভূমিরাজস্বের এই পরিমাণ কখন-ই বাড়ানো হবে না।'জমিদারি বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত এই বন্দোবস্তের এটাই ছিল স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। [২, তুলনীয় ১৮৩১, সি— ৩১১৫, ৩১১৬, ৩১৩৬, ৩২১৫, পুনরীক্ষণ কমিটি পৃ: ২১]

২। গ্রামীণ ভূমিরাজস্ব পদ্ধতি

গ্রামীণ লোক-সমাজের প্রতিষ্ঠান প্রধানত পাওয়া যেত এবং এখনও পাওয়া যায় উত্তর ভারতে। জমির মালিকানা স্বত্ব ন্যস্ত ছিল গ্রামে বসবাসকারী সমগ্র লোক সমাজের ওপর। গ্রামের প্রশাসন ভার তুলে দেওয়া হয়েছিল গ্রামবাসী দ্বারা নির্বাচিত মোড়লের (Headmen) হাতে এবং তাদের দ্বারা অপসারিত হবার শর্তাধীনে। এই পদ্ধতি অনুসারে জমি কখনও এক-ই গ্রামের মানুষদের, কখনও বা প্রতিবেশী গ্রামের মানুষদের ভাড়া দেওয়া হত, যখন কিছু কিছু অংশ ও কিছু কিছু অধিকার দখলে রাখত গ্রামের বিভিন্ন কারিগর ও কারুশিল্পীরা, যেমন বিদ্যালয়- শিক্ষক, রজক, পরামানিক, সূত্রধর, কর্মকার, পাহারাদার, গ্রামের হিসাব রক্ষক ইত্যাদি, যাদের প্রত্যেকের অধিকার ছিল গ্রামের স্বীকৃত খরচ পত্রাদি এবং বহিরাগত আতিথেয়তা জানাতে ব্যয়ভার বহন করার জন্য আলাদা করে সরিয়ে রাখা জমির কিছু অংশের ওপর [১, তু: ১৮৩০, এল ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০৫, ৪০৬, ৫২৯] এই গ্রামীণ লোক সমাজগুলি ছিল ছোট ছোট প্রজাতন্ত্র, তাদের নিজেদের জন্যে যা যা প্রয়োজন তার সবটাই তারা নিজেদের মধ্যে থেকেই পেত এবং কোনও রকমের বৈদেশিক সম্পর্কবিহীন ছিল না বলা চলে। একটার পর একটা রাজ বংশের পতন হয়েছে, একটা বিপ্লব অনুসরণ করেছে আর একটা বিপ্লবকে। হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরাজ, সবাই পালা করে প্রভুত্ব করেছে, কিন্তু গ্রামীণ লোক সমাজ থেকে গেছে অপরিবর্তিত। গণ্ডগোলের সময় তারা অস্ত্র ধরতেন এবং নিজেদের সুরক্ষিত করে রাখতেন; [২, তু: ১৮৩২, কমন্স সভার পুনরীক্ষণ (Review) কমিটি, পৃ: ২৯] গ্রামের মোট উৎপাদনের কতটা অংশ সরকারকে দেওয়া হত তা বলা কঠিন; কোনও মালিকের সঠিক কি পরিমাণ সম্পত্তি আছে কর্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানাত, সরকার তাদের বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে জানুক বা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করুক এ ব্যাপারে গ্রামবাসীদের কোনও ইচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না, অতএব তাদের সমধর্মী কেউ তার আনুগতিক প্রদেয় যদি দিতে না পারে তবে

তার মীমাংসা করত সাধারণ গ্রামবাসীরা, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে আসত ঐ ব্যক্তির হয়ে অর্থ প্রদান করত, তবে এগুলি সবাই ব্যক্তিগত বন্দোবস্ত যা তাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত; এবং এই কর নির্ধারণ বলবৎ করার জন্য সরকারের কাছ থেকে কোনও ক্ষমতা পেত না সাধারণ মানুষরা গ্রামের প্রতিটি মানুষকে কি দিতে হবে তা ছিল অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সরকারের পক্ষ থেকে বাঞ্ছনীয় ছিল না। গ্রামের সমৃদ্ধির অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেবার পর করের মোট পরিমাণ কত হবে তার হিসাব কষা হত। এযাবৎকাল সে কত দিয়েছে, কতটা দিতে সক্ষম, গ্রামের জমির অবস্থা এবং উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে কতটা পরিমাণ কর তাদের অবশ্যই বহন করা উচিত। [৩, তু: ১৮৩০, এল ৪০১, ৪০২, ৪০৪, ৫২৮, ৫৮৩, ৫৮৪]

উপযুক্ত খরচাদি সম্বন্ধে সমীক্ষা করেছিল সরকার: প্রতিটি গ্রামের জমির অবস্থা সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয় সংগ্রহ করা হয়েছিল, শুধু নিজেদের কর্মচারীদেরই নয়। সেইসঙ্গে গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও যতটা সম্ভব সাহায্য জোগাড় করা যায় তাই করে আমিনদের উপস্থিতিতে মাঠগুলি পরীক্ষা করা হত, এবং যে মানুষ নিজেরাই আগ্রহান্বিত ছিল তারা এবং রায়তরা এবং প্রতিবেশী গ্রামের মানুষেরাও উপস্থিত হতো আমন্ত্রণ পেয়ে। গ্রামের প্রকৃত সীমা নিদ্ধারিত করা হত, এবং এমন কি গ্রামের অভ্যন্তরস্থ জমির বিশদ বিবরণ, উৎপাদিত সামগ্রী, গৃহাদি, ফলের গাছ এবং অধিবাসীদের এইসব তথ্যাদির ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করা হত [১, তু: ১৮৩১, সি ৩৪৯২]

৩। রায়তওয়ার পদ্ধতি

এই তৃতীয় ধরনের কর নির্ধারণের বিচিত্র নীতিটি যাকে রায়তওয়ার বলা হয় তার কাজ হল দেশের সব জমির উপর সর্বোচ্চ পরিমাণ কর নির্দিষ্ট করা [২, তু: ১৮৩১, সি. ৪৫, ৬৫] নিজের দখলীকৃত মাঠের জন্য প্রতিটি চাষীকে যে নগদ অর্থে খাজনা দিতে হত তা যতটা সম্ভব বেশি স্থায়িত্বের সঙ্গে সমতা রেখে নির্ধারিত হত, ঐ ধরণের খাজনার যোগফল মোট নির্ধারণে (Assessment) নিরূপিত করত। যা প্রতিবছরে চাষবাসের হ্রাস বা বৃদ্ধির সঙ্গে কমতো বাড়ত। রায়তওয়ার পদ্ধতির অপর প্রধান নীতিটি হল অপরের অযথা হস্তক্ষেপের হাত থেকে সব রায়ত বা চাষিদের অধিকারগুলিকে রক্ষা করা যা বর্তমানে সব গ্রামে দেখতে পাওয়া যায়; এবং এ সব অধিকারের ওপর সব রকমের অবৈধ হস্তক্ষেপে বাধা দেওয়া [৩, তু: ১৮৩১, সি. ৫১৫৬:] ফলে রায়তওয়ার পদ্ধতিতে প্রতিটি রায়তের স্বার্থের বিস্তৃত

বিবরণ জানা যেত কিন্তু জমিদারি প্রথায় তা জানা যেত না, প্রথমোক্ত প্রথায় তাই হাতে কলমে কার্যকর করা হত যা শেষোক্ত প্রথায় করার প্রস্তাব থাকত কিন্তু কখনই তা কার্যকর করা হয়নি এবং কখনও তা করতেও পারত না। অর্থাৎ দেশের সব জমির ওপর খাজনা নির্ধারণ (Assessment) নির্দিষ্ট করতে পারেনা। রায়তওয়ার পদ্ধতিতে জমির মোট পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে কর নিরূপণ করা হত। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি শ্রেণীর সম্পত্তিকে মর্যাদা দেওয়া হত, তা সে সবচেয়ে বড় ভূস্বামীই হোক বা সবচেয়ে ছোট হোক। সম্পত্তির প্রতিটি অংশের মাপজোক করে খাজনা নির্ধারণ করা হত। এবং তার ফলে ভূসম্পত্তি হস্তান্তরের সুবিধা হত। কারণ বিক্রির জন্য বাজারে আনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে প্রশ্ন উঠত তা হল — ঐ জমি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের পাবার পরিমাণ কি? [৪, তু: ১৮৩১, সি. ৪৫৬৫, ৪৫৬৭, ৪৫৬৮] রায়তওয়ার বন্দোবস্ত প্রযোজ্য ছিল সব বিষয়ের সর্বাবস্থার ক্ষেত্রে: যেখানে মালিক আছে সেখানে তা সম্পাদিত হত কৃষক অথবা চাষির সঙ্গে: জমির সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন পরিমাণের ক্ষেত্রে সমভাবে; লক্ষ লক্ষ একর জমি বা মুষ্টিমেয় একরের ক্ষেত্রেও। একটি মাত্র জমির মালিক সরকারের কাছে সরাসরি তার শর্তাবলি দিতে পারত এবং তারপর নিজের চাষবাসের কাজে মন দিত, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকে যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অংশ ছাড়া আর বেশি তাকে দিতে বলা হবে না: যদিও এই পদ্ধতিতে খাজনা নির্ধারণের বিষয়টির তারতম্য হতে জমির মূল্য মৃত্তিকার পার্থক্য, জন বসতি, অবস্থান এবং অন্যান্য আঞ্চলিকতার ভিত্তি অনুসারে: এবং এমন কি নিম্ন হারে নির্ধারিত খাজনা প্রদানকরা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়ে উঠলে অধিকতর মাত্রায় কর দিতে বাধ্য হত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সর্বোৎকৃষ্ট জমির জন্য এক সর্বোচ্চ পরিমাণ খাজনা নির্ধারিত থাকত ও তদাতিরিক্ত সব রকম উৎপাদন নির্দিষ্ট হত ভূস্বামীর লভ্যার্থে, এবং চরম দুর্দশার ক্ষেত্রে রেহাইও দেওয়া হত। [১, তু: ১৮৩২, সি. আর পৃ-২০] জমিদারির ব্যাপারে রায়তওয়ার প্রভৃতি অপর যে বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিল তা হল শুধুমাত্র নামে মালিক থাকা মুষ্টিমেয় মানুষদের বদলে স্বাধীন মালিকদের একটা বড় সংস্থার সৃষ্টি: এবং জনগণের একটা বড় অংশের জন্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থাও ছিল, কিন্তু জমিদারির ক্ষেত্রে সেগুলি সঞ্চিত হত মুষ্টিমেয়দের সুবিধার্থে, এমন কি রায়তওয়ার পদ্ধতিতে যথেষ্ট মাত্রায় পুঁজি সঞ্চিত হয়ে ওঠার প্রবনতাও দেখা যেত। [২, তু: ১৮৩১, সি, ৪৫৭৭, ৪৫৭৮, ৪৫৭৯]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতে ভূমিরাজস্বের পদ্ধতি এই রকম-ই ছিল। এই পদ্ধতির সমলোচনামূলক মূল্যায়ন আমরা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত করে রাখছি।

রাজস্বের অপর গুরুত্বপূর্ণ খাতটি হল আফিম রাজস্ব। অর্থের পরিমাণের বিচারে আফিম রাজস্বের স্থান ছিল ভূমি রাজস্বের পরেই এবং তা ধার্য হত দুটি ভিন্ন ধরনের উপায়ে:

(১) 'বঙ্গদেশ সরকার কর্তৃক চাষ করার ও বিক্রয় করার একচেটিয়া পদ্ধতিতে।'

(২) 'মালওয়ার (Malwa) দেশীয় রাজ্যগুলিতে উৎপাদিত আফিম এবং বোম্বাই থেকে জাহাজ যোগে রপ্তানি করার ব্যাপারে বোম্বাইতে আরোপিত অতি উচ্চহারে রপ্তানি শুল্ক ধার্য করে।'

১৯৯৯ সালে প্রবিধান ৬ (Regulation VI) ধারা ৩ অনুসারে বঙ্গদেশে আফিমগাছের চাষ নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং ১৮০৩ সালের প্রবিধান ৪১, ধারা ২ অনুসারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে।

'আর্থিক দাদন দেবার ভিত্তিতে কিছু নির্বাচিত জেলাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে শাদা আফিম গাছ রোপন করার ব্যাপারে সরকার রায়তদের সঙ্গে এক বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ হত এবং আফিম থেকে উৎপাদিত উৎপাদনকে সরকারের হাতে তুলে দিতে হত এক নির্দিষ্ট হারে.....।১৮৫৬ সালে বঙ্গদেশে একচেটিয়া আফিম ব্যবসা থেকে নিট প্রাপ্তি হয়েছিল ২৭৬৭১৩৬ টাকা।'

আফিমের আন্তপ্রাদেশিক চলাচল থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের এক অপূর্ব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। ১৮৩১ সালের আগে ব্রিটিশরা আফিম কিনতে দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে বস্তুটির ব্যাপারে কঠোরভাবে একচেটিয়া ব্যবস্থা বলবৎ রাখার জন্য ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধির (Resident) মাধ্যমে এবং তা বোম্বাই অথবা কলকাতাতে নিলামে তোলা হত। কিন্তু পর্তুগিজ বসতিগুলিতে ব্যাপক হারে চোরা-পাচার বন্ধ করার জন্য একচেটিয়ার নীতি বর্জন করে পুনর্বাসিত করা হল দেশের মধ্যে দিয়ে চলাচলকরা পণ্যদ্রব্যের ওপর ধার্য শুল্কের পদ্ধতিকে এক ধরনের 'অনুমতিপত্র (Passes) দিয়ে যাতে বোম্বাই পর্যন্ত পরিবহন খরচ উঠে আসতে পারে এমন এক নির্দিষ্ট হার নির্দ্ধারিত করে। চলাচল করা পণ্য দ্রব্যের ওপর ধার্যশুল্ক প্রথম দিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল প্রতিটি ১৪০ পাউন্ডের বাক্সের জন্য ১৭৫ টাকা। এই প্রক্রিয়ায় লাভের পরিমাণে অবনতি ঘটতে দেখায় শুল্কের হার কমিয়ে প্রতি বাক্সের জন্য ১২৫ টাকা করা হয়।

সিন্ধু প্রদেশ জয় করার ফলে পর্তুগিজ অঞ্চলগুলিতে আফিম চোরা চালানের বাড়তি প্রবেশ পথটি বন্ধ হয়ে গেল তার ফলে আশা করা হয়েছিল এবং যথার্থভাবেই আশা করা হয়েছিল যে চলাচলকারী পণ্যদ্রব্যের ওপর ধার্য শুল্ক বাড়তি লাভ দিতে

পারবে। কারণ বাণিজ্যের গতিপথটি পরিবর্তন করা ছিল অসম্ভব। ফলে ১৮৪৩ সালের অক্টোবর মাসে শুল্কের হার বাড়িয়ে প্রতি বাক্সের জন্য ২০০ টাকা, ১৮৪৫ সালে ৩০০ টাকা প্রতি বাক্স এবং ১৮৪৭ সালে ৪০০ টাকা প্রতি বাক্স করা হয়।

৩। লবণ কর

ভারতে লবণ পাওয়া যেত নানা ভাবে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে করও আরোপিত হত বিভিন্ন ভাবে।

লবণ পাওয়া যেত সমুদ্রের জল ফুটিয়ে যেমন বঙ্গদেশে, বা বোম্বাই ও মাদ্রাজে সৌর তাপে বাষ্পীকরণের মাধ্যমে বা প্রকৃতির উৎস থেকে। যেমন পঞ্জাবের লবণ খনি ও রাজপুতানার লবণ হ্রদগুলি থেকে।

বঙ্গদেশে কোম্পানি লবণের ব্যবসা করত একচেটিয়া ভাবে। স্থানীয় অধিকারীরা তা তৈরি করত এবং সব তৈরি করা লবণ এক নির্দিষ্ট অত্যন্ত কম দামে সরকারকে সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ থাকত। তারপর সরকার ঐ পরিমাণ লবণ হিজলি, তমলুক, চট্টগ্রাম, হিরাকান, কটক, বালেশ্বর এবং খরদা (Khoredah) প্রভৃতি স্থানের দুটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এমন এক মূল্যে বিক্রয় করা হত যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকত প্রকৃত মূল্য এবং আমদানিকৃত লবণের ওপর ধার্য শুল্কের সমপরিমাণ বাড়তি অর্থ। এর ফলে 'ভোক্তাদের কাছে গড়পড়তা খুচরা মূল্য' দাঁড়াত প্রতি পাউন্ডে প্রায় এক পেনীর মত।

বেসরকারি ভাবে লবণ প্রস্তুতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কলকাতায় এমন এক পদ্ধতির অন্ত-শুল্ক অনুসারে যা কেবল মাত্র আমদানি করা শুল্কের সমপরিমাণ হতে হবে।

কিন্তু ১৮৩৬ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লোকসভার প্রবর-সমিতির (Select Commitee) সুপারিশের ভিত্তিতে প্রবর্তন করা হল নির্দিষ্ট মূল্যের এবং প্রকাশ্য পণ্য ভান্ডারের (Warehouses) এক পদ্ধতি যেখানে আগেকার মতো পর্যায়ক্রমে বিক্রয়ের পরিবর্তে 'অবিরাম বিক্রয় হতে শুরু করল'।

মাদ্রাজে সরকারের পক্ষ থেকে লবণ প্রস্তুত করা হত এবং শুধু অভ্যন্তরীণ উপভোগের জন্য তা বিক্রয় করা হত। আমদানিকৃত বিদেশি লবণের ওপর ধার্য শুল্ক কমিয়ে করা হল প্রতি পাউন্ডে ৩ টাকা যা ছিল বস্তুটির ক্রয়মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের সমান।

বোম্বাইতে লবণ প্রস্তুতের ভার তুলে দেওয়া হয় ব্যক্তিবিশেষদের হাতে, বস্তুটির

ওপর ধার্য আমদানি শুল্কের সমপরিমাণ অন্তঃশুল্ক ধার্য করার শর্তে। পঞ্জাবের লবণ খনিগুলি চালাত সরকার নিজে এবং খনি থেকেই লবণ বিক্রয় করা হত।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি নির্ভর করত বঙ্গদেশের নিম্ন প্রদেশগুলির ওপর, রাজপুতনার সম্বর লবণ হ্রদের ওপর এবং পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু অংশের ওপর লবণ সরবরাহের জন্য। এমন ভাবে শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল যাতে সকল এলাকা থেকে যখন লবণ পৌঁছাত উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলিতে তখন তাদের মূল্যের জন্য সমতা থাকত।

৪। শুল্ক

প্রতিটি শহরে এবং প্রতিটি রাস্তায় উপশুল্কের (Tolls) আকারে চলাচলকরা পণ্যদ্রব্যের ওপর শুল্ক বা অন্তর্দেশীয় শুল্ক ধার্য ছিল অসংখ্য। কিন্তু সেগুলি রদ করা হয়।

বঙ্গদেশে ১৮৩৬ সালের ১৪ নং আইন দ্বারা, বোম্বাইতে ১৮৩৮ সালের ১ নং আইন দ্বারা এবং মাদ্রাজে ১৮৪৪ সালের ৬ নং আইন দ্বারা এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে সমহার পদ্ধতির শুল্ক চালু করা হয়। এই সব অন্তর্দেশীয় চলাচল করা পণ্যদ্রব্যের ওপর ধার্য শুল্কের কুফলগুলি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের দুটি উৎস আরও আছে:

(১) রপ্তানি ও আমদানির ওপর ধার্য সামুদ্রিক শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক ছিল লবণ ও নীল এর ওপর।

(২) দেশীয় ও ব্রিটিশ অঞ্চলগুলির মধ্যে সীমান্ত রেখা অতিক্রমকারী পণ্যদ্রব্যগুলির ওপর প্রধান কর ধার্য করা স্থল-শুল্ক।

৫। লবণ ও আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা ছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজস্বের অপর উৎস ছিল তামাকের একচেটিয়া ব্যবসা।

৬। সুরাসার ও মদ বিক্রির একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার বিক্রি থেকেও **আবগারি শুল্ক** আদায় হত। অনুজ্ঞাপত্র (Licence) বিক্রয় করা হত সর্বোচ্চ নিলাম-ডাক দাতাকে, যে নিজস্ব দামে বিক্রি করার চুক্তিতে আবদ্ধ হত, কিন্তু ব্যবসা করার নির্দিষ্ট সময় এবং দোকানের অবস্থানস্থলের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করত সরকার।

৭। চক্র-কর আরোপিত হয়েছিল ছ্যাকরাগাড়ি, পশু বাহিত দু-চাকার গাড়ি, বগিগাড়ি ইত্যাদির ওপর।

৮। শ্রেণীভুক্ত নয় এমন করগুলির সমষ্টিবাচক নাম হল 'শেয়ার শুল্ক'। দেশের বিভিন্ন অংশে তা ছিল বিভিন্ন প্রকার। একসময় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল দেশীয় রাজস্ব আধিকারিকদের দ্বারা অনিয়মিত আদায়ীকৃত অর্থ।

মাদ্রাজে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল চলাচলকারী পণ্যদ্রব্যের ওপর ধার্য শুল্ক, বঙ্গদেশে এই খাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তীর্থযাত্রী কর, দাক্ষিণাত্যে 'রাজস্বের এই উৎসটি' দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত ছিল। প্রথমটির নাম ছিল মোহতুরফা (Mohturfa), যার মধ্যে পড়ত দোকান, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ওপর আরোপিত কর; অপরটির নাম ছিল বালুতা[১] ,যা 'অন্তর্ভুক্ত' করত চাষিদের কাছ থেকে। গ্রামের দক্ষ কারিগররা পেত পারিশ্রমিক হিসাবে অর্থের বদলে বস্তু হিসাবে এবং যে ক্ষেত্রে তারা ইনাম (খাজনা-মুক্ত) জমি পেত সেই জমির ওপরেও কর ধার্য করা হত। একটা দৃষ্টান্ত, অচল (Bad) মুদ্রার ওপর আরোপিত অনুপাতকেও 'শেয়ার' খাতে অন্তর্ভুক্ত করতে দেখা গেছে।

৯। বিচার সম্পর্কিত পরিভৃতি (Fees) আদায় হত আইনগত ব্যয় (Charges) ইত্যাদির ভার বহন করার জন্য বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন পরিমাণের অর্থ নির্দ্ধারিত করা হত আবশ্যকীয় প্রমুদ্রার (Stamps) আকারে। মামলার অর্থের পরিমাণের সঙ্গে প্রমুদ্রার মূল্যেও তারতম্য ঘটত।

মামলা ১৬ টাকা পর্যন্ত	১ টাকার প্রমুদ্রা
১৬ টাকা থেকে ৩২ টাকা পর্যন্ত	২ টাকা ,,
৩২ টাকা থেকে ৬৪ টাকা পর্যন্ত	৪ টাকা ,,
৬৪ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত	৮ টাকা ,,
১৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত	১৬ টাকা ,,
৩০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত	৩২ টাকা ,,
৮০০ টাকা থেকে ১৬০০ টাকা পর্যন্ত	৫০ টাকা ,,
১৬০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত	১০০ টাকা ,,
৫০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত	২৫০ টাকা ,,
১০,০০০ টাকা থেকে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫০০ টাকা ,,
২৫,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৭৫০ টাকা ,,

১) পাণ্ডুলিপিতে শব্দটি ছিল 'বালুবেহ' হিসাবে। —সম্পাদক

৫০,০০০ টাকা থেকে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১০০০ টাকা ,,

১,০০,০০০ টাকা এবং তদূর্দ্ধে ২০০০ টাকা ,,

এছাড়া নথিভুক্ত করার জন্য পেশকরা দলিলপত্র সমনাদি, প্রত্যুত্তর, প্রতিলিপি তৈরি, বাদীর অভিযোগ খণ্ডনের জন্য প্রত্যুত্তর অনুপূরক নালিশের আরজি, ওকালতি করার ব্যবহারজীবীকে প্রাধিকার অর্জন (Authorisation) ইত্যাদি প্রমুদ্রা (Samp) দেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল, আদালতের পদমর্যাদা অনুসারে প্রমুদ্রার তারতম্য ঘটত।

১০। **প্রমুদ্রাশুল্ক** প্রথম প্রবর্তিত হয় বঙ্গদেশে ১৭৯৭ সালে এবং তা চুক্তিপত্র, দলিলাদি, বিক্রয় কোবালা, ইজারা, আম-মোক্তারনামা, বিমাপত্র, (Insurence Policy), প্রত্যয়পত্র (Promissory note), প্রাপ্তি রসিদ, জামিন-পত্র (Bail Bond) ও সাধারণভাবে আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সবরকমের দলিলের উপর বাধ্যতামূলকভাবে (২৫ টাকার কম হুণ্ডি (Bill Of Exchange) এবং ৫০ টাকার প্রাপ্তি রসিদ এ থেকে রেহাই পেত।)

মাদ্রাজে প্রমুদ্রা পত্র (Stamp Paper) প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৮০৮ সালে, প্রধানত আইন সংক্রান্ত মামলা ইত্যাদিতে এবং ১৮১৬ সালে শুল্ক সম্প্রসারিত হয়েছিল মুচলেকা (Bond) দলিলপত্র, ইজারা, বন্ধক, হুণ্ডি ও প্রাপ্তি রসিদ পর্যন্ত।

বোম্বাইতে এই কর প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৮১৫ সালে। প্রমুদ্রার বিভাজনের ইংল্যান্ডের প্রণালীটি গৃহীত হয়েছিল ভারতে। প্রমুদ্রা বিক্রেতারা তাদের জোগান পেত সমাহর্তার (Collector) কাছ থেকে : প্রমুদ্রার জন্য বিক্রেতা জামিন দিত এবং যে সব পক্ষের তা দরকার পড়ত তাদের মধ্যে বণ্টন করত, এবং বিক্রয়ের একটা আনুপাতিক অংশ পেত।'

১১। টাকশাল (Mint) রাজস্ব সংগৃহীত হত যে ক্ষেত্রে শোধন করা দরকার সেক্ষেত্রে শোধনের খরচ বাদ দিয়ে এবং মানের পার্থক্যকে বাদ দেওয়ার পর, মোট উৎপাদনের ২ শতাংশ মুদ্রা প্রস্তুত করার জন্য মুদ্রাপ্রস্তুত করার ব্যাপারে খরচাদি বহনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত মুদ্রার উপর সম্রাটের প্রাপ্য ধার্য শুল্ক রূপে।

১২। নৌসংক্রান্ত রাজস্ব আদায় হত বন্দর ও নঙ্গর-স্থানের পণ্য ইত্যাদির মাধ্যমে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভালভাবে চালু রাখার জন্য।

১৩। সন্ধিচুক্তির শর্তানুসারে প্রদেয় দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে পাওয়া ভর্তুকি, যার মোট পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ পাউণ্ড।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে এই ১৩ টি উৎস ছিল রাজস্বের, তার মধ্যে অনেকগুলি আজও বর্তমান আছে।

III

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা সমগ্র রাজস্ব এবং সমগ্রের সঙ্গে প্রতিটি উৎসের শতাংশ হার কত ছিল তা লক্ষ করাও বেশ চিত্তাকর্ষক হবে।

প্রথমত ভূমি কর : এর আয় এবং ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র রাজস্বের সঙ্গে তার অনুপাত।

সময়-কাল	ভূমিকর বাৎসরিক গড় রাজস্ব	মোটরাজস্বের ভূমিকরের অনুপাত (শতাংশ)
১৭৯২-৯৩ থেকে ১৭৯৬-৯৭	৪০,৬৮,০০০	৫০.৩৩
১৭৯৭-৯৮ থেকে ১৮০১-০২	৪১,২৬,০০০	৪২.০২
১৮০২-৩ থেকে ১৮০৬-০৭	৪৫,৮২,০০০	৩২.৯৯
১৮০৭-৮ থেকে ১৮১১-১২	৫০,৭৮,০০০	৩১.৬৮
১৮১২-১৩ থেকে ১৮১৬-১৭	৯০,১৮,০০০	৫২.৩৩
১৮১৭-১৮ থেকে ১৮২১-২২	১,৩২,৬৩,০০০	৬৬.১৭
১৮২২-২৩ থেকে ১৮২৬-২৭	১,৩৫,৬৭,০০০	৬১.৮৩
১৮২৭-২৮ থেকে ১৮৩১-৩২	১,৩১,১২,০০০	৬০.৯০
১৮৩২-৩৩ থেকে ১৮৩৬-৩৭	১,১৯,৪২,০০০	৫৭.০০
১৮৩৭-৩৮ থেকে ১৮৪১-৪২	১,২৩,৮০,০০০	৫৯.০৫
১৮৪২-৪৩ থেকে ১৮৪৬-৪৭	১,৩৪,৩২,০০০	৫৫.৮৫
১৮৪৭-৪৮ থেকে ১৮৫১-৫২	১,৪৯,৪৭,০০০	৫৬.০৬
১৮৫২-৫৩ থেকে ১৮৫৫-৫৬	১,৬১,৮৩,০০০	৫৫.৪০
১৭৯২-৯৩ থেকে ১৮৫৫-৫৬	১,০৩,৪৯,০০০	৫৪.০৭

আফিম রাজস্ব : এর আয় এবং ব্রিটিশ ভারতের মোট রাজস্বের সঙ্গে তার অনুপাত।

সময়-কাল	গড় বাৎসরিক রাজস্ব	মোট রাজস্বের অনুপাত (শতাংশ)
১৭৯২-৯৩ থেকে ১৭৯৬-৯৭	২,৬৪,০০০	৩.২৭
১৭৯৭-৯৮ থেকে ১৮৮১-৮২	৩,১২,০০০	৩.১৮
১৮০২-০৩ থেকে ১৮০৬-০৭	৫,৭৯,০০০	৪.০৪
১৮০৭-০৮ থেকে ১৮১১-১২	৭,৬৭,০০০	৪.৭৯
১৮১২-১৩ থেকে ১৮১৬-১৭	৯,৫৮,০০০	৫.৫৬
১৮১৭-১৮ থেকে ১৮২১-২২	১০,৯২,০০০	৫.৪৪
১৮২২-২৩ থেকে ১৮২৬-২৭	১৬,৪১,০০০	৭.৪৭
১৮২৭-২৮ থেকে ১৮৩১-৩২	১৭,৪৭,০০০	৮.১২
১৮৩২-৩৩ থেকে ১৮৩৬-৩৭	১৬,৭৭,০০০	৮.০০
১৮৩৭-৩৮ থেকে ১৮৪১-৪২	১৫,৪৭,০০০	৭.৩৮
১৮৪২-৪৩ থেকে ১৮৪৬-৪৭	২৯,৬৫,০০০	১২.৩৩
১৮৪৭-৪৮ থেকে ১৮৫১-৫২	৩৮,৪০,০০০	১৪.৫০
১৮৫২-৫৩ থেকে ১৮৫৫-৫৬	৪৯,৪৩,০০০	১৬.৯১
১৭৯২-৯৩ থেকে ১৮৫৫-৫৬	১৬,৬৭,০০০	৮.৭১

লবণ কর : এর আয় এবং ব্রিটিশ ভারতের মোট রাজস্বের সঙ্গে তার অনুপাত।

সময়-কাল	গড় বাৎসরিক রাজস্ব	মোট রাজস্বের অনুপাত (শতাংশ)
১৭৯২-৯৩ থেকে ১৭৯৬-৯৭	১২,০৭,০০০	১৪.৯৩
১৭৯৭-৯৮ থেকে ১৮০১-০২	১১,৮৮,০০০	১২.১০
১৮০২-০৩ থেকে ১৮০৬-০৭	১৫,৮৯,০০০	১১.০৯
১৮০৭-০৮ থেকে ১৮১১-১২	১৭,৮৫,০০০	১১.১৪
১৮১২-১৩ থেকে ১৮১৬-১৭	১৮,৮২,০০০	১০.৯২
১৮১৭-১৮ থেকে ১৮২১-২২	২২,৫৬,০০০	১১.২৫
১৮২২-২৩ থেকে ১৮২৬-২৭	২৬,০৩,০০০	১১.৮৭

১৮২৭-২৮ থেকে ১৮৩১-৩২	২৫,৯০,০০০	১২.০৩
১৮৩২-৩৩ থেকে ১৮৩৬-৩৭	২০,৩৬,০০০	৯.৭২
১৮৩৭-৩৮ থেকে ১৮৪১-৪২	২৫,৯৩,০০০	১২.৩৭
১৮৪২-৪৩ থেকে ১৮৪৬-৪৭	২৭,৯৮,০০০	১১.৬৫
১৮৪৭-৪৮ থেকে ১৮৫১-৫২	২৪,৩৮,০০০	৯.১৪
১৮৫২-৫৩ থেকে ১৮৫৫-৫৬	২৬,৭৭,০০০	৯.১৭
১৭৯২-৯৩ থেকে ১৮৫৫-৫৬	২১,১৮,০০০	১১.০৭

আমদানি-রপ্তানির উপর ধার্যশুল্কের রাজস্ব : এর আয় এবং ব্রিটিশ ভারতের মোট রাজস্বের সঙ্গে তার অনুপাত।

সময়-কাল	গড় বাৎসরিক রাজস্ব	মোট রাজস্বের অনুপাত (শতাংশ)
১৭৯২-৯৩ থেকে ১৭৯৬-৯৭	১,৯২,০০০	২.৩৮
১৭৯৭-৯৮ থেকে ১৮৮১-৮২	৩,০৪,০০০	৩.১০
১৮০২-০৩ থেকে ১৮০৬-০৭	৫,৯৬,০০০	৪.১৬
১৮০৭-০৮ থেকে ১৮১১-১২	৮,০৭,০০০	৫.০৬
১৮১২-১৩ থেকে ১৮১৬-১৭	১১,৫৯,০০০	৬.৬৮
১৮১৭-১৮ থেকে ১৮২১-২২	১৬,৬৭,০০০	৮.৩২
১৮২২-২৩ থেকে ১৮২৬-২৭	১৬,৬৩,০০০	৭.৫৮
১৮২৭-২৮ থেকে ১৮৩১-৩২	১৭,৪৭,০০০	৮.১২
১৮৩২-৩৩ থেকে ১৮৩৬-৩৭	১৫,০৬,০০০	৭.১৯
১৮৩৭-৩৮ থেকে ১৮৪১-৪২	১৪,১৮,০০০	৬.৭৬
১৮৪২-৪৩ থেকে ১৮৪৬-৪৭	১৪,৪৯,০০০	৬.০২
১৮৪৭-৪৮ থেকে ১৮৫১-৫২	১৪,৩৯,০০০	৫.৪০
১৮৫২-৫৩ থেকে ১৮৫৫-৫৬	১৬,১১,০০০	৫.৫২
১৭৯২-৯৩ থেকে ১৮৫৫-৫৬	১১,৯০,০০০	৬.২২

বিবিধ রাজস্ব : এর আয় এবং ব্রিটিশ ভারতের মোট রাজস্বের সঙ্গে তার অনুপাত।

সময়-কাল	গড়বাৎসরিক রাজস্ব	মোট রাজস্বের অনুপাত (শতাংশ)
১৭৯২-৯৩ থেকে ১৭৯৬-৯৭	২৩,১৫,০০০	২৮.৬৪
১৭৯৭-৯৮ থেকে ১৮০১-০২	৩৮,০৯,০০০	৩৮.৭৯
১৮০২-০৩ থেকে ১৮০৬-০৭	৬৮,৫৭,০০০	৪৭.৮৭
১৮০৭-০৮ থেকে ১৮১১-১২	৭৪,৫২,০০০	৪৬.৪৯
১৮১২-১৩ থেকে ১৮১৬-১৭	৩৯,৯০,০০০	২৩.১৬
১৮১৭-১৮ থেকে ১৮২১-২২	১৩,৯২,০০০	৬.৯৪
১৮২২-২৩ থেকে ১৮২৬-২৭	১৯,৮৬,০০০	৯.০৫
১৮২৭-২৮ থেকে ১৮৩১-৩২	১৭,৮৯,০০০	৮.৩১
১৮৩২-৩৩ থেকে ১৮৩৬-৩৭	৩০,৫৯,০০০	১৪.৬০
১৮৩৭-৩৮ থেকে ১৮৪১-৪২	১৪,৩৪,০০০	৬.৮৪
১৮৪২-৪৩ থেকে ১৮৪৬-৪৭	১৬,৩৬,০০০	৬.৮০
১৮৪৭-৪৮ থেকে ১৮৫১-৫২	১৯,৭৭,০০০	৭.৪০
১৮৫২-৫৩ থেকে ১৮৫৫-৫৬	১৫,৭৫,০০০	৫.৩৯
১৭৯২-৯৩ থেকে ১৮৫৫-৫৬	৩০,৪৩,০০০	১৫.৯০

রাজস্বের উৎসগুলি এবং তাদের প্রত্যেকটি থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এবং সমগ্রের সঙ্গে তাদের অনুপাত সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যথেষ্ট।

ব্যয়ের দিকে আমরা নিম্নলিখিত খাতগুলি দেখতে পাই:

(১) রাজস্ব আদায়ের নতুন দিক খরচাদি।

(২) সামরিক এবং নৌ-বাহিনী সংক্রান্ত খরচাদি।

(৩) অসামরিক, বিচার বিভাগীয় এবং পুলিশ

(৪) বাস্তু-কর্ম (Public Works)।

(৫) ভারতে ঋণপত্র (Bond) ঋণের সুদ করার

(৬) সন্ধিচুক্তি এবং সেগুলি কার্যকর ব্যাপারে দেশীয় রাজকুমারদের প্রদত্ত ভাতা (Allowance) ও স্বত্ব-নিয়োগ।

(৭) স্বরাষ্ট্র-বিভাগীয় খরচাদি। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে:

(ক) স্বরাষ্ট্র-ঋণপত্রজনিত ঋণ-এর উপর সুদ।

(খ) ইস্ট ইন্ডিয়া স্টকের মালিকদের প্রদত্ত লভ্যাংশ

(গ) মহারানির সেনাদল এবং কর্মচারিবৃন্দের জন্য প্রদেয় অর্থ।

(ঘ) ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস এবং নিয়ন্ত্রণ পর্যদের জন্য খরচাদি।

কালক্রমানুসারী পরম্পরা অনুসারে ব্যয়ের সারণিবদ্ধ (Tabular) বিন্যাসের কিছুটা তাৎপর্য থাকতে পারে।

১৮০০ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত অধ্যায়টি নির্বাচিত করে আমরা প্রতি দশম বছরটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক বছর হিসাবে গণ্য করতে পারি এবং ঐ নির্দিষ্ট বছরটির রাজস্বের ব্যাপারে খরচাদির আনুপাতিক হারটিকে চিহ্নিত করতে পারি।

	নিট রাজস্ব	খরচাদি	সামরিক খাতে খরচাদি	ঋণের সুদ	অসামরিক ও রাজনৈতিক খরচাদি	বিচার সংক্রান্ত খরচাদি	প্রাদেশিক পুলিশ খাতে খরচ	ভবনাদি এবং দুর্গাদি নির্মাণ
	পাউন্ড	পাউন্ড	%	%	%	%	%	%
১৮০৯-১০	১,১২,৩৮,০০০	১,১০,৭৬,০০০	৫৮,৮৭৭	১৮,৩১০	৭,২২১	৭,৫২৫	১,৯৯১	১,৬৩৯
১৮১৯-২০	১,৩০,১৬,০০০	১,২৯,৩৪,০০০	৬৪,২৯০	১২,৮৩৫	৮,৯০০	৬,৮০০	২,০৯৩	১,৭৫৬
১৮২০-৩০	১,৪২,০০,০০০	১,৩১,০৭,০০০	৫৩,৭৫৪	১২,১২৪	৯,৫৭৫	৭,১০৭	১,৫৩৫	২,৮১০
১৮৩০-৪০	১,৩৭,৪২,০০০	১,৩০,০৪,০০০	৫৭,৭২১	৯,৭৫৬	১২,২৯৬	৯,৫৬৫	২,০৬২	১,৪২৮
১৮৪০-৫০	১,৯৫,১০,০০০	১,৬৪,০৪,০০০	৫১,৬৬২	১০,৫১২	৮,৯০২	৭,১০০	২,০৬২	১,৬৬১
১৮৫৭	৩,৩৩,০৩,০০০	২,৮০,৭৯,০০০	৪৫.৫৫	৭.১৯	৯.৬২	৯.৩৮		

বাস্তু-কর্ম (Public Works) :

অধ্যাপক অ্যাডামসের মতে একটি দেশের বিত্ত সম্পর্কিত ব্যাপারগুলিকে বিচার করা যায় উন্নয়নমূলক ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ দিয়ে এবং একটি দেশের উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্যে বাস্তু-কর্ম বিশেষ স্থান নিয়ে থাকে।

এই একই মাপকাঠি প্রয়োগ করলে আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমগ্র রাজস্ব সম্বন্ধীয় পদ্ধতিকে নিন্দা করতে বাধ্য হই।

১৮৫৩ সালের আগে প্রশাসন ব্যস্ত ছিল যুদ্ধাভিযানে এবং বাস্তু কর্মের কোনও নতুন প্রকল্পকে শুধু তুলে ধরে নি তা নয়, সেই সঙ্গে পুরানো প্রকল্পগুলিকে দ্রুত অবক্ষয়িত হতেও দিয়েছিল।

'মডার্ন ইন্ডিয়া' (আধুনিক ভারত) (১৮৩৭) গ্রন্থে ড. স্প্রে (Dr. Spray) বলেছেন 'স্বাধীন দেশীয় সর্দার ও রাজকুমারদের রাজ্যাংশে বিরাটাকার ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডগুলিকে প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। আমাদের এলাকাভুক্ত অঞ্চলে খাল, সেতু, জলাধার, কূপ, তরুবীথিকা (Groves) ইত্যাদি নির্মাণ কার্যগুলি, যা আমাদের পূর্বসূরীরা ঠিক এই ধরনের উদ্যোগগুলির জন্য রাজস্ব থেকে বিশেষভাবে গৃহীত অর্থ ব্যয় করেছিল সেগুলি দ্রুত ধ্বংস হয়ে চলেছে।'

ভারতে বাস্তু কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মি. জন ব্রাইট বলেছেন যে, "আমাকে যদি ভারতের দেশীয় মানুষদের হয়ে বলতে বলা হয় বাস্তু কর্ম সম্বন্ধে তবে আমি এই কথাটাই বলব যে সারা ভারতে যত রাস্তা আছে ইংরাজদের একটি দেশেই তার চেয়ে বেশি রাস্তা আছে—অনেক বেশি যাতায়াত যোগ্য রাস্তা; আমি এ কথাও বলব যে ম্যাঞ্চেস্টারের একটি মাত্র শহরে, তার অধিবাসীদের একটি মাত্র বিষয় জল সরবরাহের ব্যাপারে অনেক বেশি টাকা খরচ করেছে তাদের সমগ্র অধীনস্থ দেশগুলিতে বাস্তু কর্ম সম্বন্ধে গত ১৪ বছরে, ১৮৩৪ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যে, যত খরচ করেছে তার চেয়ে আমি বলতে চাই যে, ভারত সরকারের প্রকৃত কর্মতৎপরতা ছিল জয় করা ও দখল করার কর্মতৎপরতা।

ভারতের সবকটি প্রেসিডেন্সিতে 'বাস্তুকর্ম বিভাগ' কে একই ধরনের করার আগে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলির কাজ পরিচালিত হত বিভিন্নভাবে।

বোম্বাইতে তা পরিচালিত হত সামরিক পর্ষদের দ্বারা : অধীনস্থ হলেও সড়ক ও পুকুরের অধীক্ষক (Superintendent) সামরিক পর্ষদের সদস্য ছিল না।

বহু দেশে সামরিক পর্ষদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল।

মাদ্রাজে এই বিভাগটির প্রশাসন ছিল তিন ভাগে বিভক্ত ।

তাতে ছিল:

(১) রাজস্ব পর্ষদের বাস্তু কর্ম বিভাগ

(২) সড়ক অধীক্ষক

(৩) সামরিক পর্ষদ।

পদ্ধতির এই বৈচিত্র সমশ্রেণীতে পরিণত করেছিলেন লর্ড ডালহৌসি, যিনি বাস্তু কর্মের সঙ্গে জড়িত সদস্যাবলির মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যের আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করেছিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কালে বাস্তু কর্মের কি কি কার্য সম্পাদিত হয়েছিল এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করব।

(১) খাল : গঙ্গার খাল—৪৪৯½ মাইল। পূর্ব ও পশ্চিম যমুনা খাল—৪৪৫ মাইল পশ্চিম যমুনা খাল সম্পূর্ণ হয়েছিল। পঞ্জাব খাল—১৮৫৬ সালের মে মাসে ৪২৫ মাইল বোরি-দোয়াব খাল তৈরি হয় পঞ্জাবে।

মাদ্রাজ জলসেচ কর্ম—পুকুর, জলাধার এবং "অ্যানিকাট" বা বাঁধ যা তৈরি হয়েছিল কাবেরী, গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীর বক্ষে।

(২) পণ্য চলাচলকারী (Truck) সড়ক :

	মাইল	খরচ
কলকাতা থেকে পেশোয়ার	১,৪২৩	১৪,২৩,০০০
কলকাতা থেকে বোম্বাই	১,০০২	৫,০০,০০০
মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর	২০০	৩৭,১২১
বোম্বাই থেকে আগ্রা	৭৩৪	২,৪৩,৬৭৬
রেঙ্গুন থেকে প্রোম	২০০	১,৬০,০০০

(৩) রেলপথ

কলকাতা থেকে বর্ধমান	১২০
বোম্বাই থেকে ওয়াকিন্দ	৫০
বোম্বাই থেকে কস্তুই	১০
মাদ্রাজ থেকে ভেল্লোর	৮১

(৪) বিদ্যুৎবাহী টেলিগ্রাফ

কলকাতা থেকে পেশোয়ার	সব মিলিয়ে
আগ্রা থেকে বোম্বাই	প্রায় ৪০০০ মাইল
বোম্বাই থেকে মাদ্রাজ	

মি. হেনড্রিক্স বলেন 'ক্ষেত্রফল (area) এবং জনসংখ্যার তুলনার বিচারে এই কর্মগুলির সম্প্রসারণ যতটা বাঞ্ছনীয় ছিল ততটা বিরাটাকারে বা ততটা অবিরাম ভাবে চলে নি। সম্পূর্ণভাবে সামরিক চরিত্রের এইসব উদ্যোগগুলিকে যদি আমরা বাদ দিই এবং জলসেচ কর্ম ও যোগাযোগের স্থল ও জল প্রণালীর (channels) শ্রেণীভুক্ত বা অন্যভাবে বলা যায়, সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র উৎপাদনশীল

বাস্তু কর্ম—বা রাজস্বের প্রতিটি দফার সমীক্ষা করি তবে দেখা যাবে যে, এক বছরের জন্য সর্বোচ্চ ব্যয়ের পরিমাণ হল ১৫ লক্ষ পাউন্ড। যদি আমরা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল কর্মগুলিকে নিই যথা :—

খাল খনন, জলসেচ। তবে দেখা যাবে যে ১৮৫৩-৫৪ সালে ৭,৩৮,০১৫, এবং ১৮৫৪-৫৫ সালে ৫,৪৩,৩৩৩-এর বেশি খরচ হয়নি।

'ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় রাজ্যের ৮৩৭,০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী এলাকা এবং তার ১,৩২,০০০,০০০ জন অধিবাসীদের সম্বন্ধে বিচার করতে বসলে যাঁরা এই পরিমাণ অঙ্ককে অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে করতে চান তাদের প্রশ্নের এ যাবৎকালীন উত্তর হচ্ছে আরও দ্রুত ও ব্যাপক খরচে বাধা সৃষ্টিকারী রাজস্বের বর্তমান অবস্থা। এই উত্তরটির উত্তরণ ঘটেছে একটি মাত্র তথাকথিত অসুবিধা রূপে এবং এই অসুবিধাটি যে কেবল মাত্র আপাত প্রতীয়মান, এবং তার সমাধান যে সম্ভব, তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে শুধু যে পূর্বোল্লেখিত ঘটনাগুলিতে ঐ জাতীয় ব্যয়ের উৎপাদনশীল পরিণামগুলির ব্যবহারিক প্রামাণিক সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে তা নয়, সেই সঙ্গে এই দেশের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্যান্য শাখার নীতি ও ইতিহাস থেকেও এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস; বা অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির ইতিহাসকেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমকে দেখায় না, যে সাবধানতার সঙ্গে নির্বাচিত কর্মোদ্যোগের (enterprise) বিষয়গুলি সম্পর্কিত খরচাদি প্রায়শই অমিতব্যয়িতা ও উদ্দেশ্যহীনতার পরিচায়ক মনে হতে পারে, বিশেষ করে যখন তা শুধু সেই ক্ষেত্রের কথাই উল্লেখ করে, যার ফসল ঐ জাতীয় ব্যয়ের সুবিবেচিত পরিচালনার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত হয়।'

রাজস্বের চাপ :

আমাদের গবেষণার এই শাখাটি সম্পূর্ণভাবে বিষয় বহির্ভুত। সেটা যে শুধু আমাদের এলাকার বাইরে পড়ে তা নয়, আমাদের পদ্ধতিতে অসংখ্য দোষ ত্রুটিও আছে। তাদের মধ্যে প্রথম ও সর্বাগ্রগণ্যটি হল এই যে, জনসংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নির্ভুল পরিসংখ্যান নেই। সে যুগে আদমসুমারির (Census) ব্যাপারটি আদৌ জানা ছিল না এবং জনসংখ্যার ব্যাপারে যে-কোনও হিসাবই করা হোক না কেন তা বড় জোর হত এক সাধারণ অনুমান মাত্র এবং অস্পষ্ট, যাকে কোনও রকমের বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তি করা যেতে পারে।

ঐ ধরনের গবেষণার পথে আর একটি গুরুতর প্রতিবন্ধকতাটি এই যে প্রতি বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকৃত অঞ্চল বেশ কয়েক মাইল ধরে সম্প্রসারিত হচ্ছিল এবং এই ঔৎসুক্য প্রায়ই জাগে যে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির মূলে উচ্চহারে

কর ছিল, না অধিকৃত অঞ্চলের সম্প্রসারণ।

তৃতীয়ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্বের হিসাব-নিকাশ আর যাই হোক নিখুঁত ছিল। আগেও যা লক্ষ করা গিয়েছিল রাজস্বকে বাণিজ্যিক হিসাব নিকাশের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হত ১৮১৩ সাল পর্যন্ত এবং যখন পার্লামেন্টের অনুশাসনে (Mandate) ও দুটি পৃথক করা হল তখন সেগুলি বোধগম্য হওয়া আরও দুষ্কর হয়ে উঠল।

ঐ সব গুরুতর প্রতিবন্ধকতাগুলি শেষ পর্যন্ত আমাদের বাধ্য করল আমাদের গবেষণার এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে পাশ কাটিয়ে যেতে। কয়েকটি আলাদা আলাদা তথ্যের বিবরণ যদি একত্রিত করা হয় তবে তা রাজস্বের উপর চাপ সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দিতে পারে আমাদের। কেবল মাত্র ভূমিকর সম্বন্ধে আলাদা ভাবে বলতে গিয়ে, এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ শ্রী আর. সি. দত্ত বলেছেন, 'ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আরোপিত ভূমিকর শুধু যে মাত্রাতিরিক্ত ছিল তা নয়, সেই সঙ্গে সবচেয়ে খারাপ দিকটা ছিল এই যে ঐ কর বহু প্রদেশে অনির্দিষ্ট ছিল এবং ওঠা-নামা করত। ইংল্যান্ডে ভূমিকর ছিল প্রতি পাউণ্ডে এক শিলিং থেকে চার শিলিংয়ের মধ্যে অর্থাৎ খাজনার পাঁচ থেকে কুড়ি শতাংশের মধ্যে ১৭৯৮ সালের আগে বিগত একশো বছর ধরে এবং যখন ঐ বছরে উইলিয়াম পিট ঐ করকে স্থায়ী ও পুনরুদ্ধার যোগ্য (redeemable) করেছিলেন। বঙ্গদেশে ভূমিকর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল খাজনার ৯০ শতাংশের উপরে এবং উত্তর ভারতে তা ছিল খাজনার ৮০ শতাংশেরও বেশি ১৭৯৩ থেকে ১৮২২ সাল পর্যন্ত। একথা সত্য যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের পূর্বতন মুসলমান শাসকদের নজিরই শুধু অনুসরণ করেছিল, যে শাসকরা মাত্রাতিরিক্ত ভূমিকর দাবি করত। পার্থক্য শুধু এই টুকুই ছিল যে মুসলমান শাসকরা দাবি করত যে তারা পুরো আদায় করতে পারত না, কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা দাবি করত যে তারা অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে তা আদায় করত। বঙ্গদেশের শেষ মুসলমান শাসক তার প্রশাসনের শেষ বছরটিতে (১৭৬৪) ভূমি রাজস্ব আদায় করেছিল প্রায় ৮,১৭,৫৫৩ পাউণ্ড : ঐ একই প্রদেশে ত্রিশ বছরের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকরা ভূমি রাজস্ব আদায় করেছিল ২৬,৮০,০০০ পাউণ্ড। ১৮৩২ সালে অযোধ্যার নবাব উত্তর ভারতের এলাহাবাদ ও অন্যান্য কয়েকটি সমৃদ্ধ জেলা ব্রিটিশ সরকারকে হস্তান্তরিত করে দেয়। ঐ হস্তান্তরণের তিন বছরের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকরা ১৬,৮২,৩৩৬ পাউন্ড ভূমি রাজস্ব আদায় করেছিল। মাদ্রাজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রথম ভূমি রাজস্ব আরোপিত হয়েছিল জমির মোট উৎপাদনের অর্ধেক। বোম্বাইতে ১৮১৭ সালে মারাঠাদের কাছ থেকে জয় করা অঞ্চলের ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল জয়ের বছরটিতে মোট ৪,০০,০০০ পাউন্ড।

ব্রিটিশ শাসনের কয়েক দিনের মধ্যে তা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ১৫,০০,০০০ পাউন্ড। এবং তারপর থেকে অবিরাম তা বাড়িয়েই চলেছিল ইংরেজরা। সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণের পর এবং ব্রিটিশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি পরিদর্শনের পর ১৮২৬ সালে বিশপ হেবার (Heber) লিখেছিলেন : 'কোনও দেশীয় রাজকুমার আমাদের মত খাজনা দাবি করে না।' ১৮৩০ সালে কর্নেল ব্রিগস্ (Briggs) লিখেছিলেন, 'বর্তমানে ভারতবর্ষে যে ভূমি কর প্রচলিত আছে ভূস্বামীর খাজনার পুরো অংশ গ্রাস করার ব্যাপারে তা ইউরোপ বা এশিয়ায় কোনও সরকারের অধীনে তা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।'

'ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকের বছরগুলিতে যে মাত্রাধিক ভূমি কর আরোপিত হয়েছিল তা থেকে ধীরে ধীরে কিছু রেহাই পেতে শুরু করেছিল বহু দেশ ও উত্তর ভারতের জনগণ। বঙ্গদেশে নির্ধারিত কর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল; চাষের সম্প্রসারণের সঙ্গে তা বৃদ্ধি করা হয়নি; এখন খাজনার প্রায় ৩৫ শতাংশ হারে ঐ কর (তৎসহ সড়ক ও বাস্তু কর্ম কর, যা ঐ সময় থেকে খাজনার উপর আরোপিত হয়েছিল) বহন করতে হয়। উত্তর ভারতে নির্ধারিত কর স্থায়ী করা হয়নি। কিন্তু ১৮৫৫ সালে তা কমিয়ে ৫০ শতাংশের সামান্য বেশি রাখা হয়েছিল, যার মধ্যে সবরকম কর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু নতুন কর যুক্ত হয়েছিল : গণনা করা হয়েছিল চলতি খাজনার ভিত্তিতে, না, সম্ভাব্য খাজনার ভিত্তিতে এবং তা যতক্ষণ না পর্যন্ত খাজনার ৬০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে।'

বোম্বাই ও মাদ্রাজে ব্যাপারটি প্রায় একই ধরনের ছিল। এই প্রেসিডেন্সি দুটিতে রায়তওয়ার বন্দোবস্ত বর্তমান ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে রায়তি স্বত্বের এই রায়তওয়ার পদ্ধতির পরিচালন-ব্যবস্থার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন মি. ফুলারটন (Fullerton) (মাদ্রাজ সরকারের সদস্য)। তিনি বলছেন—'চিন্তা করুন সমগ্র ভূমি-সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে, অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের সব ভূস্বামীদের এবং এমন কি প্রধান প্রধান কৃষকদের কথা, সকলে হঠাৎ পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেল; রাজ্যের প্রতিটি মাঠের উপর খাজনা নির্দিষ্ট হওয়ার কথা চিন্তা করুন, কর প্রদান করার ক্ষমতার চেয়ে কদাচিৎ নিচে। সাধারণত উপরে থাকত যা, কল্পনা করুন, ঐ ভাবে ভাড়া দেওয়া জমি, যা গ্রামবাসীদের তাদের গবাদিপশু ও লাঙ্গলের সংখ্যা অনুসারে বণ্টন করা হত, যাতে প্রত্যেকে ৪০ থেকে ৫০ একর পর্যন্ত জমি পেতে পারে। কল্পনা করুন রাজস্বের হার উপরিউক্ত মতে নির্ধারিত হচ্ছে এবং এক লক্ষ রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীর নিযুক্তক সংস্থার (Agency) মাধ্যমে যা ধার্য করা হত এবং তাদের খেয়াল খুশি মতো আদায় করা অথবা পাঠানো হত দখলিকারের কর প্রদানের ক্ষমতা সম্বন্ধে অর্থাৎ দখলিকার তার জমির উৎপাদন থেকে বা তার পৃথক কোনও

সম্পত্তি থেকে ঐ কর দেবে কিনা সে ব্যাপারে ঐ কর্মচারীদের নিজস্ব যে ধারণা থাকত, তার ভিত্তিতে। প্রত্যেক মানুষকে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য উৎসাহিত করত এবং তার কর প্রদানের ক্ষমতা সম্বন্ধে খবরাখবর দিত, যাতে সে এর ফলে অতিরিক্ত দাবির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারত; কল্পনা করুন জেলার এক বা একাধিক ব্যক্তির অপার গতিকে পূরণ করার জন্য গ্রামের প্রতিটি চাষিকে সবসময়ে বাড়তি দাবি মেটাতে হত।

কল্পনা করুন, পর্ষদের নির্দেশানুসারে প্রতিটি প্রদেশের সমাহর্তারা সাধারণ সমতাবিধান করে শ্রমের প্রতি সবরকম প্রলোভন বিনষ্ট করার স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করত। পলাতকদের গ্রেফতার করে ফেরৎ পাঠানো হত পরস্পরের কাছে এবং সবশেষে কল্পনা করুন, প্রদেশের সমার্হর্তা, একমাত্র শাসক অথবা ন্যায়পাল (Justice of the Peace), কেবলমাত্র যাদের মাধ্যমে ও সাহায্যে প্রজার ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্য কোনও ফৌজদারি অভিযোগ এলে তা উচ্চতর আদালতে পৌঁছতে পারত। সেই সঙ্গে একথাও কল্পনা করুন যে, ভূমি রাজস্ব আদায়ের কাজে নিযুক্ত প্রতিটি অধস্তন কর্মচারী সাধারণত পুলিশ কর্মচারী হত। যার উপর ক্ষমতা ন্যস্ত থাকত নিজের এলাকার মধ্যে যে কোনও অধিবাসীকে অভিযোগের হলফ-বাক্য ছাড়াই বা মামলায় শপথবাক্য পাঠ করা নথিভুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই জরিমানা করার, কয়েদ করে রাখার, তুড়ুম ঠোকার[১] এবং চাবুক মারার।'

এর সঙ্গে মি. মার্টিন যুক্ত করছেন, 'মাদ্রাজে যারা রায়তওয়ার পদ্ধতি বজায় রাখা সমর্থন করে তাদের জ্ঞানচক্ষু যদি কিছু খুলে দিতে পারে তবে তা এইসব অত্যাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। মাদ্রাজ পরিষদের সদস্য প্রয়াত মি. সুলিভান লেখককে বলেছিলেন যে, যখন তিনি তাঁর কাছারি (কোষাগার) থেকে গাড়ি বোঝাই রুপো মাদ্রাজে পাঠাতে দেখেছিলেন এবং যাদের কাছ থেকে ঐ রুপো সংগৃহীত হয়েছিল তাদের দারিদ্রের কথা ভেবেছিলেন, তখন তিনি আসন্ন বছরে তাদের কি অবস্থা হবে কল্পনা করে শিউরে উঠেছিলেন। কারণ, সরকারের দাবিগুলি ছিল অপ্রতিহত এবং কিছু পরিমাণ অর্থ আসা চাই।'

অন্তর্দেশীয় পণ্যদ্রব্য চলাচলের উপর শুল্কের চাপের বিষয়টি পরে বিবেচিত হবে, যখন আমরা কোম্পানির শাসনকালে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রসঙ্গে আসব।

করের এই চাপের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের আয় সম্পর্কে অতি সামান্য তথ্যই আমরা পেয়েছি।

---

১) কাঠের ফ্রেমের মধ্যে পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা।

করের চাপ কতটা ছিল সে সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে আয়ের সঙ্গে তুলনা করে। কিন্তু জনগণের আয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অপ্রতুল। মুনরো (Munro)-র তথ্য অনুসারে কৃষি শ্রমিকের গড় মজুরি ছিল মাসিক ৪ শিলিং থেকে ৬ শিলিং-এর মধ্যে। এবং জীবনধারণের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক মাথাপিছু ১৮ শিলিং থেকে ২৭ শিলিং-এর মধ্যে।

করের বোঝা কতটা ছিল, তা আমরা জানি না। অবস্থাগত প্রমাণ থেকে জানা যায় যে তা ছিল প্রচুর মাত্রায়।

IV

মি. মার্টিন সমগ্র বিত্তীয় ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন এইভাবে :-

'কোম্পানি কর্তৃক অঞ্চলগুলির সংযোজনের ফলে উদ্ভূত সমৃদ্ধির যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্লাইভ জাগিয়ে তুলেছিলেন সেগুলি পূরণ হওয়ার দুস্তর অসুবিধা ছিল এবং এই ক্ষেত্রে (যখন বঙ্গদেশ ও বিহারের দেওয়ানি কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছিল) এবং পরবর্তী ক্ষেত্রগুলিতে দেখা গিয়েছিল যে, রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রায় অপরিহার্যভাবে যুক্ত ছিল ব্যয়ের, যথা পরিমাণ বৃদ্ধির চেয়ে বেশি, ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত সরকারের ব্যয়ভার, প্রতিটি প্রেসিডেন্সিতে স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি, ও অন্যান্য বৈধ ও অবৈধ ব্যয়ের উৎসগুলির বৃদ্ধি, যা সব রকমের প্রত্যাশিত উদ্বৃত্তকে গ্রাস করে ফেলত, যার ফলে শুধু দেশের সম্পদগুলির উন্নতিবিধানের জন্যই না, সেইসঙ্গে দেশীয় শাসকদের তৈরি সড়ক, খাল ও অন্যান্য বাস্তু কর্মগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও কিছু পড়ে থাকত না।'

একথা খুব অদ্ভুত শোনায় যে, কোম্পানির আর্থিক বিষয়গুলির মর্মান্তিক অপব্যবহার হত। তৎকালীন এক লেখক লিখেছেন:

"আমাদের একটি সৈন্যবাহিনী আছে যার কর্মকর্তারা ব্রিটিশ সৈনিক; ইউরোপীয় যুদ্ধ-কৌশল দ্বারা পরিচালিত হত। আমাদের ব্যবহার শাস্ত্র (Jurisprudence) আক্ষরিক অর্থে ইংরেজদের আইনের অধিকাংশ এবং মূলনীতি নিয়ে গঠিত। রাজস্ব সম্বন্ধে আমাদের কর-নির্ধারণ অ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর অনুগামীদের মতবাদের ভিত্তিতেই রচিত বলে মনে হয় (?)। শুধু আর্থিক ব্যাপারটি ভারতীয়। আমাদের সামরিক

বিভাগের কর্মীরা জোমিনি (Jomini) রণ কৌশল অধ্যয়ন করে। আমাদের পদস্থ অসামরিক কর্মচারীদের পাঠ্য-পুস্তক হল ব্ল্যাকস্টোন এবং বেন্‌থাম, মিলস এবং রিকার্ডো, কিন্তু আমাদের মূলধন বিনিয়োগকারীদের পদ্ধতিটা তিন শতাব্দী আগে আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজলের পদ্ধতির মতই থেকে গেছে।'

বৎসর	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
	পাউন্ড	পাউন্ড
১৭৯২-৯৩	৫৫,১২,৭৬১	৩৮,৭৩,৮৫৯
১৭৯৩-৯৪	৮২,৭৬,৭৭০	৬৫,৯৩,১২৯
১৭৯৪-৯৫	৮০,২৬,১৯৩	৬৫,৬৭,৮০৮
১৭৯৫-৯৬	৭৮,৬৬,০৯৪	৬৮,৮৮,৯৯৭
১৭৯৬-৯৭	৮০,১৮,১৭১	৭৫,০৮,০৩৮
১৭৯৭-৯৮	৮০,৫৯,৮৮০	৮০,১৫,৩২৭
১৭৯৮-৯৯	৮৬,৫২,০৩৩	৯১,৩৯,৩৬৩
১৭৯৯-১৮০০	৯৭,৩৬,৬৭২	৯৯,৫৫,৩৯০
১৮০০-০১	১,০৪,৮৫,০৫৯	১,১৪,৬৮,১৮৫
১৮০১-০২	১,২১,৬৩,৫৮৯	১,২৪,১০,০৪৫
১৮০২-০৩	১,৩৪,৬৪,৫৩৭	১,২৩,২৬,৮৮০
১৮০৩-০৪	১,৩২,৭১,৩৮৫	১,৪৩,৯৫,৪০৫
১৮০৪-০৫	১,৪৯,৪৯,৩৯৫	১,৬১,১৫,১৮৩
১৮০৫-০৬	১,৫৪,০৩,৪০৯	১,৭৪,২১,৪১৮
১৮০৬-০৭	১,৪৫,৩৫,৭৩৯	১,৭৫,০৮,৮৬৪
১৮০৭-০৮	১,৫৬,৬৯,৯০৫	১,৫৮,৫০,২৯০
১৮০৮-০৯	১,৫৫,২৫,০৫৫	১,৫৩,৯২,১৮৯
১৮০৯-১০	১,৫৬,৫৫,৯৮৫	১,৫৫,৩৪,৭১১
১৮১০-১১	১,৬৬,৭৯,১৯৭	১,৩৯,০৯,৯৮১
১৮১১-১২	১,৬৬,০৫,৬১৫	১,৩২,২০,৯৬৬
১৮১২-১৩	১,৬৩,৩৬,২৯০	১,৩৫,১৫,৮২৮
১৮১৩-১৪	১,৭২,২৮,৭১১	১,৩৬,১৭,৭২৫
১৮১৪-১৫	১,৭২,৯৭,২৮০	১,৫৯,৫৫,০০৬

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বৎসর	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
	পাউন্ড	পাউন্ড
১৮১৫-১৬	১,৭২,৩৭,৮১৯	১,৭০,৫৯,৯৬৮
১৮১৬-১৭	১,৮০,৭৭,৫৭৮	১,৭৩,০৪,১৬২
১৮১৭-১৮	১,৮৩,৭৫,৮২০	১,৮০,৪৬,১৯৪
১৮১৮-১৯	১,৯৪,৫৯,০১৭	২,০৩,৯৬,৫৮৭
১৮১৯-২০	১,৯২,৩০,৪৬২	১,৯৬,৮৯,১০৭
১৮২০-২১	২,১৩,৫২,২৪১	২,০০,৫৭,২৫২
১৮২১-২২	২,১৮,০৩,১০৮	১,৯৮,৫৬,৪৮৯
১৮২২-২৩	২,১১,৭১,৭০১	২,০০,৮৩,৭৪১
১৮২৩-২৪	২,১২,৮০,৩৮৪	২,০৮,৫৩,৯৯৭
১৮২৪-২৫	২,৩৭,৫০,১৮৩	২,২৫,০৪,১০৬
১৮২৫-২৬	২,১১,২৮,৩৮৮	২,৪১,৬৮,০১৩
১৮২৬-২৭	২,২৩,৮৩,৪৯৭	২,৩৩,১২,২৯৫
১৮২৭-২৮	২,২৮,৬৩,২৬৩	২,৪৬,৫৩,৮৩৭
১৮২৮-২৯	২,২৭,৪০,৬৯১	২,১৭,১৮,৫৬০
১৮২৯-৩০	২,১৬,৯৫,২০৮	২,০৫,৬৮,৩৫৮
১৮৩০-৩১	২,২৩,১৯,৩১০	২,০২,৩৩,৮৯০
১৮৩১-৩২	১,৮৩,১৭,২৩৭	১,৭৩,৪৮,১৭৩
১৮৩২-৩৩	১,৮৪,৭৭,৯২৪	১,৭৫,১৪,৭২০
১৮৩৩-৩৪	১,৮২,৬৭,৩৬৮	১,৬৯,২৪,৩৩২
১৮৩৪-৩৫	২,৮৮,৫৬,৬৪৭	১,৬৬,৮৪,৪৯৬
১৮৩৫-৩৬	২,০১,৪৮,১২৫	১,৫৯,৯৪,৮০৪
১৮৩৬-৩৭	২,০৯,৯৯,১৩০	১,৭৩,৬৩,১৬৮
১৮৩৭-৩৮	২,০৮,৫৮,৮২০	১,৭৫,৫৩,৫২৫
১৮৩৮-৩৯	২,১১,৫৮,০৯৯	২,১৩,০৬,২৩২
১৮৩৯-৪০	২,০১,২৪,০৩৮	২,২২,২৮,০১১
১৮৪০-৪১	২,০৮,৫১,০৭৩	২,২৫,৪৬,৪৩০
১৮৪১-৪২	২,১৮,৩৭,৮২৩	২,৩৫,৩৪,৪৪৬

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বৎসর	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
	পাউন্ড	পাউন্ড
১৮৪২-৪৩	২,২৬,১৬,৪৮৭	২,৩৮,৮৮,৫২৬
১৮৪৩-৪৪	২,৩৫,৮৬,৫৭৩	২,৪৯,২৫,৩৭১
১৮৪৪-৪৫	২,৩৬,৬৬,২৪৬	২,৪২,৯৩,৬৪৭
১৮৪৫-৪৬	২,৪২,৭০,৬০৮	২,৫৬,৬২,৭৩৮
১৮৪৬-৪৭	২,৬০,৮৪,৬৮১	২,৬৯,১৬,১৮৮
১৮৪৭-৪৮	২,৪৯,০৮,৩০২	২,৬৭,৪৭,৪৭৪
১৮৪৮-৪৯	২,৫৩,৯৬,৩৮৬	২,৬৭,৬৬,৮৪৮
১৮৪৯-৫০	২,৭৫,২২,৩৪৪	২,৬৯,৬০,৯৮৮
১৮৫০-৫১	২,৭৬,২৫,৩৬০	২,৭০,০০,৬২৪
১৮৫১-৫২	২,৭৮,৩২,২৩৭	২,৭০,৯৮,৪৬২
১৮৫২-৫৩	২,৮৬,০৯,১০৯	২,৭৯,৭৬,৭৩৫
১৮৫৩-৫৪	২,৮২,৭৭,৫৩০	৩,০২,৪০,৪৩৫
১৮৫৪-৫৫	২,৯১,৩৩,০৫০	৩,০৭,৫৩,৪৫৬
১৮৫৫-৫৬	৩,০৮,১৭,৫২৮	৩,১৬,৩৭,৫৩০
১৮৫৬-৫৭	৩,১৬,৯১,০১৫	৩,১৬,০৮,৮৭৫
১৮৫৭-৫৮	৩,১৭,০৬,৭৭৬	৪,১২,৪০,৫৭১

১৭৯২ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত অধ্যায়কে হিসাবের জন্য ধরে শ্রী রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, 'দেখা যাবে যে, ঘাটতি যদি ১৪ বছরের হয়, তবে উদ্বৃত্ত হয়েছে ৩২ বছর এবং সব মিলিয়ে ঘাটতি যদি হয়ে থাকে প্রায় ১৭০ লক্ষ, তবে উদ্বৃত্ত হয়েছে প্রায় ৪৯০ লক্ষ। অতএব ভারত প্রশাসনের নিট আর্থিক ফলাফল হল ৪৬ বছরে প্রায় ৩২ লক্ষের মত উদ্বৃত্ত। কিন্তু ঐ অর্থ ভারতে সঞ্চিত হয়নি বা সেচ ও অন্যান্য কাজের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হয় নি। কোম্পানির শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ দেবার জন্য সর্বদা চলে' যেত ইংল্যান্ডে নজরানা হিসাবে; এবং যেহেতু লভ্যাংশ প্রদানের ব্যাপারে ভারত থেকে অবাধে চলে যাওয়া এই অর্থ পর্যাপ্ত হত না, তাই ক্রমবর্ধমান ভাবে যে ঋণ হত তার নাম ছিল 'ভারতের সরকারি ঋণ'[১]।

ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষে ঋণ গ্রহণ করার দুটি সুনির্দিষ্ট পন্থা ছিল।

১) আর. সি. দত্ত, 'গোড়ার দিকের ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ', পৃষ্ঠা : ৪০৮।

ভারতবর্ষে যখন সরকারের অর্থের প্রয়োজন হত তখন বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হত যে, বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট হারে এবং তাতে প্রদত্ত শর্তাধীনে কোষাগার খোলা থাকবে ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করতে। যত দিন ঋণ গ্রহণের বিষয়টি খোলা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জনগণকে তাদের খুশিমতো অর্থ প্রদানের অনুমতি দেওয়া হত এবং স্বীকৃতি হিসাবে তাদের দেওয়া হয় যাকে বলা হয় ঋণপত্র, এবং এটা যে কোনও পরিমাণের অর্থ হতে পারত। ঋণ হিসাবে গৃহীত সব অর্থই ভারতবর্ষ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

ইংল্যান্ডে অন্য এক প্রণালী কার্যকর হয়েছিল। পার্লামেন্ট কর্তৃক যেভাবে চুক্তি করা হয়েছিল সেই একমাত্র প্রণালী, যার মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঋণ সংগ্রহ করতে পারত সেখানে তা ছিল অন্যান্য নিগম (corporation)-গুলির পদ্ধতির মতই যথা, ঋণপত্র এবং ঋণপত্রের ভিত্তিতে সংগৃহীত সব বয়সের ব্রিটিশ সরকারের ঋণের উপর।

ভারতের সরকারি ঋণ, অন্তত কোম্পানির শাসনে যে-সব ঋণ হয়েছিল তার সবটাই যুদ্ধের সৃষ্টি!

এই ঋণ দুটির অগ্রগতির ইতিহাস আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করব।

ভারতীয় ঋণ :

১৭৯২ সালে ভারতীয় ঋণ ছিল ৭০,০০,০০০ পাউন্ডের কিছু বেশি : সাত বছরের মধ্যে তা বেড়ে হয়েছিল ১,০০,০০,০০০ পাউন্ড। ১৮০০ সালে ছিল ১,৪৬,২৫,৩৮৪ পাউণ্ড, যার উপর মোট সুদ ছিল ১৩,৪২,৮৫৪ পাউন্ড। তারপর এল মারাঠাদের সঙ্গে ওয়েলেস্লির যুদ্ধ এবং ভারতীয় ঋণ একলাফে ১৮০৭-০৮ সালে বেড়ে হয়ে গেল ৩,০০,৯৮,৮৫৭ পাউন্ড, যার উপর বাৎসরিক সুদ ছিল ২৩,৩৯,০৮৭ পাউন্ড। সন্ধি স্থাপিত হবার পর পরিশোধের মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল । এই নীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে ভারতীয় ঋণ ১৮১০-১১ সালে কমে হয়েছিল ২,২৫,৪৫,৪৮৩ পাউন্ড আর সুদের পরিমাণ ছিল ১৫,০৩,৪৩৪ পাউন্ড। কিন্তু যুদ্ধই ছিল সাধারণ নিয়ম এবং শান্তি ব্যতিক্রম মাত্র এবং ১৮১৯-২০ সালে নেপাল যুদ্ধ ও প্রথম মারাঠা যুদ্ধের ফলে ভারতীয় ঋণ বেড়ে হয়েছিল ৩১,৩৩,৮৮,৮৫৫ পাউন্ড। মধ্যবর্তীকালীন শান্তির ফলে ১৮২৩-২৪ সালে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু পরের বছর ১৮২৪-২৫ সালের প্রথম ব্রহ্মদেশ যুদ্ধে তা আবার বেড়ে হল ৩,৮৩,১৬,৪৮৬ পাউন্ড। ১৮৩৫-৩৬ সালে ঋণ কমে দাঁড়াল ৩,১৮,২১,১১৮ পাউন্ড : কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য অপেক্ষা করেছিল

পরপর কয়েকটি সামরিক অভিযান। আফগান যুদ্ধ, সিন্ধু যুদ্ধ, দুটি শিখ যুদ্ধ। দ্বিতীয় ব্রহ্মদেশ যুদ্ধ ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল। যা ১৮৫২-৫৩ সালে হয়ে উঠেছিল ৫,২৩,১৩,০৯৪ পাউণ্ড আর তার উপর সুদ ছিল ২৪,৭৯,১৩৩ পাউন্ড। ১৮৫৩-৫৪ সালে অবশ্য ভারতীয় ঋণ কমে হয়েছিল ৪,৯৭,৬২,৮৭৬ পাউন্ড। ১৮৫৩-৫৪ সালে বাস্তু কর্ম সংক্রান্ত নীতির উদ্বোধন হল। তার ফলে ১৮৫৫-৫৬ সালে ভারতীয় ঋণের পরিমাণ বেড়ে হল ৫,৫৫,৪৬,৬৫০ পাউন্ড। ১৮৫৭-৫৮ সাল প্রত্যক্ষ করেছিল ভারতীয় বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা যুদ্ধ, যা ভারতীয় ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে করেছিল ৬,০৭,০৪,০৮৪ পাউন্ড।

ব্রিটিশ ঋণপত্র ঋণ (ইংল্যান্ডে)

১৮০০ সালে ব্রিটিশ ঋণপত্রের ঋণের পরিমাণ হয়েছিল ১৪,৮৭,১১২ পাউন্ড ৫ শতাংশ সুদ সহ। কিন্তু ওয়েলেসলির যুদ্ধগুলিও প্রভাবিত করেছিল ব্রিটিশ ঋণকে এবং ১৮০৭-০৮ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ৪২,০৫,২৭৫ পাউন্ড। ১৮১১-১২ সালে ব্রিটিশ ঋণপত্রের ঋণ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল ৬৫,৬৫,৯০০ পাউন্ডে, সুদ ছিল ৫ শতাংশ হারে। ১৮১৬-১৭ সালে সুদের হার কমিয়ে করা হয়েছিল ৪ শতাংশ এবং তারপর ঐ হার আর কখনও বাড়েনি। ১৮১৪-১৫ সালে ব্রিটিশ ঋণপত্রের ঋণ কমে হয়েছিল ৪৩,৭৬,৯৭৬ পাউন্ড। মাঝে মাঝে তা কমিয়ে নামিয়ে আনা হয়েছিল ১৭,৩৪,৩০০ পাউণ্ডে। ১৮৪০-৪১ সালে আফগান যুদ্ধ ও বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ ঋণপত্রের ঋণ বেড়ে হয়েছিল ৩৮,৯৪,৪০০ পাউন্ড। এছাড়া বিদ্রোহের খরচ ছিল ৪০,০০,০০০ পাউন্ড।

আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হতে পারে যখন দেখা যায় যে, ভারতীয় ঋণের তুলনায় ভারতীয় ব্রিটিশ ঋণপত্রের ঋণ কত কম ছিল। কিন্তু ঐ আশ্চর্যের ভাবটি বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না, যখন আমরা জানতে পারব যে ইংল্যান্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা কঠোর ভাবে সীমিত ছিল সংসদীয় প্রবিধানগুলির (Regulating) জন্য। পার্লামেন্ট সবসময়ে উদ্‌গ্রীব ছিল কোম্পানির শাসনের সুবিধাগুলি ভোগ করতে, অসুবিধাগুলি বাদ দিয়ে। পার্লামেন্ট আগ্রহী ছিল ভারত সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যের সাফল্য অর্জন করার আগে পর্যন্ত একে সবসময় সমস্যাসঙ্কুল বলে গণ্য করতে এবং এমন একটি প্রকল্পে, যা আপাতগ্রাহ্য ভাবে সাফল্যমণ্ডিত মনে হলেও এ থেকে হিতকর কোনও ফল পাওয়া যাবে না বলে দেশের স্বার্থ বিপন্ন করতে চায় নি। তাই পার্লামেন্ট একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে ঋণগ্রহণের ব্যাপারে কোম্পানির উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, যাতে না

কোম্পানি ভারতবর্ষের উপর তাদের অধিকার হারিয়ে বসে এবং ইংরেজদের পুঁজি বিপন্ন করে ইংল্যান্ডের সর্বনাশ এনে দেয়।

V

ভারতবর্ষ এবং ১৯৫৮ সালের আইন

ইংল্যান্ডের পরম সমৃদ্ধির উৎস হওয়া সত্ত্বেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও জনগণের হাতে নিদারুণ ভাবে অপমানিত হত।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় বাণিজ্যে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার সম্বন্ধে কিছুটা শংকিত থাকত এবং ঐ সুযোগ-সুবিধা কোম্পানিকে ভোগ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ রাজশক্তি যতটা সম্ভব সুফল আদায় করে নিতে বদ্ধপরিকর ছিল। কোম্পানির প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিটি দুর্বলতাকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করত অবৈধভাবে জুলুম চালাবার ও হস্তক্ষেপ করার জন্য। তারা সনদের পুনর্নবীকরণকে প্রায়ই একটা সুযোগ হিসাব গ্রহণ করত ভারতীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে সঞ্চিত সম্পদ উগরে দিতে।

কোম্পানির ইতিহাসের গোড়ার দিকে বাণিজ্য সম্পর্কে এই একচেটিয়া অধিকার সংক্রান্ত বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল এবং তার স্বপক্ষেও বিপক্ষের যুক্তিগুলি অত্যন্ত তীব্রভাবে সমালোচিতও হয়েছিল। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত সৎ ও অসৎ সবরকম উপায়ে কোম্পানি ইংরেজ কূটনীতিবিদ্দের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজেদের একচেটিয়া অধিকার অব্যাহত রাখতে স্বপক্ষে আনতে সফল হয়েছিল। কিন্তু ঐ বছরেই কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে এত হৈচৈ শুরু হল যে, কোম্পানি ও মন্ত্রীরা উভয়েই বাধ্য হন হার মানতে এবং পূর্ব ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করার দ্বার সব ইংরেজ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল।

১৮৩৪ সালের আইনের দ্বারা কোম্পানি আর বাণিজ্যিক নিগম হয়ে থাকল না। কোম্পানির বিধিসম্মত দায়-দায়িত্বগুলি যে পালন করা হয়েছিল তা নিম্নলিখিত তথ্য থেকে জানা যাবে :

'আয়ত্তাধীন বাণিজ্যিক সম্পত্তিগুলি ১৮৩৪ সালের আইন অনুসারে বিক্রি হয়েছিল এবং তা থেকে আদায় হয়েছিল ১,৫২,২৩,৪৮০ পাউণ্ড, এবং ঐ অর্থ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিলি-বন্দোবস্ত করা হয়েছিল : ভারতীয় ঋণ পরিশোধের জন্য ৮১,৯১,৩৬৬ পাউণ্ড : ইংল্যান্ড আঞ্চলিক খরচাদি মেটাতে দেওয়া হয়েছিল ২২,১৮,৮৩১ পাউণ্ড :

ব্রিটিশ ঋণপত্রের ঋণের একাংশ শোধ করার জন্য ব্যয় হয়েছিল ১৭,৮৮,৫২৫ পাউণ্ড : ১৮৭৪ সালে কোম্পানির পুঁজির (Capital Stock) (৬০,০০,০০০) চূড়ান্ত পরিশোধের জন্য চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সমেত 'প্রতিভূতি তহবিলে'র (Security Fund) ব্যবস্থা করার জন্য তহবিলে বিনিয়োগের জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডকে দিয়েছিল ২০,০০,০০০ পাউণ্ড : জাহাজ মালিক ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যয় করা হয় ৫,৬১,৬০০ পাউণ্ড : এবং বাকি ৪,৬৩,১৩৫ পাউণ্ড রেখে দেওয়া হয়েছিল ভারত সরকারের প্রয়োজনের জন্য লভ্য নগদ তহবিল হিসাবে। কোম্পানি কর্তৃক ব্যবসাদারীর জন্য অলভ্য পরিসম্পদ দাবি করেছিল যথা, লিডেন হল স্ট্রিট-স্থিত ইন্ডিয়া হাউস, সামরিক সম্ভার বিভাগের জন্য আটকে রাখা একটি গুদামবাড়ি এবং ভারতে গৃহসম্পত্তি—সবার মোট মূল্য ৬,৩৫,৪৪৫ পাউণ্ড রয়ে গেল কোম্পানির হাতে। কিন্তু তা ভারত সরকারের ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য হবে।'

বাণিজ্যিক সংস্থা হিসাবে কোম্পানির বিলোপ সাধন হলেও, ভারতবর্ষে তার অধিকৃত অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক সার্বভৌমরূপে কোম্পানি তার অস্তিত্ব অব্যাহত রেখেছিল। দুর্ভাগ্যবশত কোম্পানির অবলুপ্তির দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অক্ষমতা সুপরিস্ফুট হয়ে উঠলেও সেটাকেই তার উচ্ছেদের কারণ মনে করলে ভুল করা হবে। পক্ষান্তরে, প্রকৃত অর্থে বিদ্রোহ সংঘটিত হবার আগেই ইংল্যান্ডের রাজশক্তি কর্তৃক ভারত সরকারের সরাসরি ভার গ্রহণের আলোচনা চালু হয়ে গিয়েছিল, যা এই ঘটনাকেই নির্দেশিত করছিল যে, বিদ্রোহ হোক বা না হোক ব্রিটিশ কূটনীতিবিদরা অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন যে, ভারতবর্ষে তাদের শাসনব্যবস্থা থেকে পরোক্ষ ভাবে আসা তুলনায় অকিঞ্চিৎকর 'পাতা ও মাছের' উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে, সেটা আসত সেই নিগমের কাছ থেকে উচ্ছিষ্ট হিসাবে, যখন তারা সরাসরি নিজেদের পেট ভরাত গরুর চর্বি দিয়ে।

এই পরোক্ষ প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত ক্লান্তিকর এবং অধৈর্য মানুষদের মানসিক ভাবে অবসাদগ্রস্ত করে তুলত। ক্রিমিয়া যুদ্ধে সাফল্যের ফলে ১৮৫৭ সালে প্রবল সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন পেয়ে লর্ড পামারস্টোন নির্বাচিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির পরিচালকদের চমকে দিয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে কোম্পানির বিলোপ সাধন করার জন্য এক বিধেয়ক (Bill) প্রবর্তন করার প্রস্তাব আনলেন, সেই সঙ্গে ভারত সরকারকে রাজশক্তির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দখল করার জন্যও।

দুভার্গ্যবশত বিদ্রোহ শুরু হল ১৮৫৭ সালে এবং ইতিমধ্যে পুরোদমে চালু হয়ে যাওয়া বিলোপ সাধনের আন্দোলনকে প্রবলভাবে উৎসাহ জোগাল।

১৮৫৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির সভাপতি ও উপ-সভাপতি পামারস্টোনের বিজ্ঞপ্তির উত্তরে আবেদন জানালেন যে, ভারতবর্ষের প্রশাসনের জন্য কোম্পানির অনুরূপ 'একটি মধ্যবর্তী, অ-রাজনৈতিক এবং সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন সংস্থার' প্রয়োজন আছে।

এছাড়া কোম্পানি পার্লামেন্টের উভয় সদনে একটি যথাবিধি আবেদনপত্র পাঠাল। আবেদন পত্রটির খসড়া রচয়িতা জন স্টুয়ার্ট মিল কোম্পানির বিলোপ সাধনের জন্য বিধেয়কটির উত্থাপকের যুক্তির ভুল-ভ্রান্তিগুলি দেখালেন। একেবারে গোড়া থেকেই ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারত সরকারের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সভাপতিত্বকারী একজন মন্ত্রীর মাধ্যমে। ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির মন্ত্রীর মধ্যে ছিল পরিচালকদের সভা, যা তুলে দিতে চাইছিল এই নতুন বিধেয়ক। মিলের যুক্তি ছিল এই যে, পরিচালকদের এই সভা (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি অঙ্গ), অভিজ্ঞতার মূর্ত প্রতীক ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির মন্ত্রীর পক্ষে এক উপকারী পথপ্রদর্শক। তারা প্রকৃত অর্থে ভারতের সমগ্র প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং বলেছিল যে, প্রশাসনের প্রণালী থেকেই যদি প্রকৃত অর্থে অপকারের উদ্ভব হয়ে থাকে তবে তার প্রতিবিধানের যে পথ খোঁজা হয়েছিল অর্থাৎ পরিচালকদের সভা বাতিল করা এবং তার ফলে ব্রিটিশ রাজশক্তির মন্ত্রীকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলা, তবে তা ব্যাধির চেয়েও মারাত্মক পন্থা হয়ে উঠেছিল। পরিচালকদের সভার সাহায্য ছাড়াই ব্রিটিশ রাজশক্তির মন্ত্রী কর্তৃক যদি ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হত তবে বেশি ভুলভ্রান্তি হত না, একথা বিশ্বাস করার অর্থ হবে এই কথা মেনে নেওয়া যে, খুশিমত ভারতকে শাসন করার পূর্ণ ক্ষমতা-বিশিষ্ট ঐ মন্ত্রী অপশাসনই বেশি করেছেন। কারণ তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছিল অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল উপদেষ্টারা।'

ভারত ও ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু পরস্পরবিরোধী অভিমত চালু ছিল।

ইংল্যান্ডের একটি বিখ্যাত সংবাদপত্র দ্য স্ট্যানলে রিভিউ (The Stanlay Review) যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল যে, ভারতকে ইংরেজদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে টিকিয়ে রাখতে হবে। বস্তুত ঐ সংবাদপত্র তাদের বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল এই তথ্যের সাহায্যে যে, যে-সব ইংরেজ ভারতে যেত তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠত এবং তারই মধ্যে ছিল গণতন্ত্রের বিপদের বীজটি। পত্রিকাটি সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিল যে, 'একটি বিশাল

টর্পেডোর' মত ভারত হিতকর কর্মতৎপরতাগুলিকে অকেজো করে দেবে এবং ইংল্যান্ডের স্বাধীন নৈতিক জীবনযাত্রাকে হতবুদ্ধি করে দেবে।' ... এবং যদি ... 'এবং পুরো ছবিটি যদি ইংল্যান্ডের দৃষ্টিপথে আনা যায়, তবে তা এক মহান শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে ইংল্যান্ডের পক্ষে, যেখান থেকে ইংল্যান্ড নেপল্‌সের রাজার নীতিগুলি এবং শ্রীমতী স্টোস লেগ্রির প্রয়োগ-পদ্ধতিগুলি শিখতে পারবে।'

অন্যদের মধ্যে কোঁৎ (Conte)-এর এক শিষ্য জনৈক রিচার্ড কনগ্রিভ অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন যে, নিজের ভাগ্য নিজে নির্ধারণ করার ভার ভারতের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। তিনি এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, কোনও এক জাতিকে অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হওয়ার বিষয়টি মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট এবং তা মানবতার উন্নততর বিকাশের পক্ষে সুবিবেচিত নয়। ইংরেজরা ছেড়ে চলে আসার পর অন্য কোনও জাতি যাতে ভারতে পদার্পণ না করে তা দেখার জন্য তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, একটি আন্তর্জাতিক পর্ষদ গড়ে তোলা হোক যা প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করবে, যা শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের উপরই ন্যস্ত হবে, যখন তারা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

এই অভিমতগুলির একটিও অবশ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের অভিমতের অনুরূপ হয় নি, যে সদস্যরা ভিন্নতর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা বদ্ধপরিকর ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে উচ্ছেদ করতে এবং ভারত সরকারকে অবিলম্বে ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনস্থ করতে । তারা দ্বৈত সরকারের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সরকার উপস্থাপিত করতে চেয়েছিল। এর ফলে আবেদনপত্র বা স্বাধীন জনমতের কোনও প্রভাব পড়ল না এবং কোম্পানির উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য ও ভারতের ভবিষ্যৎ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বিধেয়ক উপস্থাপিত করেন। বিধেয়কটি অনুমোদিত হবার আগে ষড়যন্ত্র বিধেয়ক (Conspiracy Bill) পামারস্টোন সরকারের পতন ঘটাল। যার স্থলাভিষিক্ত হল রক্ষণশীল (Conservative) পার্টির দ্বারা, যাঁর নেতা ছিলেন লর্ড ডারবি। ক্ষমতাচ্যুত হবার ফলে পামারস্টোনের আনীত বিধেয়কও বাতিল হয়ে যাবার পর লর্ড ডারবি অধীনস্থ প্রধানমন্ত্রী (Chancellor) বেঞ্জামিন ডিজরেলি তাঁর ভারত-বিধেয়ক পেশ করলেন। এই দুটি বিধেয়কের গুণাবলি সম্বন্ধে জন স্টুয়ার্ট মিলের তুলনামূলক আলোচনা থেকে অনেক কিছু জানা যায় এবং পরবর্তী ঘটনাগুলি তাঁর বক্তব্যকেই পরিপুষ্ট করেছিল। তিনি বলেন:

'এই সব অসুবিধাগুলি (এক জাতির দ্বারা পরিচালিত অপর জাতির সরকারের) দূর করার জন্য বিধেয়কগুলিতে যে সব উপায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মধ্যে

মন্ত্রীর অপ্রতিহত ক্ষমতাটি অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে বিধেয়ক দুটির মধ্যে গুরুত্ব সম্পর্কে কোনও পার্থক্য নেই। একথা সত্য যে, মন্ত্রীর একটি পরিষদ থাকতে বাধ্য। কিন্তু অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী শাসকদেরও পরিষদ থাকত। একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের পরিষদ এবং শাসককে স্বেচ্ছাচারী হতে বাধা দেয় যে, পরিষদ, তার মধ্যে পার্থক্যটি হল এই যে, একটি পরিষদ স্বাধীন, অপরটি পরাধীন, একটি পরিষদের নিজস্ব কিছু না কিছু ক্ষমতা আছে, অপরটির নেই। প্রথম বিধেয়কের (লর্ড পামারস্টোনের বিধেয়ক) বলে সমগ্র পরিষদ মনোনীত হত মন্ত্রীর দ্বারা। কিন্তু দ্বিতীয় বিধেয়কে (ডিজরেলির বিধেয়ক) পরিষদের অর্ধেক সদস্যদের মনোনীত করবে মন্ত্রী। এই পরিষদের উপর যে কর্মভার সমর্পণ করা হবে, উভয় বিধেয়কের সামান্য ব্যতিক্রম বাদে তা নির্ভর করবে মন্ত্রীর নিজস্ব খেয়াল-খুশির উপর।'

লর্ড পামারস্টোনের বিধেয়কের তুলনায় ডিজরেলির বিধেয়কের পরিণাম আরও খারাপ ছিল। তা একেবারেই নাকচ হয়ে গেল। ফলে ১৮৫৮ সালের আগস্ট মাসে একটি নতুন বিধেয়ক উত্থাপিত হল এবং 'ভারতে উন্নততর সরকারের জন্য আইন' এই নামে তা অনুমোদিতও হল।

এই আইনে (৭৫ নং ধারার) নির্দেশিত ব্যবস্থা, যা আজও ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থাকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করে আসছে, তা তাদের চরিত্র অনুযায়ী দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

(১) যেগুলি অতীতের ঘটনাবলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

(২) যেগুলি ভবিষ্যতের ঘটনাবলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

যেগুলি অতীতের ঘটনাবলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, আমরা প্রথমে সেগুলি নিয়েই বিচার-বিবেচনা করব—প্রধানত রাজস্ব সম্বন্ধীয় ও বাণিজ্যিক দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে কোম্পানির দায়িত্ব স্থির করা। এই আইনের ৪২ নং ধারায় আছে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুঁজি ও সংভারের লভ্যাংশ শুধুমাত্র ভারতের রাজস্বের উপরেই দায়বদ্ধ ও দায়বদ্ধ যোগ্য হওয়া উচিত।'

ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সমদর্শিতার ভিত্তিতে সমাধান করতেই হবে, এমন সকল প্রশ্নের মধ্যে ভারতীয় ঋণের প্রশ্নের চেয়ে অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আর কোন প্রশ্ন ছিল না। সে যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য প্রশ্নটি ছিল কে এই ভারতীয় ঋণের বোঝা বহন করবে? প্রশ্নটির জটিল দিকটি এই যে, ঐ ঋণের জন্য কে দায়ী এবং ঋণ নেওয়ার উদ্দেশ্যই বা কি ছিল?

এই সমস্যা সম্বন্ধে সারগর্ভ মন্তব্যটি ছিল মেজর উইঙ্গেট-এর, যিনি বিদ্রোহের অব্যবহিত কাল পরেই বলেছিলেন :

'নিজেদের বিষয়গুলি পরিচালনার ব্যাপারে ভারতের জনগণের বক্তব্য যদি শোনা হত বা শুধুমাত্র ভারতের কল্যাণ সাধনের জন্যই যদি ভারত সরকারের কর প্রথা ও ব্যয়ের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হত এই দেশের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া বা হস্তক্ষেপ না করে? তার গঠন-বিন্যাস বা ক্ষমতাবলির পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা হোক না কেন, ভারত সরকার তার স্থাপনের প্রারম্ভ মুহূর্ত থেকে অদ্যাবধি নিঃসন্দেহে ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে। ঋণের চুক্তি করার জন্য ভারত সরকারকে যে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিল, তার কর্তৃত্ব ভার ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অর্পিত হয়েছিল, যা এই মুহূর্ত পর্যন্ত এই ক্ষমতা ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ অধিকার প্রয়োগ করে। যেমনটি করা হয়েছিল শেষ ঋণ-স্বীকার পত্রের (Debenture) ঋণ সম্বন্ধে .... পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শুধুমাত্র ব্রিটিশ জাতির ন্যাসরক্ষক (Trustee) বলে ঘোষণা করেছিল। যা এই দৃষ্টিকোণের বিচারে মাঝে মাঝে তাদের ঐ ন্যায়ের শর্তগুলি বদলে দিত এবং শেষ পর্যন্ত ন্যাসরক্ষকদের কাজকর্মের দায়িত্ব থেকে একেবারেই অব্যাহতি দিয়ে দিল। বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে যে, একটি নির্দিষ্ট রাজ্যের সরকার হওয়ার পরিবর্তে প্রথম থেকেই তা হয়ে উঠেছিল **ব্রিটিশ সরকারের একটি বিভাগ।** নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সভাপতির মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে উঠে ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলী প্রকৃত ক্রিয়াশক্তিকে (Motive Power) গড়ে তুলেছিল, যা পর্যায়ক্রমে আসা ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থাগুলির নীতি নির্ধারিত করেছিল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি সুবিধাজনক আবরণী মাত্র।...... প্রকৃত ঘটনা যদি তাই হয়, তবে, সেগুলির প্রতিবাদ করাও চলে না, মনে হয় আমাদের মুখ বন্ধ রাখা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসতে যে, ভারত সরকারের কাজকর্মগুলি প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিল ব্রিটিশ জাতিরই কাজকর্ম। জাতীয় সরকার বা সংবিধানের ছায়া পর্যন্ত ভারত কখনও পায় নি, বরং একটি বিজিত দেশ হিসাবে শাসিত হত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ব্রিটিশ প্রশাসনগুলির পরম্পরা ক্রমে। **ভারতীয় ঋণ প্রকৃতই এই দেশের সরকার দ্বারা গৃহীত হয়েছে এবং তাহলে কি করে আমরা ভারতীয় ঋণভার থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হব?'**

ইংল্যান্ডের সুযোগ-সুবিধা এবং ভারতের ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে চিন্তা করার জন্য ব্রিটিশ জনগণের মানবিকতাবোধের কাছে আবেদন জানিয়ে ছিলেন মি. উইঙ্গেটও :

'এই সুযোগ-সুবিধাগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করতে হলে, একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

বিষয় পাঠকদের মাথায় সবসময়ে থাকা উচিত এবং তা হল এই যে, পরিমাণ প্রচুরই হোক বা অল্পই হোক এই সুযোগ-সুবিধাগুলির বিনিময়ে জাতি কিছুই পায় নি। এই নিশ্চয়াত্মক উক্তিটি যত বিস্ময়করই লাগুক না কেন এই প্রজন্মের ইংরেজদের কানে, যারা এখনও ভুলে যায়নি কানাডার বিদ্রোহী, কাফরি (Caffre) যুদ্ধ, সিংহলের অভ্যুত্থান এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ দিতে তাদের কী বিশাল অংকের অর্থ দিতে হয়েছিল এবং যাদের প্রতি বছর মনে করিয়ে দেওয়া হয় পার্লামেন্টে পেশ করা সম্ভাব্য ব্যয়ের খসড়ার মাধ্যমে আমাদের উপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশগুলির রক্ষণাবেক্ষণ বা শাসন করার খরচ সম্বন্ধে। কিন্তু তবুও বলা যায় যে, ঐ নিশ্চয়াত্মক উক্তিটি কঠোরভাবে এবং খোলা মনে বিচার করলেও নির্ভুল। পরম বিস্ময়ে আমরা কি উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি, 'কী আশ্চর্য, আমরা যারা আমাদের অধিকৃত উপনিবেশগুলির জন্য প্রচুর খরচ করেছি, এবং অকৃতজ্ঞ বিদেশিদের জন্য বহু ব্যয়সাপেক্ষ যুদ্ধ চালিয়েছি, সেই আমরাই আমাদের বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য এবং তা নিজেদের অধিকারে রাখার জন্য কোনও অর্থই ব্যয় করব না। এরকম চলতে পারে না। এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।' এটা অবিশ্বাস্যই বটে। কিন্তু এর পিছনে আছে আরও কিছু আশ্চর্যান্বিত হওয়ার বিষয়। কারণ এটাই শুধু সত্য নয় যে, এই দেশের পক্ষ থেকে একটা শিলিংও খরচ না করে ভারত দখল করা হয়েছিল, এটাও সমপরিমাণে সত্য যে, ভারতের জন্য ব্যয় করা দূরের কথা, ভারত গ্রেট ব্রিটেনকে প্রচুর পরিমাণে কর জুগিয়ে এসেছে, এবং সেটা যে শুধু বর্তমান শতাব্দীর মধ্যেই ১০ কোটি পাউন্ডের মত এক বিশাল অংকের অর্থের চেয়ে কখনও কম যে হয় নি, ওটা ভেবে দেখার মত বিষয়।

'ভারতের প্রদত্ত কর, তা সেটা ন্যায় বিচারের তুলাদণ্ডেই মাপা হোক বা আমাদের প্রকৃত স্বার্থের দৃষ্টিকোণ দিয়েই বিচার করা হোক, দেখা যাবে যে সেটা মানবতার দিক দিয়ে, সাধারণ বুদ্ধির বিচারে এবং অর্থনীতি বিজ্ঞানের কাছ থেকে প্রাপ্ত নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন।'

ভারতের অভিযোগটির প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মি: উইঙ্গেট ইংরেজ জনগণকে প্রশ্ন করেছিলেন :

'ভারতে আমাদের নীতি যদি ঐ দেশের জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য নির্দোষ, নিঃস্বার্থ ও হিতকর হিসাবে নির্ধারিত হত এবং আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে পারে এমন কোনও পদ্ধতি সম্বন্ধে যদি ন্যূনতম চিন্তাও না করা হত তবে কী হত? এই নীতিটিই কি এই দেশে ভারতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির আমদানির উপর বাধাদায়ক শুল্ক

চাপিয়ে দেওয়ার এবং ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ভারতে আমদানি করার উপর নামমাত্র শুল্ক ধার্য করার নীতি নির্ধারক ছিল? ভারত থেকে গ্রেট ব্রিটেনে শুল্ক রেহাই দিয়ে রপ্তানি করা এবং পৃথিবীর অন্যান্য সকল অংশে রপ্তানির উপর কর ধার্য করাটা কি ভারতের জন্য নিছক সহানুভূতির জন্যই করা হয়েছিল? ব্রিটিশ জাহাজে করে ভারতে পণ্য দ্রব্য আনার উপর অন্য যে-কোনও দেশে জাহাজে করে আনা অনুরূপ পণ্য দ্রব্যের উপর ধার্য করের দেড়গুণ বেশি আমদানি শুল্ক ধার্য করাও কি ভারতের স্বার্থে করা হয়েছিল? ফৌজদারি মামলার বিচারের সাধারণ আদালতের অধিক্ষেত্র থেকে ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের অব্যাহতি দেওয়া, যার ফলে ব্রিটিশদের কৃত অপরাধের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিবিধান পাওয়ার বিষয়টি ১০০টির মধ্যে ৯৯টি ক্ষেত্রে প্রায় কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এটাও কি শুধুমাত্র দেশীয়দের স্বার্থেই করা হয়েছিল? ভারতীয়দের শিক্ষাদান ও আলোকপ্রাপ্ত করার জন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করার আগে ভারতস্থ সরকার প্রতিনিধি ইউরোপীয়দের জন্য ব্যয়বহুল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করাটা কি করদাতা হিন্দু ও মুসলমানদের বিবেচনার বহির্ভূত করে রাখা যায়? অন্য সব ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে যে-সব নিয়ম উপলব্ধ ছিল তার বিপরীতে ভারতে আদায়ীকৃত করের সাহায্যে পূর্বমহাদেশে ব্রিটিশ আধিপত্য সম্প্রসারিত করতে, ক্ষমতা উপলব্ধ করতে ও তা বজায় রাখতে ব্রিটিশদের সামরিক প্রতিরক্ষার খরচাদি ব্রিটিশ রাজস্ব দফতর থেকে মেটানোর জন্য যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল তা কি দেশজ ব্যক্তিদের প্রতি নিঃস্বার্থ বলে গণ্য করা যাবে? এবং সবশেষে, ভারতীয় রাজস্ব থেকে 'স্বদেশের খরচ' শীর্ষক খাতের ব্যয়ভার বহন করার যে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, তা কি ঐ স্বদেশের খরচ খাতের অধীনে ভারতে সংগৃহীত খাজনার থেকে প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড এই শতাব্দীর মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে পাঠানো হয়েছিল শুধুমাত্র ভারতবাসীর উপকারার্থে? মুক্তমনের পাঠক এই প্রশ্নগুলির উত্তর বেশ ভেবেচিন্তে ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে নিজেই নিজেকে দিন এবং তারপর বলুন আমাদের ভারত-নীতির পন্থা নির্বাচনে ব্রিটিশ স্বার্থ ও ভারতীয় স্বার্থের কোনও ভূমিকা থাকা উচিত কিনা।'

আইনগত এবং লোকহিতৈষণার সব যুক্তি-তর্কই সেদিন বিফল হয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সরাসরি অস্বীকার করল ভারতীয় ঋণের দায় বহন করতে, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্জিত সম্পত্তি সৃষ্টির সহায়ক ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেশির ভাগ অনুৎগামী ৬,৯৪,৭৩,৪৮৪ পাউণ্ডের বিশাল ঋণভারের সবটাই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল দারিদ্র-পীড়িত দেশজ ব্যক্তিদের কাঁধে, কোম্পানির ক্রিয়াকর্মে যাদের কোনও কিছু বলার অধিকার ছিল না। এটাই কিন্তু সব নয়; দুভার্গ্যজনক বিদ্রোহে খরচ হয়েছিল ৪,০০,০০,০০০ পাউণ্ড এবং একটি সাম্রাজ্য অর্জন করার জন্য বৈধ খরচ হিসাবে

ন্যায্যত ইংল্যান্ডের উচিত ছিল বিদ্রোহের খরচ মিটিয়ে দেওয়া। জন ব্রাইট (John Bright), যিনি সব সময়ে ভারতীয় কর-দাতাদের পক্ষ সমর্থন করতেন, তিনি পার্লামেন্টের কাছে এই বলে আবেদন জানিয়েছিলেন যে, 'বিদ্রোহ বাবদ যে চার কোটি ব্যয় হবে, তা ভারতের অধিবাসীদের উপরে অত্যন্ত দুঃখপ্রদ বোঝা হয়ে উঠবে। পার্লামেন্ট এবং ইংল্যান্ডের জনগণের কু-পরিচালনার ফলেই এর উদ্ভব হয়েছে। প্রতিটি মানুষ যা ন্যায্য তাই যদি পেত, তবে নিঃসন্দেহে এই চার কোটি দেওয়া উচিত এই দেশের (ইংল্যান্ড) জনগণের উপর কর ধার্য করে।

এই অবৈধ বন্দোবস্তের বাস্তবসম্মত ফলশ্রুতিটি ছিল এই যে, ভারতবাসীরা সাম্রাজ্যটি কিনেছিল লক্ষ লক্ষ অর্থে। কারণ ঋণটি ছিল প্রকৃত খরচের একটি অংশ মাত্র এবং তা উৎসর্গ করেছিল ব্রিটিশ রাজশক্তিকে । অন্যভাবে বলা যায় সাম্রাজ্যটি ছিল হয় দাস বা ন্যাস সম্পত্তি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সংভার সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল একই অন্যায় পথে। কোম্পানির সংভার ঋণমুক্ত করা হয়েছিল অন্য একটা ঋণ নিয়ে, যা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল ইতিমধ্যে এক বিশাল অঙ্কের সম্মিলিত ঋণের সঙ্গে, যা ভারত সরকার ঋণ নামে পরিচিত ছিল।

এই আইন প্রকৃত অর্থে যা করেছিল তা হল, নিয়ন্ত্রণ-পর্যদকে নির্মূল করা । কোম্পানি আইনত অধুনালুপ্ত হলেও সবরকমের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জীবিতই ছিল এবং আজও ভারতীয় রাজস্ব থেকে প্রদত্ত সুদের আকারে লভ্যাংশ পেয়ে চলেছে। এই নীতির বিস্ময়কর পরিণতি ছিল ইংল্যাণ্ডের লাভ এবং ভারতের ক্ষতি। যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতকে ন্যায়বিচার দেওয়ার সবরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল তখন লর্ড ডারবি প্রস্তাব আনলেন যে, ভারতের এই বিপুল ঋণভারকে পার্লামেন্টের উচিত প্রত্যাভূতি (guarantee) দেওয়া, যাতে এর জামিনের ভিত্তিতে সুদের হার কমবে এবং ভারতীয় করদাতারা কিছুটা রেহাই পাবে। তিনি বলেছিলেন :

'আমি জানি যে, ভারতের ঋণ সম্পর্কে সবরকম দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করাটাই পার্লামেন্ট ও এই দেশের সরকারের অভিন্ন নীতি, যে ঋণ ভারতীয় রাজস্ব বিভাগের উপর দায়বদ্ধ হয়ে আছে। বর্তমান অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে ঐ নীতিতে কোনও পরিবর্তন আনার সুপারিশ করতে যাচ্ছি না। আমি ভাল ভাবেই জানি যে, ঐ ধরনের প্রস্তাব আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারে এবং আর এটাও জানি যে আমার প্রস্তাব অপরিহার্যভাবে অগ্রাহ্য হবে। কিন্তু এই প্রশ্নটিই বারবার উঠবে এবং তা ভবিষ্যতে এবং বর্তমানেও বিবেচিত হতে বাধ্য।

অনুরূপভাবে আমি সদনকে একথা স্মরণে রাখতে বলব যে, যদি কখনও এই ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত নীতিতে পরিবর্তন ঘটানোর সময় আসে এবং ঐ সব ঋণভারের জন্য জাতীয় প্রত্যাভূতি দেওয়া হবে, তখন ঐ প্রত্যাভূতি ভারতীয় ঋণের উপর প্রদত্ত সুদের ভার ৭,৫০,০০০ পাউন্ড, বা এমন কি ১০,০০,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত কমিয়ে দেবে, যা প্রতিপূরক নিধি (Sinking Fund) হিসাবে গড়ে উঠবে ও সমগ্র ঋণ শোধের জন্য ব্যয়িত হবে।'

'রাজশক্তির তরফ থেকে এই ব্যাপারে প্রত্যাভূতি দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছি আমি। যদি আমরা ভারতের সম্পদগুলিকে নিঃশেষ করার পর তার প্রতি কর্তব্য পালন না করি এবং তারা যদি ইংরেজদের অর্থ দিতে সম্মত হয় এবং ভারতের ব্যয়ের উপর ইংল্যান্ডবাসীদের কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকার দরুন তারা যে কী পরিমাণ অকল্পনীয় অপচয় করবে তা বলা অসম্ভব এবং ভারতকে বাঁচাবার প্রচেষ্টায় আমাদের কি ইংল্যান্ডের সর্বনাশ করার দিকে আর এগনো উচিত হবে না?

এই বিপদকে এতটা বাড়িয়ে দেখানোর ব্যাপারে মি. ব্রাইটের উপর ন্যায্যতা প্রমাণের কোনও দায়িত্ব ছিল না তাই নয়, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন 'যে ভারতের ব্যাপারে ইংল্যান্ডবাসীরা অনতিবিলম্বে অবহেলা দেখানোও বন্ধ করবে এবং ভারতীয় ব্যয়ের ব্যাপারে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে, যদি ভারতীয় ঋণের দায় দায়িত্বের কিছুটা অংশ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত।'

সব আলোচনাই নিষ্ফল হল এবং যে প্রাণশক্তির অপচয় হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণও হল না এবং কোনও অর্থেই দেশজ ব্যক্তিরা "অগণিত দুঃখ-কষ্টের শোচনীয় উৎস" থেকে কোনও রকমের পরিত্রাণও পায় নি।

এবার আমরা দেখব, এই আইন ভবিষ্যতের জন্য কি করতে চেয়েছিল। ৫৫নং ধারায় বলা হয়েছিল, 'মহারানির অধিকৃত ভারতীয় সাম্রাজ্যের উপর প্রকৃত অভিযানকে প্রতিহত করতে বা বাধা দেওয়া ছাড়া বা হঠাৎ ও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া, পার্লামেন্টের উভয় সদনের সম্মতি ব্যতিরেকে ভারতের রাজস্ব ঐ ধরনের অধিকৃত রাজ্যের বহিঃসীমান্ত ছাড়িয়ে মহারানির সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত কোনও সামরিক অভিযানের ব্যয় নির্বাহের জন্য ঐ রাজস্ব দায়বদ্ধ থাকবে না।

শ্রী আর. সি. দত্তের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও একথা অবশ্য ঠিক বোঝা যায় না যে, কিসের ভিত্তিতে তিনি এই ধারাটিকে 'একটি হিতকর আর্থিক ব্যবস্থা' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এটা যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থ সংক্রান্ত প্রশাসনের উন্নতিবিধায়ক। এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। তবে

আইনটি পাশ হবার পরেও ভারতের বাইরে অ-ভারতীয় উদ্দেশ্যে ভারতের রাজস্ব ব্যয়িত হয়েছে, সেটা কখনও হিতকর হতে পারে না। মারাত্মক ত্রুটিটি এই—উপরিউক্ত ধারায় ব্যতিরেকী প্রকরণ, যা ভারতের বাইরে ভারতীয় রাজস্ব ব্যয় করার অনুমোদন করে, তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ 'আগে' বাদ দিয়েছে। কার্যত হিতকর হতে হলে প্রকরণটি এইরকম হওয়া উচিত ছিল—'ভারতের রাজস্ব, পার্লামেন্টের উভয় সদনের আগে নেওয়া সম্মতি ছাড়া, প্রযোজ্য ইত্যাদি .....' 'বর্তমানে যে-ভাবে আছে সেভাবে থাকা চলবে না'। এক অজ্ঞাত লেখক বলছেন, 'খুব সম্ভব ঐ প্রয়োজনীয় অনুবিধিটি (Proviso) মূল খসড়ায় সন্নিবেশিত ছিল, কিন্তু পরে সেই হাতই ঐ শব্দটি বাদ দিয়ে দিয়েছিল, যে অনিষ্টকারী হাত সুপরিকল্পিত ভাবে ২৬, ২৭, ২৮ নং ধারা রচনা করেছিল, যাতে রাজ্য সচিব ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতা, দায়িত্ব-বোধহীনতা এবং সব রকমের অনাক্রম্যতা (immunity) সুনিশ্চিত করে রাখতে পারে।'

অবহেলিত অনুবিধিটিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংবিধির (Statute) রচনার ব্যাপারে যাদের অনেক কিছু করতে হয়েছিল, সেই লর্ড স্ট্যানলি এবং আর্ল অফ ডারবি যে ঐকমত্য হয়েছিলেন সেটা দেখানোর পর লেখক ৫৫নং ধারা সম্বন্ধে মি. গ্ল্যাডস্টোনের অভিমতটি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন :

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বর্ণিত কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র বাদে ভারতীয় সীমান্ত ছাড়িয়ে ভারতের দায়বদ্ধতায় থাকা সেনাবাহিনী কর্তৃক অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় অর্থ মঞ্জুর করার ব্যাপারে পার্লামেন্টের প্রাথমিক সম্মতি নেওয়া যে প্রয়োজন, সেটাই ছিল আমার মতে এই প্রকরণের উদ্দেশ্য। বস্তুত এর উদ্দেশ্য ছিল সামরিক অভিযানে ভারতীয় অর্থ ব্যবহারে বাধা দেওয়া। এটা আমার মনে আছে। কারণ ঐ প্রকরণের রচয়িতা ছিলাম আমি নিজেই এবং বর্তমান লর্ড ডারবি, যিনি তখন ভারতের রাজ্য সচিব ছিলেন, তিনি এই প্রকরণের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে আমার সঙ্গে একমত পোষণ করেছিলেন।'

ঐ একই লেখক আবার বলেছেন :

'এই আইনের এইসব ঘৃণিত ও উপেক্ষিত শর্তগুলির অধীনে লোক দেখানোভাবে নির্দেশিত রক্ষাকবচগুলির প্রতি চরম অবহেলার তুলনায় 'মহারানির ভারত'-এর প্রতি যে বিপর্যয় ও আর্থিক লোকসান এনে দিয়েছে সেগুলি সংখ্যায় অল্প, যদি অবশ্য সেগুলি কারণ হয়ে থাকে। আমরা ভালভাবেই জানি যে, যদি ঐ ধারায় অনিষ্ট নিবারক 'আগে' শব্দটিও অন্তর্ভুক্ত থাকত, তবে কৃত্রিম সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বা দলীয় প্রকল্পের জরুরি প্রয়োজনগুলির পক্ষ থেকে উচ্চ কণ্ঠের দাবি হয়ত ভারতীয় জনগণের

দাবি ও অধিকারগুলিকে অগ্রাহ্য করার জন্য যথেষ্ট হত। কিন্তু ঐ শব্দটি, অন্ততঃপক্ষে, এক অমূল্য অবকাশ দেওয়াটা সুনিশ্চিত করতে পারত, যার মধ্যে বিবেকের কণ্ঠস্বর হয়ত শোনা যেত।'

এই আইনের অ-রাজস্ব সংক্রান্ত (Non-fiscal) ধারাগুলি ছিল :

(১) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলি ন্যস্ত হয়েছিল মহারানির অধীনে, এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ব্যবহৃত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছিল ভারতের রাজ্য সচিবের হাতে। তাঁর অধীনে ১৫ জন সদস্যের একটা পরিষদ্ (Council) থাকার কথা ছিল এবং সদাচরণ করা পর্যন্ত তাঁরা পদে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারতেন এবং ভারতের রাজস্ব থেকে প্রতিটি সদস্য বাৎসরিক ১২০০ পাউন্ড পেতেন বেতন হিসাবে। রাজ্য সচিব ও তাঁর কর্মচারিবর্গের বেতনও প্রদত্ত হত অনুরূপ ভাবে ভারতের রাজস্ব থেকে।

(২) কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সচিবকে। শান্তি ও যুদ্ধের প্রশ্নে (যা এযাবৎ কাল পর্যন্ত পরিচালকদের সভার গুপ্ত কমিটির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দ্বারা বিবেচিত হত) রাজ্য সচিবকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তাঁর পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই বা সদস্যদের না জানিয়েই ভারতে নির্দেশ পাঠাবার।

(৩) ভারতের বড়লাট এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের লাটসাহেবদের অতপর নিয়োগ করল মহারানি; এবং সহকারী লাট সাহেবদের নিয়োগ করবেন বড়লাট অবশ্যই মহারানির অনুমোদন সাপেক্ষে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় জনপালন কৃত্যকে যোগ দেবার জন্য নিয়মাবলি রচনা করবেন রাজ্য সচিব।

উপরে উল্লিখিত প্রশাসন বিভাগের অসৎ প্রবণতাগুলির সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে (১) স্বেচ্ছাচারিতা, (২) গোপনীয়তা এবং (৩) দায়িত্বভারহীনতার দ্বারা। যেগুলি, দেশের সৎ প্রশাসনের পরিপন্থী। এটা সত্যিই অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, ঐ আইনে নিজের দেশের প্রশাসনে দেশজ ব্যক্তিদের বক্তব্যকে স্থান দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একথা কি কেউ বলতে পারে যে, কোম্পানির প্রশাসনের সঙ্গে মহারানির প্রশাসনের খুব বেশি একটা পার্থক্য আছে?

এই আইনের শর্তগুলিকে জনসাধারণ সুবিদিত করার জন্য মহারানি ভিক্টোরিয়া লর্ড ডারবিকে (আইনটির প্রথম খসড়ার ব্যাপারে বাহ্যত খুব একটা সন্তুষ্ট না হয়ে) বলেছিলেন একটি উদ্‌ঘোষণা (Proclamation) জারি করতে, যা, মহারানির বক্তব্য অনুযায়ী, 'মহানুভবতা, সদাশয়তা এবং ধর্মীয় সহনশীলতার মনোভাব সঞ্চারিত করতে

পারে এবং তাতে যেন দেখানো হয় ভারতীয়রা কি কি সুযোগ-সুবিধা পাবে ব্রিটিশ রাজের প্রজাদের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে এবং সভ্যতার দ্বারা বাহিত হয়ে আসা সমৃদ্ধির অংশীদার হয়ে।'

এই উদ্‌ঘোষণা ভারতে পড়ে শোনানো হয় এবং এটিকে ভারতের মহাসনদ (Magna Carta) হিসাবে গণ্য করা হয় এবং যদিও এতে জনগণের অধিকারের কথা ছিল না, তবুও এটা ছিল এক মহান দলিল।

অবশ্য তখনও প্রশ্ন থেকে যায় ভারতের প্রতি ইংল্যান্ডের অবদানের পরিমাণ সম্বন্ধে। বাহ্যত ইংল্যান্ডের প্রতি ভারতের অবদানের পরিমাণের বিশালতা ঠিক ততটাই বিস্ময়কর যতটা ভারতের প্রতি ইংল্যান্ডের অবদানের অকিঞ্চিৎকরত্বের বিষয়টি। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে অবশ্য দুটি বক্তব্যকেই সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে, যদি ভারতের অবদানকে ন্যায় বিচার ও মানবতার তুলাদণ্ডে যেমন মাপা না যায়, তেমনি ইংল্যান্ডের অবদানকে স্বর্ণ বা রৌপ্যের তুলাদণ্ডেও মাপা যায় না। শেষ বক্তব্যটি ভাষাগত এবং আলংকারিক উভয় অর্থেই সত্য। ইংল্যান্ডে ভারতের স্বর্ণ ও রৌপ্যের সংভারে কিছুই যুক্ত করতে পারে নি। পক্ষান্তরে, ভারতকে নিঃশেষিত করে দিয়েছে—যে ভারতকে বলা হত 'পৃথিবীর নিষ্কাশনের নর্দমা।'

ইংল্যান্ডের অবদান ছিল অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন সব ক্ষেত্রে এবং একই ভাবে এই অবদান এতই বেশি যে, টাকা-পয়সা দিয়ে তা মাপা যায় না।

'অবিমিশ্র সন্তুষ্টি দিয়ে না হলেও অন্তত কিছুটা বৈধ গর্বের সঙ্গে ইংরেজরা ভারতে তাদের অতীতের কাজের সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে। তারা ভারতের জনগণকে উপহার দিয়েছে মানবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ—শান্তি। ইংরেজরা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করে এক প্রাচীন সভ্য জাতিকে আধুনিক প্রতিষ্ঠান ও জীবনযাত্রার সংস্পর্শে এনেছে। তারা এক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা কালের অগ্রগতির সঙ্গে সংস্কার সংশোধনের প্রয়োজন হলেও, এখনও অত্যন্ত শক্তিশালী অভীষ্ট ফলদানে সক্ষম। তারা সুবিবেচিত আইন রচনা করেছে এবং ন্যায় বিচারের আদালত স্থাপন করেছে যে আদালতগুলির পবিত্রতা পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশের আদালতের মতোই স্বাধীন। এইগুলিই হল সেই সব ফলশ্রুতি যা ভারতে ব্রিটিশ ক্রিয়াকর্মের সৎ সমালোচক উচ্চ প্রশংসা না করে থাকতে পারে না।'

কিন্তু শুধুমাত্র জৈবিক শান্তিই কি অর্থনৈতিক চরম দারিদ্রের চেয়ে অধিক কাম্য। তার বিচার সকলে নিজের নিজের মত করেই করবে।

দ্বিতীয় অংশ

ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক বিত্তের বিবর্তন

রাজকীয় বিত্তের প্রাদেশিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে গবেষণা

প্রাক্ কথন

এডউইন এ. সেলিগম্যান

অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক

উৎসর্গ

মহামহিম শ্রী সয়াজিরাও গায়কোয়াড়
বরোদার মহারাজা

আমার শিক্ষালাভের ব্যাপারে তাঁর সাহায্যের প্রতি
আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

লেখকের ভূমিকা

সুদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় বিত্ত বা অর্থনীতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা উপস্থাপিত করার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রথাগত অবমাননার হাত থেকে মুক্তি পাবে ছাত্ররা। কিন্তু অপর দিকে, আমার আশংকা, প্রায় সমপরিমাণ দীর্ঘ সময় লাগবে তাঁদের তরফ থেকে তাদের নিজ নিজ তথ্যানুসন্ধানের দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রয়োজন পড়বে। এমন কি যখন কোনও বিষয়ের আলোচনা বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক হবে, তখন ভালভাবে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার জন্য প্রায়ই একটি ঐতিহাসিক পরিবেশ দরকার। দুর্ভাগ্যবশত ভারতের বিত্ত সংক্রান্ত বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক পরিশ্রম করা হয়নি। ফলে এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎকে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কোনও এক বিচার্য-বিষয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা পূর্ণমাত্রায় বিশদে ব্যাখ্যা না থাকার জন্য প্রায়ই অসুবিধা দেখা দিত। প্রায়ই এরকম আশংকা হয় যে, কিছু ভুল-ত্রুটি অলক্ষ্যে ঢুকে পড়েছে এবং এর হাত থেকে ছাত্রটিকে উদ্ধার করার জন্য কদাচিৎ কাউকে পাওয়া সম্ভব যখন হয় না, তখন এক বিরক্তিকর মানসিক ক্লেশ ভোগ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এরকম ঘটনা কদাচিৎই ঘটে যে, এক পথিকৃৎ ছাত্র তার গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে কোনও তথ্য পেয়ে উৎফুল্ল হয়, কিন্তু সেটাও এক দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃত তথ্য বেছে নিতে পারবে। আবার অনেক সময় তথ্যের উৎসগুলি ভ্রান্ত পথেও চালিত করতে পারে, যার ফলে সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পঠন-পাঠন করতে গিয়ে যথেষ্ট সময় ও শক্তির অপচয় হয়।

সংক্ষেপে এইগুলিই ছিল বর্তমান কর্মভারের সঙ্গে যুক্ত অসুবিধা। একজন ছাত্রের কাজের প্রস্তুতির জন্য কোনও পুস্তকই নেই। তার পরিশ্রমকে লাঘব করা বা তাকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য তেমন কোনও পণ্ডিতকেও পাওয়া সহজ নয়। এই সব বিতর্ক সত্ত্বেও অত্যন্ত বিশদে না গিয়েও প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এই গবেষণাকে সফল করতে। এটা এই দায়িত্বভারকে বেশ কঠিন পরিশ্রমের ব্যাপার করে তুলেছে। কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত পরিশ্রম সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি ইচ্ছুক নই এবং এই প্রকরণ গ্রন্থের (monograph) প্রস্তুতিকল্পে যে-সব গ্রন্থ ও দলিলপত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তার এক বিশাল তালিকা পেশ করে পাঠকদের চমকে দিতেও চাই না। আমি বেশি উৎসুক এর দোষত্রুটিগুলি সম্বন্ধে বলতে। অবশ্যই সেরকম বহু দোষত্রুটি আছে যা সু-পণ্ডিত সমালোচকের চোখে পড়তে পারে। তবে আমি আশা করি যে, সেগুলি এমন এক ধরনের নয় যা এর মূল্যের প্রভূত ক্ষতি করতে পারে, যে-মূল্য

এই প্রকরণ গ্রন্থে আছে বলে গণ্য করা যায়। ঐ দোষত্রুটিগুলির কয়েকটি সম্বন্ধে আমি দুঃখিত। বিত্তের স্থানীয় বিকেন্দ্রীকরণ ভারতে শুরু হয়েছিল তার একটা সুনির্দিষ্ট তারিখ আমার কাছে আছে। তবে আমার মনে হয় ঐ তারিখটি সর্বপ্রথম এবং আমার প্রদত্ত তারিখের আগেও কোনও তারিখ থাকতে পারে। এই বিচার্য বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার ইচ্ছে আছে আমার। অথচ ওটা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতই দুষ্কর। ঐ পরিশ্রমের তুলনায় ফলপ্রাপ্তির মূল্য কতটা হবে সেটা সন্দেহের ব্যাপার। এছাড়া আমার প্রদত্ত তারিখটি সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত নই, তবে আমার মনে হয়, পরবর্তীকালের তথ্যানুসন্ধানীরা হয়তো শেষ পর্যন্ত আমার বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করবেন। অন্য যে বিষয়টি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করি নি, অথচ আলোচনা করতে আমার ভাল লাগত, সেটা হল প্রাদেশিক ও স্থানীয় বিত্তের পারস্পরিক সম্পর্ক। আমার মূল পরিকল্পনা তাই ছিল, কিন্তু এটা নিয়ে আমি আর বেশিদূর অগ্রসর হই নি। কারণ আমি দেখলাম যে, যে প্রধান বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করছি, যথা রাজকীয় বিত্তের প্রাদেশিক বিকেন্দ্রীকরণ, তার উপর নানা তথ্য ও যুক্তির ভার চাপানো হয়েছে যা ঐ প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই দোষ-ত্রুটিগুলি অবশ্য অপসারিত হবে ব্রিটিশ ভারতে স্থানীয় সম্পর্কিত একটি ক্রোড়পত্র রূপে প্রকাশিত প্রকরণ গ্রন্থের দ্বারা, যা লিখিত হচ্ছে এবং তা খুব শীঘ্রই প্রকাশ করার আশা রাখি। মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তিও এই প্রকরণ গ্রন্থের ত্রুটি হিসাবে উল্লেখিত হতে পারে। সেগুলি পরিহার করাই ভাল। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করার জন্য শব্দ প্রয়োগে মিতব্যয়িতা বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে তোলে, সেক্ষেত্রে যেসব পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য তা অযৌক্তিক নয়। কারণ সুস্পষ্টীকরণের স্বার্থে তাদের সঙ্গে জড়িত একঘেয়েমিতাকে সব সময়ে ছাপিয়ে যাওয়া দরকার।

ইন্ডিয়া অফিসের (ভারত দপ্তর) বিত্ত-বিষয়ক সচিব মি. রবিনসনকে ধন্যবাদ না জানিয়ে এই ভূমিকার উপসংহার করতে পারি না আমি। তার কারণ তাঁর কাছ থেকে এই বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তিনি আমায় সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন এবং বহু মূল্যবান উপদেশও দেন। আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যান্নানের (Cannan) কাছেও কৃতজ্ঞ, যিনি পাণ্ডুলিপির একটা ক্ষুদ্র অংশের খসড়াও পড়েছিলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যানের কাছেও আমি অশেষ ঋণী আছি। কারণ তাঁর কাছেই আমি সরকারি বিত্তের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার প্রথম পাঠগুলি পেয়েছিলাম। প্রুফ দ্রষ্টার কাজের মত ক্লান্তিকর কাজে সহায়তা করার জন্য আমার বন্ধু শ্রী সি. এস. দেওলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ভীমরাও আম্বেদকর

প্রাক্ কথন

শ্রী আম্বেদকর তার চমৎকার গবেষণামূলক প্রবন্ধে যে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন তা এমনই একটি সমস্যা যা পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ জাগিয়ে তুলছে। প্রথম থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাজস্ব সংক্রান্ত বোঝা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারগুলি চাপিয়েছে। রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যুদ্ধ পরিচালনা এবং অপর দিকে স্থানীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা এবং সুযোগ-সুবিধা সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উভয়ের কাছ থেকে খরচপত্রের দাবি জানাল। পরবর্তীকালে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়ে এসেছিল এক মধ্যবর্তী রূপ, যাকে শ্রী আম্বেদকর বলেছেন প্রাদেশিক সরকার। এই বিভিন্ন শ্রেণীর খবরাদির যে সব নাম দেওয়া হয়েছিল, সেগুলির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের নিজেদের মধ্যেই মত-পার্থক্য ছিল। ভারতে আমরা বলি স্থানীয় প্রাদেশিক ও সম্রাজ্ঞী-সম্বন্ধীয় ব্যয়; জার্মানিতে স্থানীয়, রাষ্ট্র এবং সম্রাট-সম্বন্ধীয় ব্যয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডে স্থানীয়, রাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয়, দক্ষিণ আফ্রিকা ও কানাডায় স্থানীয়, প্রাদেশিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয় এবং ফ্রান্সে স্থানীয়, বিভাগীয় ও সাধারণ ব্যয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আরও ব্যাপক শ্রেণীর ব্যয় সম্প্রসারিত করা হচ্ছে, যা বহন করবে সমগ্র সাম্রাজ্য।

ব্যয়ের এইসব বহুবিধ শ্রেণীর চারিত্র-বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক অবিরাম পরিবর্তিত হয়ে চলেছে সরকারের ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তনের জন্য এটা ঘটেছে।

প্রধানত সাধারণ অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য, যার ফলে রাজনৈতিক কাঠামো বা প্রশাসনিক ক্রিয়া-কর্মে ধীরে ধীরে পরিবর্তন এনেছিল। কোনও কোনও দেশে, যেমন কানাডা, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলে প্রদেশগুলি প্রকৃত অর্থে কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি; অন্যান্য দেশে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, সুইজারল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সৃষ্টি হয়েছিল মূলত সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির দ্বারা। কোনও কোনও দেশে মধ্যবর্তী (প্রাদেশিক অথবা রাষ্ট্র) সরকার গুরুত্ব হারাচ্ছে স্থানীয় অথবা কেন্দ্রীয় সরকারগুলির তুলনায়। অন্যান্য দেশে এর বিপরীতটাই সত্য।

করের ক্রমবর্ধমান চাপ এবং বর্ধিত সরকারি ক্রিয়াকর্মের আধুনিক গণতান্ত্রিকতার বিকাশের সঙ্গে এই বিভিন্ন ধরনের সরকারের উপর করভারের সম-বণ্টনের সমস্যা কম-বেশি তীব্র হয়ে উঠছে। শ্রী আম্বেদকর যাকে রাজস্ব নিয়োগ (assignment), নিয়োজিত রাজস্ব এবং রাজস্ব-ভাগ বলেন, তা সবদেশে পদ্ধতি নির্বাচনের লক্ষণাক্রান্ত। তিনটি মৌলিক পরিকল্পনার একটিকে গ্রহণ করতেই হবে। ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকার একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে।

অতীতকালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এবং জার্মানিতে রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করবে বলে প্রত্যাশা করা হত হয় সম্পূর্ণভাবে নয়। বহুলাংশে আধুনিক কালে কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় এর বিপরীতটাই সত্য। অথবা দ্বিতীয়ত, পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট রাজস্ব ভাগ করে দেওয়া হত আলাদা আলাদা সরকারগুলিকে। অতি সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার মুখ্যত অপ্রত্যক্ষ করের সাহায্য পেত এবং রাজ্য সরকারগুলি সাহায্য পেত প্রত্যক্ষ করের দ্বারা। অথবা তৃতীয়ত, রাজস্ব একটি সরকারই শুধু আদায় করতে পারত এবং লব্ধ অর্থের একাংশ অপরকে বরাদ্দ করা হত। রাজ্য অথবা প্রাদেশিক সরকারের কর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়ার অনেক উদাহরণ আছে। তার চেয়েও বেশি উদাহরণ আছে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় কর ভাগাভাগি করা হচ্ছে রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত করের রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে যথোচিত বণ্টনের সমস্যাটি দ্রুত হয়ে উঠছে এক তুমুল আন্দোলনের বিষয়। জার্মানিতে রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত সম্পর্কটি চলে এসেছে রাজনৈতিক আলোচনার পুরোভাগে।

এই আলোচনায় শ্রী আম্বেদকরের অবদানের মূল্য নিহিত আছে প্রকৃত তথ্যের বস্তুধর্মী বর্ণনা এবং তাঁর স্বদেশে যে চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছিল তার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে। এই উদাহরণগুলি অন্যদেশ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আমার জ্ঞানত অন্য কোনও দেশে অন্তর্নিহিত নীতিগুলি সম্পর্কে এত বিস্তারিত গবেষণা করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

এ কথা সত্য যে প্রকৃত চিত্রের মাত্র অর্ধেক এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। কারণ পরিস্থিতি সর্বত্র জটিল হয়ে উঠেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করার ফলে এবং রাজ্য (প্রাদেশিক) ও সাধারণ (যুক্তরাষ্ট্রীয়) উভয়ের চাহিদার তুলনায় রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের দাবির ফলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যালয়গুলিকে অর্থ সাহায্যদানের সমস্যা সম্বন্ধে বর্তমানে যে ব্যাপক বিতর্কের সূচনা হয়েছে, তা প্রধানত এর সমাধানের জন্য নির্ভর করছে রাজস্ব সংক্রান্ত পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটির যথাযথ উত্তরের উপর। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্রী আম্বেদকর পরবর্তী গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক। এখনকার প্রাথমিক সমস্যাটি সম্বন্ধে যে সাফল্যের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন, ঠিক সেই ভাবেই ঐ পরিস্থিতির উপর আলোকপাতে যদি সফল হন, তবে তিনি আমাদের সবাইকে আরও গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় — এডউইন এ. সেলিগম্যান

নিউইয়র্ক

অক্টোবর, ১৯২৪

ভূমিকা

বিষয়টির সংজ্ঞা এবং রূপরেখা

ভারতীয় বিত্তের ছাত্রের কাছে তথ্য ও পথ-নির্দেশের দুটি প্রধান উৎস সহজলভ্য। একটি হল, বার্ষিক আয়-ব্যয়ক বিবরণ এবং অন্যটি বিত্ত ও রাজস্ব হিসাবের বার্ষিক গ্রন্থ। আলাদা-আলাদাভাবে প্রকাশিত হলেও এই দুটি প্রকৃত অর্থে অনুপূরক গ্রন্থ এই জন্য যে, বিত্ত বিষয়ক বিবরণ বলতে গেলে বাৎসরিক বিত্তীয় লেনদেনের বিশদে ব্যাখ্যাত স্মারকলিপির গঠনের সহায়ক, যা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে বিত্ত ও রাজস্ব হিসাবের গ্রন্থে।

এই উৎস দুটি সহায়ক হলেও, তারা জটিলতা-বর্জিত নয়। বিত্ত ও রাজস্ব হিসাবের সর্বশেষ গ্রন্থের উল্লেখ করলে দেখা যাবে যে, তাতে সন্নিবেশিত হিসাবকে চারটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :— (১) রাজকীয়, (২) প্রাদেশিক, (৩) নিগমবদ্ধ করা (In-corporated) স্থানীয় এবং (৪) বর্হিভূত স্থানীয়। কিন্তু এটাও সর্বত্র সমভাবে পালিত হয়নি। যেমন, ১৮৭০ সালের আগে প্রকাশিত একই শ্রেণীর একটি গ্রন্থে 'প্রাদেশিক' বলে অভিহিত হিসাবের বিবরণ পাওয়া যাবে না। আবার 'স্থানীয়' নামাঙ্কিত হিসাব পাওয়া যাবে না ১৮৬৩ সালের আগে প্রকাশিত কোনও গ্রন্থে। অনুরূপভাবে, ১৮৭০ সালের আগে প্রকাশিত বিত্ত সম্পর্কিত বিবরণের কোনও গ্রন্থে দেখা যাবে, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিত্ত বিষয়ক লেনদেন বিভক্ত হয়েছে কেবল মাত্র রাজকীয় ও স্থানীয় নামে। আবার ১৯০৮ সালের পরে একই শ্রেণীর গ্রন্থ বড় বিচিত্রভাবে হিসাব-পত্রকে বিন্যস্ত করেছে রাজকীয় বা স্থানীয় নামে নয়, বরং করেছে (১) রাজকীয় এবং (২) প্রাদেশিক নামে, যখন কি না ১৯২১ সালের পর বিত্ত বিষয়ক বিবরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শুধু রাজকীয় লেনদেন। হিসাবপত্রের শ্রেণীগুলির মধ্যে নতুনের প্রবেশ এবং পুরনোগুলির অবসানের বিষয়টি একজন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর কাছে অত্যন্ত গোলমেলে।[১] যে স্বাভাবিক প্রশ্নটি করবে তা হল এই যে, এই বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব

---

১) এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, 'বহির্ভুত স্থানীয়' শীর্ষক হিসাবপত্রের শ্রেণীটি, যা বিত্ত ও রাজস্ব হিসাব বিষয়ক গ্রন্থে দেখা যায়, তা কখনই বিত্ত বিষয়ক বিবরণে দেখা যায়নি। এটাকে অন্তর্ভুক্ত না করার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাননি লেখক। মাদ্রাজ ম্যানুয়েল (খণ্ড ১, অধ্যায় ৫, পৃ: ৪৬৭-৯) পত্রিকায় একথা যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছিল যে, অন্তর্ভুক্ত না করার ব্যাপারটি প্রায়োগিক এবং এই পরিস্থিতির মধ্যে নিহিত যে বহির্ভূত তহবিল কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ রাজস্ব আদায়কারী সংস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত হয় না এবং তার হস্তক্ষেপ করারও অধিকার নেই। অসামরিক হিসাব সংহিতার (পৃ: ১৩৭) তৃতীয় সংস্করণে প্রদত্ত একটি বিনির্দেশে (Ruling) আর একটি প্রায়োগিক কারণ পাওয়াও যেতে পারে, যে বিনির্দেশ অনুসারে তহবিলগুলিকে বলা হয় বহির্ভূত। অর্থাৎ বিত্ত বিষয়ক বিবরণ থেকে বহিভূত কারণ যেগুলি সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু ঐ গ্রন্থের সপ্তম ও শেষতম সংস্করণে (পৃ: ১২২) একই বিষয়ে প্রদত্ত বিনির্দেশটি এটিই বোঝাতে চায় বলে মনে হয় যে, প্রতিটি সরকারি তহবিলকে অবশ্যই সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি দেওয়া হয়েছে **নৈতিক ও বৈষয়িক প্রগতির প্রতিবেদনে, ১৮৮২-৮৩** (খণ্ড ১, পৃ: ১০৭), যেখানে বলা হয়েছে যে, এই তহবিলগুলি সাধারণ বিত্তের মধ্যে স্থান পায় না, কারণ সেগুলি 'প্রধানত গঠিত বিশেষ ন্যাস ও উৎসর্জন (Endorsment) দ্বারা।'

হল কি করে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কই বা কী?

বর্তমান গবেষণায় তাদের একটির অর্থাৎ 'প্রাদেশিক'-এর উত্থান ও বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু প্রদর্শিত যুক্তিটিকে বুঝতে যাতে অসুবিধা না হয় তাই এই গবেষণার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যাকারী একটি রূপরেখা এবং যে যে অংশে তা বিভক্ত, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশকারী একটি ভূমিকার প্রয়োজন যুক্তিসঙ্গত মনে হতে পারে। বিষয়টিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার সাহায্যার্থে গবেষণাটিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি আলোচনায় আছে প্রাদেশিক বিত্তের মূল উৎস, বিকাশ সংগঠন ও তার চূড়ান্তরূপ, যা ১৯১৯ সালে সাংবিধানিক পরিবর্তনের ফলে রূপায়িত হয়েছিল। ভাগ-১-এ কিছুটা কণ্টকাকীর্ণ, অ-পদস্পৃষ্ট (untrodden)। অথচ প্রয়োজনীয় পটভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রাদেশিক বিত্তের উদ্ভব সম্বন্ধে এক পূর্ণ ধারণার সৃষ্টি করতে। সেই প্রবচনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে, যে প্রবচন অনুসারে বর্তমানের ছাত্রদের অতীত সম্পর্কে গবেষণা করার দাবি জানায়, তাতে বর্তমানের অতীতের অতিরিক্ত আর কিছু আলোচিত হয়নি। অধ্যায়-১, ভাগ-I-এ প্রাদেশিক বিত্তের শুভারম্ভের আগে বিত্ত সংক্রান্ত পদ্ধতি যে-রূপে বিদ্যমান ছিল, তার একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সেই সব কারণগুলিকে জানাতে যা এর সংগঠনের পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছিল। অধ্যায়-২-এ পুনর্নির্মাণের অধ্যায়ে প্রস্তাবিত বিত্তের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতিকে লোকসমক্ষে আনা হয় এবং দেখানো হয় কেন সাধারণ মানুষ তা মেনে নেয়নি। অধ্যায়-৩-এ একটি পরিকল্পনার আলোচনা আছে, যা ছিল বর্তমান পদ্ধতি ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্ধতির মধ্যে এক ধরনের একটি রফা এবং কোন পরিস্থিতিতে সেটাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল তারও আলোচনা আছে।

ভাগ-I-এ মূল উৎস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেবার পর, প্রাদেশিক বিত্তের বিকাশকে ভাগ-II-এর বিষয়বস্তু করা হয়েছে। এর সঙ্গে তুলনা করার কোনও কিছু না থাকলে ভাগ-I-এ যে বন্দোবস্ত অনুসৃত হয়েছে, তার কতটা সহায়ক হবে যেটা পাঠকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিতে হবে। যদিও ভাগ-II-এর ব্যাপারে লক্ষ করা যাবে যে, বন্দোবস্তটি প্রাদেশিক বিত্ত সম্পর্কে প্রয়াত বিচারপতি রানাডে (Ranade) কর্তৃক ১৮৮৭ সালে এই বিষয় সম্বন্ধে প্রকাশিত যে অসম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ গৃহীত হয়েছিল, তা থেকে ভিন্নতর। ভাগ-II পাঠ করলে দেখা যাবে যে প্রাদেশিক বিত্তের অন্যতম লক্ষণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে সংযোজিত করা রাজস্ব এবং খরচাদি প্রতি পঞ্চম বছরে সংশোধিত হত। বিচারপতি রানাডে তাঁর পুস্তিকাতে, যাতে শুধু ভাগ-II-এ বর্ণিত কারণগুলি সম্বলিত আছে এবং তাও শুধু ১৮৮২ সাল পর্যন্ত, এই

লক্ষণ বৈশিষ্ট্যটিকে একটি আদর্শ নমুনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন প্রাদেশিক বিত্তের বিকাশে একটা স্তর থেকে ভিন্ন স্তরে যাবার বিষয়টিকে চিহ্নিত করতে। এর ফলে প্রতি পঞ্চবর্ষকালের অধ্যায়টিকে তাঁর কাছে একটা স্তর হয়ে উঠেছে এবং তাঁর হাতে পড়ে প্রাদেশিক বিত্তের ইতিহাস ঠিক পঞ্চবর্ষকালের পূর্ণ সময়টি যত অংশে বিভক্ত হয়েছিল ততগুলি স্তরে বিভক্ত হয়েছে। এ কথা অবশ্য বলা চলে যে, যদি প্রতিটি সংশোধন প্রাদেশিক বিত্তের মূল সূত্রটিকে বদলে দিয়েছিল, তবে ঐ ধরনের বন্দোবস্ত অযৌক্তিক হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে প্রতিটি সংশোধনের ফলেও কিন্তু প্রাদেশিক বিত্ত তার রূপ পাল্টায়নি। সংশোধনগুলির কাজ ছিল লোম কেটে নেওয়া মেষকে হাওয়া খাওয়ার সুবিধা করে উপকার করার মত। প্রাদেশিক বিত্তের বিকাশের ইতিহাসকে তার মৌলিক ভিত্তিগুলিতে পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রেখে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করতে হয়, তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিতে হবে। সরকারি বিত্তের তত্ত্ব বিষয়ক লেখকরা মনে হয় বিষয়টিকে কল্পনা করেছিলেন যে, সেটা যেন মূলত করের ব্যাপারে সমতা রক্ষা এবং ব্যয়ের ব্যাপারে মিতব্যয়িতার বিষয় হয়ে যায়। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের একজন প্রধান অর্থমন্ত্রীর কাছে বিত্ত প্রধানত একটি ব্যবহারিক বিষয়, যার সঙ্গে জড়িত সমস্যাটির সমাধান প্রয়োজন। যথা, আয়-ব্যয়কে কী করে ভারসাম্য আনা যায়। আমরা যদি ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক বিত্তের ইতিহাস নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করি প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে ভারসাম্য আনার সমস্যার মোকাবিলা করার পদ্ধতিটি ও এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে, তবে আমরা দেখতে পাব যে, প্রাদেশিক বিত্ত তিনটি বিশিষ্ট স্তরের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। প্রত্যেকটির নিজস্ব সরবরাহ প্রণালী ছিল। যথা (রাজস্ব) নিয়োগ, নিয়োজিত রাজস্ব এবং রাজস্ব-ভাগ। ফলে বিচারপতি রানাডের গতানুগতিক পরিকল্পনা অনুসরণ করার পরিবর্তে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রাদেশিক সরকারগুলির সরবরাহ পদ্ধতি অনুসারে প্রাদেশিক বিত্তের ক্রমবৃদ্ধিতে স্তরগুলি ভাগ করা অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত ও শিক্ষাপ্রদ বলে অনুমিত হয়। ফলে, প্রাদেশিক বিত্তের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা সম্বলিত ভাগ-II-কে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে : (১) (রাজস্ব) নিয়োগের দ্বারা আয়-ব্যয়, (২) নিয়োজিত রাজস্ব দ্বারা আয়-ব্যয় এবং (৩) রাজস্ব-ভাগ দ্বারা আয়-ব্যয় (বাজেট)।

প্রাদেশিক বিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে এই আলোচনা ভাগ-III-এ অনুসৃত হয়েছে এর সংগঠনের পরীক্ষার মাধ্যমে। ভাগ-III এবং সপ্তম অধ্যায়টিতে প্রাদেশিক বিত্ত যে তার সংগঠনের ব্যাপারে স্বাধীন নয়, এই সত্যটি মুখ্যত প্রকাশ করার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির বিত্তীয় ক্ষমতার উপর এযাবৎকাল পর্যন্ত উপেক্ষিত সীমাবদ্ধতার

নিয়মাবলির বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত আছে। প্রাদেশিক বিত্তের প্রকৃত বিশ্লেষণ অবশ্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ের জন্য। যেখানে এই সব সীমাবদ্ধতার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে সিদ্ধান্তটিকে সুদৃঢ় করা হয়েছে যে, প্রাদেশিক বিত্ত সম্পর্কে আড়ম্বরপূর্ণ নাম দেওয়া সত্ত্বেও রাজকীয় বিত্ত এবং রাজকীয় পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও প্রাদেশিক রাজস্ব বা প্রাদেশিক পরিষেবা ছিল না। যার ফলে সংগঠনের ব্যাপারে সঙ্ঘবদ্ধ না হয়ে পদ্ধতিটি প্রধানত রাজকীয় হিসাবেই থেকে গিয়েছিল। পুরানো আইনের অধীনে ভারত সরকারের সাংবিধানিক দায়-দায়িত্বকে বিপন্ন না করে প্রাদেশিক বিত্তের পরিধি কতটা বিস্তৃত করা সম্ভব তারই আলোচনা আছে নবম অধ্যায়ে।

১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের দ্বারা প্রাদেশিক বিত্তের কার্য-পদ্ধতিতে যে সব পরিবর্তন আনা হয়েছিল তার আলোচনা আছে ভাগ-IV-এ। এই অংশের দশম অধ্যায়টি নিয়োজিত হয়েছে সেইসব কারণগুলির বিশ্লেষণে, যা ঐ পরিবর্তনগুলি এসেছিল। একাদশ অধ্যায়ে নতুন আইন দ্বারা যে সব পরিবর্তন আনা হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যখন এক দ্বাদশ অধ্যায় নতুন শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ মাত্র।

প্রাদেশিক বিত্তকে সূচিত করতে গিয়ে ভারতীয় বিত্তের ছাত্ররা সাধারণত 'বিত্তের বিকেন্দ্রীকরণ' শব্দগুচ্ছটি উল্লেখ করে সন্তুষ্ট থাকতে চায় বলে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, যাকে এই গবেষণার অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার শীর্ষক বলা যেতে পারে, তার সমর্থনে সামান্য কৈফিয়ত দেওয়া দরকার। ভারতীয় বিত্তের যে ছাত্র পদ্ধতিটির বিভিন্ন দিকে শাখা-প্রসারণ সম্বন্ধে অবহিত যে, প্রাদেশিক বিত্তের অর্থ বুঝাবার জন্য বিত্তের বিকেন্দ্রীকরণ শব্দগুচ্ছ যে অপ্রতুল, তা লক্ষ করতে ব্যর্থ হবে। ভারতীয় পদ্ধতিতে যদি শুধু মাত্র প্রাদেশিক বিকেন্দ্রীকরণ থাকত তবে এক নতুন শীর্ষক খোঁজার জন্য পরিশ্রমের দরকার হত না। বস্তুত বিকেন্দ্রীকরণের প্রারম্ভিক সূত্রপাতগুলি মোটামুটি অভিন্ন ছিল এবং এর মাধ্যমে বিবর্তিত পদ্ধতিগুলি বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৫৫ সাল থেকে কার্যকর হওয়া বিকেন্দ্রীকরণের কেন্দ্র ও বিকেন্দ্রীকরণের নীতির দ্বারা বিবর্তিত পদ্ধতিগুলি ভিন্নতর ছিল ১৮৭০ সাল থেকে আরম্ভ হওয়া বিকেন্দ্রীকরণের নীতির থেকে উদ্ভূত পদ্ধতিগুলি ও কেন্দ্র থেকে। আবার, লক্ষ করতে হবে যে, ১৮৯২ সাল থেকে যে কেন্দ্র ধীরে ধীরে বিকেন্দ্রীভূত হতে শুরু করেছিল তা ১৮৫৫ বা ১৮৭০ সালের বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা প্রভাবিত কেন্দ্রগুলি থেকে ভিন্নতর। এটাকে আরও সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ১৮৫৫ সালের বিকেন্দ্রীকরণ ছিল ভারতীয় বিত্তের বিকেন্দ্রীকরণ যার ফলে—

(১) স্থানীয় বিত্ত থেকে রাজকীয় বিত্তের পৃথকীকরণ।

১৮৭০ সালের বিকেন্দ্রীকরণ ছিল রাজকীয় বিত্তের বিকেন্দ্রীকরণ যার ফলে—

(২) প্রাদেশিক বিত্ত পৃথক হয়েছিল রাজকীয় বিত্ত থেকে।

এবং ১৮৮২ সাল থেকে শুরু হয়েছিল যে বিকেন্দ্রীকরণ তা হচ্ছে, প্রাদেশিক বিত্তের বিকেন্দ্রীকরণ যার ফলে—

(৩) স্থানীয় বিত্ত পৃথক হয়েছিল প্রাদেশিক বিত্ত থেকে।

অতএব সুস্পষ্টতই 'বিত্তের বিকেন্দ্রীকরণ' প্রাদেশিক বিত্তের নির্দেশক হওয়া দূরের কথা, তা ছিল উপরে বর্ণিত বিকেন্দ্রীকরণের এই বৈচিত্র্যময় এবং বহুবিধ প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ নাম এবং তা বিকেন্দ্রীকরণের একটি প্রণালীর গবেষণার শীর্ষক হিসাবে ব্যবহার করতে গেলে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু হবে না, যে শব্দগুচ্ছ উপরে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত বিকেন্দ্রীকরণের তিনটি প্রণালীর ক্ষেত্রে শ্রেণীগতভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব, যাতে এই গবেষণা যে বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে চাইছে সেটা ছাড়া বিকেন্দ্রীকরণের অন্য প্রণালীর সম্পর্কযুক্ত হিসাবে গৃহীত না হতে পারে। তাই সঠিকভাবে চিন্তা করা হয়েছিল এর নামকরণ করতে 'ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক বিত্তের বিবর্তন', উপ-শিরোনাম সহ 'রাজকীয় বিত্তের প্রাদেশিক বিকেন্দ্রীকরণের গবেষণা', যেখানে প্রাদেশিক ও রাজকীয় শব্দদুটিকে তাদের গুরুত্ব অনুসারে গণ্য করতে হবে। এই শব্দগুচ্ছটি যে প্রায়শই অত্যন্ত অসাবধানতার সঙ্গে ব্যবহৃত হত তার প্রমাণ এই ঘটনা যে বিচারপতি রানাডের লেখা উপরিউক্ত পুস্তিকার নাম দেওয়া হয়েছিল 'প্রাদেশিক বিত্তের বিকেন্দ্রীকরণ।' প্রাদেশিক বিত্তের বিকাশ সম্বন্ধে এতে আলোচনা থাকলেও ছাত্রদের এটা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। কারণ শিরোনাম পরোক্ষভাবে প্রকাশ করছে যে এর বিষয়বস্তু একান্ত ভাবেই হওয়া উচিত স্থানীয় বিত্ত। বিকেন্দ্রীকরণের এই বৈচিত্র্যগুলি সম্বন্ধে বিচারপতি রানাডে যদি সচেতন থাকতেন, তবে হয়তো তিনি বুঝতে পারতেন যে তাঁর পুস্তিকার শিরোনামটি তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিথ্যাচার করছে।

ভাগ I

প্রাদেশিক বিত্ত : এর উৎস

অধ্যায়-১

সাম্রাজ্যিক পদ্ধতি এর বিকাশ এবং পতন

ভারত সরকারের রাজকীয় পদ্ধতির সূত্রপাত হয় ১৮৩৩ সাল থেকে।

যে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য পার্লামেন্ট প্রণোদিত করেছিল এই পদ্ধতি উপস্থাপিত করতে, তার মধ্যে একটি হল, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশি পদ্ধতিগুলির মধ্যে যে সংখ্যাধিক্যতা ছিল তার বদলে একটি সমশ্রেণীর পদ্ধতি স্থাপন করা, যা তার বৈচিত্র্যগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ করে সমগ্র ভারতে যতদূর সম্ভব সর্বজনীন হয়ে উঠবে। সেই সময়ে যে পদ্ধতি বর্তমান ছিল তাতে সংখ্যাধিক্যতা হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। কারণ বঙ্গদেশ[১], মাদ্রাজ[২] এবং বোম্বাই[৩] এই তিনটি প্রেসিডেন্সির প্রত্যেকটির রাজস্বের ক্রম-বিন্যস্তকরণ (ordering) এবং পরিচালন ব্যবস্থা ও সামরিক ও অসামরিক সরকার শুধু যে তাদের নিজ-নিজ সপরিষদ লাটসাহেবে ন্যস্ত ছিল তা নয়, সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি সপরিষদ লাটসাহেব তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে সব অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব করতেন তার উপযুক্ত আইনশৃঙ্খলা ও অসামরিক সরকারের জন্য সেইসব বিধিনিয়ম, অধ্যাদেশ এবং নিয়মতন্ত্র রচনা করার ও জারি করার ক্ষমতাসম্পন্নও ছিলেন। এই শর্তে যে, সেগুলি ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত হবে এবং ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের আইনের বিরোধী হবে না। এইসব কর্তৃপক্ষের দ্বারা ঘোষিত আইন সংহিতাগুলির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে ১৭২৬ সালে প্রথম জর্জের সনদ দ্বারা ঘোষিত যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য ভারতে প্রবর্তিত ইংল্যান্ডের সংবিধি (Statute) আইনের সমগ্র অংশটিকে এবং সেইসব ইংল্যান্ডের আইনগুলির সঙ্গেও যা ঐ তারিখের পর দেশের বিশেষ বিশেষ এলাকায় বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

এই জাতীয় আইনের নানাবিধ অংশগুলিকে পরিচালনা করার কাজটি এত বেশি হতবুদ্ধিকর (embarrasing) ছিল যে, কলিকাতা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় (Supreme Court) এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে—

---

১) ১৩ জর্জ তৃতীয়, সি-৬৩, এস-৩৬

২) ৩৯ এবং ৪০ জর্জ তৃতীয়, সি-৭৯, এস-১১

৩) ৪৭ জর্জ তৃতীয়, অধি: ২, সি-৬৮, এন-৩

'মানুষজনের কোনও বিতর্কিত অধিকার সম্বন্ধে যে কোনও ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করতে বা কোনও মীমাংসায় উপনীত হতে পারবে না, যা মান্য করতে গিয়ে সেইসব মানুষরা সন্দেহ এবং বিভ্রান্তির প্রশ্ন তুলতে পারে, যারা এর যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। কারণ সাধারণ মানুষ বা স্বদেশে পদাধিকারী কোনও ব্যক্তি, এমন কি আইন বিভাগের পদাধিকারীর মধ্যেও অত্যন্ত মুষ্টিমেয় মানুষের কাছ থেকে ভারতীয় আইন পদ্ধতির সম্বন্ধে গভীর ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকাটা আশা করা যায় না, যার দ্বারা তারা এই আইনের প্রতিটি অংশের সঙ্গে বাকি অংশের সম্পর্ক সম্বন্ধে সরাসরি ও অন্তরঙ্গভাবে জানতে সক্ষম হবে।'[১]

অপর উদ্দেশ্যটি ছিল, এই দেশে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের ফলপ্রদভাবে আচরণ করার জন্য এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা। এটা লক্ষ করতে হবে যে, যদি দেশজ অধিবাসীরা আইনের অনিশ্চয়তার জন্য কষ্ট ভোগ করতে থাকে, তবে ব্রিটিশ জনগণ অত্যন্ত পীড়াদায়ক বিধি-নিষেধের মধ্যে বাস করত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্মের ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য ১৭৭১ সালে নিয়োজিত ইংল্যান্ডের লোকসভার গুপ্ত কমিটির প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে ইংরেজদের দ্বারা কৃত নিপীড়নের স্বরূপ প্রকাশের পর ভারতে বেসরকারি ব্রিটিশ প্রজাদের এদেশে আসা ও বসবাস করাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অত্যন্ত কঠোর আইন পাশ করা হয়েছিল। জন্মসূত্রে ইউরোপীয় কোনও ব্রিটিশ প্রজা কোম্পানি বা ভারতের বড়লাট বা আলোচ্য প্রধান উপনিবেশের লাট সাহেবের আগে থাকতে নেওয়া বিশেষ অনুমতিপত্র না নিয়ে প্রধান উপনিবেশগুলির কোনও একটিতে ১০ মাইলের বাইরে ভারতে বসবাস করার অনুমতি পেত না।[২] নিয়ন্ত্রণ পর্যদের[৩] পুনঃপরীক্ষার শর্তসাপেক্ষে কোম্পানির পরিচালকদের সভার ঐ ধরনের অনুমতিপত্র[৪] নামঞ্জুর করার ক্ষমতা ছিল এবং ভারতের সরকারগুলির উপর নির্দেশ ছিল বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া[৫] নিজেদের কর্তৃত্ববলে ব্রিটিশ প্রজাদের বসবাসের অনুমতি দেবে না এবং যে সব ক্ষেত্রে যেগুলি যথোচিত মনে হবে, সেক্ষেত্রে অন্যভাবে বৈধ হলেও অনুমতি পত্রগুলিকে বাতিল ঘোষণা করার অধিকার থাকবে তাদের।[৬]

---

১) হার্বার্ট কোয়েলের 'দ্য হিস্ট্রি অফ দি কনস্টিটিউশন অফ কোর্টস অ্যান্ড লেজিসলেটিভ অথরিটিজ ইন ইন্ডিয়া', কলিকাতা, গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

২) ৩৩ জর্জ তৃতীয়, সি-৫২, এস-৯৮

৩) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, এস-৩৮

৪) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, এস-৩৩

৫) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, এস-৩৭

৬) ৫৩, জর্জ তৃতীয়, সি-১৫৫, এস-৩৬

জাল অনুমতিপত্র[১] বা অনুমতিপত্র ছাড়া বসবাস করা[২]কে জরিমানা বা হাজতবাস সহ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয় এবং যে সব ব্যক্তিকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে বা যে পদত্যাগ করেছে, তারা যদি তাদের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও ঐ দশ মাইল সীমার বাইরে ইচ্ছা করে থেকে যায়, তবে তারা বে-আইনি ব্যবসা করার অপরাধে অপরাধী বলে ঘোষিত হবে।[৩] অনুমতিপত্র ছাড়া ব্রিটিশ প্রজাদের নির্বাচিত করা হত[৪] এবং যাদের অনুমতিপত্র থাকত, তারা যে জেলায় থাকত, সেখানকার আদালতে গিয়ে নিজেদের নাম নিবন্ধভুক্ত করতে বাধ্য থাকত।[৫] স্থানীয় সরকারের[৬] প্রবিধানের অধীনস্থ হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্রিটিশ ভারতে[৭] বা দেশীয় রাজ্যে[৮] সব বয়সের অবৈধ কাজের জন্য ভারতে, সেইসঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় বিচারের জন্য দায়ী থাকত। যাতে এরা কোনও জটিলতা সৃষ্টি করতে অক্ষম হয় তার জন্য এদের অর্থ ঋণ দিতে দেওয়া হত না বা কোনও দেশজ রাজকুমার[৯] বা বিদেশি কোম্পানি বা বিদেশি ইউরোপীয় বণিকদের জন্য ঋণ সংগ্রহ করার ব্যাপারে জড়িত হতে দেওয়া হত না। অনুরূপভাবে এদের অত্যাচার থেকে দেশজ ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য এদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, যাতে তারা শেষোক্তদের বার্ষিক ১২ শতাংশ হারের বেশি সুদে অর্থ ধার না দেয়, এটা না মানলে প্রতিটি অপরাধের জন্য মূল্যের তিনগুণের সমপরিমাণ[১০] অর্থ জারি মানার ব্যবস্থা ছিল এবং ভারতের দেশজ ব্যক্তিদের প্রাপ্য সামান্য পরিমাণ ঋণ[১১] বা তাদের উপর আঘাত হানা বা অসঙ্গত হস্তক্ষেপ[১২] সংক্রান্ত সবরকম ক্ষেত্রে তাদের ন্যায়পাশের (Justice of Peace) অধিক্ষেত্রের আওতায় আনা হবে। উপরন্তু, জন্মসূত্রে ইউরোপীয়

---

১) ৫৩, জর্জ তৃতীয়, সি-১৫৫, এস-১২০

২) ৩৩, জর্জ তৃতীয়, সি-৫২, এস-১৩১

৩) পূর্বোক্ত গ্রন্থ এস-১৩৪

৪) ৫৩, জর্জ তৃতীয়, সি-১৫৫, এস-১০৪

৫) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, এস-১০৮

৬) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, এস-৩৫

৭) ২৪ জর্জ তৃতীয়, সি-২৫, এস-৪৪

৮) ২৬ জর্জ তৃতীয়, সি-৫৭, এস-৬৭

৯) ৩৭, জর্জ তৃতীয়, সি-১৪২, এস-ই-২৮

১০) ১৩, জর্জ তৃতীয়, সি-৬৩, এস-৩০।

১১) ৫৩, জর্জ তৃতীয়, সি-১৫৫, এস-১০৫

১২) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, এস-১০৬

প্রতিটি ব্রিটিশ প্রজা বাধ্য ছিল তার জেলার দপ্তরে তার দেশের তত্ত্বাবধায়ক, প্রতিনিধি এবং অংশীদারের[১] নাম ইত্যাদি তার জেলার দপ্তরে নিবন্ধভুক্ত করতে। এর অন্যথা করলে প্রদেশগুলির অর্ন্তগত যে কোনও আদালতে আইনত মোকদ্দমা করে বা ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে তার হিসাব দাখিল করতে বাধ্য করতে বা যৌথ উদ্যোগের দ্বারা যে কোনও পরিমাণ অর্থ বা একাধিক অর্থ আদায় করতে বা গ্রহণ করতে অধিকার হারাবে[২]।

যে সব বিধি-নিষেধের মধ্যে শাসক জাতিকে রাখা হয়েছিল, তারা তার জন্য দীর্ঘকাল ধরে বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও তেমন কোনও ফল পায়নি। ভারত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিপজ্জনক হতে পারে এমন কারণকে তারা দূরে সরিয়ে রাখতে যে চাইত তা সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে এবং যেহেতু দেশজ রাজকুমারদের বিরুদ্ধে নিরন্তর জয়লাভের ফলে ভারত সাম্রাজ্য পুনর্বিন্যাসের ফলে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তাই ঐসব বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড ক্ষোভ মিশ্রিত সমালোচনার ঝড় উঠেছিল যে, এমন কি তারাও, যারা তাদের নৈতিক উৎকর্ষতাকে নীরবে মেনে নিয়েছিল, একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, তারা তাদের উদ্দেশ্যকে লঙ্ঘন করে গেছে। যুগের অভিমতকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অস্বীকার করতে না পারলেও সেই পরিণামগুলিকে উপেক্ষা করতে অস্বীকার করেছিল, যা তার মতে তৎকালীন সরকারি পদ্ধতিতে জন্মসূত্রে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের অবাধ প্রবেশাধিকার যে অপরিহার্যভাবে দেবে তা বুঝতে পেরেছিল। পার্লামেন্ট উপলব্ধি করেছিল যে, অভিবাসীদের (Im-migrants) প্রতি সুসমঞ্জস আচরণ এবং তাদের উপর ফলপ্রদ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা খুবই দরকারি। পার্লামেন্ট শংকিত ছিল যে, বিভিন্ন সরকার তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে অধিবাসীদের প্রবেশের ব্যাপারে ঐসব ক্ষমতার প্রয়োগ করবে যাদের আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন চালাবার সম-পরিমাণ ও স্বাধীন ক্ষমতা আছে এবং যার ফলে ভিন্নধর্মী মনোভাব বিশিষ্ট অভিবাসীরা তাদের পরস্পর-বিরোধী নীতি অনুসারে সামগ্রিক ভাবে নিজেদের একটি আনুগত্যহীন দলে ঐক্যবদ্ধ করবে, যাদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। সমধর্মী নীতির ভিত্তিতে সুসমঞ্জস আচরণের প্রয়োজন ছাড়াও পার্লামেন্ট ভয় পাচ্ছিল যে ব্রিটিশ অভিবাসীদের অনধিকার প্রবেশের ফলে দেশজ ব্যক্তিদের উপর অত্যাচারের পুনঃপ্রবর্তন সম্পূর্ণভাবে কমানো যাবে না। যেহেতু এর পুনঃপ্রকাশ সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে হয়েছিল, তাই পার্লামেন্ট চেয়েছিল তাদের এক শক্তিশালী ও সমধর্মী

---

১) ২১, জর্জ তৃতীয়, সি-৭০, এস-১৩

২) পূর্বোক্ত গ্রন্থ, এস-১৬

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন করে রাখতে, যাতে একটা অধিক্ষেত্রের কোনও অপরাধী অন্য অধিক্ষেত্রে আশ্রয় পেতে না পারে। ফলে নির্দেশ অবমাননাকর কারণগুলির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা অথবা সমধর্মী আইন বলবৎ করার দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বিবেচিত হোক বা না হোক তৎকালীন বর্তমান সরকার তার বিভক্ত অধিক্ষেত্র সহ সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল যা অভিপ্রেত ছিল। সমগ্র ভারতের কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ ও আইন প্রণয়নের জন্য একটি সর্ব-ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকারকে জরুরিকালীন ব্যাপারের জন্য একমাত্র সমাধান হিসাবে গণ্য করা হত। এইভাবে ১৮৩৩ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় যে 'সপরিষদ বড়লাট (বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়াম) যে-কোনও আইন বা প্রবিধান রচনা করার ক্ষমতার অধিকারী হবে যে কোনও আইন বা প্রবিধান বাতিল করা, সংশোধন করা বা পরিবর্তন করার জন্য, যা উক্ত অঞ্চলগুলিতে বা তার কোনও অংশে এখন বলবৎ আছে বা অতঃপর বলবৎ হবে এবং সকল ব্যক্তিদের, ব্রিটিশ বা দেশজ, বিদেশি বা অন্যান্যদের জন্য, এবং সব ন্যায় বিচারের আদালতে, যা সম্রাটের সনদ বলে বা অন্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের অধিক্ষেত্রগুলিতে এবং সকল স্থান এবং উক্ত অঞ্চলের সকল অংশের মানুষদের জন্য এবং রাজকুমারদের রাজ্যে অবস্থিত উক্ত কোম্পানি ও উক্ত কোম্পানির সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ রাজ্যগুলির সকল কর্মচারীদের জন্য আইন ও প্রবিধানও রচনা করতে পারে.........,'[১]

ভারতের সপরিষদ বড়লাটকে আইন রচনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ন্যস্ত করে এইভাবে এক কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা হয়েছিল।

কিন্তু বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিগুলি যদি আগের মত আইনের মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে অসামরিক ও সামরিক সরকারের অধিকারী হয়ে না থাকত তবে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারত না।

অপর পক্ষে পার্লামেন্ট যদি তাদের ঐ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করতে সাময়িকভাবে বিরত হত তবে এই শাসক কর্তৃপক্ষগুলি এবং সদ্য সৃষ্ট একমাত্র বিধানিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারত। শান্তি, শৃঙ্খলা এবং উপযুক্ত সরকার স্থাপনের দায়িত্ব থাকায়, প্রথমোক্তরা শেষোক্তদের দ্বারা তৈরি আইন দিয়ে শাসন চালাতে অস্বীকার করতে পারত এবং একটি কেন্দ্রীয় ও শক্তিশালী সরকারের প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব সুফল আশা করা যেত তা ব্যর্থ হত। ভারতের এই নবগঠিত

---

১) উইলিয়াম চতুর্থের ৩ ও ৪-এর ধারা ৪৩, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করার জন্য এবং সম্রাটের ভারতীয় অঞ্চলগুলির উপযুক্ত সরকার গঠনের জন্য প্রণীত একটি আইন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থার (Polity) এই দুর্বলতার দিকটিকে পরিহার করার জন্য পার্লামেন্ট এগিয়ে এসেছিল বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উচ্চ মর্যাদা কেড়ে নিতে যা এযাবৎকাল পর্যন্ত তার দায়িত্বশীল সরকার হিসাবে নতুন সংবিধান অনুসারে তাদের করারও ছিল।

'......কয়েকটি প্রেসিডেন্সির প্রত্যেকটির কার্যনির্বাহী সরকার.......পরিচালিত (হবার ছিল) একজন লাটসাহেব ও তিনজন উপদেষ্টার দ্বারা (আগের মত ন্যস্ত থাকত না)'।

যখন—

'........ভারতের সকল......অঞ্চল ও রাজস্বের সমগ্র অসামরিকও সামরিক সরকারের তত্ত্বাবধান (Superintendence), পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত (ছিল) বড় লাট ও উপদেষ্টাদের হাতে যাদের নামকরণ করা হয়েছিল সপরিষদ ভারতের বড়লাট'।[১]

এইভাবে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একথা সত্য যে, এর প্রতিষ্ঠা হবার বহু আগে বঙ্গদেশ সরকারের[২] ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতা শুধু যে জরুরি অবস্থার (Emergency) ঘটনা বাদে, কোনও ভারতীয় রাজকুমার বা শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধ করা বা শত্রুতার সূত্রপাত করার ব্যাপারে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সরকার ও পরিচালনার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা নয়, সেই সঙ্গে পরবর্তীকালীন বিধিবদ্ধ করা আইনের বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিল রাজস্ব আদায় অথবা তার প্রয়োগ বা নিয়োজিত সৈন্যবাহিনী বা উক্ত প্রেসিডেন্সিগুলির অসামরিক বা সামরিক সরকার সংক্রান্ত সবরকম বিষয়ে তত্ত্বাবধান করার।[৩] কিন্তু এমন অনুমান কিছুতেই করা যেতে পারে না, যা প্রায়ই করা হয়ে থাকে, যে ১৮৩৩ সালের আগে এই দুটি প্রেসিডেন্সি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রকৃত অর্থে বোম্বাই সব নির্দেশ ও প্রস্তাবের এবং পরিষদে তাদের কাজকর্মের প্রকৃত ও সঠিক প্রতিলিপি নিয়মিতভাবে ও অধ্যাবসায় সহকারে বঙ্গদেশ সরকারকে প্রেরণ করতে বাধ্য থাকার বিষয়টি এবং বঙ্গদেশ সরকারের নির্দেশগুলির প্রতি যথাযথ আনুগত্য প্রদর্শনের আদেশপ্রাপ্ত থাকা

১) উইলিয়াম চতুর্থের ৩ এবং ৪-এর ৪৩ নং ধারা, এস-৫৬, ৫৭ নং ধারা অনুসারে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল প্রেসিডেন্সিগুলিতে উপদেষ্টাদের সংখ্যা হ্রাস করার বা একেবারে বরখাস্ত করার, বাদ দেওয়া হত শুধু প্রেসিডেন্সির কার্য নির্বাহী সরকারকে যার পরিচালনা করত একমাত্র লাটসাহেব। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছিল ১৮৩৩ সালে বোম্বাই ও মাদ্রাজে কার্যনির্বাহী উপদেষ্টাদের সংখ্যা যথাক্রমে তিন থেকে দুইয়ে কমিয়ে এনে।

২) উইলিয়াম চতুর্থ, ৩ এবং ৪, সি-৮৫, এস-৩৯

৩) ১৩, জর্জ তৃতীয়, সি-৫২, এস-৪০

সত্ত্বেও এর অর্থ এমন করা যায় না যে, তারা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনওভাবে অধীনস্থ ছিল। কারণ, বঙ্গদেশ সরকারে ন্যস্ত আঞ্চলিক কর্তৃত্ব বহির্ভূত ক্ষমতা ছাড়া, একথা স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, বঙ্গদেশের সঙ্গে সমানভাবে[১] মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সরকারগুলির প্রতিটির[২] উপর অসামরিক ও সামরিক সরকার ন্যস্ত ছিল এবং সকল আঞ্চলিক সংযোজন ও সেগুলির রাজস্বের পরিচালন ব্যবস্থা ও নির্দেশ দেবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হয়েছিল। বঙ্গদেশ সরকারের সঙ্গে সমানভাবে তাদেরও ছিল উপরিউক্ত সম-পরিমাণ ও স্বাধীন ক্ষমতা তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে আইন প্রণয়নের। অতএব অপেক্ষাকৃত প্রকৃত অভিমতটি এইরকমই হওয়া উচিত যে তারা তাদের কাজকর্মের প্রতিলিপি বঙ্গদেশ সরকারকে পাঠাত শুধু জানাবার জন্য, নির্দেশের জন্য নয়। যাই হোক, খোদ বঙ্গদেশ সরকারও ঐ ধরনের অভিমত পোষণ করত বলে মনে হয়, কারণ নির্দেশ জারি করা এবং তাদের অনুগত হয়ে থাকতে বাধ্য করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কার্যত বঙ্গদেশ সরকার তার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল নিয়মের ব্যতিক্রমগুলিকে দেখানো এবং সেগুলির যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য অনুরোধ করার মধ্যে। এর অতিরিক্ত কিছু করাটা ছিল অ-যুক্তিযুক্ত[৩] এবং সেটা সাংবিধানিক কিনা সে বিষয়েও ছিল সন্দেহ।[৪]

সরকারের সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবেই এসেছিল বিত্তের সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি। প্রশাসনের সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির প্রতিষ্ঠার আগে কয়েকটি প্রেসিডেন্সি ছিল আলাদা আলাদা ঘড়ির মতো, নিজেদের মধ্যে নিজস্ব প্রধান স্প্রিং সহ। প্রত্যেকে সার্বভৌমত্বের ক্ষমতাবিশিষ্ট ছিল, যেমন আইন প্রণয়ন করা দণ্ডদান বিষয়ক সরকার আরোপের ক্ষমতা ছিল। বিত্তের ব্যাপারেও তাদের স্বাধীনতা ছিল। নিজেদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং উপযুক্ত সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার ব্যবস্থা রাখার দায়িত্ব ছিল তাদের এবং নিজেদের দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য কর ধার্য করা বা তাতে পরিবর্তন আশা বা ঋণ গ্রহণ করে অর্থ সংগ্রহ করার স্বাধীনতা ছিল তাদের। নিজেদের উপায় উপকরণের জন্য তারা প্রায়ই একে অপরের সম্পদ থেকে

---

১) ১৩, জর্জ তৃতীয়, সি-৬৩, এস-৭

২) ৩৩, জর্জ তৃতীয়, সি-৫১, এস-২৪

৩) তুলনীয়, ১৮৩১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখের বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক রচিত ভারত সরকারের সংবিধানের লিপিবদ্ধ কার্যবিবরণী। সেই সঙ্গে উক্ত বিষয় সম্পর্কে স্মারকলিপি বঙ্গদেশ সরকারের সচিব কর্তৃক লর্ড ক্যানিং-এর ১৮৫৯ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখে প্রেরিত সরকারি নথিপত্রের সঙ্গে, প্রকাশিত সংবিধানের ইতিহাস, বিবরণ ১৮৬১ সালের ৩০৭।

৪) তুলনীয় বঙ্গদেশ সরকারকে প্রেরিত পরিচালকদের সভার প্রেরিত সংবাদ নং ৪৪ তারিখ ১০ ডিসেম্বর ১৮৩৫। মূল খসড়া আছে ভারত দপ্তরের নথিপত্রের সঙ্গে।

আদায় করত। কারণ তাদের রাজস্ব-বিভাগ যে শুধু পৃথক ছিল না, তা নয়, তার কারণ তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক অভিন্ন রাজস্ব বিভাগের অংশ ছিল। এসবের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল ১৮৩৩ সালের আইন, যা রাজস্ব এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারগুলিকে ন্যস্ত করেছিল সপরিষদ ভারতের বড়লাটের হাতে। রাজস্ব ও পরিষেবাগুলি আইনের দ্বারা ভারত সরকারের রাজস্ব ও পরিষেবায় রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রদেশগুলি হয়ে উঠেছিল ভারত সরকারের আদায় করা ও খরচ করার প্রতিনিধি সংস্থায়। তারা আর নিজেদের নামে নতুন কর আরোপ করতে বা পুরানো কর আদায় করতে পারত না এবং অনুরূপভাবে যে-সব পরিষেবা তারা পরিচালিত করত সেগুলি ভারত সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকত, এবং ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে ঐসব পরিষেবাগুলি পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন রাজস্বের অংশ নিয়ে গঠিত তহবিল থেকে অর্থ বণ্টন করত। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যে ভারত সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোনও নতুন পদ সৃষ্টি করা বা কোন বেতন অনুমোদন করা, আনুতোষিক (Gratuity) বা ভাতা দেওয়ার জন্য তাদের যে তহবিল দেওয়া হত তা থেকে খরচ করতে পারত না প্রদেশগুলি।[১] সরকারি ঋণ আর কোনও একটি বিশেষ প্রেসিডেন্সির রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ হত না এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্সিগুলির সঙ্গে তার মধ্যে কোনও মুখ্য বা গৌণ দায়বদ্ধ থাকার প্রশ্নই উঠত না। সব প্রাদেশিক ঋণ হয়ে উঠেছিল ভারত সরকারের ঋণ এবং তা সমগ্র ভারতের রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ থাকত। সংক্ষেপে, বিত্তবিষয়ক পদ্ধতি যা উৎপাদন থেকে উৎস ও প্রদত্ত বস্তুর বিচ্ছিন্নকরণের পদ্ধতির মোটামুটি সদৃশ ছিল, তা পরিবর্তিত হল উৎপাদনের উৎসগুলির একত্রীকরণ ও বণ্টনের পদ্ধতিতে। কারণ, ১৮৩৩ সালের আইন মোতাবেক সরকারি প্রস্তাবে যে মন্তব্য করা হয়েছিল :

'ব্রিটিশ ভারত, সুবিধার জন্য স্থানীয় আলাদা সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রেসিডেন্সিগুলিতে উপ-বিভাজিত করা হলেও, বাস্তবে (হয়ে উঠেছিল) একটি একমাত্র প্রধান শক্তি যা গ্রেট ব্রিটেনের উপর নির্ভরশীল ছিল, এবং তাদের ছিল এক অভিন্ন স্বার্থ, একটিমাত্র রাজস্ববিভাগ এবং একটি মাত্র সরকার—সপরিষদ বড়লাট দ্বারা সকল প্রয়োজনীয় ও সাধারণনীতিগুলির ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত হত.............ভারতের সমগ্র সম্পদ একটি মাত্র উদ্দেশ্যের জন্য প্রযোজ্য (ছিল), যা হল এর পূর্ব নির্ধারিত কর্মগুলি সম্পাদন করা এবং ইংল্যান্ডে এর পরিচালক ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত কর্মগুলিও এবং ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও বিভাগে স্বাভাবিক ভাবে যে-সব তহবিলের ঘাটতি (ছিল), তহবিল জোগানো

---

১) উইলিয়াম চতুর্থ, ৩ এবং ৪, সি-৮৫, এস-৫৯।

(হয়েছিল) যে বিশেষ উৎস থেকে তা সংগৃহীত হয়েছিল তার উল্লেখ না করেও সেগুলি সম্বন্ধেও'।[১]

কালক্রমে রাজকীয় বিত্ত পদ্ধতি এতই ব্যাপক হয়ে উঠেছিল যে যখন ১৮৫৮ সালে সম্রাট কোম্পানির কাছ থেকে ভারত সরকারের ভার নিয়ে নিয়েছিল তখন দেখা গেল যে,

'কোনও প্রদেশেরই আইন প্রণয়নের আলাদা ক্ষমতা ছিল না, কোনও আলাদা আর্থিক সম্পদের উৎস ছিল না, বা সরকারি কৃত্যকে কোনও নিয়োগ সম্বন্ধে পদসৃষ্টি করা বা সংশোধন করার ক্ষমতা ছিল না, এবং এই শেষ প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে জড়িত ভারত সরকারকে প্রদত্ত নির্দেশগুলি ঐ সরকারকে সুযোগ দিয়েছিল প্রাদেশিক প্রশাসনের সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার'।[২]

সামরিক, রাজনৈতিক বিধানিক বা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণের বিচারে সরকারের সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির গুণাবলি যাই হয়ে থাকুক না কেন এটা খুবই হতাশার ব্যাপার যে বিত্তবিষয়ক পদ্ধতি হিসাবে এর উপর যে চাপ পড়েছিল তা অসম বলে প্রমাণিত হয়েছিল। এর প্রারম্ভ থেকেই বিত্তবিষয়ক অপর্যাপ্ততার মারাত্মক ব্যধিতে ভুগছিল এবং কেবলমাত্র মাঝে মাঝে সংকটের মুহূর্তগুলি ঠেকিয়ে রাখতে এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে বিত্তমন্ত্রীদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। ঘাটতি যে কত তীব্রভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তা নিম্নে উল্লিখিত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায়[৩]:—

রাজকীয় বিত্তের অপর্যাপ্ততা

বৎসর	উদ্বৃত্ত পাউন্ড	ঘাটতি পাউন্ড	বৎসর	উদ্বৃত্ত পাউন্ড	ঘাটতি পাউন্ড
১৮৩৪-৩৫	—	১,৯৪,৪৭৭	১৮৪৬-৪৭	—	৯,৭১,৩২২
৩৫-৩৬	১৪,৪১,৫১৩	—	৪৭-৪৮	—	১৯,১১,৯৮৬
৩৬-৩৭	১২,৪৮,২২৪	—	৪৮-৪৯	—	১৪,৭৩,২২৫
৩৭-৩৮	৭,৮০,৩১৮	—	৪৯-৫০	৩,৫৪,১৮৭	—
৩৮-৩৯	—	৩৮,১৭,৭৮৭	৫০-৫১	৪,১৫,৪৪৩	—

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

১) ভারত সরকার, বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব, তারিখ ২২ নভেম্বর, ১৮৪৩।

২) ব্রিটিশ ভারত বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে রয়্যাল কমিশনের প্রতিবেদন, পৃ: ২৪।

৩) ব্রিটিশ ভারতের ১৮৬০-১ সালের জন্য বিত্ত বিষয়ক বিবরণ থেকে, লেখক মি. উইলসন, লোকসভা, বিবরণ ৩৩, ১৮৬০ সালের, পৃ: ১০০

বৎসর	উদ্বৃত্ত পাউন্ড	ঘাটতি পাউন্ড	বৎসর	উদ্বৃত্ত পাউন্ড	ঘাটতি পাউন্ড
৩৯-৪০	—	২১,৩৮,৭১৩	৫১-৫২	৫,৩১,২৬৫	—
৪০-৪১	—	১৭,৫৪,৮৫২	৫২-৫৩	৪,২৪,২৫৭	—
৪১-৪২	—	১৭,৭১,৬০৩	৫৩-৫৪	—	২০,৪৪,১১৭
৪২-৪৩	—	১৩,৪৬,০১১	৫৪-৫৫	—	১৭,০৭,৩৬৪
৪৩-৪৪	—	১৪,৪০,২৫৯	৫৫-৫৬	—	৯,৭২,৭৯১
৪৪-৪৫	—	৭,৪৩,৮৯৩	৫৬-৫৭	—	১,৪৩,৫৯৭
৪৫-৪৬	—	১৪,৯৬,৮৬৫	৫৭-৫৮	—	৭৮,৬৪,২২২

ভারতের আর্থিক অবস্থার এই করুণ কাহিনী নিয়ে যে কেউ ভাবনা-চিন্তা করবে, যা ফুটে উঠেছে এইসব ঘাটতির তথ্য থেকে, সে আদৌ আশ্চর্য হবে না ডিজরেলির বক্তব্য সম্বন্ধে, যিনি ইংল্যান্ডের লোকসভায় বলেছিলেন—

'ভারতের প্রশাসন আগের মত যত দক্ষই হোক না কেন, ঐ প্রশাসন যে-সব মানুষদের উপস্থাপিত করেছিল তারা যতই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশিষ্ট হোক না কেন, এবং যত অসংখ্য বিখ্যাত ক্যাপ্টেন, ধূর্ত কূটনীতিবিদ এবং বড় বড় জেলার প্রশাসকদের দ্বারা সরকার যত পরিপূর্ণই হোক না কেন, ভারতের আর্থিক অবস্থা সব সময়েই জটিলতায় ভরা ছিল এবং ভারত যত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সৃষ্টি করে থাকুক না কেন, তা কখনও গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান অর্থমন্ত্রী তৈরি করতে পারেনি।'[১]

এইভাবে ভেঙ্গে পড়ার কারণগুলি অবশ্য খুঁজে পেতে দেরি হয় না। ভারতের আর্থিক অবস্থার এই অপর্যাপ্ততার প্রধান কারণ হিসাবে ধরা যেতে পারে ত্রুটিপূর্ণ রাজস্ব নীতি। নানাবিধ কারণে নীতিটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। সরকারি অর্থনীতির ব্যাপারে এ যুক্তি স্বাভাবিকভাবেই আসে যে, যা ব্যয় করা হতে যাচ্ছে তা অবশ্যই নির্ধারিত করবে কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতে হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই বহুল প্রচলিত প্রবাদটি সর্বনাশা প্রমাণিত হয়েছে যেখানেই তার সীমাবদ্ধতা নিজের যথার্থ মর্যাদা পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। এ কথা বারবার বলা চলে না যে রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয়কে কেবলমাত্র বহন করতে পারে সমাজের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক। বা একথা খুব জোর দিয়ে বলাও যায় না যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হওয়াটাই শুধু বলিষ্ঠ আর্থিক অবস্থার প্রমাণ নয়। একথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, রাজস্ব আদায় করার প্রণালী সেই প্রশ্নের একটা দিক মাত্র

১) স্যার চার্লস উড-এর প্রশাসন, লেখক ওয়েস্ট পৃ : ৬৫-৬।

যা রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও উৎপাদনশীলতার জন্য ভয়াবহ পরিণতির দ্বারা আকীর্ণ। ব্যাপারটা এতই সুস্পষ্ট যে তা অস্বীকার করা যায় না যে অসম প্রয়োগের ফলে কর প্রথা সামাজিক আন্দোলনের কারণ হয়ে উঠতে পারে, ঠিক যেমন ভাবে বাণিজ্য ও শিল্পের উপর অবিবেচনা-প্রসূত করভার চাপানো সমাজকে দুর্বলতর করে দিতে পারে তার অর্থনৈতিক কার্যপদ্ধতি ও প্রকৌশলকে (technique) বিকল করে দিয়ে এবং সমাজের উৎপাদন ক্ষমতাকে দুর্বলতর করে পরিণামে রাজ্যকে নিঃস্ব করে দেয়। অতএব প্রকৃত জ্ঞানবুদ্ধি এটাই দাবি করে যে, যারা রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্বে আছে তাদের উচিত অর্থ আদায় ও ব্যয় করার অতি প্রত্যক্ষ লক্ষ্যসীমাকে অতিক্রম করে আরও দূরের দিকে তাকান, কারণ বিত্তের 'প্রণালীগুলি' অত্যন্ত জরুরি, এবং ঝুঁকি ব্যতিরেকে কার্যক্ষেত্রে তা কদাচিৎ উপেক্ষা করা যেতে পারে। সমাজের সম্পদ হল একমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যা তুলতে পারে রাজ্য এবং যে রাজ্য এর ক্ষতি সাধন করে সে পরিণামে নিজেরই ক্ষতি করে। এই প্রত্যক্ষ সত্যগুলিকে অজ্ঞানতাবশত অবহেলা করার জন্য বহু রাজ্যের যে ভরাডুবি হয়েছে ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু যদি এর সত্যতা প্রমাণে আরও কোনও নতুন দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়, তবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় বিত্ত পদ্ধতি তার নজিরবিহীন প্রমাণ হবে।

কার্যকর রাজকীয় রাজস্ব প্রথার উপর সর্বাধিক ধার্য শুল্ক ছিল ভূমিকর। ভারতে করের অন্তর্নিহিত মতবাদটি ছিল এই যে, অনন্তকাল ধরে ভারতে ভূমিকে রাজ্যের মালিকানাধীন সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়ে এসেছে এই তত্ত্বের ভিত্তিতে কৃষক কর্তৃক প্রদেয় খাজনা রূপে গণ্য করা হবে এই করকে। কৃষক জমির মালিক নয়, সে শুধু জমির দখলিকার। জমি তাকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। অতএব জমি থেকে উদ্গত আর্থিক খাজনার সবটাই দাবি করা রাজ্যের পক্ষে অন্যায্য নয়। এই অনুমানের ভিত্তিতে প্রয়োজন বা ন্যায়ের প্রশ্ন ব্যতিরেকেই ভূমিকর আরোপ করা হয়েছিল।

রাজ্যই জমির মালিক, এই তত্ত্বটিকে সত্য বলে ধরে নেওয়া ছাড়াও আর একটি অর্থনৈতিক নীতি ছিল যা ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি করার বিষয়টিকে সমর্থন করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। বিশ্বাস করার এমন কারণ ছিল যে, মোট উৎপাদনের (Product net) প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পরিচালনার (physiocratic) মতবাদের প্রভাব ছিল ভারতে ভূমিকর নির্ধারিত করা ও পরিচালনা করার। ভারতের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের রাজস্ব পরিচালনার প্রথম দিকের অধ্যায়ে এই যুক্তি দেখাতে দেখেছি যে—

'জমির উপর ধার্য সকল কর আরোপ করার ফরাসি অর্থনীতিবিদের নীতিটি.........ভ্রমাত্মক বা অন্য কিছু যাই হোক না কেন, যেটা ভারতে প্রচলিত পদ্ধতির

পক্ষে অবশ্যই স্বস্তিজনক ছিল, বা এটাও নয় যে ঐ তত্ত্বটি শুধু ফরাসিদের দ্বারাই সমর্থিত হয়েছিল, সেইসঙ্গে ইংল্যান্ডের সম্মানিত শাসকমণ্ডলদের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছিল, যারা দাবি করত যে সব করই শেষ পর্যন্ত পড়ে ভূমির উৎপাদনের উপর এবং একটি ভিন্নতর মতবাদ পেশ করতে গিয়ে **দ্য ওয়েলথ্ অফ নেশন**-এর (জাতির সম্পদ) প্রখ্যাত লেখক স্ব-বিরোধী কথা বলেছিলেন এই কারণে যে, তাঁর প্রদত্ত পূর্বেকার উপরও থেকে ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়।'

ভূমিকর বাড়ানোর কারণ যাই হোক না কেন খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই এ কথা অস্বীকার করতে পারে যে, যে কোনও ধরনের শিল্পের প্রথম প্রচেষ্টার উপর গুরুভার সম্মিলিত কর যা তার সমগ্র বা প্রায় সমগ্র মুনাফাকে গ্রাস করে নেয় তা বিনাশাত্মক এবং অযৌক্তিক। এটা সেই উৎপাদিত বস্তুর উৎপাদনে কার্যকর প্রতিবন্ধকতা হয়ে ওঠে যার উপর ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টা লাভজনকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পদ ও সরকারি রাজস্ব প্রায় অকল্পনীয় পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে। এই জাতীয় ভূমিকর সেই সম্পদের বিশেষ উৎপাদনকে ধ্বংস করে দিতে পারে সুনিশ্চিতভাবে যা পক্ষান্তরে সেই সম্পদ পরিশ্রমের মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারত। ভূমিকর এতই গুরুভার ছিল যে ভারতে প্রচলিত কর পদ্ধতিকে একক কর পদ্ধতির প্রায় সমধর্মী বলা যেতে পারে।[১]

ভূমিকর যখন কৃষিশিল্পের সমৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করছিল, তখন বহিঃশুল্ক দেশের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের গতিরোধ করেছিল। অন্তঃশুল্ক ও বহিঃশুল্ক উভয়েই সমপরিমাণে বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছিল।

১। ভারতের মোট রাজস্বের তুলনার ভূমি রাজস্বের অনুপাত নিচে দেওয়া হল :—

বৎসর	অনুপাত	বৎসর	অনুগত	বৎসর	অনুগত
১৭৯২-৩ থেকে ১৭৯৬-৭	৫০.৩৩	১৮১৭-৮ থেকে ১৮২১-২	৬৬.১৭	১৮৪২-৩ থেকে ১৮৪৬-৭	৫৫.৮৫
১৭৯৭-৮ থেকে ১৮০১-২	৪২.০২	১৮২২-৩ থেকে ১৮২৬-৭	৬১.৮৩	১৮৪৭-৮ থেকে ১৮৫১-২	৫৬.০৬

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

---

১) এই উল্লেখনীয় বিতর্কের জন্য, যা ব্যাডেন পাওয়েলের সর্বব্যাপী সৃষ্টিও এড়িয়ে গিয়েছিল, দ্রষ্টব্য লোকসভার ১৮১২-১৩ সালের নথি ৩০৬।

বৎসর	অনুপাত	বৎসর	অনুগত	বৎসর	অনুগত
১৮০২-৩ থেকে ১৮০৬-৭	৩১.৯৯	১৮২৭-৮ থেকে ১৮৩১-২	৬০.৯০	১৮৫২-৩ থেকে ১৮৫৫-৬	৫৫.৪০
১৮০৭-৮ থেকে ১৮১১-২	৩১.৬৮	১৮০২-৩ থেকে ১৮৩৬-৭	৫৭.০০	৬৪ বছরের গড়	৫৪.০৭
১৮১২-৩ থেকে ১৮১৬-৭	৫২.৩৩	১৮৩৭-৮ থেকে ১৮৪১-২	৫৯.০৫		

অন্তঃশুল্ক[১] সংগঠিত হয়েছিল চলাচলকারী নানা দ্রব্যের উপর ধার্য শুল্ক ও শহর শুল্ক নিয়ে। দেশের মধ্যে চলাচলকারী পণ্যদ্রব্যের উপর ধার্য শুল্কের জন্য দেশকে কৃত্রিমভাবে কয়েকটি ছোট ছোট শুল্ক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছিল। পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও উপভোগ ইচ্ছামত (ad libitum) করা যেতে পারত প্রতিটি শুল্ক এলাকার মধ্যে, কিন্তু যে মুহূর্তে ঐ পণ্যদ্রব্য তাদের নিজ নিজ বিভাগ থেকে বাইরে যাবে সেই মুহূর্তে সেগুলি শুল্ক দিতে বাধ্য হত। এই প্রবিধানের ক্ষতিকারক প্রভাব, যদি তা গুপ্তভাবে থাকা সত্ত্বেও বাস্তব সত্য ছিল। পণ্যদ্রব্য চলাচলের উপর ধার্য শুল্ক বাণিজ্যে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল, যা পক্ষান্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল দেশের প্রস্তুতকারকদের উপর। অ্যাডাম স্মিথ আমাদের বলেছেন যে, কী ভাবে শিল্পের ক্রমবৃদ্ধি নির্ভর করে বাজারের বিস্তারের উপর। এখানে পণ্যদ্রব্য চলাচলের উপর ধার্যশুল্কের জন্য সমগ্র দেশ দাবার ছকের বর্গগুলির মত ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল। এতে বাণিজ্য ও তার সেবিকা শিল্প, উভয়েই যে প্রচুর পরিমাণে দুর্বল হয়ে উঠবে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। পণ্যদ্রব্য চলাচলের উপর ধার্য শুল্কের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও অনুভূত হত অন্যভাবে। শিল্পক্ষেত্রে কিছুটা উন্নত প্রতিটি দেশে শুধু যে শ্রমের সামাজিক বিভাজন ছিল তা নয়। সেখানে শ্রমের আঞ্চলিক বিভাজনও ছিল, যাকে অন্যভাবে বলা হত শিল্পের স্থানীয়করণ। এটা দেখাতে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব নেই যে শিল্পের স্থানীয়করণ ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে

১) মি. ট্র্যাভেলিয়ান (Travelyan), যিনি এই পদ্ধতিটিকে খুব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, তিনি এর ক্ষতিকারক প্রভাব দেখে এতই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি লিখেছিলেন, 'যদিও বর্তমানে আমরা শুধু এর অস্তিত্বের চাক্ষুষ প্রদর্শন দেখতে পাচ্ছি, তবুও যখন এটার অবদান ঘটবে তখনও এটা বিশ্বাস করতে পৃথিবীবাসীর কষ্ট হবে যে, ঐ ধরনের একটি পদ্ধতি এক শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়ে কিভাবে আমরা সহ্য করে এসেছি'—**বঙ্গদেশ প্রেসিডেন্সিতে পণ্য দ্রব্য চলাচল এবং শহর শুল্কের পদ্ধতি**, পৃ: ৬।

উঠেছিল[১]। এর অধীনে ভারতের প্রতিটি এলাকা কোনও একটি বিশেষ কলা বা শিল্পে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন, একটি এলাকায় তুলার উৎপাদন, অন্য এলাকায় কাপড় বোনা হত এবং তৃতীয় স্থানে তা ধুয়ে সাদা করা হত। কিন্তু এটা প্রায়ই দেখা যেত যে এই এলাকাগুলি বিভিন্ন শুল্ক ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত, এবং একটি কাঁচামালকে তার উৎপাদনের সমাপ্তি পর্যায়ে পৌঁছনো পর্যন্ত বহুবার চলাচলজনিত ধার্য শুল্ক দিতে হত। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য প্রতিটি এলাকা পণ্যদ্রব্য চলাচলের উপর ধার্য শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার জন্য ও লাভদায়ক পথে তাদের সব কর্মশক্তি অপচয় করতে বাধ্য হত।

অন্তঃশুল্কের অংশ হিসাবে শহর শুল্কও তার প্রভাব বিস্তার করেছিল শুল্কাধীন বি-নগরীকরণের কাজে। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুল্কাধীন পণ্যাগারগুলি দেশের বাণিজ্যের এক বিশাল মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। সরাসরি খরিদ এবং যে কোনও পরিমাণের প্রায় সবধরনের পণ্য দ্রব্যের বিক্রয়ের, সঞ্চিত পুঁজি, বর্দ্ধিত ঋণ, সাধারণ খবরাখবর পাওয়ার সুযোগ সব এখানে পাওয়া যেত, যেমন পাওয়া যেত কেন্দ্রে। এগুলি দেশের পণ্য বিনিময় ও বাণিজ্যকে সমর্থন, উৎসাহ দান এবং উন্নতিবিধানে সাহায্য করত। কিন্তু শহর-শুল্কের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল বাণিজ্যকে পথ-ভ্রষ্ট করা ও অপসারিত করা। কারণ এই পদ্ধতি অনুসারে এর অধীনস্থ প্রতিটি বস্তুকে পণ্য চলাচলের শুল্ক দেওয়ার পর শহরে প্রবেশের জন্য কর, শহর-শুল্ক দিতে হত, এবং প্রবেশ করতে যাওয়া শহরের মধ্যে যদি ঐ বস্তুর আকারে প্রস্তুতিকরণের ফলে কোনও পরিবর্তন ঘটে, তবে তা পণ্য চলাচলের জন্য ধার্য-শুল্ক প্রদান পদ্ধতি অনুসারে দ্বিতীয়বার শুল্ক না দিয়ে নিকটবর্তী কোনও স্থানে পাঠানো যেতে পারত না এবং ঐ কর ঐ বস্তুর উপর আরোপিত শ্রম ও দক্ষতার ফলে তার মূল্যে যে পরিবর্তন ঘটতে পারে সেই পরিমাণে বাড়ানো হত। এর ফল হয়েছিল এই যে, শহরগুলিতে বণিকদের যাতায়াত কমে আসার দরুন এবং পণ্য চলাচলের জন্য ধার্য শুল্কের অধীনস্থ বস্তুগুলির উৎপাদন শুধু মাত্র নিজেদের প্রয়োজন ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হত না বলে শিল্প ও বাণিজ্য হ্রাস পেতে লাগল।

এই মন্দার পরিবেশেই ভারতীয় শিল্পগুলিকে বিদেশি প্রতিযোগিদের মোকাবিলা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এ কথা বলা যায় যে বহিঃশুল্ক ভারতীয় শিল্পকে সুরক্ষিত করতে তো পারেইনি, উন্নতিবিধান করার ব্যাপারটা তো দূরের কথা। সাধারণত বাণিজ্যিক মাশুল যার ভিত্তিতে গড়ে উঠত তাকে বলা হয় পণ্য দ্রব্যের

১) দ্রষ্টব্য : এস. মার্টিনের "পুর্বাঞ্চলীয় ভারত", ৩ খণ্ড।

প্রতিযোগিতা। সেইসব বিদেশি পণ্যদ্রব্যের উপর উচ্চতর হারে শুল্ক আরোপ করে আমদানি শুল্ক এমন ভাবে পরিকল্পিত হত যা স্বদেশের অনুরূপ পণ্যদ্রব্যের সফল উৎপাদনে হস্তক্ষেপ করতে পারত এবং রপ্তানি শুল্ক রচিত হত সেই সব স্বদেশি পণ্যদ্রব্যকে উৎসাহিত করার জন্য অনুদান দেবার উদ্দেশ্যে। যার ফলে তা বিদেশি বাজারে প্রতিষ্ঠা পাবার সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু ভারতে বহিঃশুল্কের তত্ত্বের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য প্রতিযোগিতার তত্ত্বের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য প্রতিযোগিতার তত্ত্বের কোনও সম্পর্ক ছিল না। প্রকৃত অর্থে গৃহীত নীতির তুলনায়, এমন কি সংরক্ষণ নীতির সমর্থকও সম্পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য বেশি পছন্দ করতে পারত। কারণ শুল্ক নির্ধারিত হত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের চেয়েও অধিকতর মাত্রায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। ভারতীয় আমদানি শুল্ক ওঠা-নামা করত আমদানির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তা করত আমদানির মূল উৎস এবং সেই জাহাজের ভিত্তিতে যার মাধ্যমে তা বিদেশে পাঠান হত। রাজনৈতিক চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের জন্য অগ্রাধিকার পেত তার পরিকল্পনা ও তার গঠন বিন্যাস। আরও দুঃখের কারণ এই যে, এই অগ্রাধিকারের সঙ্গে জড়িত থাকত দেশবাসী ও সরকারের চরম ক্ষতি। ব্রিটেনে উৎপাদিত এবং বিদেশে উৎপাদিত ও বিদেশি জাহাজে করে পাঠানো দ্রব্যের জন্য খরচের অর্ধেক খরচে ব্রিটিশ জাহাজে করে পাঠানো দ্রব্য ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়াটা মার্জনীয় ছিল। কিন্তু অন্তঃশুল্কের নিয়মানুসারে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যকে যে খরচ দিতে হত তার চেয়ে কম হারে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য প্রবেশ করতে দিয়ে ভারতীয় শিল্পগুলির উপর যে ক্ষতির বোঝা চাপানো হয়েছিল তা কমাতে পারেনি কোনও কিছুই এবং স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা যখন করা হয়েছিল তখন ভারতে তৈরি জাহাজ ও ভারতে তৈরি পণ্যদ্রব্যের প্রবেশাধিকার ইংল্যান্ড নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল উচ্চহারে শুল্ক ধার্য করে। কিন্তু এদিকে যখন আমদানি শুল্ক বিদেশিদের পক্ষে অন্তঃশুল্কের গুরুভার বিপর্যস্ত ভারতীয় উৎপাদনের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সহজ হয়ে উঠেছিল। তখন অন্যদিকে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিল বিদেশি বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে রপ্তানি শুল্কের পীড়াদায়ক প্রভাব যা ভারতীয় শুল্কের পক্ষে ছিল শোচনীয় লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যের অন্যতম এবং যা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল।[১] এইভাবে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশুল্ক সম্পর্কিত আইনগুলি বাণিজ্যে বাধার সৃষ্টি এবং শিল্পের

১। উপর্যুক্ত প্রতিটি বক্তব্যের জন্য নজির উল্লেখ করা কঠিন। ভারতের শুল্ক ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি, কিন্তু সে সম্পর্কে প্রচুর লক্ষ্য—প্রমাণ পাওয়া যাবে ১৮২১ সালের বাণিজ্য সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনে এবং সংসদ কর্তৃক ১৮১৩ ও ১৮৫৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্মের ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য ও প্রামাণিক তথ্য থেকে। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে ১৮৪৬ সালের ইস্ট ইন্ডিয়ার উৎপাদন সম্বন্ধে কমিটির প্রামাণিক তথ্য ও প্রতিবেদনের প্রতি।

শ্বাসরোধ করেছিল। এখান থেকে তুলনামূলকভাবে যে নামমাত্র রাজস্ব আদায় হত সেটি তাদের সর্বনাশা প্রভাবের সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

যখন এই সব সম্পদ অচল হল, তখন সরকার রাজস্ব আদায় করার জন্য কয়েকটি অত্যন্ত আপত্তিকর পন্থার সাহায্য নিল।

১। নিম্নলিখিত সারণিতে মোট রাজস্বের সঙ্গে শুল্ক রাজস্বের তুলনামূলক অনুপাত প্রদত্ত হল :—

বৎসর	অনুপাত	বৎসর	অনুপাত	বৎসর	আনুপাত
১৭৯২-৩ থেকে ১৭৯৬-৭	২.৩৮	১৮১৭-৮ থেকে ১৮২১-২	৮.৩২	১৮৪২-৩ থেকে ১৮৪৬-৭	৬.০২
১৭৯৭-৮ থেকে ১৮০১-২	৩.১০	১৮২২-২৩ থেকে ১৮২৬-২৭	৭.৫৮	১৮৪৭-৮ থেকে ১৮৫১-২	৫.৪০
১৮০২-৩ থেকে ১৮০৬-৭	৪.১৬	১৮২৭-৮ থেকে ১৮৩১-২	৮.১২	১৮৫২-৩ থেকে ১৮৫৫-৬	৫.৫২
১৮০৭-৮ থেকে ১৮১১-১২	৫.০৪	১৮৩২-৩ থেকে ১৮৩৬-৭	৭.১৯	৬৪ বছরের গড়	৬.২২
১৮১২-১৩ থেকে ১৮১৬-১৭	৬.৬৮	১৮৩৭-৮ থেকে ১৮৪১-২	৬.৭৬		

হেনড্রিকস, উল্লিখিত স্থানে, পৃ: ২৮৬

সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীনে যে রাজস্ব প্রথা প্রচলিত ছিল তার নিরপেক্ষ সমীক্ষা করলে একথা বলতে বাধ্য হতে হয় যে, করধার্যের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতিটাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটা একটা নিষ্ঠুর বিদ্রুপাত্মক সাহিত্য, বা বড় জোর একে একটা অসার প্রবচন বলা চলে। কারণ শল্য-চিকিৎসকের ছুরি চলেছিল যেখানে সবচেয়ে বেশি রক্ত জমাট হয়ে আছে সেখানে নয়, বরং রাষ্ট্রের সেই অংশে যেটা তার দুর্বলতা ও দরিদ্রের জন্য ভীরুর মত তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করেছিল। দরিদ্র প্রজাদের উপার্জন থেকে বিচিত্র ভোগসুখে এবং অপরের বিনিময়ে অবসর বিনোদনে জীবন অতিবাহিতকারী ভূস্বামীরা অথবা বেতন বা উপরি-পাওনা দিয়ে গায়ে-গতরে চর্বিদার

হয়ে ওঠা ইউরোপীয় সরকারি পদস্থ কর্মচারীদের সম্পূর্ণভাবে রেহাই দেওয়া হয়েছিল সরকার পরিচালনার জন্য কোনও কিছু কর ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে, যার প্রধান কাজ ছিল জাঁকজমক ও সুযোগ-সুবিধা দানের বিষয়গুলি বহাল রাখা। অন্যদিকে লবণ কর[১] এবং মোতুরফা[২] ও অন্যান্য গুরুভার কর[৩] পরিশ্রমী দরিদ্রদের বিব্রত করেই চলেছিল।

১। বিভিন্ন সময়ে মোট রাজস্বের তুলনায় লবণ রাজস্বের পরিমাণ কত শতাংশ অনুপাতে ছিল তা নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে—

বৎসর	অনুপাত	বৎসর	অনুপাত	বৎসর	অনুপাত
১৭৯২-৩ থেকে ১৭৯৬-৭	১৪.১৩	১৮১৭-৮ থেকে ১৮২১-২	১১.২৫	১৮৪২-৩ থেকে ১৮৪৬-৭	১১.৬৫
১৭৯৭-৮ থেকে ১৮০১-২	১২.১০	১৮২২-২৩ থেকে ১৮২৬-২৭	১১.৮৭	১৮৪৭-৮ থেকে ১৮৫১-২	৯.১৪
১৮০২-৩ থেকে ১৮০৬-৭	১১.০৯	১৮২৭-৮ থেকে ১৮৩১-২	১২.০৩	১৮৫২-৩ থেকে ১৮৫৫-৬	৯.১৭
১৮০৭-৮ থেকে ১৮১১-১২	১১.১৪	১৮৩২-৩ থেকে ১৮৩৬-৭	৯.৭২	৬৪ বছরের গড়	১১.০৭
১৮১২-১৩ থেকে ১৮১৬-১৭	১০.৯২	১৮৩৭-৮ থেকে ১৮৪১-২	১২.৩৭		

২) ১৮৫৮ সালে ইংল্যান্ডের লোকসভাকে উদ্দেশ্য করে মাদ্রাজ দেশজ সমিতির লেখা আবেদনপত্রে এটাকে বর্ণনা করা হয়েছিল "একটি কর হিসাবে যা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সবরকম পেশাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। যথা তন্তুবায়, সূত্রধর, সকল ধাতুকর্মী, সকল বিক্রেতা, যাদের দোকান আছে তাদের আলাদাভাবে কর দিতে হত, বা রাস্তায় ধারে বিক্রি করত ইত্যাদি. অনেককে তাদের যন্ত্রপাতির জন্য শুল্ক দিতে হত অন্য দেয় বিক্রয় করার অনুমতি পাবার জন্য, যা সম্প্রসারিত ছিল অত্যন্ত মামুলি পণ্য পর্যন্ত এবং মিস্ত্রিদের ব্যবহৃত সবচেয়ে সস্তা যন্ত্র, যার মূল্য মোতুরফার চেয়ে ৬ গুণ বেশি হত এবং যেটা দিলে ওগুলি ব্যবহার করার অনুমতি পাওয়া যেত',—এটি উদ্ধৃত হয়েছে রঘুভায়াঙ্গারের গ্রন্থ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রগতি,১৮৯৩, পৃ: ১১৩ থেকে।

৩) ড. ফ্রান্সিস বুকনান তার মাদ্রাজ থেকে যাত্রা, দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন যে, 'কোয়েম্বাটুরের, দক্ষিণ ভারত, শান্তি-মঙ্গলমে এক নতুন মুদ্রাঙ্ক শুল্ক (Stamp-duty) ভির-রায়া ফানমের ৩/৪+১/৩ বা প্রায় ৫১/৪ পেনি ধার্য করা হয়েছে দুইখণ্ড সূক্ষ্ম কাপড়ের উপর এবং ভির রায়া ফানমের ৩+৩/৪ অথবা প্রায় ২৩/৪ পেনি দুই খণ্ড মোটা কাপড়ের উপর। এর ফলে তন্তুবায়রা তাদের কর্ম পরিত্যাগ করে, দলবদ্ধভাবে সমাহর্তার (Collector) কাছে গিয়েছিল তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য। বার্ষিক ৪ বা ৫ ফানম শুল্কের বদলে কর ধার্য করা হল, যা আগে প্রতিটি তাঁতের উপর ধার্য ছিল; কিন্তু তন্তুবায়রা তাকেও অপেক্ষাকৃত গুরুভার মনে করল'— পৃ: ২৪০। লেখক একথাও বলেছেন, '৫০ ঘর তন্তুবায় বিশিষ্ট দোদারা পাল্লিয়ামে, তন্তুবায়রা এই নতুন মুদ্রাঙ্ক শুল্ক সম্বন্ধে অত্যন্ত সরব বিক্ষোভ জানিয়েছিল। তাদের বক্তব্য—তবে কি প্রতিটি তাঁতের জন্য ৫ এর বদলে ২০ ফানম খরচ করতে হবে তাদের, যা তারা আগে দিত।'—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ২৪২।

একথা সত্য যে, দেশজ ব্যক্তিদের শাসনাধীনে প্রচলিত বহু অকিঞ্চিৎকর ও বিরক্তিকর কর রদ করা হয়েছিল; অথচ এমন অনেক প্রমাণ আছে যা থেকে দেখা যাবে যে, এর ফলে রাজস্বের যা ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ করে নেওয়া হয়েছিল চালু ধার্য করের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে ভূমিকর বৃদ্ধি করে। শেযোক্ত অভিযোগটি সরকারিভাবে সব সময়েই অস্বীকার[১] করা হত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটা সত্য যে ভূমিকর একীকৃত ও বর্ধিত হয়েছিল, প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ না হলেও সেইসব করের অবসানের অনুষঙ্গী হিসাবে, যা দরিদ্রদের কাছ থেকে আদায় করতে গিয়ে সরকারকে যেগুলির আদায়ের পরিমাণের তুলনায় খরচ বেশি করতে হত।

উপর্যুক্ত ক্ষতিকারক রাজস্ব প্রথার অধীনে মানুষের বরপ্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পেল যার ফলে বহুবিধ উৎস[২] থাকা সত্ত্বেও, যে সব উৎস থেকে সরকার তার রাজস্ব আদায় করত, তা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী সরকার তার আয়-ব্যয়ের সমতা রাখতে পারত না।

১। সংসদীয় নথিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, ১৮৩১, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থে সাক্ষ্য-প্রমাণের কার্যবিবরণ, প্রশ্ন ৩৮৬৪-৬৬।

২। ধার্যকরের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ :—

রাজস্বের উৎস	আদায়ীকৃত রাজস্ব দশ লক্ষে	পর্যায়কাল		স্থান এবং আরম্ভ হওয়ার তারিখ
		বছরের সংখ্যা	তারিখ	
ভূমি রাজস্ব	৬৬২.৩০৮	৬৪	১৭৯২-৩ থেকে ১৮৫৫-৬	এই সমগ্র পর্যায়কালের মধ্যে বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজে; ১৮৩৪-৩৫ থেকে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, এবং ১৮৪৯-৫০ থেকে পঞ্জাবে।
সেকিয়ার এবং আবগারি	৯.৭২৯	২০	১৮৩৬-৭ থেকে ১৮৫৫-৬	এই সমগ্র পর্যায়-কালের মধ্যে বঙ্গদেশ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে এবং ১৮৪৯-৫০ থেকে মাদ্রাজে।
অন্তঃশুল্ক (Excise)	৪.৯৮৭	”	”	কেবলমাত্র বঙ্গদেশের হিসাব
মোতুরফা	৬.৪৫৫	”	”	কেবলমাত্র মাদ্রাজের হিসাব
লবণ	১৩৫.৫৩২	৬৪	১৭৯২-৩ থেকে ১৮৫৫-৬	১৭৯২ থেকে বঙ্গদেশে, ১৮২২ থেকে মাদ্রাজ, ১৮২২ থেকে বোম্বাই ও ১৮৩৯ থেকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে
আফিম	১০৬.৭০৭	৬৪	১৭৯২-৩ থেকে	১৭৯২ থেকে বঙ্গদেশে, ১৮২০ থেকে বোম্বাই

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

সকল মূলধন বিনিয়োগকারীদের কাছে এক শিক্ষণীয় বস্তু হয়ে থাকবে এটা দেখাতে যে, যখন তাদের রাজস্ব সংক্রান্ত আইনগুলি জনগণের সম্পদের পক্ষে ক্ষতিকারক প্রমাণিত হচ্ছে তখন তাদের শূন্য কোষাগারের জন্য অন্য কাউকে দোষ না দিয়ে নিজেদের উপর দোষারোপ করাই উচিত।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির উপর কী প্রভাব পড়বে তার খেয়াল না করেই শুধু করদাতা জনগণের অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধ ও উন্নত করার জন্য বিবেচিত হতে পারে এমন সব জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যই কি ঐ ধরনের ক্ষতিকারক কর সম্পদ আদায়

উৎস	রাজস্বের রাজস্ব দশ লক্ষে	আদায়ীকৃত বছরের সংখ্যা	পর্যায়কাল তারিখ	স্থান এবং আরম্ভ হওয়ার তারিখ
			১৮৫৫-৬	
পোস্ট অফিস	৮.৮৮৮	”	”	১৭৯২ থেকে বঙ্গদেশ ও মাদ্রাজ, ১৮১৩ থেকে বোম্বাই, ১৮৪৯ থেকে পঞ্জাব ও ১৮০৫ থেকে উ:প: প্রদেশ
মুদ্রাঙ্ক (Stamp)	১৬.৬৯৭	৫৯	১৭৯৭-৮ থেকে ১৮৫৫-৬	১৭৯৭ থেকে বঙ্গদেশ, ১৮১৩ থেকে মাদ্রাজ, ১৮১৯ থেকে বোম্বাই, ১৮৩৪ থেকে উ: প: প্রদেশ ও ১৮৪৯ থেকে পঞ্জাব।
বহিঃশুল্ক *অভ্যন্তরীণ* ১। চলাচল ২। শহর বহিঃস্থ ১। আমদানি ২। রপ্তানি	৭৬.১৭৯	৬৪	১৭৯২-৩ থেকে ১৮৫৫-৬	১৭৯২-৩ থেকে বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে, ১৮৩৪-৫ থেকে উ: প: প্রদেশ এবং ১৮৪৯-৫০ থেকে পঞ্জাবে
টাঁকশাল (Mint)	৩.২২১	”	”	১৭৯২ থেকে বঙ্গদেশে, ১৮১৩ থেকে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে
রাজস্ব তামাক	১.৪৩৭	১৮	১৮৩৬-৭ থেকে ১৮৫৩-৪	১৮৩৬ সালে মাদ্রাজে
বিবিধ	১৯৪.৭৭৭	৬৪	১৭৯২-৩ থেকে ১৮৫৫-৬	ভূমি রাজস্বের মতই

করা হত? বিভিন্ন পরিষেবার ক্ষেত্রে কয়েক দশক ধরে ব্যয়ের পরিমাণ কি ভাবে বিভাজিত হত তার নিম্নলিখিত সারণিতে এক নজর দিলে দেখা যাবে যে কি ভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল :—

ব্যয়ের পরিমাণের বিভাজন[১]

মোট ব্যয়ের অনুপাতের শতাংশ	কোন বৎসর					
	১৮০৯-১০	১৮১৯-২০	১৮২৯-৩০	১৮৩৯-৪০	১৮৪৯-৫০	১৮৫৭
সামরিক	৫৮.৮৭৭	৬৪.২৯০	৫৩.৭৫৪	৫৭.৭২১	৫১.৬৬২	৪৫.৫৫
ঋণের সুদ	১৮.০১০	১২.৮০৫	১২.১২৪	৯.৭৫৬	১০.৫১২	৭.১৯
অসামরিক ও রাজনৈতিক	৭.২২১	৮.৯০০	৯.৫৭৫	১২.২৯৬	৮.৯০২	৯.৬২
বিচারবিভাগীয়	৭.৫২৫	৬.৮০০	৭.১০৭	৯.৫৬৫	৭.১৮০ }	৯.৩৮
প্রাদেশিক পুলিশ	১.৯৯১	২.০৯৩	১.৫৩৫	২.০৬২	২.০৬২ }	
ভবনাদি ; দুর্গনির্মাণ ইত্যাদি	১.৬৩৯	১.৭৫৬	২.৮১০	১.৪২৮	১.৬৬১	

এই শ্রেণীবদ্ধ সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হল, সামরিক খাতে খরচ এবং কালক্রমে তা কমে এলেও দেশের মোট রাজস্বের অর্ধেকেরও বেশি অপরিহার্যভাবে ব্যয় হত তার জন্য। কিন্তু সামরিক খাতের পাশে লেখা বিশাল অংশের পরিমাণ ঐ খাতে খরচের প্রকৃত গুরুভারটিকে প্রতিফলিত করে না। এগুলির সঙ্গে যোগ করতে হবে ঋণের জন্য ব্যয় করা সুদের পরিমাণটিকে, কারণ যে ঋণ করা হয়েছিল তার সবটাই ছিল যুদ্ধ ঋণ। এই সমগ্র সময়কালে ভারত ছিল দেশীয় শক্তি ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে এক যুদ্ধক্ষেত্র। দুটি মারাঠা যুদ্ধ, তিনটি মহীশূর যুদ্ধ, দুটি বর্মা যুদ্ধ, দুটি আফগান যুদ্ধ, কর্ণাটক যুদ্ধগুলি, ছোটখাট অসংখ্য সংঘর্ষের কথা উল্লেখ না করলেও চলে, যে যুদ্ধগুলি করা হয়েছিল কোম্পানির এবং সম্রাটের উপনিবেশের

১) 'ব্রিটিশ ভারতের অতীত, বর্তমান এবং প্রত্যাশিত আর্থিক অবস্থা' লেখক কর্নেল সাইক্স, রয়্যাল স্ট্যাটিসটিকাল সোসাইটির পত্রিকা, ১৮৫৮, খণ্ড-২২, পৃ: ৪৫৭।

সঙ্গে যুক্ত করার স্বার্থে। ব্রিটিশ সংসদ যখন দাবি করত যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপনিবেশ সম্রাটেরই অধীনস্থ উপনিবেশ, তখন একথা মনে রাখতে হবে যে পার্লামেন্ট খরিদ মূল্য বাবদ একটা পয়সাও দিতে রাজি হয়নি। অপরদিকে, ঐসব যুদ্ধের সমগ্র খরচ বহন করতে হয়েছিল ভারতকেই এবং তার অপ্রতুল সম্পদের উপর যেটা ছিল অত্যন্ত পীড়াদায়ক ভার। আলাদাভাবে ভবনাদি ও দুর্গ নির্মাণ ইত্যাদির জন্য যে খরচ দেখান হয়েছে সেটাও সামরিক খরচের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যেটা প্রকৃত পক্ষে ঐ শ্রেণীর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এই প্রয়োজনীয় সংযোজনগুলি করার পর আমরা সেই দেশের সম্বন্ধে এক বেনজির তথ্য পেলাম যে, দেশ তার মহামূল্য সীমিত অর্থের ৫২ থেকে ৮০ শতাংশ অপচয় করছিল যুদ্ধের কাজে। পক্ষান্তরে এই যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে সামরিক ব্যয়ের অধিকাংশ, যদিও সেটার পরিমাণ যথেষ্ট ছিল, সেটা চলে যেত ভারতীয়দেরই সিন্দুকে, কারণ দেশের সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ তাদেরই নিয়ে গঠিত ছিল। ভারতীয়রা অবশ্যই সামরিক বাহিনীর একটা বড় অংশ ছিল[১], এবং ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট বেতন-ক্রম যদি সমান হত তাহলে তার ফল দেশের প্রকৃত অধিবাসীদের পক্ষে অনুকূলই হত, যদিও তা বিপুল সামরিক খাতে ব্যয়ের কোনও ওজর হিসাবে গণ্য করা হত না।

১। নিম্নলিখিত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে তা বোঝা যেতে পারে :—

বিদ্রোহের আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যবল[২]

	ইউরোপীয়	দেশীয়	মোট
গোলন্দাজ	৬,৪১৯	৩,১৩৮	১৫,৫৭৭
পরিখা খননকারী	১১০	৩,০৪৩	৩১৫৩
অশ্বারোহী	৩,৪৫৬	৩০,৫৩৩	৩২,৯৮৯
পদাতিক	২৯,৭৬০	১,৮৮,৬৬০	২,১৮,৪২০
মোট	৩৮,৭৪৫	২,৩১,৩৭৪	২,৭০,১১৯

২। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন সম্পর্কে মেজর জেনারেল হ্যানককের প্রতিবেদন, সংসদীয় নথিপত্র ১৮৫৯ সালের, পৃ: ২১।

কিন্তু ইউরোপীয় ও দেশীয়দের বেতনক্রম এত স্থূলভাবে অসম[১] ছিল যে গড়ে চারজন দেশীয় কর্মচারীর মোট বেতনের চেয়েও বেশি পেত। অতএব এই ব্যয়ভার, তা সেটা জনকল্যাণমূলক অথবা ব্যক্তিগত নিয়োগের দৃষ্টিকোণ দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, সেই দেশবাসীর উপকারে আসত না, যারা রাজ্যের রাজস্ব দিত।

রাজস্বের প্রায় ১০ শতাংশ শোষণ করে নিত যে অসামরিক ও রাজনৈতিক খরচাদি তাকে কার্যত পুনরুদ্ধারযোগ্য আদৌ বলা যেতে পারে না। ব্যয়ের এই অংশটা এক্ষেত্রেও অপর ভারবহন করলেও দেশীয় অধিবাসীরা তার কোনও ভাগ পেত না। বিজিত হবার ফলে দেশীয় ব্যক্তিরা স্বাভাবিক ভাবে এক গৌণ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এই বিজয় তাদের মর্যাদা শুধু হ্রাস করানোর চেয়েও বেশি ক্ষতি করেছিল। এর ফলে ইংরেজদের মনে দেশীয় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এক ধরনের অবিশ্বাস জন্মেছিল। ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত থেকে বিজিত ও সন্দেহভাজন দেশীয় ব্যক্তিরা দেশের উচ্চতর প্রশাসনিক পদ (দ্রষ্টব্য : পর পৃষ্ঠায় ১ নং পাদটীকা) থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল।

১। এটা নির্দেশিত হচ্ছে নিম্নলিখিত সারণির দ্বারা :—

পদাতিক বাহিনীর মাসিক খরচ

ইউরোপীয়

	বিশদে বর্ণিত			মোট		
আধিকারিক	টাকা	আনা	পয়সা	টাকা	আনা	পয়সা
৩৭জন আধিকারিক	১৪,৭৩৪	১৪	৩			
সেনানী ও কর্মচারিবৃন্দ	৪,৫১৫	১২	৪	২১,৭৭৯	২	৭
নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ভাতা	২,৫২৮	৮	০			
সিপাহী						
১১৭ নিম্নপদস্থ আধিকারিক	২,২৮৯	৪	৫			
৯৫০ সর্বনিম্ন পদস্থ রেশন,	১১,২০৩	৮	৪	২৫,৯৯৯	৮	০
পোশাক ও অন্যান্য খরচ	১২,৫০৬	১১	৩			
মোট				৪৭,৭৭৮	১০	৭

এই অবিচারের অবসান ঘটানোর জন্য ১৮৩৩ সালের আইনে ব্রিটিশ সংখ্যক ব্যবস্থা করেছিল।

'যে উক্ত অঞ্চলগুলির কোনও দেশীয় ব্যক্তি, বা সেখানে বসবাসকারী সম্রাটের কোনও জন্মগতভাবে প্রজা কেবলমাত্র তার ধর্ম, জন্মস্থান, বংশানুক্রমিকতা, বর্ণ বা এর যেকোনও একটির জন্য উক্ত কোম্পানির অধীনে কোনও স্থান, পদ বা নিযুক্তি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারবে না।' (ধারা-৮৭)

১। ১৮৩৩ সালের আগে যে অত্যন্ত কম বেতন হারে তাদের নিযুক্ত করা হত তা জানা যাচ্ছে নিম্নলিখিত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে :—

৩টি প্রেসিডেন্সির মহাকরণের (Secretariate) সঙ্গে যুক্ত ১ম শ্রেণীর দেশীয় জনপালন কৃত্যকের কর্মচারীরা প্রতি মাসে যে বেতন পেতেন	বঙ্গদেশ		মাদ্রাজ		বোম্বাই		মোট	
	সংখ্যা	মোট গৃহীত বেতন	সংখ্যা	মোট গৃহীত বেতন	সংখ্যা	মোট গৃহীত বেতন	সংখ্যা	মোট গৃহীত বেতন
৫০০ টাকা এবং তদুর্দ্ধ	৫	২,৭০০	—	—	৫	২,৫০০		
৪০০ টাকা এবং তদুর্দ্ধ	২	৮০০	—	—	১	৪০০		
৩০০ টাকা এবং তদুর্দ্ধ	৪	১,৪০০	১	৩৫০	১	৩৫০		
৩০০ টাকা এবং তদুর্দ্ধ	৩	৯০০	—	—	২	৬০০	৮৯	২০,৬৯০
২৫০ টাকা এবং তদুর্দ্ধ	৫	১,২৫০	—	—	১	২৫০		
২৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা	১৭	৩,৪৬০	৫	১,১৫৫	১	২০০		
২০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা	১০	১,৫৯০	৪	$৬৮২^{১}/_{২}$	—	— ৮৯		
১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা	৫	৫৫৯	৫	৫২৫	৫	৩৩০		
১০০ টাকার কম	৬	৪.৭৩	১	$৮৭^{১}/_{২}$	২	১৪০		
মোট	৫৭	১৩,১২০	১৬	২,৮০০	১৬	৪,৭৭০		

দেশীয় ব্যক্তি						
	বিশদে			মোট		
উচ্চপদাধিকারী	টাকা	আনা	পয়সা	টাকা	আনা	পয়সা
২৬ ইউরোপীয়	৯,৮৬১	২	১			
২০ দেশীয়	৯৪০	০	০	১৩,৫২৭	৮	৭
নিম্নপদস্থ ও কর্মচারিবৃন্দ	১,২০৯	১	৪			
নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ভাতা	১,৫১৭	৫	২			
সিপাহী						
১৪০ নিম্নপদস্থ আধিকারী	১,৭৮০	০	০			
১০০০ সিপাহী	৭,০০০	০	০	৯৬০৬	১৪	০
অন্যান্য খরচ	৮২৬	১৪	০			
মোট				২৩,১৩৪	৬	৭

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বিদ্রোহের অবসানের পর পর্যন্ত একজনও দেশীয় ব্যক্তি এই সংবিধি পাশ হবার আগে পর্যন্ত যে-সব পদে তারা যোগ্য বিবেচিত হত সেগুলি ছাড়া অন্য কোনও পদে তাদের নিয়োগ করা হয়নি। কারণ পরিচালকবৃন্দের সভা এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারত সরকারকে এই পরামর্শ দিয়েছিল যে এই আইন প্রণয়নের দ্বারা একেবারে প্রথম থেকেই :

'কার্যত .... ফলাফলের কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা দেবে না। চুক্তিবদ্ধ চাকরির জন্য বরাদ্দ পদগুলি এর অন্য যে কোনও সরকারি বা জনসাধারণ সম্পর্কিত পদগুলির মধ্যে প্রভেদ সাধারণভাবে থাকবে যা বর্তমানে চলছে।'[১]

মোট আদায়ীকৃত রাজস্বের প্রায় ১০ শতাংশ শোষণ করে নেওয়া বিচারবিভাগীয় ও পুলিশ যৌথ খাতে খরচকে তাদের চারিত্র-বৈশিষ্ট্যে সংরক্ষণমূলক গণ্য করা যেতে পারে। এইভাবে ক্ষতিকারক করের মাধ্যমে আদায়ীকৃত অর্থের একটা বড় অংশ খরচ হতে অনুৎপাদী পদ্ধতিতে। যুদ্ধের সংস্থাগুলিকে প্রতিপালন করা হত শান্তির নামে এবং সেগুলি মোট তহবিলের এত বেশি অংশ শোষণ করে নিত যার ফলে কার্যত প্রগতির মাধ্যমগুলির জন্য কিছুই আর বাকি থাকত না। যেসব ব্যয় করা হত তার মধ্যে শিক্ষার কোনও স্থান ছিল না এবং উপযোগী লোক হিতকর কাজের সংখ্যাও ছিল হতাশাজনকভাবে মুষ্টিমেয়। বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশে সহায়ক রেলপথ, নাব্যপথ

১) বঙ্গদেশের জন্য প্রেরিত সরকারি নির্দেশ নং ৪৪, তাং ১০ ডিসেম্বর ১৮৩৪, অনুচ্ছেদ ১০৭।

ও জলসেচ এবং অন্যান্যগুলি দীর্ঘকাল সরকারি বাজেটে কোনও স্থান পায়নি।[১] ৮,৩৭,০০০ বর্গমাইল মোট এলাকার মধ্যে মাত্র কয়েক মাইল রেলপথ নির্মিত হয়েছিল, ২১৫৭ মাইল স্থলপথ, ৫৮০ মাইল জলপথ এবং ৮০ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন। কিংবা কত অর্থ ব্যয় হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলতে হয়, তবে আমরা দেখতে পাই যে, ১৮৩৭-৩৮ থেকে ১৮৫১-৫২ পর্যন্ত ১৫ বছরের সমগ্র সময়ের মধ্যে উৎপাদনশীল চরিত্রের গড় ব্যয় হয়েছিল মাত্র বছরে ২৯৯, ৭৩২ পাউন্ড।[২] একটি তত্ত্ব কৃষকদের কাছে সুবিদিত ছিল যে, সার প্রয়োগ না করে অবিরাম ফসল ফলিয়ে গেলে জমি নিঃশেষিত হয়ে যায়। এটা অবশ্য আরও ব্যাপক প্রয়োগ হবার যোগ্য এবং এটা যদি ভারতের সরকারি অর্থনীতিতে পালন করা হত তাহলে দেশের কর দেবার ক্ষমতা রাজকোষ ও জনগণের উপকারেই বৃদ্ধি পেত। দুর্ভাগ্যবশত এটা ভারতের লগ্নীকারকদের মনোযোগ আকর্ষণ না করায় উভয়েরই অনিষ্টসাধন করেছে।

যদি এই দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি পূরণ করার জন্য ন্যায়সঙ্গত কর ও উৎপাদনশীল ব্যয়ের দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি করার সুযোগ সুরক্ষিত করা হত তবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার পথ উন্মুক্ত হতে পারত। একথা অনুমান করা যেতে পারে যে, ১৮৩৩ সালের মত যদি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হত তবে যে-সব ক্ষেত্রে সম্ভব সেখানে মিতব্যয়িতার প্রয়োগ হত। কার্যত কেন্দ্রীয়করণটি ছিল সবচেয়ে দুর্বলতম ধরনের। আইনত প্রশাসনের একটি সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি ছিল কিন্তু কার্যত প্রশাসন পরিচালিত হত যেন কার্যনির্বাহী সরকারের প্রাথমিক একক-মাত্রা হিসাবে ছিল প্রদেশগুলি এবং ভারত সরকার ছিল কেবলমাত্র সমন্বয়সাধনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে। কতকগুলি নানা ধরনের পরিস্থিতি থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

---

১) তিনটি প্রেসিডেন্সিতে দেশীয় কর্মচারিবৃন্দ সম্পর্কে অসামরিক বিত্ত কমিটির প্রতিবেদন,—বঙ্গদেশের বিত্তীয় পরামর্শ সমিতি, তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ১৮৩০। ইন্ডিয়া অফিসের নথিপত্র। কয়েকটি প্রেসিডেন্সির সঙ্গে যুক্ত অচুক্তিবদ্ধ খ্রিস্টান ও দেশীয় কর্মচারীদের অধস্তন কর্মচারিবৃন্দ কমিটি কর্তৃক চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, (১) অন্তর্ভুক্ত করা প্রধান করণিক, নিবন্ধক, অধ্যক্ষ (Manager) ও তাদের সহকারী, পরীক্ষক, বিনিয়োগকারী ইত্যাদি যারা সচিবদের অধীনে নিযুক্ত হত দপ্তরের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করার জন্য; (২) চলতি ব্যবসার কেরানি ও স্থায়ী নকল-নবিশ; (৩) বিভাগীয় প্রধান কেরানি অথবা নকল-নবিশ যারা ফুরনে (Piece work) কাজ করত এবং সকল অধস্তন কর্মচারী। কমিটি লক্ষ করেছিল যে,

অনুচ্ছেদ ৩৫। কলকাতার চলতি ব্যবসার কেরানিদের প্রাপ্ত বেতন ছিল মাসিক ২০ টাকা থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে, প্রত্যেকে গড়ে পেত ১০৪ টাকা করে; বোম্বাইতে ১৫ টাকা থেকে ১২৫ টাকার মধ্যে, গড়ে ৪৮ টাকা; মাদ্রাজে এটা একটা স্থায়ী নিয়ম ছিল যে প্রেসিডেন্সির সচিবালয়ে এই জাতীয় কর্মচারীদের গড় পারিশ্রমিক ছিল ২৭১/২ টাকা, যা বন্টন করা হত ১০১/২ থেকে ৮৭১/২ টাকা হারে, এবং তা দেওয়া হত প্রত্যেকের চাকুরির সময়কাল ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ....

অনুচ্ছেদ ৫১। বঙ্গদেশে সচিবালয়ের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারিদের বর্তমানে দেওয়া হয় মাঝে ১১৪২ টাকা; মাদ্রাজে মুচি সহ ৪৫৫ টাকা করে; বোম্বাইতে ২৬১ টাকা। বঙ্গদেশে ১৮৬ জন কর্মচারী ছিল, মাদ্রাজে ৫৬ এবং বোম্বাইতে ৪২।

২) ব্রিটিশ ভারত সম্পর্কিত পরিসংখ্যানগত প্রবন্ধ, থর্জনি কর্তৃক সম্পাদিত, ১০৫৩।

একথা সত্য যে, আইন প্রণয়নের বিষয়টি ছিল ভারত সবকারের হাতে কেন্দ্রীভূত, তৎসত্ত্বেও ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আইনগুলি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল বিভিন্ন প্রদেশের জন্য। যেন আইন প্রণয়নের অধিকার তখনও ছিল প্রদেশগুলির হাতে এবং ভারত সরকার ছিল শুধুমাত্র তা মঞ্জুর করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব আমদানি রপ্তানি শুল্ক ছিল। অভ্যন্তরীণ ও সেই সঙ্গে বৈদেশিক যেটা ছিল তাদের সার্বভৌমত্বের মর্যাদার উদ্বর্তনের (Survival) চিহ্ন। নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রাখা অব্যাহত রেখেছিল প্রতিটি প্রদেশ। কেন্দ্রীয়করণ করা সত্ত্বেও হিসাব রাখার পদ্ধতি তখনও প্রদেশের হাতেই ছিল। তাদের আর্থিক স্বাধীনতার বোধটিকে বজায় রাখার জন্য। প্রশাসনের কাজকর্ম এবং রাজস্ব আদায় করা তখনও পর্যন্ত তাদের দ্বারাই পরিচালিত হত। প্রদেশগুলি এমন আচরণ করত যেন তারাই সরকারের দায়দায়িত্বের ভারপ্রাপ্ত বৈধ কর্তৃপক্ষ। স্বাধীনতার এই বোধটি অবাধ্যতার জন্ম দেয়। এবং কয়েকটি প্রদেশের, বিশেষ করে বোম্বাই ও মাদ্রাজের বিদ্রোহের খরচ মেটানোর জন্য ভারত সরকার তার নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে বসবাসকারী অধিবাসীদের উপর নতুন বোঝা চাপিয়ে কর বসাতে চায় তখন তারা বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হল এই যে ১৮৩৩ সালের আইন প্রশাসনিক ও আইনগত দায়িত্বের মধ্যে এক দুর্ভাগ্যজনক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদী সরকার আইনত দায়ী থাকলেও দেশকে শাসন করত না। প্রাদেশিক সরকারগুলি দেশ শাসন করত, কিন্তু আইনত তাদের কোনও দায়িত্ব ছিল না। দেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারে মিতব্যয়িতার উপর এক মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল এই বিচ্ছেদের। অপরিহার্যভাবেই ব্যয়ের ক্ষেত্রে মাত্রাধিক্যতা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম হয়ে উঠেছিল, এবং এটা সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির মধ্যেই সহজাত ছিল। মিতব্যয়িতা আসে দায়িত্ব থেকে এবং দায়িত্ববোধ তখনই আসে যখন এক সরকারকে সম্পদ খুঁজে নিতে হয় যে ব্যয় তারা করতে চায় তা পূরণ করার জন্য। সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির অভিষেকের আগে প্রাদেশিক সরকার বাধ্য ছিল ব্যয়ের জন্য সেই অর্থ সংগ্রহ করতে যা তাদের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর ফলে তারা বাধ্য হয়েছিল মিতব্যয়ী হতে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির অধীনে যখন বিভিন্ন পরিষেবার জন্য ব্যয়বরাদ্দ প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত করা হত, তখন প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার দায়িত্ব থাকত ভারত সরকারের উপর। ইতিপূর্বে যে ভাণ্ডার থেকে অর্থ তারা তুলত তার সীমারেখা জানা ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির অধীনে তাদের—

'সেই পরিমাপ সম্বন্ধে জানবার কোনও উপায় ছিল না, যার দ্বারা ভারত সরকারের কাছ থেকে তাদের বার্ষিক দাবি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত ছিল। অর্থ তোলার জন্য

তাদের যে ভাণ্ডারটি ছিল তা ছিল অন্তহীন। কারণ তার গভীরতা ছিল অজ্ঞাত। চতুর্দিকে তারা উন্নত বিধানের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যক্ষ করত এবং তাদের অবিরাম ও ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা ছিল সাম্রাজ্যের সাধারণ রাজস্ব থেকে ভারত সরকার যতটা সম্ভব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজ নিজ প্রদেশগুলির জন্য যথাসম্ভব বেশি অংশ পাওয়া। অভিজ্ঞতা থেকে তারা দেখেছিল যে তারা যত কম মিতব্যয়ী হবে এবং তাদের দাবি যত জোরদার হবে। তত বেশি সম্ভাবনা থাকবে তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারত সরকার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে। তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতে গিয়ে তারা বুঝেছিল যে যা ঠিক তাই তারা করেছিল। এবং ভারত সরকারের উপর তারা দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল, যে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি সরবরাহ করার ব্যাপারে রাজি না হওয়ার দায়িত্ব ভারত সরকার নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিল।'[১]

এই মাত্রাতিরিক্ত চাহিদার ব্যাপারে ভারত সরকারকে প্রায়ই নত হতে হত। কারণ, দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারত সরকারের সেই প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল না চাহিদাগুলির মূল্যায়ন করা এবং সেগুলি সম্বন্ধে ব্যয়ের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও ছিল না। কোনও প্রশাসনের সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির কাছ থেকে অত্যন্ত দক্ষতা আশা করাটা স্বাভাবিকভাবে সঙ্গত নয়। আশা আরও কম করা উচিত বিশেষ করে যেখানে তা কোনও একটা বিভাগ বা কোনও একটা প্রদেশ সম্পর্কিত না হয়ে মহাদেশের মত এক বিশাল দেশের ব্যাপার হয়। শুধুমাত্র এর বিশালতার জন্যই এর গতি ছিল শ্লথ। এবং তা আরও শ্লথ হয়ে উঠবে যদি সেটা এমন এক পদ্ধতি হয় যা ভারতীয় পদ্ধতির মত অসংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ না হয়। প্রথমত ভারতের সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি ছিল তার নিয়ন্ত্রণের কার্যনির্বাহী প্রশাসন ব্যবস্থাবিহীন। যে আইন এটা সৃষ্টি করেছিল তার সম্বন্ধে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে বঙ্গদেশ সরকার এবং ভারত সরকারকে ঐক্যবদ্ধ করে এক করে দেওয়াটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। এই একীভূত হওয়ার ফলে প্রশাসন ব্যবস্থার উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়েছিল। বঙ্গদেশ সরকার হিসাবে নিজ কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তা খুবই অল্প সময় পেত ভারত সরকার হিসাবে নিজস্ব কর্তব্য পালন করার। শুধু যে একটি এজমালি (Common) কার্যনির্বাহী ছিল তা নয়, একটি এজমালি মহাকরণও (Secretariate) ছিল দুটি সরকারের কাজের দায়িত্বে। অতিরিক্ত কাজের চাপের জন্য মহাকরণের দক্ষতা যথেষ্ট কমে গিয়েছিল ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত দেশের অর্থনীতিকে পরিচালনা করার জন্য বিশেষ দায়িত্বভার সম্পন্ন কোনও আধিকারিক

১) ভারতের ভাইসরয় ও বড়লাট হিসাবে আর্ল অফ মেয়োর প্রশাসন—কাউন্সিলের সদস্য ও প্রাক্তন বড়লাট মাননীয় জন স্ট্র্যাচির লিখিত সংক্ষিপ্তসার। অধ্যায় ৩০ এপ্রিল, ১৮৭২, সরকারি ছাপাখানার অধীক্ষকের (Superintendent) কলকাতা দপ্তর, ১৮৭২, পৃ: ৪৬।

না থাকত ঐ বৎসরেই ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড এলেনবরো (Ellenborough) বঙ্গদেশের মহাকরণকে ভারতের মহাকরণ থেকে আলাদা করে দেন।[১] শেষোক্তের সঙ্গে ভারত সরকারের বিত্ত সচিব নামের একটি সম্পূর্ণ আলাদা পদ যুক্ত করেন।[২] যা বিত্ত বিভাগ ছাড়া সরকারের অন্য কোনও বিভাগের পালনীয় কর্তব্যের সঙ্গে জড়িত থাকত না। কিন্তু যখন সমীক্ষক পদাধিকারীর অভাব ঐ ভাবে পূর্ণ করা হল একজন স্বতন্ত্র বিত্ত সচিবের নিযুক্তির দ্বারা, তখন কিন্তু একটি উপযোজন (Appropriation) আয় ব্যয়ক এবং একটি কেন্দ্রীভূত নিরীক্ষা (Audit) এবং হিসাবগণনার পদ্ধতি থাকায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা বলবৎ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিত্তের সাম্রাজ্যবাদী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্তেও নিরীক্ষা ও হিসাবগণনার আধিকারিকরা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের মহাকরণের সঙ্গে যুক্ত থাকত। তারা সর্বোচ্চ সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য দায়ী থাকত না। যে সরকারের উপর আইনের বলে ভারতের রাজস্ব সম্বন্ধে নির্দেশদান ও পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পিত ছিল। প্রাদেশিক মহাকরণের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য ভারত সরকার হিসাব নিকাশ ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশ সরাসরি জারি না করে কেবল মাত্র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের ব্যাখ্যা সহ জারি করতে পারত। দ্বিতীয়ত আয় ব্যয়ক পদ্ধতি, বাণিজ্যিক হিসাব নিকাশ রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হলেও অর্থাৎ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকা, কিন্তু তা একটি উপযুক্ত সরকারি হিসাব নিকাশ রক্ষা কারার ব্যাপারে প্রথম ও মৌলিক অর্থাৎ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার ব্যাপারে নিরর্থক ছিল। প্রতিটি আলাদা আলাদা পরিষেবার কাজ চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ দেখিয়ে দেশের বিত্ত সংক্রান্ত প্রশাসনের উদ্দেশ্যে তিনটি প্রাক্কলন (Estimate) (খসড়া, প্রথাসিদ্ধ এবং আয় ব্যয়ক) অবশ্যই প্রস্তুত করা হত। কিন্তু বিভিন্ন পরিষেবার জন্য সরকারি অর্থের এই বণ্টনপ্রথা উপযোজনের অর্থে বিবেচিত হত না। নগদ প্রয়োজন হিসাবে গণ্য করা হত শুধু। এই কারণে অনুদানগুলি (Grants) কখনই সাবধানতার সঙ্গে প্রস্তুত হয় নি এবং কার্যত তা প্রতিপালিত হবার ক্ষেত্রে কোনও সীমারেখা নির্ধারিত হয় নি। যেহেতু প্রতিটি পরিষেবার জন্য কোনও নির্দিষ্ট মতদান অথবা অনুমোদনে যুক্ত আয় ব্যয়ক ছিল না তাই নিরীক্ষা ও হিসাব গণনা করা আদৌ কোনও কিছুর ব্যাপারে মাথা ঘামাত না সরকারি কোষাগারের মাধ্যমে গৃহীত ও প্রদত্ত সকল অর্থের বিধিবদ্ধ বিবরণ রাখা হোক বা না হোক। এটা প্রত্যক্ষ করা যেত যে উপযোজন আয় ব্যয়ের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সব সরকারি হিসাব রক্ষা ও নিরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, যথা খরচ

১) ভারত সরকার প্রস্তাব, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, ২৯ এপ্রিল, ১৮৪৩।

২) ভারত সরকার প্রস্তাব, তারিখ ৪ জানুয়ারি, ১৮৪৩।

করার কর্তৃপক্ষের উপর অনুমোদন-নীতি মেনে চলার জন্য প্রতিবন্ধকতা আরোপের বিষয় সম্বন্ধে সাফল্য অর্জন করা যায় নি। মাত্রাতিরিক্ত দাবিসহ প্রাদেশিক সরকারগুলি খরচের ব্যাপারে বেপরোয়াও ছিল। যত দিন পর্যন্ত ভারত সরকারের উপযোজন আয়ব্যয়ক এবং নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষার একটি কেন্দ্রীভূত পদ্ধতি ছিল না, ততদিন পর্যন্ত তা শুধু বিত্ত বিষয়ক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নামমাত্র কর্তৃপক্ষ ছিল, এবং বিত্ত সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনত দুর্বলতম কর্তৃপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও প্রদেশগুলি বাস্তবে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণকর্তা ছিল।

প্রাদেশিক সরকারগুলির তরফ থেকে বিত্ত সম্পর্কিত দায়িত্বহীনতার ফলে উদ্ভূত প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষগুলির অপচয়ী অভ্যাসগুলিকে সংযত করার অক্ষমতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অদক্ষতার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে অনীহার সাধারণ মনোভাব যা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছিল বিত্ত সম্পর্কিত ব্যাপারে ভারত সরকারের কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষেত্রে। একদিকে এটা যেমন সত্য ছিল যে, কার্যনির্বাহী পরিষদের মত ছাড়া ভারতের রাজস্ব থেকে কিছুই খরচ করা যেত না, তেমনি পরিষদের কার্যপদ্ধতি থেকে এটাও দেখা যেত না যে তা ব্যয়ের ব্যাপারে মিতব্যয়িতার উৎকর্ষ সাধনে তারা কোনও গভীর অগ্রহ দেখিয়েছে। পরিষদ কাজ করত যৌথভাবে এবং যেসব বিভিন্ন সদস্য নিয়ে পরিষদ গঠিত হয়েছিল তাদের কোনও কার্যনির্বাহী কর্মভার অর্পণ করা হত না। যুদ্ধ ও আইন প্রণয়নের বিভাগ ছাড়া সরকারের সমস্ত কাজ গোচরে আনা হত বড়লাট ও তাঁর উপদেষ্টাদের। এর যৌথভাবে কাজ করার ফলে—

'প্রতিটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতিটি সদস্যদের হাত ফেরৎ হয়ে যেত, যা একটি ছোট মেহগনি কাঠের বাক্সে ভরা অবস্থায় শম্বুক গতিতে এক উপদেষ্টার বাড়ি থেকে অন্যদের বাড়িতে যেত।'[১]

এই পদ্ধতির অধীনে কেউই অর্থমন্ত্রী হিসাবে ব্যয় সংকোচের জন্য দাবি জানাতে পারত না, কারণ প্রত্যেকেই মন্ত্রী বলে বিবেচিত হত। ফল হয়েছিল এই যে, বিত্ত সম্পর্কিত কর্তব্য হয়ে না ওঠার দোষে দোষী হয়ে উঠেছিল; যার জন্য তহবিল পরিষেবাগুলির প্রকৃত চাহিদা অনুসারে বণ্টিত হত না, বরং তা হত পরিষেবাগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক দাবি ও চাপ দেওয়ার ব্যাপারে, যে যত জোর গলায় দাবি জানাত তার ভিত্তিতে।

পর্যাপ্ত প্রমাণ দাখিল করা হয়েছে এটা দেখাবার জন্য যে সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়েছিল ক্ষতিকারক করপ্রথা ও অনুৎপাদী ও বেহিসাবি খরচের দ্বারা জর্জরিত

---

১) ডবলু. ডবলু. হান্টার, লাইফ অফ মেয়ো, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯০।

ত্রুটিযুক্ত রাজস্ব-সংক্রান্ত পদ্ধতির জন্য। একথা অবশ্যই মনে করা উচিত নয় যে এই ত্রুটিযুক্ত রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি শুরু হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির অভিষেকের সময় থেকে। অন্যদিকে অতীতের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক পদ্ধতি যা সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে বর্তেছিল। তৎসত্ত্বেও এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির সমায়োচিত সংশোধন এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করাটা সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির ভিত্তি সুদৃঢ় করতে পারত। কিন্তু তা দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত রাখার ফলে এর বিত্ত সম্পর্কিত ভিত্তির ক্ষতি হয়েছিল এবং এর ক্রমবর্ধমান খরচ মেটাবার জন্য ভিখারিতে পরিণত, করা দেশবাসীর কাছ থেকে আর অধিক অর্থ পাচ্ছিল না, তাই সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি বিদ্রোহের আকস্মিক আঘাতটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং আদি মহিমায় আরও কখনও মাথা তুলতে পারেনি।

অধ্যায়-২

সাম্রাজ্যবাদ বনাম যুক্তরাষ্ট্রবাদ

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের খরচের ফলে ইতিমধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত সাম্রাজ্যবাদী কিন্তু এতই সংকট পূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, পরবর্তী দশকগুলিতে অন্য কোনও সমস্যা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল বলে বলা যেতে পারে না যতটা করেছিল টলমলে পদ্ধতিটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সমস্যাটি। গ্রহণযোগ্য পুনর্গঠনের প্রকৃত পন্থা সম্বন্ধে বিতর্ক দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও, ভেঙ্গে পড়ার কারণগুলি এতই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান ছিল যে ভারতের বিত্ত সম্পর্কে যাদের কোনও কিছু করণীয় ছিল তারা পদ্ধতিটির একটি সর্বপ্রধান ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল, যে পদ্ধতিটির ভাঙ্গন তারা প্রত্যক্ষ করেছিল, যেমন, যে ত্রুটিটি প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে অপচয়ের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। এই অশুভত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য একদিকে কিছু দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল।

'স্থানীয় সরকারগুলিকে ভারতীয় বিত্তের বিশাল যৌথ সংভারের অংশীদার করতে, এবং তাদের আগ্রহ ও উজ্জীবিত সহযোগিতা ভারত সরকারের সঙ্গে যুক্ত করতে শুধুমাত্র প্রতিনিধি ও কর্মচারীর ভিত্তিতে না রেখে। যাদের মিতব্যয়ী হবার কোনও সঙ্কল্প ছিল না এবং প্রভুসুলভ উপকরণগুলি প্রয়োগ করে শুধু নিজেদের চাহিদাগুলি বাড়াবার কথা চিন্তা করত কম বেশি সুযুক্তিসঙ্গত তুলনার দ্বারা তৎসহ অন্যদের যে সব প্রশ্রয় দেওয়া হত সেগুলি তো ছিলই।'[১]

এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ প্রদেশগুলিকে পৃথক ও সার্বভৌম রাজ্য করে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভারতকে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পরিবর্তন করার জন্য এক সু-শিক্ষিত অভিমত বিশিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা গঠিত হবার পথ প্রশস্ত করেছিল।[২] উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতির পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি স্থাপন করা এবং ভারতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আর্থিক অবস্থার

---

১) সংক্ষিপ্তসার কৃত এইচ. ই. স্যার ডবলু. আর. ম্যানসফিল্ড, সর্বাধিনায়ক, তারিখ ১৭ অক্টোবর, ১৮৬৭। স্থানীয় সরকারগুলিকে আর্থিক ক্ষমতা সম্প্রসারণ সংক্রান্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি, পৃ: ৯৯-১০৩।

২) তুলনীয় কর্নেল আর. স্ট্র্যাচির নোট, তারিখ ১৭ আগস্ট ১৮৬৭, যা ছিল জে. এফ. ফিনলের প্রাদেশিক বিত্তবিষয়ক ব্যবস্থাদির ইতিহাস। উদ্ধৃতির তালিকা, পৃ: ৩।

সংযোজন করা। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে নিষ্পন্ন করার জন্য এমন দাবি জানান হয়েছিল যে, ভারতের রাজস্বগুলিকে সম্রাটের কোষাগারে সংগৃহীত হবার পর বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করার নিমিত্ত একটি আয় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল নিজস্ব রাজস্ব নিজের কাছে রাখতে এবং তা থেকে খরচ মেটাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের থাকবে আলাদা নিজস্ব সম্পদ, এবং প্রয়োজনবোধে সংযোজিত হবে প্রদেশগুলির প্রদেয় অর্থ যা তারা দেবে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের ব্যাপারে তাদের অংশ হিসাবে একটি ন্যায্য মানের ভিত্তিতে। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাধীনে রাজকীয় ও প্রাদেশিকের রীতিসিদ্ধ বিভাজন সহ সম্মিলিত রাজকীয় আয়-ব্যয়কের পরিবর্তে স্থলাভিষিক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল একটি সম্পূর্ণ আলাদা আয়-ব্যয়ক, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সৃষ্টি করে, পরিষেবাগুলির প্রকৃত বিভাজন এবং রাজস্বের নির্দিষ্ট বণ্টনের ভিত্তিতে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অনুকূলে বহু সুযোগ- সুবিধা পাওয়ার দাবি করা হয়েছিল। প্রথমত একথা বিশ্বাস করা হত যে রাজস্ব এবং পরিষেবাগুলির পৃথগীকরণ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির উপায়-উপকরণগুলিকে/সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার পথ নির্দিষ্ট করে দেবে, যাতে তাদের প্রত্যেকে দায়ী থাকবে নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করার ব্যাপারে তাদের জন্য বরাদ্দ অর্থের সীমার মধ্যে। এর আগে প্রাদেশিক সরকারগুলি রাজস্ব ও ব্যয়ের একটা হিসাব সরকারি ভাবে প্রদত্ত বিবরণ (Returns) হিসাবে পাঠাত যাতে একের সঙ্গে অপরের কোনও সম্পর্ক থাকত না, এবং সর্বোচ্চ সরকার তার কাছে প্রেরিত বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রাক্কলন (Estimate) সমষ্টিগতভাবে নিয়ে সমীকরণের (Balancing) দায়িত্ব গ্রহণ করত। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অধীনে প্রাদেশিক প্রাক্কলনকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া প্রাপ্তির ও খরচের সমীকৃত হিসাব হওয়া আবশ্যিক ছিল। মুখ্য হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকরা তাদের পরিকল্পনার এটাকেই একমাত্র সুবিধা বলে গণ্য করত না। কারণ এটা উপস্থাপিত হয়েছিল যে, তহবিল থেকে প্রাদেশিক সরকারগুলি অর্থ গ্রহণ করত তা সীমিত করে দিয়ে ঐ সরকারগুলির বেহিসাবি ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা হিসাবে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান ব্যয়েরও সীমা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা হিসাবে। যুক্তরাষ্ট্রপন্থীরা এই সত্যটি গোপন করেনি যে, সমগ্র ভারতের মোট সম্পদ থেকে অর্থ সংগ্রহের অধিকারী হওয়ায় নিজেদের খরচের ব্যাপারে বেহিসাবি হওয়ার প্রবণতা দেখাত। অতএব তারা ভেবেছিল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা যার কাজ ছিল রাজস্ব ও পরিষেবার বিভাজন বণ্টন করা। কেন্দ্রীয় ও সেই সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের উপর মিতব্যয়িতা বলবৎ

করতে সফল হবে।

শুধু মিতব্যয়িতা ও দায়িত্বের স্বার্থেই যে এর সমর্থকরা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছিলেন তা নয়, সেই সঙ্গে বহু জনের স্বার্থেও তা করেছিল। রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের জন্য রাজস্বের কতিপয় উৎস ভারত দিতে চেয়েছিল একথা যুক্তরাষ্ট্র-পন্থীরা মানতে চায়নি। ভারতের আর্থ-সম্পদের খেয়াতরীর ভরাডুবি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের অভিমত ছিল এই যে, কর আরোপ করার বহু উৎস ছিল, যার প্রবাহে তা আবার ভেসে উঠতে পারবে। কিন্তু তারা যুক্তি দেখিয়েছিল যে, এই ব্যবহারযোগ্য উৎসগুলি ঠিকমত ব্যবহৃত হয়নি, যেহেতু রাজকীয় সরকার, যা সেগুলি ব্যবহার করতে পারত, তা করেনি তাদের সীমাবদ্ধ আঞ্চলিকতার জন্য; এবং প্রাদেশিক সরকার, যারা সেগুলিকে ব্যবহার করতে চাইত, তৎকালীন বর্তমান সাংবিধানিক আইনগুলির অধীনে নিজেদের সীমাবদ্ধ আঞ্চলিকতার জন্য তা করতে পারে নি। কিন্তু যদি প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কর আরোপ করার ক্ষমতা ন্যস্ত বা পুনর্ন্যস্ত করা হত, যেটা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় দেবার কথা হচ্ছিল, তাহলে সেই জাতীয় করের উৎসগুলি,যা খুব বেশি আঞ্চলিক চরিত্রের হওয়ার জন্য রাজকীয় সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল সেগুলি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় বিত্তের পক্ষে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিত পারত।

মিতব্যয়িতা ও প্রাচুর্যের স্বার্থেই যুক্তরাষ্ট্রবাদের সমর্থন যে করা হয়েছিল তা নয়, ন্যায় ও সমতার স্বার্থেও বটে। একথা বলা হয়েছিল যে, প্রচলিত পদ্ধতির ফলে বিভিন্ন প্রদেশ সম্পর্কে অন্যায় আচরণ করা হত। যদি আমরা বিভিন্ন প্রদেশের হিতার্থে বাস্তুকর্ম এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যয়কে মাপকাঠি হিসাবে ধরি, তবে যুক্তরাষ্ট্রপন্থীদের সমালোচনাকে অযৌক্তিক বলতে যাবে না। অপর দিকে নিম্নলিখিত সংখ্যাতত্ত্ব তাদের যুক্তির একটা বড় অংশকে সমর্থন করছে:

বাস্তুকর্মে ব্যয় ১৯৩৭-৩৮ থেকে ১৮৪৫-৪৬ বছরগুলির গড়

প্রদেশ	জনসংখ্যা হাজারে	ক্ষেত্রফল বর্গমাইলে	রাজস্ব শত টাকার হিসাবে	বাস্তুকর্মে ব্যয় শত টাকার হিসাবে
বঙ্গদেশ	৪,০০,০০,০০০	১,৬৫,৪৪৩	১,০২,৩৯,৫০০	১,৭৯,৮১২
উ: প্রদেশ	২,৩২,০০,০০০	৭১,৯৮৫	৫৬,৯৯,২০০	১,৪১,৪৫০
মাদ্রাজ	২,২০,০০,০০০	১,৪৫,০০০	৫০,৬৯,৫০০	৩০,৩০০

* ক্যালকাটা রিভিউ থেকে সংকলিত, ১৮৫১, ষোড়শ খণ্ড, পৃ: ৪৬৬

এই ভাবে বাস্তুকর্মে খরচ ছিল বঙ্গদেশে ১$\frac{৩}{৪}$ শতাংশ। উত্তর- পশ্চিম প্রদেশগুলিতে ২^{১}$_{২}$ শতাংশ; মাদ্রাজে ১/$_{২}$ শতাংশের কিছু বেশি তাদের নিজ নিজ রাজস্বের তুলনায়। অন্যদের তুলনায় কিছু কিছু প্রদেশের প্রতি এই পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ সমর্থন করেছিল ব্রিটিশ সরকার, যে অর্থ বণ্টন করত এর ভিত্তিতে যে দাক্ষিণ্যপুষ্ট প্রদেশগুলি তাদের হিসাবে উদ্বৃত্ত দেখিয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রপন্থীরা দেখাল যে, বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষেত্রে এই সব ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত দেখানোর বিষয়টি ছিল জাজ্বল্যমানভাবে কাল্পনিক। ওগুলি ছিল হিসাবরক্ষার নিকৃষ্ট পদ্ধতিরই পরিণাম। পদ্ধতিটি নিকৃষ্ট ছিল এই কারণে যে, ঐ হিসাবে দেশের আর্থিক লেনদেনের হিসাব দেখানো হচ্ছিল হিসাবের খাত অনুসারে নয়, বরং প্রদেশানুসারে, যে ভাবে সেগুলি দেখান হত ১৮৩৩ সালের আগে পর্যন্ত, যখন বিত্ত সম্পর্কে কোনও যৌথ পদ্ধতি ছিল না। ১৮৩৩ সালের আইন পাশ হবার পর হিসাব রাখার এই পদ্ধতিটি, উক্ত আইনের মূল লক্ষ্য ও আক্ষরিক নির্দেশের সঙ্গে পদ্ধতি রেখে চলার মত আর রইল না। এতে তেমন কিছু হের-ফের হত না যদি সাধারণ হিসাবের খাতে সর্বভারতীয় দফাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক দফা থেকে পৃথক করে দেওয়া হত। কিন্তু তা না করায় এই পদ্ধতির অবগুণগুলি আরও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল সেই সব খরচকে, বিশেষ করে প্রদেশের হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে, যা বাস্তবিক ক্ষেত্রে ছিল একটি সর্বভারতীয় পরিষেবার খরচ, যার ফলে তা সব সময়েই ঘাটতি দেখিয়ে চলত, যখন কি না অন্য প্রদেশগুলি। যারা এটা এড়াতে পেরেছিল তারা উদ্বৃত্ত দেখাত এবং তাদের প্রতি যে দাক্ষিণ্যপুষ্ট আচরণ করা হত তার ফলস্বরূপ দাবি জানাতো। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি যুক্তরাষ্ট্রপন্থীদের এই বিষয়ে একটা ঘটনা জানিয়ে ছিল। এই প্রেসিডেন্সির দাবিগুলিকে ভারত সরকার অপরিহার্যভাবে নামমাত্র সৌজন্য দেখিয়ে গ্রহণ করত। কারণ বোম্বাইয়ের ইতিহাসে তার হিসাবে উদ্বৃত্ত দেখানো ঘটনা কদাচিৎ। কিন্তু একথা যদি উপলব্ধি করা হত যে ঘাটতিগুলি হচ্ছিল ঐ জঘন্য হিসাব রাখার পদ্ধতির জন্য যাতে ভারতীয় নৌবাহিনীর খরচ প্রেসিডেন্সির খরচের খাতে চাপিয়ে দেওয়া হত, তবে নিঃসন্দেহে বোম্বাই আরও ভাল করতে পারত। নিয়োগের এই ত্রুটিপূর্ণ পন্থাগুলিই শুধু এই হিসাব রাখার পদ্ধতির একমাত্র বৈলক্ষণ ছিল না। এই পদ্ধতির অধীনে এটা প্রায়ই দেখা যেত যে, কোনও একটি পরিষেবার খরচ একটি প্রেসিডেন্সির ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে এবং রসিদ সহ তা জমা পড়ছে অন্যের খাতে। কি ভাবে মাদ্রাজের হিসাবের ঘাটতি হিসাব রাখার ভুল পদ্ধতির জন্য বোম্বাইয়ের ঘাড়ে চাপানো হয়েছিল তা দেখা যাবে নিম্নবর্ণিত তথ্য থেকে:—

দখলিকার সৈন্যবাহিনীর খরচ		অধিকৃত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব	
খরচ	পরিমাণ টাকায়	জমা	পরিমাণ টাকায়
মাদ্রাজ	৭৯,৮৩,০০০	বোম্বাই	.... ২০,০০,০০০
		বঙ্গদেশ	.... ১,০৪,২২,৮৭০

* পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে সংকলিত, পৃ: ৪৭৫

এই জাতীয় হিসাব পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত অধিকারগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনলে এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে না যে, নিজেদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র-পন্থীরা যে-সব সুযোগ-সুবিধার দাবি জানাচ্ছে সেগুলি কাল্পনিকও নয় এবং অকিঞ্চিৎকরও নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে কাজকর্মের বিভাজন নিজেই একটা বিশেষ সুবিধা হয়ে উঠতে পারে বর্তমান বিশৃঙ্খলার তুলনায়। এতে যদি ন্যায়বিচার নাও পাওয়া যেত, এর মধ্যে অন্তত তা পাওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার গুণটি বর্তমান ছিল।

এই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাটি যখন একটি কার্যকর প্রস্তাব হিসাবে কর্তৃপক্ষদের সামনে পেশ করা হয়েছিল। তখন এক সুদৃঢ় বিরোধিতার উদ্ভব হয়েছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়েছিল সাম্রাজ্যিক পদ্ধতির সমর্থকরা। এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, তারা ছিল বেশির ভাগ অসামরিক বিভাগে নিযুক্ত সামরিক বিভাগের ব্যক্তি। তারা দুদিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে আক্রমণ শুরু করল, একটা দিক হল সাধনযোগ্যতা, অন্যটি উপযোগিতা।

সাম্রাজ্যবাদীরা প্রশ্ন করেছিল ভারতের রাজস্ব ও খরচাদিকে সুনির্দিষ্টভাবে একটি বিশেষ প্রদেশের অধিকারভুক্ত হিসাবে সীমাবদ্ধ করে রাখা সম্ভব কিনা? তারা দাবি করেছিল যে—

'ভারতে (ব্রিটিশ) শক্তির আরম্ভ থেকে ... প্রেসিডেন্সিগুলির এবং প্রদেশগুলির স্বার্থ ও বিষয়গুলি একে অপরের সঙ্গে সংপৃক্ত ও পরস্পরজড়িত থেকে এসেছে এবং প্রায়ই একটি অপরকে এবং তদ্বিপরীত ভাবে অধিক্রমণ (Overcome) করত এমন ভাবে যে বর্তমান পদ্ধতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত অসুবিধাগুলির চেয়ে আরও বেশি অসুবিধা ঘটাতে পারে, এমন পরিবর্তন না ঘটিয়ে বিজড়িত অবস্থা থেকে মুক্ত করা বা জট খুলে ফেলা এখন অসম্ভব। .... বঙ্গদেশ প্রেসিডেন্সির সৈন্যবাহিনীকে নিম্নগঙ্গার সমৃদ্ধ জেলাগুলিতে না রেখে, রাখা হয়েছে প্রধানত পঞ্জাবের

অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জেলাগুলিতে। এইভাবে সন্নিবেশিত ঐ সৈন্যবাহিনী কার্যত সমগ্র প্রেসিডেন্সির প্রতিরক্ষা করত। মাদ্রাজ সৈন্যবাহিনীকে ঐ প্রেসিডেন্সির মধ্যে রাখা হত না, কিন্তু মাদ্রাজ প্রদেশ ছাড়াও দাক্ষিণাত্য, মধ্যপ্রদেশ এবং ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের সুরক্ষার দায়িত্ব ছিল। অনুরূপ ভাবে, বোম্বাই সৈন্যবাহিনী তার নিজ প্রেসিডেন্সি ছাড়া, রাজপুতানা রাজ্য এবং মালব রাজ্যের আধিপত্যে নিযুক্ত ছিল। নিম্নদেশীয় প্রদেশগুলি অথবা প্রকৃত বঙ্গদেশ নিজেরাই বেশ ধনী ছিল; কিন্তু তাদের নিজস্ব রাজস্ব ছাড়াও তারা বহিঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটা বড় অংশ পেত, যা ছিল অংশত তাদের নিজস্ব কিন্তু সেইসঙ্গে বহুল মাত্রায় বঙ্গদেশ প্রেসিডেন্সির অন্যান্য বিভাগের। এমন কি বঙ্গদেশের আফিমের সবটাই বঙ্গদেশের নিজস্ব ছিল না। যার বেশিটা সংগৃহীত হত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি থেকে। সঠিক অর্থে বোম্বাইতে আফিম-রাজস্ব আদৌ ঐ প্রেসিডেন্সির নিজস্ব ছিল না, কারণ তা সংগৃহীত হত এর সীমার বাইরে সেই সব অঞ্চল থেকে যেগুলি, যদি সেগুলিকে আদৌ কোনও প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত করা হত। তবে তা হত বঙ্গদেশের অংশ। বোম্বাই এবং মাদ্রাজ উভয় প্রদেশের কিছু পরিমাণ লবণ-শুল্ক সংগৃহীত হত মধ্য ভারতে ব্যবহারের জন্য প্রেরিত লবণ থেকে এবং কঠোর নিয়ম মেনে চললে তা জমা পড়া উচিত ছিল ভারত সরকারের তহবিলে। দৃষ্টান্ত আরও অসংখ্য দেওয়া যেতে পারে ; কিন্তু এটা সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত হয়ে ওঠে যে, এই বিষয়গুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করার উদ্দেশে বিত্তের সম্পূর্ণ স্থানীয়করণ করার প্রচেষ্টা যদি করা হত, তবে বহু অসুবিধা, সম্ভবত বিবাদও উদ্ভূত হতে পারত...।'[১]

একই সুরে যুক্তি দেখিয়ে তৎকালীন ভারতের রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) লর্ড লরেন্স লিখেছিলেন:

'অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ ভারতের সম্পদগুলিকে যে বিশেষ প্রদেশ থেকে তা সংগৃহীত হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে সমষ্টিগতভাবে বিবেচনা করাটা বেশি সুবিধাজনক হবে। নিয়মটি যদি অন্যরকম হয়, তবে আমরা এই প্রশ্নে অবতীর্ণ হব যে— কোন কোন রাজস্ব প্রতিটি প্রদেশ সঙ্গত ভাবে দাবি করতে পারে? দৃষ্টান্ত স্বরূপ, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার বিচারের কারণে পার্বত্য এলাকায় অবস্থানরত সকল ব্রিটিশ সেনা দলের জন্য পঞ্জাবকেই কি ব্যয়ভার বহন করতে হবে? উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিন্যস্ত করা সমগ্র বাহিনীর ব্যয় কি অনুরূপ ভাবেই দেখানো হবে? রাজপুতানায় অবস্থানরত সেনাদলের জন্য কি খরচের ভার চাপানো হবে বোম্বাইয়ের উপর, যেহেতু ঐ সৈন্যদল বোম্বাইয়ের বা কি ভাবে তাদের খরচের ব্যবস্থা করা

---

১) স্যার রিচার্ড টেম্পলের টিপ্পনী। তারিখ ৭ নভেম্বর ১৮৬৮; বিত্তীয় শক্তি স্থানীয় সরকারগুলিতে সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রবন্ধ ইত্যাদি, পৃঃ ১৯৭-২০৮।

হবে? অপর দিকে, আমাদের এ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে কোনও বিদেশি প্রতিবেশী না থাকার এবং অধিবাসীরা সহজে বশ্য এবং ভীরু হওয়ার ফলে কেবল মাত্র ন্যূনতম সৈন্য সরবরাহের প্রয়োজন হয় বলে কেন বিশেষ করে বঙ্গদেশ তার উদ্বৃত্ত রাজস্বের সুফল ভোগ করতে পারবে না? প্রশ্নটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে কথা উঠতে পারে যে আগেকার কালের রোহিলা, মারাঠা এবং পিণ্ডারিদের আক্রমণের মত অভিযান থেকে রক্ষাকারী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি, পঞ্জাব ও মধ্যভারতে অবস্থানরত সেনাদলের ব্যয়ের নিজস্ব অংশ বঙ্গদেশ কেন বহন করবে না? যদি প্রত্যেকটি প্রদেশের নিজস্ব বিত্ত সম্পর্কিত পদ্ধতি রাখার কথা ওঠে তবে এই প্রশ্নগুলির সমাধান প্রয়োজন।'[১]

তাঁর মতে প্রশ্নগুলির সমাধান অসম্ভব ছিল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদপন্থীরা এর চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে যুক্তি দেখান যে, ব্যয় ও রাজস্বকে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ভাবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা ও স্থানীয়করণ করা সম্ভব হলেও, সেটা করা অযৌক্তিক হবে। বিত্ত সম্পর্কিত বর্তমান পদ্ধতির অধীনে, তাঁরা এই অভিমত পোষণ করেছিলেন যে—

'সমগ্র ভারতের আর্থিক সম্পদের বিন্যাস করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার ঐ সম্পদগুলিকে দ্রুত সেই স্থানে পৌঁছে দিতে পারে যেখানে তার আবশ্যকতা সবচেয়ে বেশি। কতকগুলি লক্ষ্যমাত্রা আছে যেগুলির প্রকৃত জাতীয় গুরুত্ব আছে, যদিও সেগুলি কোনও এক বিশেষ জেলার বিশেষ ভাবে হিতকর মনে হতে পারে। কোনও বিশেষ জেলার অনিষ্টকর বস্তু, প্রয়োজনীয়তা এবং বিপদ থাকতে পারে যা সমগ্র দেশের দায়িত্ব সংশোধন করা এবং প্রতিকার করা সর্বোচ্চ সরকারের কর্তব্য। একটি অংশের সৃষ্টি বা উন্নতিসাধন করার ব্যাপার সম্বন্ধে জাতীয় গুরুত্ব থাকতে পারে, যদিও তার জন্য ব্যয় করাটা কোনও এক বিশেষ এলাকার পক্ষে অন্যায়ভাবে হিতকারী হতে পারে। একটি তুলা-জেলা বা কফি-জেলা বা চা-জেলা থেকে সড়ক, খাল, রেলপথ করার বিশেষ তাৎপর্য থাকতে পারে ভারতের সমগ্র জনগণও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে। তৎসত্ত্বেও যে ঐ ধরনের কাজের জন্য ব্যয় সেই জেলার বর্তমান রাজস্বের অনুপাত বহির্ভূতও হতে পারে, যার মূল লক্ষ্য তার উন্নতি বিধান করা অথবা নৈতিক এবং সামাজিক উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ সরকার। সম্প্রতি বিজিত বর্বর অথবা অসন্তুষ্ট প্রদেশগুলির জন্য ঐ প্রদেশগুলির পক্ষে ন্যায্যতা প্রমাণ করা রাজস্বের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন মনে করতে পারে গণ্ডগোল

১) সংক্ষিপ্তসার, তারিখ ২২ নভেম্বর ১৮৬৭, তদেব পৃষ্ঠা ১০৪-৭।

অথবা বিপদের কারণগুলি অপসারিত করার জন্য এবং ঐ প্রদেশগুলিকে দীর্ঘকাল সাপেক্ষ সুমীমাংসিত, শান্তিপূর্ণ অবস্থায় আনীত সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা অংশগুলির সঙ্গে কিছু পরিমাণ সামঞ্জস্য স্থাপনে প্রদেশগুলিকে বাধ্য করতে পারে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পুরাতন প্রদেশগুলি নতুন প্রদেশগুলিকে জয় করবে তারা যা জয় করেছে তাকে সুসভ্য করাটা পুরনোদের অবশ্য কর্তব্য। একটি দেশকে অধিকার করা এবং তারপর তাকে নিজেদের সম্পদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য করার কোনও অধিকার আমাদের নেই। বিজয়ের নিজস্ব কর্তব্যের সঙ্গে কিছু অধিকারও আছে।'

'আমি নির্ভীক ভাবে আপত্তি জানাচ্ছি', লিখেছিলেন মাদ্রাজ পরিষদের সভাপতি 'লর্ড নেপিয়ার মারচিস্টন (Merchiston),' তাদের সেই নীতির বিরুদ্ধে যারা সর্বোচ্চ সরকারের সুযোগ-সুবিধাগুলিকে সীমিত রাখতে চায়, তার আয়ের সীমার মধ্যে এবং যারা এক অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রত্যেক প্রদেশকে তাদের নির্দিষ্ট লাভের অনুপাতে বরাদ্দ অর্থ ভাগ করে দেবে। পক্ষান্তরে, দরিদ্রকে সাহায্যদান করে ধনী। তরুণকে সুরক্ষা দিতে বৃদ্ধের, মন্দকে উন্নত করতে সৎ-এর অবশ্যই সন্তোষলাভ করা উচিত; কারণ তবেই এই ভাবে সকলে ঐক্যবদ্ধ ভারতের মহান কাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারবে। সমগ্র সাম্রাজ্যের বিত্তীয় সম্পদ ভাগ করেই কেন্দ্রীয় সরকার এ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।'[১]

এটা সুস্পষ্ট যে, উপর্যুক্ত যুক্তিতর্ক বা উপদেশগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদপন্থীদের উদ্দেশ্যটিকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারত না। রাজস্ব ও ব্যয়কে সাম্রাজ্যিক ও প্রাদেশিক ভাবে ভাগ করার অসুবিধার উপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও, একথা মেনে নিতেই হবে যে, কাজটি আদৌ তত কঠিন নয় যা সাম্রাজ্যবাদপন্থীরা দেখাতে চাইছে। সামরিক খাতে খরচের বিষয়টি ন্যায্যভাবে ভাগ করার অসুবিধাটি সহজেই দূর করা যায় সমর বিভাগের কেন্দ্রীয়করণ করে এবং তার ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারেকে দিয়ে বহন করিয়ে। ঐ একই ভিত্তিতে যে সব পরিষেবার ব্যয়ভার কোনও এক বিশেষ প্রদেশ বা প্রেসিডেন্সির উপর ন্যস্ত হয়, কিন্তু তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে সমগ্র সাম্রাজ্যের উপকারে লাগে। তবে তা সহজেই কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত হতে পারে। অনুরূপভাবে, বর্তমান রাজস্বের উৎসগুলিকে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে বন্টন করে দেওয়া কার্যত সম্ভব ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজস্বের সেই ধরনের উৎসগুলিকে নিজ অধিকারে ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া যেতে পারত, যার আঞ্চলিকতা একটি প্রেসিডেন্সির সীমা অতিক্রম করে সম্প্রসারিত

---

১) তুলনীয়, তাঁর সংক্ষিপ্তসার। তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, অনুচ্ছেদ-৯, তদেব পৃঃ ১৮৬-৯০।

বা যার সর্বাধিক উৎপাদন নির্ভর করত সারা দেশ জুড়ে তার অভিন্ন প্রশাসনের উপর। যখন অপর দিকে প্রাদেশিক সরকারকে সেই ধরনের উৎসগুলিকে নিজেদের জন্য প্রয়োগ করতে দেওয়া যেতে পারত, যা তাদের আঞ্চলিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বা যার উৎপাদন নির্ভর করত স্থানীয় সতর্ক তদারকির উপর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমদানি রপ্তানির উপর ধার্য শুল্ককে সহজেই কেন্দ্রীয় সম্পদ করা চলত। শুধু যে তাদের প্রয়োগ ব্যাপকতর ছিল তার জন্য নয়। বরং এই কারণে যে তাদের জন্য প্রয়োজন ছিল আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের একটি সাধারণ ও অভিন্ন নীতি। আফিম রাজস্বকে গণ্য করা যেতে পারত রাজস্বের কেন্দ্রীয় উৎস হিসাবে এবং ঐ একই আচরণ অনুমোদন করা যেতে পারত লবণ রাজস্ব সম্বন্ধে। এটা ঠিকই যে রাজস্বের উৎসগুলির পৃথগীকরণ করা ঠিক সেই ভাবে করা কঠিন হত যাতে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সরকারের প্রত্যেকটিকে তাদের উপর বর্তানো ব্যয় মেটানোর পক্ষে পর্যাপ্ত সম্পদ সুনিশ্চিত হতে পারত। প্রদেশগুলি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে বা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রদেশগুলিকে অর্থ দিয়ে তহবিলে কিছুটা সমন্বয়সাধন করা অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারত। কিংবা রাজস্বের বা খরচের পরিভাজনের (Apportionment) ব্যাপারে মোটামুটিভাবে স্বেচ্ছাচারমূলক নীতি গ্রহণের বিষয়টিকে পরিহার করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সামাজিক আয়-ব্যয়কে কেন্দ্রীয় এবং কতিপয় প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে পৃথক করার সমস্যার সঙ্গে জড়িত অসুবিধা ও স্বেচ্ছাচারিতার কথা স্বীকার করে নিলেও, একথা অবশ্যই বলতে হবে যে এটার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব ছিল। সাম্রাজ্যবাদ পন্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ডাকে সাড়া দিয়ে কর্নেল চেজনি এক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন ব্যয়ের বর্তমান খাতগুলিকে সাম্রাজ্যিক ও প্রাদেশিক ভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে। তিনি তাঁর 'ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা' গ্রন্থে বলেছেন:

'সাম্রাজ্যিক ব্যয়ের দফাগুলি, যার জন্য অর্থপ্রদান করা প্রয়োজন হবে, তার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে পড়ছে—(১) স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মচারিবৃন্দ এবং ব্যয় যা রাজ্য সচিব ব্যয়-নির্বাহ করবে;(২) ভারতীয় ঋণের উপর সুদ; (৩) ভারত সরকারের কর্মচারিবৃন্দ; (৪) কূটনৈতিক কর্মচারিবৃন্দ ; (৫) সৈন্যবাহিনী, (৬) সাম্রাজ্যিক পরিষেবা— ডাক-ঘর এবং তার বিভাগ; (৭) রেলপথ পুঁজির উপর সুদের প্রত্যাভূতি (Guarantee); যার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে (৮) অপেক্ষাকৃত দরিদ্র প্রদেশগুলির জন্য সহায়ক অনুদান (Grants in aid)। (যারা বর্তমানে তাদের ব্যয়ভার বহন করে না)।'

এটি এবং অন্যান্য প্রচেষ্টাগুলি সাম্রাজ্যবাদপন্থীদের সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, সাধনযোগ্যতার ব্যাপারে তাদের যুক্তিতর্ক ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলে তারা তাদের যুক্তির চাপ সাধনযোগ্যতার উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল উপযোগিতার উপর।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার উপর আক্রমণ চালানোর ভাল সুযোগ দিয়েছিল উপযোগিতার বিষয়টি। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কি সাম্রাজ্যিক সরকারের মত অত দক্ষ হতে পারে? এর মর্যাদা কি বর্তমান সাম্রাজ্যিক পদ্ধতির মত মহান হতে পারে? এটা অনুমান করে নিতেই হবে যে জনগণ একথা ভাল ভাবেই মনে রেখেছে যে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহীদের হাত থেকে ব্রিটিশদের জন্য দেশটিকে বাঁচিয়েছিল শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা-বিশিষ্ট সাম্রাজ্যিক পদ্ধতি। এই সংগ্রামে সাম্রাজ্যিক পদ্ধতির টিকে থাকার মূল্য যে কত তা প্রমাণিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদপন্থীরা এক নিপুণ কৌশল অবলম্বন করে কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয় এবং তাদের বিবেচনা করতে বলে সারা সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিকে টিকিয়ে রেখেছিল কে? এই বিষয়টির উপর জোর দিতে তারা ভোলে নি যে, যেহেতু বিত্ত সম্পর্কিত সাম্রাজ্যিক পদ্ধতি সাম্রাজ্যের রাজস্ব ও তার খরচপত্রের পরিচালনার নিয়ন্ত্রণ ভার অর্পণ করেছিল সাম্রাজ্যিক সরকারের হাতে তাই শেষোক্ত সরকার, বিদ্রোহের মত জরুরি অবস্থায় প্রতিটি আয়ের উৎসকে প্রবল ভাবে সক্রিয় করতে পেরেছিল। বেরিয়ে যাওয়ার সবকটি পথকে বন্ধ করেছিল এবং তার সকল প্রকারের ব্যয়কে কেন্দ্রীভূত করেছিল বিপদের প্রধান কারণটির ব্যাপারে— অর্থাৎ অতি উৎসাহে যুদ্ধবিগ্রহের বিরুদ্ধাচরণ করতে। তারা দেখিয়েছিল যে, বিত্ত বিষয়ক সাম্রাজ্যিক পদ্ধতি ব্যতিরেকে সাম্রাজ্যিক সরকার হয়তো বাধ্য হত উদাসীন, অনিচ্ছুক, দ্বিধ গ্রস্ত অথবা এমন কি বিরুদ্ধভাবাপন্ন সহযোগীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে। যারা তার সরকারি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিল না বা এর প্রয়োজন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল না। এবং বিলম্ব করা বা অভিযোগ থেকে মুক্তি দেবার জন্য ব্যগ্র ছিল। উপরন্তু তারা প্রমাণ করেছিল যে, বিত্তের সাম্রাজ্যিক পরিচালন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ছিল শুধু সরকারের দক্ষতা বাড়াবার জন্যই নয়। সেই সঙ্গে উচ্চহারে জমার অবস্থাটিও বজায় রাখা। যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, জমা নির্ভর করে রাজস্বের পরিমাণের উপর এবং রাজস্বকে খণ্ড খণ্ড করা জমার হার হ্রাস করা একই জিনিস। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ঐতিহ্যের বিনষ্টিকরণেরও অভিযোগ ছিল, যা তাদের এশীয় সরকারের ব্যাপারে নিজেদের বিধি-নিয়মে সম্মানকে এক উচ্চস্থান দিয়ে রেখেছিল। সাম্রাজ্যবাদপন্থীদের কাছে এটা অকল্পনীয় ছিল যে, বিত্তের ব্যাপারে কেন্দ্রীয়করণ না করে কেন্দ্রীয় সরকার তার সম্মান বজায় রাখতে পারবে। কারণ এই সাম্রাজ্যিক বিত্ত পদ্ধতি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রধান প্রধান বিরক্তিকর দায়িত্বগুলি তুলে দিয়েছিল সাম্রাজ্যিক সরকারের হাতে, যাতে ঐ সরকার নীতি নির্ধারিত করতে সমর্থ হয় এবং তা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কার্য করতে পারে। কিন্তু নিজের অধীনস্থ স্থানীয় সরকারগুলির কাছে বৃত্তিভোগী হয়ে উঠলে কে-ই বা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মান

তুলে ধরতে পারবে?

বাদ-প্রতিবাদের প্রারম্ভ থেকে বিচ্ছিন্নতার সুবিধাজনক স্থান থেকে দেখলে আশ্চর্য হতে হয় যে, উপযোগিতার বিষয়টির স্বপক্ষে যুক্তিতে কী এমন শক্তি ছিল যে সাম্রাজ্যবাদপন্থীরা অতি সহজে জয় লাভ করেছিল যুক্তরাষ্ট্রপন্থীদের বিরুদ্ধে। আমেরিকা, জার্মানি বা অন্যত্র যে ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বিদ্যমান ছিল তা এই মতবাদটিকে সমর্থন করে না যে, ঐ ধরনের সরকারের কর্মপদ্ধতিতে দক্ষতা, কৃতিত্ব বা সম্মানের হানি হয়। এইসব হতাশাজনক ভবিষদ্বাণীগুলিকে ঐ দেশগুলির ইতিহাস মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, ভারতে যখন এই বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্রবাদের ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠাই ফাঁকা ছিল। কারণ যুক্তরাষ্ট্রবাদ তখন ছিল তার শৈশবাবস্থায়। জনগণ অবশ্য সাম্রাজ্যবাদপন্থীদের পক্ষ নিল, তাদের যুক্তির স্বপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রবাদের ইতিহাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে না পারার জন্য নয়। বরং এই কারণে যে, তখনকার ঘটনাবলি তাদের মধ্যে প্রবণতা এনে দিয়েছিল সাম্রাজ্যিক পদ্ধতিকে সমর্থন করতে। সাম্রাজ্যিক পদ্ধতি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কবল থেকে ভারতকে বাঁচিয়েছিল। তার পুনরাবৃত্তি সম্পর্কিত ভীতি তখনও প্রশমিত না হওয়ায় সেই প্রশাসন যন্ত্রের সংহতি নষ্ট করার ব্যাপারে তাদের সম্মতি অত শীঘ্র পাওয়ার আশা করা ঠিক না যা সদ্য সদ্য তাদের নিজস্ব ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছিল ঐ গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে। এর দোষত্রুটি সম্বন্ধে তারা সচেতন থাকলেও এ ব্যাপারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে জনগণ পিছিয়ে আসে। সাম্রাজ্যিক পদ্ধতি সম্বন্ধে জনগণের পক্ষপাতিত্ব এতই প্রবল ছিল যে, পদ্ধতিটির দক্ষতা হ্রাস পাওয়া সম্বন্ধে দোষত্রুটিগুলি সম্বন্ধে অবগত থাকা সত্ত্বেও, তারা সহানুভূতির সঙ্গে মাননীয় মেজর জেনারেল স্যার এইচ. এম. ডুরান্ডের বক্তব্য শুনেছিল। যিনি লিখেছিলেন:

'সম্পূর্ণ আস্থা সহ জোর দিয়ে আমি বলছি যে, এই অভিযোগের আদৌ কোনও যুক্তি নেই যে ভারত সরকার বিত্ত সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ কখনই তার প্রচেষ্টায় অনুচিত হয়ে ওঠেনি এবং শোচনীয়ভাবে ব্যর্থও হয় নি...... পক্ষান্তরে, নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনও আংশিক ব্যর্থতা .... নিয়মাবলির দোষত্রুটির আদৌ কোনও প্রমাণ নয়, বরং তাদের শৈথিল্য ছিল অত্যন্ত অবিবেচনা-প্রসূত, এবং সেগুলির আরও কঠোর ভাবে অধীনস্থ করে রাখার ব্যাপারটা ভারত সরকার এবং স্বরাষ্ট্র সরকারের উচিত ছিল বলবৎ করা। নয়টি প্রশাসনের মধ্যে একটি কিছু পরিমাণে পরিচালনার অসাধ্য হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণকে ধ্বংস করা। আমার মতে এমনি একটা বিচক্ষণ পদ্ধতি যেমন যদি কোনও সেনাদল কিছুটা পরিমাণে অসদাচরণ করে, আর সেই কারণে যুদ্ধোপকরণ এবং সর্বাধিনায়কের ক্ষমতা লোপ করা হয় তারই

মতন। এইভাবে ভারত বা সৈন্যবাহিনীর উপর শাসন করার রাজনীতিকে আমি সন্দেহ করার দুঃসাহস রাখি।'[১]

সাম্রাজ্যবাদপন্থীদের জয় হওয়া সত্ত্বেও একথা অবশ্যই বলতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্রপন্থীরা এমন একটা ব্যাপারে হেরে গেল, যেখানে তাদের অবশ্যই জেতা উচিত ছিল। সাম্রাজ্যিক পদ্ধতি টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে যুগের মানসিকতা যত অনুকূলই হোক না কেন তা ঘটনাপ্রবাহকে বাধা দিতে ছিল অক্ষম। যে স্থায়ী অভাবগ্রস্ত অবস্থায় সাম্রাজ্যিক সরকার পতিত হয়েছিল, তা থেকে তাকে মুক্ত করে আনা অত্যন্ত জরুরি ছিল। এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় বিত্ত পদ্ধতিকে যদি রাজনীতিকরা উপায় হিসাবে সমর্থন না করত, তবে অর্থলগ্নীকারীরা শীঘ্রই বুঝে ফেলত যে, সাম্রাজ্যিক বিত্ত পদ্ধতি উদ্দেশ্যপূরণের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ।

১) সংক্ষিপ্তসার, তারিখ ৭ অক্টোবর ১৮৬৭, তদেব, পৃঃ ৯৪-৯৭

অধ্যায়-৩

আপস মীমাংসা

সাম্রাজ্যিক পরিচালনাহীন সাম্রাজ্যিক বিত্ত

যুক্তরাষ্ট্রপন্থীরা সাফল্য না পেলেও, তারা অন্তত তাদের বিরোধীদের ঐ পদ্ধতিটির যে-সব দোষত্রুটি ছিল তার কয়েকটি মৌলিক দোষত্রুটি অপসারিত করে পদ্ধতিটির উন্নতি সাধন করতে পথ দেখাতে পেরেছিল। মনোযোগ প্রধানত পরিচালিত হয়েছিল রাজস্ব সংক্রান্ত আইনগুলির সংশোধন এবং নিয়ন্ত্রণকারী প্রশাসন-যন্ত্রের উন্নতি সাধন করার ব্যাপারে যাতে আরও বেশি রাজস্ব পাওয়া যায় এবং অপচয় অনেক কমে। সাম্রাজ্যিক পদ্ধতিকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন বন্ধ করার জন্য নিপীড়নমূলক করের অবসান ঘটাতে। যা এতকাল জনগণের উন্নতিতে বাধা দিয়ে আসছিল, এবং পরিণামে সরকারেরও। অন্তঃশুল্কের অবসান ঘটানো হয়। বাণিজ্য ও শিল্পের গতিরোধকারী সবরকম বিধিনিষেধ থেকে দেশকে শুধু যে মুক্ত করা হয়েছিল, তা নয়। সেই সঙ্গে অন্তঃশুল্কে সংরক্ষণের বিষয়টি প্রবর্তন করে তাদের ইতিবাচক উৎসাহও দেওয়া হয়েছিল এবং ইংরাজ ও বিদেশি জাহাজে মাল প্রেরণের উপর শুল্কের হার সমান করে বাণিজ্যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। রপ্তানির দ্রব্যগুলিকেও রপ্তানি শুল্কের প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং চাষবাস ও তুলা, চা এবং অন্যান্য প্রধান পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে উন্নতি করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, ইউরোপ ও অন্যত্র যেগুলির খুব ভাল বাজার ছিল।

এর পর সংশোধনের আওতায় আনা হয় প্রশাসন যন্ত্রকে। ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের সুবিধা গ্রহণ করে রাজপ্রতিনিধিকে (Viceroy) ক্ষমতা দেওয়া হয় 'তাঁর পরিষদে ব্যবসায়িক লেনদেন আরও সুবিধাজনক করার জন্য মাঝে মাঝে নিয়ম ও নির্দেশাবলি রচনা করার' সেই পদ্ধতিটির বৈধভাবে অবসান ঘটানোর জন্য যার

অধীনে সমগ্র পরিষদের যৌথ ভাবে অংশগ্রহণ করার কথা সরকারের সব রকম কাজ চালাতে গিয়ে প্রশাসনের পৃথক বিভাগের দায়িত্ব পরিষদের এক একজন সদস্যের উপর ন্যস্ত করে; এইভাবে পরিষদ কার্যত পরিণত হয়েছিল এক মন্ত্রিপরিষদে, যার শীর্ষে ছিলেন বড়লাট। এই ভাবে এক প্রধান অর্থমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হয়েছিল, যে-পদে নিযুক্ত হন বিখ্যাত রাজস্বাধ্যক্ষ মি. জেমস উইলসন। রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসন যন্ত্রের উন্নতি সাধনের ব্যাপারে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় মি. উইলসনের। ভারতে হিসাব রক্ষার একটি অভিন্ন পদ্ধতি, অসামরিক ও সামরিক আয়-ব্যয় পরীক্ষার কেন্দ্রীয়-করণ এবং একটি উপযোজন আয়-ব্যয়কের প্রবর্তন করার জন্য সঙ্গত কারণেই কৃতিত্বের তিনিই দাবিদার। উন্নত ও দক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে রাজস্ব আইনের উন্নতি সাধন ও অপচয়ের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যয়ের ক্ষেত্রে[১] ছাঁটাইয়ের নীতি এবং আয়-ব্যয়ক ও আয়-ব্যয় পরীক্ষার নিয়মগুলি ছিল।

'এমন ভাবে রচিত যাতে প্রতিটি স্থানীয় সরকারের প্রধান বা প্রশাসনের প্রতিটি শাখাকে অনেক বৃহত্তর (মূল রচনায় এমনই ছিল) অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হবে.... ইতিপূর্বে.... ব্যয়ের ফিরিস্তির পুনর্বিন্যাসে যে অনুমতি দেওয়া হত তার তুলনায়'[২]—

যদি তা ছাঁটাইয়ে পর্যবসিত হয়। মিতব্যয়িতা এত কাঠোরভাবে পালিত হল যে, ১৮৫৪ সালে রাজ্য সচিবের প্রেরিত সরকারি আদেশের দ্বারা সারা দেশে শিক্ষার বিস্তর নীতির অভিষেক হবার অনতিকাল পরেই শিক্ষাখাতে যে কোনও ব্যয় বৃদ্ধি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।[৩]

যত অধ্যবসায় সহকারেই উন্নতিবিধানের প্রচেষ্টাগুলি চালানো হোক না কেন, ভারতের আর্থিক অবস্থা কার্যকর ভাবে উন্নত করতে পারে নি। যাই হোক, ১৮৬০-৬১ সালের বিত্ত সম্পর্কিত তার বিবরণে মি. উইলসন আর্থিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সবকিছু সংক্ষেপে বলতে গিয়ে জানান:

'গত তিন বছরে আমাদের ঘাটতি হয়েছে ৩০, ৫৪৭, ৪৮৮ পাউন্ড; আগামী বছরে আমাদের সম্ভাব্য ঘাটতি হচ্ছে ৬০,০০,০০০ পাউন্ড; আমাদের ঋণের সঙ্গে ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছে ৩৮, ৪১০, ৭৫৫ পাউন্ড।' এই বিরাট ঘাটতি মেটাবার জন্য

---

১) তুলনীয়, বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ১২৬, ১৯ নভেম্বর ১৮৬০ সালের, ক্যালকাটা গেজেটের পরিশিষ্টে প্রকাশিত। তাং ২৪ নভেম্বর ১৮৬০, পৃ: ৩৫

২) তুলনীয়, বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব ১২৬, ১৯ নভেম্বর ১৮৬০ তারিখের, ক্যালকাটা গেজেটের পরিশিষ্টে প্রকাশিত, তাং ২৪ নভেম্বর ১৮৬০, পৃ: ২০

৩) বিজ্ঞপ্তি, ক্যালকাটা গেজেট, ১৪ আগস্ট ১৮৫৮, পৃ: ১৬৪২

মি. উইলসন বাধ্য হয়ে ছিলেন মুদ্রাঙ্কশুল্ক বাড়াতে, বহিঃশুল্ক দ্বিগুণ করতে এবং আয়কর আরোপ করতে, যা এযাবৎকাল পর্যন্ত জনগণের অজ্ঞাত ছিল। এমন কি এই 'তিন ভয়াবহ কর থেকে প্রাপ্ত অর্থও মি. উইলসনের উত্তরসূরী মি. স্যামুয়েল লেইঙ্গকে এক সমৃদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে নি। কারণ তিনিও তাঁর ১৮৬১-২ সালের বিত্তবিষয়ক বিবরণে ঘাটতি মোটামুটি ভাবে বহন করার জন্য ৫,০০,০০০ পাউন্ড চেয়েছিলেন এবং সামান্য উদ্বৃত্ত নিয়ে স্বচ্ছন্দে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মি. লেইঙ্গের কাছ থেকে ১৮৬৬ সালে কর্মভার গ্রহণ করে মি: ম্যাসি।

'সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা এবং তার উৎসগুলির উপর ক্রমবর্ধমান দাবিগুলির সমীক্ষা চালিয়ে ..... বর্তমান রাজস্বের সঙ্গে স্থায়ীভাবে কমপক্ষে দশ লক্ষ পাউন্ড যুক্ত করার ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন'।[১]

একের পর এক বিত্ত মন্ত্রীদের প্রচেষ্টাগুলি কেন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি তা প্রধানত এই ঘটনার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় যে, দেশের প্রশাসনিক ও জনগণের দাবিগুলি মাত্রা ছাড়িয়ে বেড়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের পর—

'হাজার হাজার ইংরেজ, শুধু সৈনিক নয়, প্রায় সব শ্রেণীর ইংরেজ দলে দলে ভারতে এসেছিল। দশ হাজার জিনিসপত্রের প্রয়োজন ছিল, যা ভারতের ছিল না। এবং সেগুলি সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছিল। দেশকে রেলপথ, তারবার্তা যন্ত্র, পথ ও রাস্তা দিয়ে ছেয়ে ফেলা (দরকার ছিল)। জনগণকে অপবাদের হাত থেকে রক্ষা করার খাল তৈরি করা (প্রয়োজন ছিল)। বিশাল ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য সেনানিবাস তৈরি করা (প্রয়োজন ছিল) এবং সেনাদলের সুবিধার্থে সবরকমের স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ক ব্যবস্থা করা (আবশ্যক ছিল)। এটা শুধু সাম্রাজ্যিক সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির সম্বন্ধেই সত্য ছিল তা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর উন্নত বিধানের দাবির যে ছাপগুলি পড়েছিল অনুরূপ দাবি উদ্ভূত হয়েছিল প্রতিটি শহরে এবং স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিটি জেলায়। উন্নত প্রশাসনের দাবিগুলিও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। সারা ভারতে পুলিশি ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক অবস্থায়। ..... এবং দেশীয় বিচারক ও আদালতে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত অধীনস্থ আধিকারিকদের প্রদত্ত বেতনের অপ্রতুলতাকে রাজপ্রতিনিধি থাকাকালীন লর্ড লরেন্স সরকারি কলঙ্ক বলে ঘোষণা করেছিলেন। বঙ্গদেশ প্রেসিডেন্সিতে চার হাজারেরও বেশি এই সব আধিকারিকদের মধ্যে,সার্বোচ্চ বেতন-ভোগীরা এবং এদের সংখ্যা

১) স্থানীয় সরকারগুলিকে লিখিত পরিপত্র (Circular letter), তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৬।

খুবই কম, বছরে বেতন পেত ১৮০ পাউন্ড। এদের মধ্যে অধিকাংশই বছরে ১২ থেকে ২৪ পাউন্ড কম পেত ভারতের বহুঅংশে সাধারণ রাজমিস্ত্রি ও ছুতার মিস্ত্রির উপার্জনের চেয়ে। এইসব কিছুকে এক সম্পূর্ণ নতুন অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করা অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল।'[১]

এইভাবে যখন খরচের প্রয়োজন ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তখন ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অর্জন করা দুরূহ হয়ে উঠেছিল। গোড়ার দিকে তুলনামূলক ভাবে সহজ মনে হলেও মিতব্যয়িতা সংক্রান্ত পর পর যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল তার প্রতিটি সরাসরি। সেই সঙ্গে আপেক্ষিক ভাবে, তার পূর্ববর্তী ব্যবস্থার চেয়ে বেশি কষ্টসাধ্য ছিল। এযাবৎ কাল পর্যন্ত অবহেলিত উন্নতির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনগুলি এবং মিতব্যয়িতার সংকুচিত হয়ে আসা সম্ভাবনাগুলি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে চাপ দিয়েছিল করের হার ক্রমশ বাড়াবার জন্য। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানকারী বস্তুগুলি পাওয়ার ব্যাপারে অনাগ্রহী, বিশেষ করে বিনিময়ে পেতে আরও বেশি অনাগ্রহী জনগণের এক বিদেশি সরকার কর্তৃক কর বৃদ্ধি করার বিপদগুলি তিনজন বিখ্যাত রাজস্বাধক্ষ্যের মনে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেছিল। যাঁদের ইংল্যান্ড থেকে একের পর এক পাঠানো হয়েছিল ভারতের আর্থিক অবস্থাকে এক সুদৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, উন্নত প্রশাসন এবং উন্নত বৈষয়িক ও নৈতিক পরিবেশের দাবির জন্য সীমারেখা নির্দিষ্ট না করা হলে, যার প্রত্যক্ষ সুবিধাগুলি দেশীয় অধিবাসীদের তুলনায় ইউরোপীয়রা বেশি উপভোগ করত। করের হার যত বেশিই হোক না কেন, আর্থিক দিক দিয়ে সক্ষম হবার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক স্থায়িত্বের পক্ষেও তা বিপদজনক। নিষ্ফলা অভিন্নতা এবং লোক দেখানো কেন্দ্রীয়করণের বর্তমান পদ্ধতির অধীনে তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়া প্রায়ই অসম্ভব বিবেচিত হয়েছিল। স্থানীয় সরকারগুলি, কেবলমাত্র যাদের উপরই কেন্দ্রীয় সরকার মিতব্যয়িতার জন্য নির্ভর করতে পারত। সেই সরকারগুলি বড় জোর আর্থিক বিষয়ে নজরদারি ও সংস্কার সাধনের ব্যাপারে শুধু যে নিস্পৃহ ও অলসভাবে ঐ সরকারকে সমর্থন করত তা নয়। বরং প্রায়ই এক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রদর্শন করত এবং এমন কি মিতব্যয়িতার পক্ষে সহায়ক আইনগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টিকেও সমর্থন করত। নিজেদের কর্মপন্থায় স্থানীয় সরকারগুলিকে মিতব্যয়ী করার একমাত্র পথ ছিল নিজেদের কাজকর্ম চালানোর ব্যাপারে

---

১) স্যার জন স্ট্র্যাচির লেখা 'ভারতীয় বিত্ত সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে মন্তব্য' প্রতিবেদন থেকে কিছুটা পরিবর্তন সহ নিছক সাহিত্যিক মূল্যবোধে উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের লোকসভা, প্রতিবেদন নং ৩২৬, ১৮৭৪ সালের।

তাদের ক্ষমতাও দায়িত্ব দেওয়া। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার ব্যাপারে রাজস্বাধ্যক্ষরা দেখেছিলেন যে, রাজস্বের ও ব্যয়ের কতকগুলি শাখা প্রকৃত পক্ষে সাম্রাজিক হলেও, উভয়ের জন্যই এক বিস্তৃত ক্ষেত্র ছিল, যা প্রকৃত অর্থে চরিত্র বৈশিষ্ট্যে স্থানীয় এবং সেগুলিকে স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ব্যয় সংকোচের কোনও নির্দিষ্ট মান ততক্ষণ থাকতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত স্থানীয় সরকারগুলির প্রয়োজনগুলিকে পূর্ণ মাত্রায় পরিচিত মাধ্যমগুলির উপর নির্ভর করতে দেওয়া না হয় এবং তাঁদের মনে হয়েছিল যে যতক্ষণ না পর্যন্ত স্থানীয় সরকারগুলির ব্যবহারার্থে সাম্রাজ্যিক তহবিল থেকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণের পৃথক তহবিল কেটে নিয়ে তাদের খরচের জন্য দেওয়া হচ্ছে এবং নিজেদের আর্থিক ব্যাপারে ভারসাম্য বজায় রাখা ও নিজেদের চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের খরচের জন্য লব্ধ উপকরণগুলি সম্বন্ধে স্থানীয় সরকারগুলিকে না জানানো পর্যন্ত কোনও সুফলই লাভ করা যাবে না।

এই ভাবে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রপন্থীদের সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন। যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদপন্থীদের কাছে পরিকল্পনাটি গ্রহণযোগ্য করার জন্য তাঁরা পরিকল্পনাটিকে কার্যকর করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে কোনও আপস মীমাংসায় না গিয়ে কিছু সুবিধা দেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার জন্য ভারতে সরকারি পদ্ধতির নিয়মতন্ত্রে একটি পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। এর জন্য প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল কেন্দ্রীয় ও কতিপয় প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্ব ও ব্যয়ের একটি **বৈধ** বিভাজন। যখন সাম্রাজ্যবাদপন্থীসহ সকলেই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মধ্যে আর্থিক দায়িত্ব ও মিতব্যয়িতা বলবৎ করার জন্য এক শক্তিশালী উপায়কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তখন এর বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি উঠেছিল যে কারণে তা হল এই যে, এই পরিকল্পনা চাইছে কেন্দ্রীয় সরকারকে **বৈধভাবে ও স্থায়ীভাবে** ভারতের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে। ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদদের মত এই রাজস্বাধক্ষ্যরা অবিলম্বে আবিষ্কার করলেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার এই ক্রটিটি পরিহার করবে বিষয়টিকে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাজকর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকার জন্য তাঁরা দেখলেন যে এর জন্য নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তনের সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই। প্রচলিত প্রথাকেই প্রকৃতপক্ষে আইন বলে গণ্য করা হয় এবং একবার তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে কদাচিৎ তা পাল্টানো যায় বিনা বাধায়। তাই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ব্যয় ও রাজস্বের পৃথগীকরণকে প্রচলিত প্রথা হিসাবে চিহ্নিত করার প্রস্তাব হয়েছিল এবং এর সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ যতক্ষণ তা লাভজনক বলে পরিগণিত হবে ততক্ষণ তা বজায় রাখবে। এর ফলে ভারতের সম্পদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আইনত বাদ না দিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সবকটি সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেল। চরিত্রগত ভাবে এটা ছিল নিয়মতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ ও নিয়মতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রবাদের মধ্যে একধরনের আপস-মীমাংসা। এর অর্থ দাঁড়িয়েছিল এই যে, সাম্রাজ্যিক পরিচালনাবিহীন সাম্রাজ্যিক বিত্ত। ঐ আপস-মীমাংসা অনুসারে রাজস্ব ও ব্যয় ইত্যাদি তাদের মর্যাদায় সাম্রাজ্যিকই থেকে গেল। কিন্তু তাদের পরিচালন ব্যবস্থার প্রাদেশীকরণ হয়ে গেল, যাতে প্রতিটি প্রাদেশিক সরকার তার অঞ্চলের মধ্যে খরচ করা সাম্রাজ্যিক ব্যয়ের একটা অংশ পরিচালনা করবে তারই অঞ্চলের মধ্যে সংগৃহীত সাম্রাজ্যিক রাজস্বের একটা অংশের মধ্যে সীমিত রেখে। এটাই ছিল নতুন পরিকল্পনার সারমর্ম। প্রশাসনের একটি অংশের নির্ধারিত কাজ কর্মগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অর্থে না জড়িয়ে ভারতীয় বিত্ত সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ, উপদেশদান ও আইনগত ভাবে সমন্বয় সাধন করার কর্তৃত্বাধিকার সাম্রাজ্যিক সরকারের অধিকারে রাখার ব্যাপারেই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে এর পার্থক্য।

উপরে বর্ণিত পরিকল্পনার সারমর্মে তিনজন বিত্ত মন্ত্রীই, যাঁদের ডাকা হয়েছিল পুনর্গঠনের দায়িত্ব নিতে, তাঁরা রাজি হয়েছিলেন। তবে তাঁরা কী মাত্রায় তা কার্যকর করা হবে সে ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন । মি: উইলসন তাঁর পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গগুলি বিশদে ব্যাখ্যা করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে চিন্তাটা যে তাঁর মাথায় এসেছিল, সে ব্যাপারে দ্বিমত নেই। তাঁর চাপানো ১৮৬০ সালের ৩২ নং আয়কর :

‘পরিকল্পিত হয়েছিল দুটি ভাগ বিশিষ্ট হতে-প্রথম, পরিবর্তনযোগ্যকর। মূলত নির্ধারিত হয়েছিল আয়ের উপর ৩ শতাংশ হিসাবে, সাম্রাজ্যের সাধারণ প্রয়োজনানুসারে যে শতকরা হারটি বাড়ানো কমানো যেতে পারবে এবং আর্থিক অবস্থা যদি কখনও অনুমতি দেয় তবে তা একেবারেই মুকুব করা যাবে। দ্বিতীয়ত, ১ শতাংশ হারে স্থায়ী কর, যা আয়ত্তাধীনে থাকবে স্থানীয় সরকারের এবং যা খরচ করা হবে পথ, খাল ও অন্যান্য পুনরুৎপাদী বাস্তু কর্মে, সেই এলাকার মধ্যে যা কর দেয় (দ্রষ্টব্য আইনটির ১৯০ থেকে ১৯৪ নং ধারা)। করের এই অংশটি মকুব করার কোনও অভিপ্রায়ই ছিল না। তা সব সময়েই বজায় রাখা হবে, যে ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য শুধু তার খরচ বহন করার জন্যই নয়, সেই সঙ্গে কর আদায় করার ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্যও, যাতে জরুরি প্রয়োজনের মুহূর্তে, করের অন্য অংশটিকে সাময়িকভাবে ছাড় দিয়ে। সাধারণ অর্থব্যবস্থার সাহায্যার্থে প্রযোজ্য, এটা আবার আরোপ করা যেতে পারে বিক্ষোভ, আলোচনা বা ঝঞ্ঝাট ছাড়াই’।[১]

১) স্যার বি. ফ্রেরে-র কৃত সংক্ষিপ্তসার। তারিখ ২৫ নভেম্বর, ১৮৬৬, অনুচ্ছেদ ৩০, স্থানীয় সরকারগুলির বিত্তীয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রবন্ধ ইত্যাদি, পৃ: ৪২।

কিন্তু নিজের ভাবনা-চিন্তাকে একটি প্রকল্পে সম্প্রসারিত করার জন্য পর্যাপ্ত সময়কাল পর্যন্ত মি: উইলসন জীবিত না থাকার কারণে, একথা বলা দুষ্কর যে, সেগুলি ব্যবহারিক ভাবে কতটা কার্যকর করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল।

মি: উইলসনের উত্তরসূরী মি: লেইঙ্গ এটাকে অনেক বেশি পরিমাণে একটি নির্দিষ্ট রূপদান করেন। তাঁর ১৮৬১-২ সালের আয়-ব্যয়কটি ছিল প্রয়োজনীয় বাস্তুকর্মের জন্য স্থানীয় সরকার গুলির জরুরি চাহিদার ফলে উদ্ভূত ঘাটতি-বিশিষ্ট এবং আর্থিক নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁর বাস্তববুদ্ধি তাঁকে বাধ্য করেছিল—

'পথ, খাল ও ঐ জাতীয় অন্যান্য হিতকর কাজকর্ম ছাঁটাই করতে, যে বরাদ্দগুলির ভিত্তিতে সেগুলি কার্যকর করা (হয়েছিল) অথবা অন্যথায় .... বঞ্চিত ছিল, বিদ্রোহের সময় থেকে।'

কিন্তু হিতকর বাস্তুকর্মগুলির উন্নতির জন্য তাঁর উদ্বেগ, যার জরুরি প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণমাত্রায় অবগত ছিলেন, তাঁকে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এই প্রস্তাব দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের যে সামান্য সাম্রাজ্যিক অনুদান দেওয়া হত, তা সম্পূর্ণ করার পদ্ধতি দেখতে। তিনি তাদের বলেছিলেন :

'আমরা তোমাদের যা দিতে সমর্থ তোমরা তাই নাও, এবং বাকি অংশের জন্য কর আরোপ করার কিছু ক্ষমতা নাও এবং নিজেরাই তা সংগ্রহ কর.... কারণ এমন কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলি সাম্রাজ্যিক করের অধীনে আনার চেয়ে স্থানীয় সরকারগুলি আরও ভালভাবে ব্যবহার করতে পারবে .....।'

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় আয়-ব্যয়ককে এমন ভাবে বিধিবদ্ধ করতে যাতে তা 'শুধু সাময়িক অসুবিধার মেকাবিলা করবে না। সেই সঙ্গে স্থায়ী উন্নতিরও সূচনা করবে' সাম্রাজ্যিক কোষাগারকে কিছুটা ভার মুক্ত করতে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির উপকার করতে।

সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যিক রাজস্বের বরাদ্দ ও পরিপূরক হিসাবে কর ধার্য করার ক্ষমতা সহ প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক বাস্তুকর্ম সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিচালনার এই প্রকল্পটি সকলের অনুমোদন সুনিশ্চিত করেছিল। কিন্তু প্রকল্পটি যখন পেশ করা হল, তখন প্রস্তাবিত কর আরোপ করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা কার্যকর করার মত প্রয়োজনীয় প্রশাসন যন্ত্র স্থানীয় সরকারের ছিল না। অতএব প্রকল্পটি কার্যকরের বিষয়টি স্থগিত রাখা হল যতদিন পর্যন্ত স্থানীয় বিধান পরিষদের দ্বারা আইন প্রণয়নের ব্যাপারটি মুলতুবি থাকবে, যা সেই সময় পার্লামেন্ট নিজের দায়িত্বে

রেখেছিল। কিন্তু তার পরবর্তী বছরগুলি আর্থিক সমৃদ্ধির বছর হওয়ায়, প্রকল্পটি সম্বন্ধে আগ্রহ শিথিল হয়ে যায় এবং পরিণামে তা **অনির্দিষ্টকালের** জন্য পরিত্যক্ত হয়েছিল।

সমৃদ্ধির এই স্বল্পস্থায়ী সময়টি অবশ্য কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী পর্ব বলে প্রমাণিত হল এবং দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা ফিরে আসার চাপটি যে ভাবে মি: ম্যাসিকে ঘিরে ধরেছিল যার জন্য তিনি বাধ্য হয়েছিলেন প্রকল্পটিকে আরও বড় আকারে পুনরায় সক্রিয় করতে।[১] তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে:

'অতিরিক্ত (দশলক্ষ পাউণ্ডের) পরিমাণ অর্থ কী ভাবে সংগৃহীত হবে তার উপায় উপকরণগুলি সম্বন্ধ বিচার বিবেচনা করতে গিয়ে...... অগ্রসর হবার সবচেয়ে সুবিধাজনক প্রণালী হবে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যয়গুলির আংশিক হস্তান্তর করতে হবে সাম্রাজ্যিক থেকে স্থানীয় খাতে।'

ভারতে স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে প্রযোজ্য স্থানীয় অর্থ-তহবিলের বার্ষিক উৎপন্ন আয় যেহেতু ২০ লক্ষ পাউন্ডের খুব একটা বেশি মাত্রায় অতিক্রম করে নি, তাই এই প্রায় ১২,০০,০০০ পাউন্ড পরিমাণ অর্থের সঙ্গে মাঝামাঝি ধরনের সংযোজনের প্রস্তাব হয়েছিল, যা কয়েকটি প্রেসিডেন্সি ও স্থানীয় সরকার থেকে আনুপাতিক হারে কর নির্ধারণের দ্বারা সংগৃহীত হবে, এবং তা স্থানীয় পরিষেবাগুলির জন্য অনুরূপ ব্যয়ের পরিমাণে সাহায্যার্থে প্রযোজ্য হবে, যার ভার তখন পর্যন্ত বহন করত সাম্রাজ্যিক রাজস্ব। উপরোক্ত ১২,০০,০০০ পাউন্ড পরিমাণ অর্থের অংশে উপনীত হওয়া গিয়েছিল কয়েকটি স্থানীয় সরকারের (ব্রহ্মদেশ বাদে) অনুমিত রাজস্বের উপর ৪ শতাংশ হারে কর নিরূপণ করে চলতি বছরের জন্য বহিঃশুল্ক ও আয়কর বাদ দিয়ে।[২] নতুন তহবিল থেকে প্রাপ্ত আয় প্রযোজ্য হবার ছিল যে খরচের খাত গুলিতে তা হল (১) শিক্ষা, (২) পুলিশ, (৩) জেলার জেলখানা, (৪) বাস্তুকর্ম, (৫) পথ-ঘাটের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাবিত করের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল (১) ব্যবসা বাণিজ্য ও পেশাগত কর্মের উপর অনুমতিপত্রের কর, (২) গৃহ-কর, (৩) শহরে প্রবেশের দ্বারা দেয় শুল্ক (Octroi Duty), এবং (৪) রাজস্ব দেয় নয় এমন জমির উপর ধার্য উত্তরাধিকার কর। সপরিষদ ভারত সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে, স্থানীয় সরকারগুলিকে স্বাধীনতা দিতে হবে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে ধার্য হবার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী বিশেষ কর

---

১) আধা-সরকারি চিঠি, তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ লিখিত হয়েছিল স্থানীয় সরকারগুলিকে। স্থানীয় সরকারগুলির বিত্তীয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রবন্ধ ইত্যাদি, পৃ: ৬৭।

২) তদেব, অনুচ্ছেদ ৮।

বেছে নেওয়ার যাতে আদায় করার খরচ বাদে মোট প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যেতে পারে এবং তাদের নিজেদের ইচ্ছামত উপরোক্ত পরিষেবাগুলির সবকটির উপর বা তাদের মধ্যে যে কোনওটির উপর উপলব্ধ আয় খরচ করবে।

এই প্রকল্প সম্পর্কে প্রদত্ত স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনগুলির প্রত্যুত্তরগুলির মধ্যে আভাষিত হয়েছিল এই ধরনের ব্যয়ের হস্তান্তর, যা নতুন স্থানীয় করের ভিত্তিতে ব্যয়িত হবে এবং বহনও করা হবে তার সাধনযোগ্যতা সম্বন্ধে সাধারণ ঐকমত্যের বিষয়টি, যদিও ব্যয়ের হস্তান্তর সম্পর্কে এক সাধারণ আপত্তির প্রবণতা দেখা দিয়েছিল একই সঙ্গে রাজস্বের হস্তান্তর না করে। যা দিয়ে এগুলি সম্পর্কিত ব্যয়ভার মেটানো হত। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার স্থানীয় সরকারগুলিকে হস্তান্তরণযোগ্য ব্যয় কমিয়ে ৮,০০,০০০ পাউন্ড করতে রাজি হয়েছিল এবং উক্ত কারণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে উপায় হিসাবে অনুমতিপত্র প্রদান সম্পর্কিত কর তাদের হস্তান্তর করতে রাজি ছিল।[১] যে সাদর অভ্যর্থনা জানানো ও সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা করা হয়েছিল এই প্রকল্পটির তা মি: ম্যাসিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রকল্পটিকে সম্প্রসারিত এবং সংশোধিত করতে। নতুন ও পরিবর্ধিত প্রকল্পটির ব্যাখ্যা[২] করতে গিয়ে মি: ম্যাসি লিখেছিলেন:

'স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে এমন প্রথম দফাভুক্ত ব্যয়গুলির জন্য খরচের সেই সব দফাগুলিকে বেছে নেওয়াটাই ছিল আমার প্রথম লক্ষ্য। যেগুলি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ যোগ্য ছিল, এবং মোটামুটি ভাবে এমন এক পরিমাণ অর্থ প্রদান করা যার পরিচালনা করা কঠিন হবে না। এবং তৎসত্ত্বেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে যা স্থাপিত করবে যে, গৃহীত ব্যবস্থাটির লক্ষ্য ছিল বাস্তবসম্মত হওয়া এবং স্থানীয় সরকারের হাতে অর্থবিষয়ক প্রশাসনের আরও পূর্ণমাত্রায় হস্তান্তরণের দিকে এক কদম এগিয়ে যাওয়া। অসামরিক প্রাক্কলনের (Estimate) ব্যাপারে .... আমার সুস্পষ্ট ভাবে মনে হয় যে, কয়েকটি অনুদানের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ দফাগুলি বেছে নেবার পরিবর্তে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত কয়েকটি পূর্ণ অনুদান অথবা অনুদানের কয়েকটি বিভাগকে হস্তান্তরে উদ্যত সবচেয়ে সুবিধা জনক পদ্ধতি......পরিকল্পনাটিকে গ্রহণ করে.......হিসাবরক্ষার পদ্ধতিতে কোনও চরম পরিবর্তন সম্পর্কিত দাবি জানানো হবে না; এবং যে একমাত্র অদল-বদল করা হবে তা এই যে বিভিন্ন উদ্দেশের জন্য নির্ধারিত অনুদানের কিছু কিছু বিভাগ সরবরাহ

১) পরিপত্র, তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬৭, পূর্বে উল্লিখিত। পৃ: ৬৭।

২) মি: ম্যাসির অনুরোধে কর্নেল আর. স্ট্র্যাচি তার সরকারি ব্যয়ের কয়েকটি বিভাগ সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের হাতে নিয়ন্ত্রণভার হস্তান্তর বিষয়ে টিপ্পনীতে নতুন প্রকল্পটির খসড়া প্রদত্ত হয়েছিল, উক্ত গ্রন্থে, পৃ: ৫১-৬২।

করা হবে বিশিষ্ট পদ্ধতিতে। এই নিয়মটির একমাত্র ব্যতিক্রম.....হল 'বিবিধ' শীর্ষক খাতের, সম্বন্ধে গৃহীত ব্যবস্থা, যে খাতটি....... প্রকৃতপক্ষে খরচাদির একটা বেমানান সংকলন। এর মধ্যে স্থানীয় পরিচালন ব্যবস্থার কাছে হস্তান্তরণের জন্য ধরে রাখা হবে সেই সব দফাগুলিকে, যেগুলিকে সঙ্গত কারণে স্থানীয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে......... এবং অবশিষ্টগুলিকে......... সহজেই খরচের অন্যান্য প্রধান খাতের কয়েকটির অধীনে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়গুলির মধ্যে যেটাকে হস্তান্তরিত করার প্রস্তাব উত্থাপন করা উচিত বলে মনে করি সেটা হল 'আইন ও বিচার-এর অধীনস্থ কারাবিভাগ', যা...... সর্বসাকুল্যে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'নিবন্ধন' এবং 'তলবানা'-র খরচও 'আইন ও বিচার' খাতের অন্তর্ভুক্ত। এই খরচগুলি বহন করা হয় 'আইন ও বিচার' খাতের অধীনে জমা পড়া বিশেষ মাশুল (Fee) থেকে। এই খরচাগুলির বিপরীতে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য 'আইন ও বিচার' শীর্ষক খাতের অধীনে রাজস্ব হস্তান্তর করার প্রস্তাবও করা হয়।...... 'শিক্ষা' খাতের অধীনস্থ 'বিবিধ' খরচগুলি সম্বন্ধেও প্রস্তাব করা হয়েছিল 'শিক্ষা' খাতের অধীনে জমা পড়া রাজস্বের হস্তান্তরের অনুরূপ খাতে হস্তান্তরিত করার। তারপরে আসে 'চিকিৎসা পরিষেবার' অধীনস্থ সমগ্র ব্যয়ের বিষয়টি শুধু 'চিকিৎসা বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ও রাসায়নিক পরীক্ষক' বাদে। 'খাতপত্র লেখার সরঞ্জাম ও ছাপাখানা' শীর্ষক খাতের সমগ্র খরচও গৃহীত হয়েছিল। 'পুলিশ' খাতে স্থানীয় উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা বহন করা ব্যয় হস্তান্তরিত হত, যার মধ্যে রেল পুলিশও অন্তর্ভুক্ত থাকত। এর বিপরীতে 'পুলিশ' খাতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ভারসম্য বজায় রাখা হত। উপরোক্তটি ছাড়া ভূমিরাজস্ব, আয়কর ও অনুমতিপত্র প্রদানের কর আদায়ের জন্য খরচাদির একটি অংশ হস্তান্তরের প্রস্তাব ছিল, যা..... আমার অনুমান ভবিষ্যতে ধার্য হতে পারে। সাধারণ খরচাদি বহন করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন হয়েছিল; যা হস্তান্তরিত করার কথা, এবং আদায় করার খরচের একটা অনুরূপ অংশ হস্তান্তরিত করার উপযুক্ততা আপাতত প্রতীয়মান মনে হয়েছিল। ভূমিরাজস্বের আদায়ের খরচাদি শীর্ষকের অধীনে রাজস্ব পরিমাপন (Survey) বা জমি জরিপও কর নির্ধারণের খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ সেগুলি ছিল ব্যতিক্রমী ও পরিবর্তনশীল, যদিও 'গ্রামীণ আধিকারিকদের ভাতা' খাতের অধীনস্থ খরচাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

'রাজস্বের প্রথম ও প্রধান হস্তান্তর হবে ভূমিরাজস্বের একটা অংশ, যা আমি $^{১}/_{১৬}$ অংশ বা টাকায় এক আনা হারে নির্ধারিত করার প্রস্তাব দিচ্ছি। হস্তান্তরিত করা আদায়ের জন্য খরচের অনুপাতও ঐ হারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে..........

'রাজস্বের পরবর্তী দফা, যা আমি অনুমান করে নিচ্ছি আয়কর ও অনুমতিপত্র

প্রদানের করের এক-চতুর্থাংশ হিসাবে, যা আমাকে সংগ্রহ করতে হবে।[১]

'পরবর্তী প্রস্তাবে সমগ্র আয়কে নিম্নলিখিত খাতে হস্তান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হয়: (১) আইন ও বিচার; (২) পুলিশ, (৩) শিক্ষা, (৪) বিবিধ, বিত্তবিষয়ক দফাগুলি বাদে, এবং সেইসঙ্গে (৫) জলসেচ থেকে প্রাপ্ত আয় বাদে বাস্তুকর্মের অধীনস্থ সকল আয়। বাস্তুকর্মের অধীনস্থ খরচাদির দফাগুলি যে সব খাতে হস্তান্তরিত করার প্রস্তাব হয়েছিল সেগুলি হল (১) পথঘাট, (২) পৌরভবনগুলির মেরামতি, (৩) নতুন ও মেরামতি সহ বিবিধ কর্মগুলি এবং (৪) সাধনযন্ত্র (Fouls) এবং শিল্পশালা (Plants)।'

এই ভাবে বিবর্ধিত পরিকল্পনাটি নানা দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছিল। পরিণামদর্শী সমালোচকদের[২] অনুমোদন আদায় করলেও প্রকল্পটি সাম্রাজ্যবাদপন্থীদের পক্ষে একটু বেশি বৃহদাকারই হয়ে গিয়েছিল। এদের মধ্যে বিখ্যাত দুজন ভারতের ভাইসরয় লর্ড লরেন্স এবং মাদ্রাজের লাটসাহেব লর্ড নেপিয়ার অফ মারচিসটন যেহেতু এর বিরোধিতা করেছিলেন তাই তাঁদের বিরোধিতার ফলে পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হতে ব্যর্থ হল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদপন্থীদের দুর্ভাগ্যবশত এই গোটা দশক ধরে যখন তারা তাদের রোগী— বিত্তসম্পর্কিত সাম্রাজ্যিক পদ্ধতির উপর কোনও রকম শল্য চিকিৎসা করতে দেওয়ার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে এসেছিল, তাই তার স্বাস্থ্যোদ্ধারের কোনও উপসর্গই দেখা দিল না। পক্ষান্তরে, অস্ত্রোপচারে দেরি করায় অসুখ আরও বেড়ে গেল। কর ভারের অবিরাম বৃদ্ধি এবং খরচ হ্রাস করা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড থেকে প্রেরিত ভারতীয় অর্থ ব্যবস্থার তিন মন্ত্রী ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সাল এই দশকের মধ্যে মাত্র তিন বছরের উদ্বৃত্ত দেখাতে পেরে ছিলেন। পক্ষান্তরে, অবিরাম ঘাটতি জনিত অস্বস্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আয়-ব্যয়ক প্রথার বিভ্রান্তিকর ভাঙ্গন ধরা, যে প্রথা রচিত করা

---

১) অংশ ভাগ সম্বন্ধে এই ভাবে হিসাব করতে গিয়ে মিঃ ম্যাসি লিখেছিলেন, 'আয়কর আমি ধরেছি ২ শতাংশ হিসাবে; এবং আমি চিন্তা করে দেখেছি যে ২,০০০ টাকার কম আয়ে এটা থাকবে না। অনুমতিপত্র প্রদানের করাকে আমি ধরে নিয়েছি বাণিজ্যকর হিসাবে যা শুরু হবে বর্তমান সীমা থেকে এবং ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আয়করের সমকক্ষ হবে।

২) স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট ঘোষণা করেছিলেন, ভারতের রাজস্বের সুসংহতি যাতে নড়বড়ে না হয়ে ওঠে তার জন্য আমাদের অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, এবং বেপরোয়া খরচের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। আমাদের এমন এক পদ্ধতি আছে যা ভারতের সুনাম সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে আমি আদৌ বাধা দেব না। এবং কোনও রকম পরিবর্তন আনার ব্যাপারে খুব ধীরে ও সতর্কভাবে এগোব। যাই হোক, আমি আবার বলছি যে মিঃ ম্যাসির প্রস্তাবগুলির নীতিগুলি সম্বন্ধে আমি একমত।—

হ্যানসার্ডের (Hansard) সংসদীয় বিতর্ক, খণ্ড ১৯১, ২৩ এপ্রিল, ১৮৬৮।

হয়েছিল এই দেশের সরকারি অর্থ-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও ব্যয় সংকোচ ঘটাতে। ব্যয় সংকোচের হাতিয়ার হিসাবে এর দক্ষতার কথা না বলাই ভাল, অতিমাত্রায় কেন্দ্রীয়-করণের ফলে আয়-ব্যয়ক প্রথার উপর যে চাপ পড়েছিল তা এমন কি শৃঙ্খলা বজায় রাখার হাতিয়ার হিসাবেও নিষ্ফল মনে হয়েছিল। আর্থ-ব্যবস্থা এক বিশৃঙ্খলতার আবর্তে পতিত হয়েছিল। আয়-ব্যয়ক প্রাক্কলন রচনা করার ব্যাপারে নির্ভুল হবার জন্য বিস্তারিত পরিপত্র (Circular) ও নির্দেশাবলি প্রচার করা সত্ত্বেও এক বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বিত্ত মন্ত্রীদের, যখন প্রাক্কলিত বিশাল মাত্রার উদ্বৃত্ত নিয়ে শুরু করা আয়-ব্যয়ক বিস্ময়কর ভাবে সমাপ্ত হয়েছিল প্রকৃত অর্থে বিশাল অংকের ঘাটতি নিয়ে। প্রাক্কলন থেকে প্রকৃত হিসাবে কতটা ভুল ছিল তা নিম্নলিখিত সারণি থেকে দেখা যাবে:

সরকারি বিত্ত বিষয়ে বিশৃঙ্খলা[১]

বৎসর	প্রাক্কলিত হিসাব ঘাটতি উদ্বৃত্ত পাউন্ড	প্রকৃত হিসাব ঘাটতি উদ্বৃত্ত পাউন্ড
১৮৬৬-৬৭	— ৬৬,৭০০	— ২৩,০৭,৭০০
১৮৬৭-৬৮	১৬,২৮,৫২২	— ৯,২৩,৭২০
১৮৬৮-৬৯	১৮,৯৩,৫০৮	— ২৫,৪২,৮৬১
১৬৬৯-৭০	৪৮,২৬৩	— ১৬,৫০,০০০(প্রাক্)

উপরিউক্ত সারণি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে ১৮৬৮-৬৯ সালের সংশোধিত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে রচিত ১৮৬৮-৯ এবং ১৮৬৯-৭০ সালের প্রাক্কলনগুলির কাছ থেকে

১। ডবলু, ডবলু, হান্টার, লাইফ অফ মেয়ো, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৭-৮

সারণিতে প্রদত্ত প্রকৃত ঘাটতির সংখ্যাতত্ত্বগুলির সঙ্গে ভারত সরকারের অস্থায়ী সচিব মি: চ্যাপমান, এফ. ডি,—এর প্রাপ্ত ও সংখ্যাতত্ত্ব থেকে ভিন্নতর, যা দেওয়া হয়েছিল তার ১৭-৮-১৮৭০ তারিখের বোম্বাই সরকারকে প্রেরিত পরিপত্রে, যাতে শেষোক্তকে লর্ড মেয়োর প্রকল্পের কথা জানানো হয়েছিল। মি: চ্যাপমানের মতে ঘাটতির (প্রকৃত) সংখ্যাতত্ত্ব গুলি নিম্নরূপ:—

১৮৬৬-৬৭ সালে প্রকৃত ঘাটতি ছিল ... ২৫১৭৪৯১ পাউণ্ড

১৮৬৭-৬৮ সালে প্রকৃত ঘাটতি ছিল ... ১,০০৭,৬৯৫ পাউণ্ড

১৮৬৮-৬৯ সালে প্রকৃত ঘাটতি ছিল ... ২,৭৭৪,০৩১ পাউণ্ড

তুলনীয়, উল্লিখিত পরিপত্রের জন্য— স্থানীয় সরকারগুলির বিত্তীয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রবন্ধ ইত্যাদি পৃ: ২৪৩।

যথাক্রমে ১৮,৯৩,৫০৮ পাউন্ড আশা করা হয়েছিল। কিন্তু যখন ১৮৬৮-৬৯ সালের প্রকৃত হিসাব দেখিয়ে দিল যে উদ্বৃত্তের পরিবর্তে প্রচুর ঘাটতি হতে যাচ্ছে, তখন লর্ড মেয়ো, যিনি ইতিমধ্যে ভারতের ভাইসরয় বিভাগ নিয়োজিত হয়েছিলেন, তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মাল যে, যদি এই সব ফলাফলের ভিত্তিতে তার আয়-ব্যয়ক নতুন করে রচনা করেন তবে প্রাক্কলিত উদ্বৃত্তের পরিবর্তে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে প্রকৃত ঘাটতিতে। বিত্ত বিষয়ক এই চমকটি তাঁর আয়-ব্যয়ককে এক বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফেলল, এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি বাধ্য হয়েছিলেন আর্থিক বছরের মধ্যভাগেই ব্যয় সংকোচন এবং অতিরিক্ত কর আরোপ করার অস্বাভাবিক পদ্ধতিকে প্রয়োগ করতে:

যে ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:—

	পাউন্ড
১। অতিরিক্ত কর—	
১। আয়কর বাড়ানো হল ১ থেকে ২$\frac{১}{২}$ শতাংশ	৩,২০,০০০
২। বর্ধিত লবণ-কর (মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে)	১,৮০,০০০
মোট	৫,০০,০০০
২। ব্যয় হ্রাস করা	
১। শিক্ষা	৩,৫০,০০০
২। বাস্তুকর্ম	৮,০০,০০০
মোট	১১,৫০,০০০
প্রাক্কলিত ঘাটতি	১৬,৫০,০০০

সংকট এতই গভীর হয়ে উঠেছিল যে এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেও তিনি তাঁর আয়-ব্যয়ক এক প্রাক্কলিত ১৬,৫০,০০০ পাউন্ডের ঘাটতি দিয়ে শেষ করা ছাড়া আর কিছু করে উঠতে পারেন নি, যা অপরিহার্য হয়ে উঠত যদি না কিছু অপ্রত্যাশিত লাভ হত যেমন আবিসিনীয়া যুদ্ধে সরবরাহ করা সংভারের মূল্য আদায় করা এবং বিপুল পরিমাণের অনাদায়ী হিসাবের সমন্বয় সাধনের দ্বারা। যা তাঁকে সমর্থ করেছিল বিশাল অংকের ঘাটতিকে সামান্য উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত করতে। তাঁর এই প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল লাভে সন্তুষ্ট হয়ে লর্ড মেয়োর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, সাম্রাজ্যিক বিত্ত ব্যবস্থার পদ্ধতিতে এমন খারাপ কিছু আছে এবং তার অবসান ঘটাতে উদ্বেগ তার না থাকলেও, তিনি সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল তা সংশোধন করতে প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্পের অভিষেক করে এক আপস-মীমাংসার মাধ্যমে, যার বিকাশের বিষয়টি এই গবেষণার দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু হিসাবে সন্নিবেশিত হবে।

ভাগ-II

প্রাদেশিক বিত্ত : তার বিকাশ

অধ্যায়-৪

নিয়োগের (Assignments) দ্বারা আয়-ব্যয়ক (Budget)

১৮৭১-৭২ থেকে ১৮৭৬-৭৭

যে আদি কারণগুলির জন্য প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের প্রকল্পটি সূত্রবদ্ধ হয়েছিল, তা এই গবেষণার পূর্ববর্তী অংশে উপস্থাপিত করার পর এবার আমরা প্রকল্পটি যেভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং মাঝে মাঝে তাতে যে-সব পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল সেই প্রকল্পটির গঠন বিন্যাসটিকে পরীক্ষা করা শুরু করব।

নিজ সহজাত বুদ্ধির সন্দেহাতীত প্রত্যয়ের ভিত্তিতে লর্ড মেয়ো সাম্রাজ্যিক সরকারের অদক্ষতা এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলি ও বিত্তীয় ঘাটতির সন্ধান পেয়েছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের প্রবর্তনই ছিল ব্যধির একমাত্র উপযুক্ত চিকিৎসা। কিন্তু একথা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে পরিস্থিতি তখনও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদ ভিত্তিক কারণগুলির দ্বারা, এবং বিষয়গুলির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই ইচ্ছুক, এমন কি আগ্রহী ছিল যে-কোনও উপায়ে পরিস্থিতিকে সহজ করে তোলা, তখন মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি তাই করতে চাইছিল সাম্রাজ্যিক নিয়ন্ত্রণের বিনিময়ে। এমন কি লর্ড মেয়োরও সাম্রাজ্যবাদ ভিত্তিক প্রবণতা ছিল। কিন্তু বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির চাপ তাঁকে বাধ্য করেছিল অদ্যবধি বর্তমান দ্বিধা ও সঙ্কল্পের অভাবের মনোভাবটিকে অগ্রাহ্য করতে, যদিও প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ের গঠন বিন্যাস স্থির করার ব্যাপারে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি ছিল অত্যন্ত মন্থর গতি ও সাবধানতাপূর্ণ।

যে প্রকল্পটি ১৮৭১-৭২ বিত্তীয় বৎসর থেকে প্রকৃত অর্থে প্রবর্তিত হতে শুরু করেছিল তা প্রথমে ভাসাভাসা ভাবে জানানো হয়েছিল ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র

দপ্তরের ১৮৭০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখের পরিপত্রের মাধ্যমে। ব্যয়-সংক্ষেপের নীতির আরও বিশদ ব্যাখ্যা করে, যে নীতির ফলে গোড়ার দিকে পথঘাট সংক্রান্ত অনুদান ১৮৬৯-৭০ সালে নির্ধারিত হয়েছিল ১২,৩৬,০০০ পাউন্ড, যা বছরের শেষ ভাগে কমে দাঁড়িয়েছিল ১০,২১,১৭৮ পাউন্ডে এবং ১৮৭০-৭১ সালের হিসাব অনুযায়ী যা ধরা হয়েছিল ১০,০০,০০০ পাউন্ড এবং তা শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছিল ৭৮৪,৮৩৯ পাউন্ডে, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিবিধ সরকারি উন্নতিবিধানের জন্য ২৯,১১০ পাউন্ড। ঐ পরিপত্র (Circular) প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দিয়েছিল।

"এটা অনুধাবন করতে যে যোগাযোগ ও পথঘাটের জন্য সাম্রাজ্যিক অনুদান যে কমানো হয়েছিল তা বর্তমান আর্থিক চাপের ফলে সাময়িক ভাবে কমানো হয় নি। এটি একটি ইচ্ছাকৃত ভাবে গৃহীত, সাময়িক বিচার-বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া নির্ধারিত নীতির ফলশ্রুতি, এবং আগামী বছর গুলিতে এইসব কাজের জন্য বিশেষ অনুদান বাড়ার পরিবর্তে কমে যাবার সম্ভাবনাই অনেক বেশি। অতএব এটা বিশেষ ভাবে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে যে স্থানীয় উৎসগুলি থেকে অর্থসরবরাহ করার ব্যাপারে একটুও সময় নষ্ট করা উচিত নয়, যে অর্থ প্রয়োজন গড়তে বর্তমান প্রদেশ ও জেলাগুলির পথঘাটের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং যোগাযোগের নতুন লাইন নির্মাণের জন্য যা প্রতিদিন উত্তরোত্তর জরুরি হয়ে উঠছে।"

ভারতের আর্থিক ব্যাপারের পুনর্গঠনের সমগ্র সময়টিতে ভারতীয় অর্থ বিশেষজ্ঞদের আদর্শ ছিল এই যে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে হবে স্থানীয় সম্পদ থেকে। কিন্তু এই মতবাদ যে সেই সময় কালের মধ্যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার স্তর পার হয়ে গিয়েছিল এটা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যেত, কারণ পরিপত্রে বলা হয়েছিল যে ভবিষ্যতে 'সপরিষদ বড়লাট সম্পূর্ণভাবে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন যে, এই নীতিটিকে পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করার উপর তিনি জোর দেবেন।' পরিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত ভারত সরকারের মনোভাবটিকে বহু স্থানীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিল যে অর্থে সেটা নেবার কথা ছিল এবং নিজেদের স্থানীয় সম্পদের উন্নতি সাধনের কাজ শুরু করেছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ভূমি রাজস্বের উপর ৬$^{১}/_{৪}$ শতাংশ

হারে উপকর (Cess) ধার্য হয়েছিল এবং দুই-তৃতীয়াংশ আলাদা করে রাখা হয়েছিল পথঘাট ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য জেলার পথঘাটের জন্য মাদ্রাজ সরকার ১৮৬৬ সালের পুরনো আইন মোতাবেক বার্ষিক খাজনার প্রতি একটাকায় আধ আনা করে উপকর ধার্য করেছিল যা ছিল ভূমি রাজস্বের ৩১/৮ শতাংশের সমান। মাদ্রাজ সরকারের পন্থা অনুসরণ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল বঙ্গদেশ সরকার। এইসব স্থানীয় সরকারদের গৃহীত ব্যবস্থার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে পরিপত্র উত্তর ভারতের, যেমন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, অযোধ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনগুলিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিল ভূমি রাজস্বের উপর ৫ শতাংশ হারে পথ উপকর বাড়ানোর উপযোগিতার বিষয়টি বিবেচনা করতে। এই পদক্ষেপের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল পর্যাপ্ত স্থানীয় রাজস্ব প্রাদেশিক সরকারগুলির আয়ত্তে একবার এসে গেলে পথ-অনুদান সম্পর্কিত সাম্রাজ্যিক কোষাগারের উপর চাপ অনেক কম পড়বে।

এইভাবে পরিপত্রটি প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের একটি অত্যন্ত সামান্য প্রকল্পের কথা চিন্তা করেছিল, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কেবল স্থানীয় সরকারি উন্নতিবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে খরচাদি এবং তা মেটাবার জন্য স্থানীয় সম্পদ থেকে অর্জিত রাজস্ব। কিন্তু এই প্রকল্পটি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আগে ভারত সরকারের আর্থিক অসুবিধাগুলি আরও বড় আকারে সাহায্যের দাবি জানিয়েছিল। অবস্থা তো আগে থাকতেই খারাপ ছিল। তাই আফিম রাজস্বের স্থায়িত্বের উপর আস্থা স্থাপন খুব অল্প পরিমাণই ছিল; এবং যখন ব্যয়ের ব্যাপারে ব্যয় সংকোচ করা হচ্ছিল তখন সরকারি ঋণের উপর সুদ বাবদ খরচ প্রচুর পরিমাণে বাড়তে দেখা গেল। এই ধরনের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ভারত সরকার এযাবৎ কাল পর্যন্ত বর্তমান আয়করের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এর বিরুদ্ধে ধনী শ্রেণীদের শোরগোল বন্ধ করার জন্য। ১০,০০,০০০ পাউন্ডের অতিরিক্ত ঘাটতি মেটাবার উপায়-উপকরণের সম্ভাব্য পদ্ধতি আয়কর হার কমানর ফলে যার উদ্ভব আশা করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে ভারত সরকার আর একটি গোপনীয় পরিপত্র, তারিখ ১৭ আগস্ট, ১৮৭০, প্রকাশ করে, যাতে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কগুলি সম্পর্কিত অভিপ্রেত প্রকল্পটিতে অনেক ব্যাপক সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই পরিপত্রে বলা হয়েছিল যে :

'যদি আয়কর কমাতে হয়, তাহলে সরকারের উপায়-উপকরণগুলি অন্য ভাবে সংগ্রহ অবশ্যই করতে হবে ... বিশেষ করে স্থানীয় সরকারগুলির প্রতিনিধি-সংস্থার মাধ্যমে, এবং কর আরোপের সেই জাতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করে যা প্রতিটি প্রদেশের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এবং জনগণের উপর যার বোঝা হবে ন্যূনতম।'

স্থানীয় সরকার গুলির উপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রশাসনের কয়েকটি বিভাগের খরচের বিষয়গুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া যেগুলি কম-বেশি স্থানীয় চরিত্রের ছিল তৎসহ ১৮৭০-৭১ সালের জন্য সেগুলির জন্য নিট অনুদানে ১০ লক্ষ পাউন্ড কমিয়ে দিয়ে।[১] প্রস্তাব করা হয়েছিল, মোট নিট অনুদানের মধ্যে প্রতিটি প্রদেশের নিট অনুদান যা বহন করেছিল সেই অনুপাতে নানা প্রদেশের মধ্যে এই অর্থ বণ্টন করে দেওয়ার এবং হয় পুনর্বণ্টন, ছাঁটাই বা কর আরোপের দ্বারা ছাঁটাই সম্পর্কিত তাদের নিজ নিজ নির্দ্ধারিত অংশ পূরণ করার স্বাধীনতা দেওয়া।

প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছ থেকে পরিপত্রের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সম্মতি পাবার পর ১৮৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখের বিখ্যাত বিত্ত সম্পর্কিত প্রস্তাব কর্তৃক

---

১) নিট অনুদান বলতে বোঝায় একটি পরিষেবায় মোট ব্যয় থেকে ঐ পরিষেবা থেকে প্রাপ্ত আয় বাদ দেওয়া। গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিশিষ্ট খ-তে কয়েকটি কাজের তফসিল (Schedule) দেওয়া হয়েছে, যার জন্য সাম্রাজ্যিক রাজস্ব থেকে পৃথক অর্থ-তহবিল দেওয়া হবে। সেগুলি হল ভবনাদি এবং নিম্নলিখিত বিভাগগুলির দপ্তর :-

আফিম (কলকাতাস্থ রাজস্ব পর্ষদের দপ্তর অন্তর্ভুক্ত নয়)
টাঁকশাল ও প্রচলিত মুদ্রা
ডাকঘর
টেলিগ্রাফ
সর্বোচ্চ সরকারের দপ্তরগুলি
রাজপ্রতিনিধির (Viceroy) বাসভবন
সাম্রাজ্যিক যাদুঘর
মুদ্রাঙ্ক ও দপ্তরের কাগজপত্রের দপ্তর
কোষাগার ভবন
বিশ্রামের প্রাসাদ, কলকাতা
গোদাবরী কর্মশালা

করাচি বন্দর উন্নয়ন বর্তমানে সাম্রাজ্যিক হিসাবে সংরক্ষিত সেই ধরনের সামরিক সড়ক, যা চালু বছর পর্যন্ত প্রদত্ত হয়েছিল 'সামরিক কাজকর্মের' জন্য অনুদান থেকে।

তা বিত্ত-বর্ষ ১৮৭১-৭২ থেকে প্রবর্তন করার জন্য গৃহীত প্রস্তাবের বিষয়টি ঘোষিত হয়েছিল।

এই প্রস্তাব কর্তৃক রচিত প্রাদেশিক আয় ব্যয়কের গঠনতন্ত্রটিকে বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হবো আমরা। প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের ব্যয়ের দিকটি প্রথমে নেওয়া যাক, দেখা যাবে যে এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল নিম্নলিখিত সাম্রাজ্যিক পরিষেবাগুলির খরচাদি :-

১। কারা বিভাগ

২। নিবন্ধভুক্তকরণ

৩। পুলিশ

৪। শিক্ষা

৫। চিকিৎসাবিষয়ক পরিষেবা (চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানাদি বাদে)

৬। ছাপাখানা

৭। সড়ক

৮। বিবিধ, জন উন্নয়ন

৯। অসামরিক ভবনাদি

নিজেদের আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত উপরোক্ত ব্যয়গুলি বহন করার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্থ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তাদের হাতে সমর্পণ করেছিল সেই সব প্রাপ্ত অর্থ যা ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সাম্রাজ্যিক রাজস্ব থেকে অতিরিক্ত (রাজস্ব) নিয়োগ (assignment) সহ তাদের হাতে তুলে দেওয়া পরিষেবাগুলি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। স্থানীয় সরকারগুলিকে সমর্পণ করা অর্থ ও অনুদান হিসাবে প্রদত্ত নিয়োগগুলি নিম্নরূপ :

প্রাদেশিক সরকারগুলির আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলির জন্য ১৮৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখের বিত্তীয় প্রস্তাব নং ৩৩৩৪ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগগুলি

প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত পরিষেবা	পরিষেবাগুলির জন্য সাম্রাজ্যিক (রাজস্ব) নিয়োগ								
	অযোধ্যা	ম. প্র.	ব্রি. ব্রহ্মদেশ	বঙ্গদেশ	উ.প. প্র.	পঞ্জাব	মাদ্রাজ	বোম্বাই	মোট
	পা.	পা.	পা.	পা.	পা.	পা.	পা.	পা.	পা.
কারা বিভাগ	২৬,৯২২	২৭,৮৮১	৩২,৭৭৭	২১৮,২১০	৮৮,৩৯৪	৫৮,২৫৪	৯১,৯৮৩	৭৩,৪৪০	৬১৭,৮১১
নিবন্ধভুক্ত করণ	...	৩,৫০৯	...	৩৬,৬০৯	২০,১২৯	১১,৬২৩	২২,৯৭০	২৫,৩৭২	১২০,২১২
পুলিশ	১০৩,২৬৯	১৩০,৬০৭	১৩৯,২৫৩	৫৫৫,৭৫৭	৩৪৮,১৩৫	২৮৯,৯৫০	৩৫০,৭৩০	৩৮৮,৭০৩	২,৩০৬,৪০৯
শিক্ষা	২৬,০৫৬	২৭,৮৬৪	১০,৯৯৮	২৩৪,৩৮৫	১০৩,৫২৮	৬৪,৯০৯	৯০,০৫২	১১৮,২৭১	৬৭৬,০৬৩
চিকিৎসা বিষয়ক (চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গুলি বাদে)	৫,০৪৯	১১,৭৭০	৬,৪৬০	৮৯,৭১৩	২৭,৬০৭	২৪,৯৩৫	৬১,৬৯৬	৭৪,৮৫২	৩০২,৫৩২
ছাপাখানা	৭,৬০৯	৩,৬৪০	৩,০০০	৪১,৭৩২	২৫,৩০২	১৪,১০৬	২৫,৮৪০	২৭,০৫০	১৪৮,২৭৯
সড়ক এবং জন উন্নয়ন	৩২,৯০০	৬৩,৪০৩	৬৩,০০০	১৫৭,৮০০	৮২,৬৩৬	৮৪,২০০	১২৩,৮৮০	১২১,৯০০	৭২৯,৮১৯
অসামরিক ভবনাদি	২০,০৯০	১৪,৪০৬	২৩,৯৫৯	১১১,৩৭০	৬৩,৩৪১	৩৯,৭১০	৫৮,৫০৬	১০৭,৫০০	৪৩৬,৮৮২
বাস্তুকর্ম প্রতিষ্ঠানাদি	১৩,৭৭৭	২০,২৩০	২২,৬৩৫	৬৯,৯৮৪	৩৭,৯৫৪	৩২,২১৭	৪৭,৪২১	৫৯,৬৪৪	৩৩৩,৮৬২
সাধনযন্ত্র এবং শিল্পশালা	১,০৬০	১,৫৫৬	১,৭৪১	৫,৩৮৩	২,৯২০	২,৪৭৮	৩,৬৪৮	৪,৫৮৮	২৩,৩৭৪
মোট	২৩৭,১৮২	৩০৪,৮৬৬	৩০৩,৯২৩	১,৫২০,৯৪৩	৭৯৯,৯৪৬	৬২২,৩৩২	৮৭৬,৭২৬	১,০০১,৩২০	৫,৬৬৭,২৪৩

পরিষেবাগুলি থেকে সম্ভাব্য আয়ের হিসাব

কারা বিভাগ	১,৫৭৫	৬,০০০	৯,৪২০	১১০,৩৮৫	১১,১৫৪	...	৭,৩০০	৬৬৪	১৪৬,৪৯৮
নিবন্ধভুক্তকরণ	...	৫,৫০০	...	৪০,০০০	৩৫,০৩০	২০,৬৯৪	৩৪,০০০	৩০,১৪১	১৬৫,৩৫৬
পুলিশ	১০,৫৮৬	১২,৫২০	১৮,৬৭১	৭০,০৬৩	৫১,৭০০	৪১,৭২৪	৩২,৩৫০	১৪,০০০	২৫১,৯৪৪
শিক্ষা	১,৪৮২	...	৫০০	৪২,০১২	১১,০৫০	৫,০০০	৬,৯০০	১৩,৪৮০	৭৭,৪২৪
ছাপাখানা	১,০৮০	...	...	২,০০০	২,১৬০	...	১,২৬০	...	৬,৫০০
মোট	১৪,৭২৩	২৪,০২০	২৮,৫৯১	২৬৪,৭৬০	১১১,১২৪	৬৭,৪১৮	৮১,৮১৩	৫৫,২৮৫	৬৪৭,৭৩১
নিট (রাজস্ব) নিয়োগের সর্বমোটফল	২২২,৪৫৯	২৮৩,৮৪৬	২৭৫,৩৩২	১,২৫৬,১৮৩	৬৮৮,৮২২	৫৫৪,৯১৪	৭৯৪,৯১৬	৯৪৬,০৪০	৫,০১৯,৫১২

১৮৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখের প্রস্তাব প্রদত্ত সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত।

আয়কর হ্রাস করার ফলে অনুমিত ঘাটতি পূরণের জন্য প্রাদেশিক সম্পদগুলি ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে সাহায্য পেতে ভারত সরকার যদি ইচ্ছুক না হত তবে সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলির জন্য খরচাদি বহন করতে এইগুলিই হতে পারত প্রাদেশিক সরকারগুলির মোট (রাজস্ব) নিয়োগ। প্রাথমিক ভাবে সাহায্য দানের যে ১০,০০,০০০ পাউন্ড অর্থ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা কমিয়ে করা হয় ৩,৫০,০০০ পাউন্ড যা বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে যথা ভাগ অনুসারে বণ্টন করা হয়েছিল। এই ছাঁটাইগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করে এই প্রদেশগুলিকে যে স্থায়ী (রাজস্ব) নিয়োগ করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ :-

প্রদেশ	পরবর্তী (রাজস্ব) নিয়োগ	ছাঁটাইয়ের অনুপাত	স্থায়ী (রাজস্ব) নিয়োগ
	পাউণ্ড	পাউন্ড	পাউন্ড
অযোধ্যা	২,২২,৪৫৯	১৫,৫১১	২,০৬,৯৪৮
মধ্যপ্রদেশ	২,৮০,৮৪৬	১৯,৫৮৩	২,৬১,২৬৩
ব্রহ্মদেশ	২,৭৫,৩৩২	১৯,১৯৯	২,৭৫,৩৩২
বঙ্গদেশ	১২,৫৬,১৮৩	৮৭,৫৯১	১১,৬৮,৫৯২
উ: প: প্রদেশ	৬,৮৮,৮২২	৪৮,০৩০	৬,৪০,৭৯২
পঞ্জাব	৫,৫৪,৯১৪	৩৮,৬৯৩	৫,১৬,২২১
মাদ্রাজ	৭,৯৪,৯১৬	৫৫,৪২৮	৭,৩৯,৪৮৮
বোম্বাই	৯,৪৬,০৪০	৬৫,৯৬৫	৮,৮০,০৭৫
মোট	৫০,১৯,৫১২	৩,৫০,০০০	৪৬,৮৮,৭১১

টাকায় রূপান্তরিত করা হলে, ১ পাউন্ড ১০ টাকার সমান

প্রকল্পটিকে কার্যকর করার জন্য নির্ধারিত সময় শুরু হবার আগে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের আয়-ব্যয়কে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পরিষেবাগুলিকে[১] সন্নিবেশিত করে : অসামরিক বিভাগে ভবনাদির ছোট খাট নির্মাণ কার্য এবং মেরামতি খরচাদি, শুধু এইগুলি বাদে বঙ্গদেশের আফিম বিভাগ, বঙ্গদেশের অধস্তন প্রদেশগুলির বাহিরের লবণ বিভাগ ও চিকিৎসা বিষয়ক পরিষেবাগুলি, যেমন প্রেসিডেন্সি শহরগুলির মেডিক্যাল কলেজ ও কেন্দ্রীয় কারাগার ও উন্মাদ আশ্রমের মেডিক্যাল অফিসারদের বেতন; (২) মফস্বলের উন্মাদ আশ্রম এবং কলেজ ও কেন্দ্রীয় কারাগার ইত্যাদির মেডিক্যাল খরচের জন্য মেডিক্যাল আধিকারিকদের প্রদত্ত বাড়তি ভাতা,

১) বিত্ত বিভাগের ১৮৭১ সালের ২০ মার্চ তারিখের প্রস্তাব নং ১৬৫৯।

এবং (৩) সদর স্টেশন অথবা জেলাগুলির অসামরিক মেডিক্যাল খরচ ছাড়া অন্য সব জায়গায় নিযুক্ত অবর সহ-চিকিৎসক (Sub-assistant Surgery) ও ভেষজীদের (Apothecaries) জন্য এবং অপর সকল অধীনস্থ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য খরচাদি। এই হস্তান্তরের পাশাপাশি ভারত সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাদেশিক থেকে সাম্রাজ্যিক আয়-ব্যয়কে[১] প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। সরকারি ডাক-মাসুলের[২] এবং বেঙ্গল পুলিশের[৩] খরচাদির পুনর্সংশোধন. এবং উপরোক্ত পরিষেবাগুলি সম্পর্কে সংযোজন ও প্রত্যাহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে ১৮৭১-৭২ সালের জন্য সাম্রাজ্যিক (রাজস্ব) নিয়োগ আবার পাল্টানো হয় যাতে তা পরবর্তী দুই পৃষ্ঠার সারণিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেই অবস্থায় পৌঁছায়।

১৮৭১-৭২ রাজস্ব বৎসরের জন্য এই (রাজস্ব) নিয়োগগুলি ছাড়া ভারত সরকার স্থানীয় সরকারগুলিকে ১৮৭০-৭১ বৎসরে ২,০০,০০০ পাউন্ডের বিশেষ দান দেয় এইজন্য যে যাতে তারা 'পরিকল্পনাটিকে সাফল্যের সঙ্গে শুরু করতে পারে, এবং ভাল ভাবে সূত্রপাত করার মতন করে পেতে পারে।' এক্ষেত্রে জোড় রাশির সংখ্যা নিয়ে, কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত ব্যয় বহন করার জন্য ১৮৭১-৭২ সালে তাদের আয়ত্তে নিম্নলিখিত সম্পদগুলি ছিল :

প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ক (নিম্নলিখিত প্রদেশগুলির জন্য)	সম্পদ		মোট
	সাম্রাজ্যিক সরকার কর্তৃক সমর্পিত আয়	সাম্রাজ্যিক কোষাগার থেকে (রাজস্ব) নিয়োগ	
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
অযোধ্যা	১৪,৭০০	২,১১,৩০০	২,২৬,০০০
মধ্যপ্রদেশ	২৪,০০০	২,৬৯,৬০০	২,৯৩,০০০
ব্রহ্মদেশ	২৮,৬০০	২,৭৬,৫০০	৩,০৫,১০০
বঙ্গদেশ	২,৬৪,৮০০	১১,৯৭,৯০০	১৪,৬২,৭০০
উ: প: প্রদেশ	১,১০,০০০	৬,৩৫,০০০	৭,৪৫,০০০
পঞ্জাব	৬৭,৪০০	৫,২৮,৮০০	৫,৯৬,২০০
মাদ্রাজ	৮১,৮৯০	৭,৫২,৩০০	৮,৩৪,১০০
বোম্বাই	৫৫,৩০০	৯,০১,২০০	৯,৫৬,৫০০

১) ভারত সরকারকে লেখা সচিবের চিঠি; বিত্ত বিভাগ, সংখ্যা ১৬৮৩, তারিখ ২১ মার্চ; ১৮৭১

২) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ১৬৫৯, তাং ২০ মার্চ, ১৮৭১

৩) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ১৫৮৭, তাং ২০ মার্চ ১৮৭১

সাম্রাজ্যিক (রাজস্ব) নিয়োগ—১৮৭১-৭২[১]

	অযোধ্যা	ম. প্রদেশ	ব্রি. ব্রহ্মদেশ	বঙ্গদেশ	উ.প. প্রদেশ	পঞ্জাব	মাদ্রাজ	বোম্বাই	মোট
	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড
১৮৭০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের প্রস্তাব হিসাবে (রাজস্ব) নিয়োগ	১,৬৯,৩৫৫	২০৫,২৭১	১৯২,৪৮৮	১,১৭৬,৪০৬	৬১৩,০৯৫	৪৬৩,৭২৭	৬৪৩,২৭১	৭০৭,৬৯৩	৪,১৭১,৩০৬
যোগ কর—									
সরকারি ডাক-মাশুল	১,৫৫১	৫,০৯৩	...	৪,৮৯৩	১০,৮৪০	৮,০৩১	৪,১৬৩	৪,৩১১	৩৮,৮৮২
চিকিৎসা পরিষেবা থেকে হস্তান্তরিত অসামরিক									
ভারতের ছোটখাট নির্মাণ	২,১৩৯	১,৭৬৭	৭৪৫	৬,৬৪৯	৫,৬২৪	২,৮২৮	৭,৫৯৭	৮,৫০০	৩৫,৮৪৯
কার্য ও মেরামতির হস্তান্তর	৬,৯৯৯	১,৭৭৮	৪২০	৬,৫০৮	২,৫৫৫	১,৯০৮	১,০০০	৪,০৫০	১৮,৯৬৮
অন্যান্য দফা নিট				৭,৮৬৬	১,৪৮৫	...	...	৪,৬০০	১৩,৭৫৩
					৬৩৩,৫৯৯				৪,২৭৮,৭৫৮
বাদ দাও—									
আজমীর বাবদ খরচ ভারত সরকারকে হস্তান্তরিত	...	...	...	...	২৮,৭১৪	...	...	...	২৮,৭১৪
	১৭৩,৭৪৪	২১৩,৯০৯	১৯৩,৬৫৩	১,২০২,১২৪	৬০৪,৮৮৫	৪৭৬,৪৯৪	৬৫৬,০৮১	৭২৯,১৫৪	৪,২৫০,০৪৪

বাদ দাও—									
১৮৭০-৭১-এর আয়-									
ব্যায়ক বাবদ আয়	১৪,৭২৩	২৪,০২০	২৮,৫৯১	২৬০,৫৭৮	১০৯,৯৯২	৬৭,৪১৮	৮১,৮১০	৫৫,২৮৫	৬৪২,৪১৭
অসামরিক বিভাগে নিট খরচ	১৫৯,০২১	১৮৯,৮৮৯	১৬৫,০৬২	৯৪১,৫৪৬	৪৯৪,৮৯৩	৪০৮,০৭৬	৫৭৪,২৭১	৬৭৩,৮৬৯	৩,৬০৭,৬২৭
১৪-১২-১৮৭০-এর প্রস্তাব									
অনুসারে বাস্তু কর্মের জন্য									
আয়ব্যয়ক অনুদান যোগ কর									
যথা—সড়ক ও বিবিধ জন-	৩২,৯০০	৬৩,৪০৩	৬৩,১০০	১৫৭,৮০০	৮২,৬৩৬	৮৪,২০০	২৩,৮০০	১২১,৯০০	৭২৯,৮১৯
উন্নয়ন অসামরিক ভবনাদি	২০,০৯০	১৪,৪০৬	২৩,৯৫৯	১১১,৩৭০	৬৩,৩৪১	৩৯,৭১০	৫৮,৫০৬	১০৭,৫০০	৪৩৮,৮৮২
বাস্তু কর্ম প্রতিষ্ঠানাদি	১৩,৭৭৭	২০,২৩০	২২,৬৩৫	৬৯,৯৮৪	৩৭,৯৫৪	৩২,২১৭	৪৭,৪২১	৪৯,৬৪৪	৩৩৩,৮৬২
সাধন যন্ত্র ও শিল্পশালা	১,০৬০	১,৫৫৬	১,৭৪১	৫,৩৮৩	২,৯২০	২,৪৭৮	৩,৬৪৮	৪,৫৮৮	২৩,৩৭৪
মোট বাস্তু কর্ম	৬৭,৮২৭	৯৯,৫৯৫	১১১,৪৩৫	৩৪৪,৫৩৭	১৮৬,৮৫১	১৫৮,৬০৫	২৩৩,৪৫৫	২৯৩,৬৩২	১,৪৯৫,৯৩৭
সর্ব মোট	২২৬,৮৪৮	২৮৯,৪৮৪	২৭৬,৪৯৭	১,২৮৬,০৮৩	৬৮১,৭৪৪	৫৬৭,৬৮১	৮০৭,৭২৬	৯৬৭,৫০১	৫,১০৩,৫৬৪
বাদ দাও—									
৩৫০,০০০ পাউণ্ডের									
অনুপাত সংশোধিত স্থায়ী	১৫,৫৫৭	১৯,৮৫৩	...	৮৮,১৯৯	৪৬,৭৫৩	৩৮,৯৩১	৫৫,৩৯৪	৬৬,৩৫১	৩৩১,০৩৮
(রাজস্ব) নিয়োগ	২১১,২৯১	২৬৯,৬৩১	২৭৬,৪৯৭	১,১৯৭,৮৮৪	৬৩৪,৯৯১	৫২৮,৭০০	৭৫২,৩৩২	৯০১,১৫০	৪,৭৭২,৫২৬
অথবা মোট সংখ্যায়	...	...	...	...	...	...	...	...	৪,৭৭২,৬০০
যোগ দাও—ভারত[2]									২৬,৭০০
								মোট	৪,৭৯৯,৩০০

১। ১৮৭১ সালের ২০ মার্চ তারিখের বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ১৬৬০-এর ভিত্তিতে।

২। উপরোক্ত সারণিতে 'ভারত'-এর বিপরীতে উল্লেখিত দফা ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এবং কুগ, আজমীর ও অন্যান্য জেলা যা ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ প্রশাসনে ছিল সেগুলির প্রাদেশিক পরিষেবার (বাস্তু কর্ম বাদে) জন্য—স্যার রিচার্ড টেম্পল-এর বিত্তবিষয়ক বিবরণ ১৮৭১-৭২ সালের জন্য।

প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের গঠনতন্ত্র বিশ্লেষণ করে এবং তার মধ্যে আয় ও ব্যয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আমরা অগ্রসর হব সেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে, যা ১৮৭০-৭১ সালে রচিত তাদের গঠনতন্ত্রকে চিহ্নিত করে রেখেছে। উপরোক্ত উত্থাপিত প্রশ্নটি সম্বন্ধে আরও প্রত্যক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি জানবার আর কি পদ্ধতি হতে পারে নিজেদের কাছে এই প্রশ্নটি না রেখে যে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের রচয়িতারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এবং কী ভাবে তার সমাধা করা হয়েছিল। প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ক পরিকল্পনা করা নিয়ে যে প্রবল বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল তার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থেকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে ব্যয়ের কোন কোন দফা সামিল করতে হবে তা তখনকার মত আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে থাকেনি। সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় চরিত্রের সাম্রাজ্যিক আয়-ব্যয়কে খরচাদি থাকার কথা দীর্ঘকাল আগেই স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছিল, সর্ব সম্মতিতে যেগুলিকে সাম্রাজ্যিক আয়-ব্যয়ের সবচেয়ে অসন্তোষজনক অংশ বলে গণ্য করা হচ্ছিল। সকলেই একথা স্বীকার করেছিল যে এই খরচগুলি সম্বন্ধে আদৌ কোনও কিছু না জেনে ভারত সরকার একটি অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অনুমোদন করতে বাধ্য হয়েছিল, যা অসাবধানতাবশত এক বিভাগের প্রধান কর্তৃক সমর্থিত হয়ে থাকতে পারে যার সরকারি অর্থের অপচয়ের বিরুদ্ধে সতর্ক হবার ব্যাপারে কোনও প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল না, অথবা এলোমেলোভাবে মিতব্যয়িতার অতি সাবধানী মনোভাবের দ্বারা, অথবা সরকারি রাজস্বের অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মিতব্যয়িতার দ্বারা এর অনুমোদন দিতে অস্বীকার করে এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ ও লাভজনক ব্যয়গুলি পরীক্ষা করে। যেহেতু উভয় পদ্ধতিই কুফল ফলাতে পারত। তাই সর্বসম্মতিতে ঠিক হয় যে সেই সব বিষয় যার উপর নিজেদের চূড়ান্ত অজ্ঞতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও রকম নিয়ন্ত্রণ জারি করতে অক্ষম ছিল। সেগুলি সাম্রাজ্যিক সরকারের প্রত্যক্ষ আওতা থেকে হস্তান্তরিত করা উচিত প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্বে। কেবল মাত্র পরিস্থিতির চাপে পড়ে সমস্যার একটা দিকের সমাধান এই ভাবে হয়েছিল। যে বিষয়টির উপর প্রধানত সকলের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল তা ছিল নিজেদের আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত ব্যয়গুলি বহন করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দেবার সমস্যা। সকলকেই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হতে যে সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলি থেকে উদ্ভূত আয়গুলি বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হবে প্রাদেশিক সরকারগুলির দ্বারা। এই ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য দুটি ভাল কারণ দেখানো হয়েছিল। কল্যাণকর বিত্ত ব্যবস্থার আদর্শনীতি হিসাবে এটা নির্দেশিত হয় যে কর-নিয়ন্ত্রণ এবং কর-উপযোজন যতদূর সম্ভব মিশে যাওয়া উচিত। এই নীতির ভিত্তিতে এটাই উপযুক্ত হবে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে তাদের পরিচালনাধীন পরিষেবাগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিজ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়া। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটিকে প্রভাবিত করেছিল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের সূত্রপাত করার পিছনে প্রধান ইচ্ছাটি ছিল বিত্তসংক্রান্ত ব্যাপারে বিচক্ষণ ও মিতব্যয়ী পরিচালনার

জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আগ্রহান্বিত করা এবং এ বিষয়ে তাদের আগ্রহ বজায় রাখার একটি পন্থা হল, তাদের পরিচালিত পরিষেবাগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থ তাদের দেওয়া। এই আয়গুলি প্রাদেশিকীকরণ ব্যয় বহন করার জন্য প্রয়োজনীয় মোট অর্থের তুলনায় এতই কম ছিল যে তৎসত্ত্বেও প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ক গুলির ভারসাম্য বজায় রাখার সমস্যাটি অমীমাংসিতই থেকে গেল। সেই সময় মীমাংসার দুটি সম্ভাব্য অর্থ ছিল ভারত সরকারের সামনে : হয় সাম্রাজ্যিক রাজস্বের কয়েকটি উৎসের প্রাদেশিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হস্তান্তরিত করা নয় তো সাম্রাজ্যিক কোষাগার থেকে এক থোক (রাজস্ব) নিয়োগ প্রদান করা। এক সময়ে দুটির মধ্যে কোনটি বেশি উপযুক্ত তা স্থির করাই ছিল কঠিন, কারণ সে দুটি গুণের দিক দিয়ে যে শুধু অসম ছিল তা নয়, সেগুলি বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পক্ষদের কাছে ভিন্নতর আবেদনও রেখেছিল। প্রাদেশিক সরকারের কাছে রাজস্বের নিয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক সমাদৃত ছিল নির্দিষ্ট নিয়োগের তুলনায় যেহেতু তা থেকে তাদের বিত্ত সম্পর্কে অধিকতর স্থিতিস্থাপকতা উপলব্ধ ছিল। অপর দিকে ভারত সরকারের কাছে রাজস্বের নিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ পরিণামে পরিপূর্ণ বলে মনে করা হত। ভারতের অতীত ও বর্তমানের আর্থিক অবস্থা সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্বের উৎসগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য যে মানসিক সমতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে দখলে রেখেছিল সেগুলি হস্তান্তরিত করার বিষয়টিকে সমর্থন করে নি। অন্য দিকে এর সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থা অতীতের মতই অনিশ্চিত ছিল এবং তাই তার ইচ্ছা ছিল উৎসগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যার কার্যকারিতাই শুধু পারত যে-কোনও আসন্ন সংকটকে ঠেকিয়ে রাখতে। অপর দিকে দ্বিতীয় বিকল্পটি ছিল ঠিক সেই ধরনেরই একটি যা প্রদেশগুলিকে দিতে পারত পর্যাপ্ত অর্থ নিজেদের উৎসগুলির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ রাখার ব্যাপারে ভারত সরকার কর্তৃক অধিকারচ্যুত না হয়ে। একথা ভুলে যাওয়া আদৌ উচিত নয় যে, ভারত সরকার তার সাংবিধানিক অবস্থার ভিত্তিতে পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল ভারতের রাজস্ব পরিচালনা করা ও তা নিজের কাজে লাগানোর ব্যাপারে। অতএব প্রদেশগুলিকে অর্থ সাহায্য করার ব্যাপারে যে কোনও রকম সমাধানকে তার স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে যা ঐ সমাধানের মধ্যেই পরিকল্পিত হয়েছিল। পরিস্থিতি এই ধরনের হওয়ায় প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে যে প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার সমাধানে নির্দিষ্ট করা রাজস্বের পরিবর্তে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট করার পদ্ধতির উপর।

প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সরবরাহের পদ্ধতি হিসাবে সাম্রাজ্যিক কোষাগার থেকে অর্থ নিয়োগ করার কারণে ১৮৭১-৭২ সালে প্রবর্তিত পদ্ধতিটি এই গবেষণায় নিয়োগের দ্বারা আয়-ব্যয়কের পদ্ধতি হিসাবে বিশিষ্ট রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৮৭১-৭২ সালে যে নীতির ভিত্তিতে প্রাদেশিক আয় ব্যয়ক রচিত হয়েছিল তা টিঁকেছিল ১৮৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত। ১৮৭১-৭২ সালে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে যে (রাজস্ব) নিয়োগ করা হয়েছিল তা নির্দিষ্ট এবং আবর্তক (recurring) ঘোষিত হয়েছিল। সেগুলি

আবর্তক হলেও, নির্দিষ্ট ছিল না, কারণ প্রতি বছর গোড়া থেকে ভারত সরকার প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে ইতিমধ্যে সন্নিবেশিত ব্যয়ের দফাগুলি আয়-ব্যয়কের সঙ্গে যুক্ত করত এবং তুলেও নিত। সন্নিবেশিত ব্যয়গুলিতে এই সব সংশোধনগুলির জন্য সাম্রাজ্যিক (রাজস্ব) নিয়োগ- গুলিকে প্রয়োজনানুসারে হয় বাড়াতে হত বা কমাতে হত। ১৮৭১-৭২ থেকে ১৮৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত নিয়োগগুলিতে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়গুলি যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সেগুলি অনুমোদিত হয়েছিল তা নিম্নলিখিত সারণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে :-

১৮৭১-৭২ সালের জন্য প্রদেশগুলির সাম্রাজ্যিক (রাজস্ব) নিয়োগের বিবরণ

(রাজস্ব) নিয়োগের উদ্দেশ্য	নিয়োগ করা অর্থের পরিমাণ	
	বিশদে	মোট
	টাকা	টাকা
মূল নিয়োগ		১,১৯,৭৯,০০০
যোগ দাও—		
গোরস্থান প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য	৪,০০০	
আগ্রা ইঁট কারখানার ক্ষতিপূরণের জন্য	২৮,০০০	১,১৪,০০০
দপ্তর ও বাড়িভাড়া	৮২,০০০	
		১,২০,৯৩,০০০
বাদ দাও—		
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের পরিবহনের জন্য	১৫,০০০	
পণ্যবাহী নৌকার অনুমতি পত্র দানের		১,২৪,৬৯০
ফিয়ের জন্য	২,৬০০	
বাস্তুকর্ম বিভাগের আয়ের জন্য	১,০৭,০০০	
		১,১৯,৬৮,৩১০
বিশেষ অনুদান		
যোগ দাও—		
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য	৬০,০০০	
মেদিনীপুর দেওয়ানি আদালত ভবনের জন্য	৩১,৬৮০	৩,৪১,৬৮০
কলিকাতা ছোট আদালত ভবনের জন্য	২,৫০,০০০	
		১,২৩,০৯,৯৯০
১৮৭১-৭২ সালের জন্য মোট নিয়োগ		১,২৩,০৯,৯৯০

**১৮৭২-৭৩ সালের জন্য প্রদেশগুলির জন্য
সাম্রাজ্যিক (রাজস্ব) নিয়োগের বিবরণ**

(রাজস্ব) নিয়োগের উদ্দেশ্য	নিয়োগ করা অর্থের পরিমাণ	
	বিশদে	মোট
	টাকা	টাকা
মূল (রাজস্ব) নিয়োগ		১,১৯,৭৯,০০০
যোগ দাও—		
১৮৭১-৭২ সালে স্থায়ী সংযোজন (উপরোক্ত)	১,১৪,০০০	
বিবিধ পরিষেবার জন্য	২,৬৭,০৭০	
গ্রন্থ ও প্রকাশনা	৭৬,০০০	৩,৮৮,৯৩৬
হাওড়ার অনাথ ইস্কুলের জমির উপর গৃহ নির্মাণের (অপরকে প্রদত্ত) খাজনার জন্য	২৬৬	
		১,২৩,৬৭,৯৩৬
বাদ দাও—		
১৮৭১-৭২ সালের স্থায়ী বিয়োজন (উপরোক্ত)	১,২৪,৬৮০	১,৩০,৩৯০
বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরামতির জন্য	৫,৭০০	
		১,২২,৩৭,৫৪৬
বিশেষ অনুদান		
যোগ দাও—		
বর্ধমান জ্বর ত্রাণের জন্য	১,০০,০০০	
সদর আদালত ভবনের জন্য ক্ষতিপূরণ	৪,০০,০০০	৯,৬৬,৬৭০
সরকারি দপ্তরগুলির জন্য ২১,০০০ টাকার বার্ষিক ভাড়ার মূলধনের অর্থমূল্য	৪,৬৬৬,৬৭০	৩,৪১,৬৮০
	২,৫০,০০০	
		১,৩২,০৪,২১৬
ভগ্নাংশগুলি বাদ দাও		৩৮০
		১,৩২,০৩,৮৩৬
১৮৭২-৭৩ সালের জন্য মোট রাজস্ব নিয়োগ		১,৩২,০৩,৮৩৬

১৮৭৩-৭৪ সালের জন্য প্রদেশগুলিতে সাম্রাজ্যিক (রাজস্ব) নিয়োগের বিবরণ

(রাজস্ব) নিয়োগের উদ্দেশ্য	নিয়োগ করা অর্থের পরিমাণ	
	বিশদে	মোট
	টাকা	টাকা
স্থায়ী (রাজস্ব) নিয়োগ ১৮৭২-৭৩-এর জন্য উপরোক্ত		১,২৩,৩৭,৫৪৬
যোগ দাও—		
অসামরিক স্থানীয় দপ্তরগুলির জন্য ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসা আধিকারিকদের বেতনের জন্য	৩,৮৫,০০০	৪,৮৫,০০০
ভূমি রাজস্ব শাখা প্রতিষ্ঠানের জন্য	১,০০,০০০	
		১,২৭,২২,৫৪৬
বাদ দাও—		
সরকারি দপ্তরগুলির ভাড়া হ্রাসের জন্য	২১,০০০	২১,০০০
		১,২৭,০১,৫৪৬
১৮৭৩-৭৪-এর জন্য অনুমোদিত		১,২৭,০১,০০০
যোগ দাও এই গুলির জন্য—হাওড়া অনাথ ইস্কুলের জন্য জমির উপর গৃহনির্মাণের খাজনার জন্য	২৬৬	
ইউরোপীয় ভবঘুরেদের জন্য খরচ বাবদ	১১,৫০০	১৮,০৬৬
জমির উপর গৃহনির্মাণের জন্য ব্যয়	৬,৩০০	
বাদ দাও—		
প্রাদেশিক থেকে সাম্রাজ্যিকে প্রত্যাহৃত চিকিৎসা বিভাগের ছাত্রদের বেতন বাবদ		৫,৪০০
প্রাদেশিক থেকে সাম্রাজ্যিক প্রত্যাহৃত অসামরিক স্থানীয় দপ্তর গুলির		৩,৯০,৪০০
ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসা আধিকারিকদের বেতনের জন্য বিশেষ অনুদান	৩,৮৫,০০০	১,২৩,২৮,৬৬৬
যোগ দাও—		
ছোট আদালতের ভাড়া বাবদ		১৪,৪০০
১৮৭৩-৭৪ সালের জন্য মোট রাজস্ব নিয়োগ		১,২৩,৪৩,০৬৬

১৮৭৪-৭৫ সালের জন্য প্রদেশগুলিতে সাম্রাজ্যিক (রাজস্ব) নিয়োগের বিবরণ

(রাজস্ব) নিয়োগের উদ্দেশ্য	নিয়োগ করা অর্থের পরিমাণ	
	বিশদে	মোট
	টাকা	টাকা
স্থায়ী (রাজস্ব) নিয়োগ ১৮৭৩-৭৪ সালের জন্য উপরোক্ত		১,২৩,২৮,৬৬৬
যোগ দাও—		
মুসলমানদের শিক্ষায় উৎসাহ প্রদানের জন্য নিয়োগ	৫০,০০০	৫০,০০০
অনুমোদিত (রাজস্ব) নিয়োগ		১,২৩,৭৮,০০০
যোগ দাও—		
আদর্শ খামারের জন্য অনুদান	৭,০০০	
জমির উপর গৃহ নির্মাণের জন্য ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত অনুদান	১,১৮০	৮,১৮০
		১,২৩,৮৬,১৮০
বাদ দাও—		
গির্জা ও সমাধিস্থলের জন্য ব্যয় থেকে বিয়োজন	১৪,৩১৪	
আসামে হস্তান্তর বাবদ বিয়োজন	১৩,৩০,০০০	১৩,৪৪,৫৮০
হাওড়া অনাথ ইস্কুলের জমির উপর গৃহ নির্মাণের জন্য ভাড়া বাবদ	২৬৬	
মোট অনুমোদিত (রাজস্ব) নিয়োগ		১,১০,৪১,৬০০

১৮৭৫-৭৬ সালের জন্য প্রদেশগুলিকে সাম্রাজ্যিক (রাজস্ব) নিয়োগের বিবরণ

(রাজস্ব) নিয়োগের উদ্দেশ্য	নিয়োগকরা অর্থের পরিমাণ	
	বিশদে	মোট
	টাকা	টাকা
১৮৭৪-৭৫ সালের স্থায়ী (রাজস্ব) নিয়োগ উপরোক্ত		১,১০,৪১,০০০
যোগ দাও—		
বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্য অনুদান	৫২,৫০০	
জমির উপর গৃহ নির্মাণের ভাড়ার জন্য অনুদান	১,১৮০	৫৩,৬৮০
		১,১০,৯৪,৬৮০
বাদ দাও—		
লবণ বিভাগের জন্য বাস্তুকর্ম বাবদ খরচ	১৩,৬৮৩	
প্রত্যাহৃত জাহাজ এবং আলোক-স্তম্ভের জন্য (রাজস্ব) নিয়োগ	১,৭৬৯	৩৩,১৬৩
অসমের নগর উন্নয়ন তহবিল বাবদ রাজস্ব নিয়োগ		১৭,৭১১
মোট (রাজস্ব) নিয়োগ		১,১০,৬১,৫১৭

১৮৭৬-৭৭ সালের জন্য প্রদেশগুলিকে
সাম্রাজ্যিক (রাজস্ব) নিয়োগের বিবরণ

(রাজস্ব) নিয়োগের উদ্দেশ্য	নিয়োগকরা অর্থের পরিমাণ	
	বিশদে	মোট
	টাকা	টাকা
১৮৭৫-৭৬ সালের জন্য মূল (রাজস্ব) নিয়োগ		১,১০,৪১,০০০
যোগ দাও—		
জমির উপর গৃহ নির্মাণের ভাড়া বাবদ	১,১৮০	৫৩,৬৮০
বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্য	৫২,৫০০	
বাদ দাও—		১,১০,৯৪,৬৮০
লবণ-বিভাগের জন্য বাস্তুকর্ম খরচাদি		১৩,৬৮৩
		১,১০,৮০,৯৯৭
বাদ দাও—		
নিদর্শপত্র (Form) ভাণ্ডার বিভাগের জন্য	৮,০৩৪	৬,০৩৪
যোগ দাও—		
প্রদর্শনী ও মেলার জন্য	২,০০০	
মোট		১,১০,৭৪,৯৬৩
অনুমোদিত হওয়া (রাজস্ব) নিয়োগ		১,১০,৭৫,০০০
যোগ দাও—		
বাকি ও উনগুল তালুকের জন্য অনুদান	৩,২৭১	
সর্প-বিষ আয়োগ, প্রতিষ্ঠান ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য ব্যয়	৬,০০০	৫৮,৭৫৩
আদমসুমারি রেজিস্টার বাবদ অনুদান	৪৯,৪৮২	
		১,১১,৩৩,৭৫৩
বাদ দাও—		
প্রত্যাহৃত আলোকসংকেত জ্ঞাপনকারী জাহাজ ও আলোকস্তম্ভর বাবদ (রাজস্ব) নিয়োগ	১,৭৬৯	
নগর উন্নয়ন তহবিল, আসাম-এর জন্য (রাজস্ব) নিয়োগ	১৭,৭১১	২১,১৮০
তেজপুর উন্মাদ আশ্রমে প্রেরিত উন্মাদদের বার্ষিক খরচ বাবদ	২,৭০০	
মোট (রাজস্ব) নিয়োগ		১,১১,১১,৫৭৩

(রাজস্ব) নিয়োগের দ্বারা আয়-ব্যয়ক পদ্ধতি যতদিন বলবৎ ছিল সেই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলি এবং সেগুলির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যিক রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক (রাজস্ব) নিয়োগের বিবরণ এইভাবে পূর্ণতা লাভ করল। এখন শুধু বাকি থাকল (রাজস্ব) নিয়োগের পরিকল্পনাধীন পদ্ধতিটি সাফল্য লাভ করেছিল কি না তা দেখা। সাফল্যের উপাদানগুলি সম্পর্কিত প্রশ্নটি সব সময়েই আলোচনা সাপেক্ষ, কারণ যা এক দিক দিয়ে দেখলে সাফল্য বলে প্রতীয়মান হয়। অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে তার সম্পূর্ণ বিপরীতও হতে পারে। তাই প্রশ্নটির এই দিকটি সম্বন্ধে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া যায় না, কারণ একটি পর্যায়ের সাফল্যের ফলাফলের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টিকে নির্ভর করতে বাধ্য করেছিল প্রাদেশিক বিত্তের সম্প্রসারণের সমগ্র কাল জুড়ে থাকা সময়ের উপর। যেহেতু সাফল্যের সংজ্ঞা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য অনুসারে। তাই আমাদের অনুসন্ধান কার্যের জন্য প্রথমে অবশ্যই আমরা ঐ দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে নির্ণয় করব। অতএব সম্ভাব্য পক্ষগুলি সম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধান করব যাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচিত হয়েছিল প্রাদেশিক বিত্তের রূপদানের ব্যাপারে এবং অর্জিত সাফল্য সম্বন্ধে তাদের সন্তোষজনক অভিমত ছাড়া আগে থাকতে এক নতুন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারত না। স্পষ্ট তাই ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলি ছিল দুটি প্রধান পক্ষ। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্নতর, বিরোধী না হলেও। ভারত সরকারের চিন্তা-ভাবনায় যে প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে উঠেছিল তা হল এই যে হস্তান্তরের ফলে সাম্রাজ্যিক কোষাগারের লাভের পরিমাণ কতটা বেশি হবে। অপর দিকে প্রাদেশিক সরকারগুলি এ কথা জানতে উদগ্রীব ছিল ভারত সরকার তাদের যে সম্পদ দিতে চাইছে সেটা কি সন্নিবেশিত ব্যয়ের বিষয়টি পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারটি নিশ্চিন্তে স্বীকার করার পক্ষে যথেষ্ট হবে। এটা সুস্পষ্ট ছিল যে প্রাদেশিক সরকারগুলি (রাজস্ব) নিয়োগের বিষয়টি পর্যাপ্ত হচ্ছে এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট নিয়োগের জন্যে সাম্রাজ্যিক ব্যয় পরিচালনা করার দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না। অনুরূপ ভাবে, সাম্রাজ্যিক সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনার অধীনে যা খরচ পড়ত তার চেয়ে কম পরিমাণ অর্থে ব্যয়ের বিষয়টি পরিচালনা করার দায়িত্ব যদি প্রাদেশিক সরকার না নিত তবে সাম্রাজ্যিক সরকারও হস্তান্তর করার বিষয় থেকে কোনও সুফল দেখতে পেত না। অতএব প্রদেশগুলির জন্য প্রাচুর্য এবং সাম্রাজ্যিক কোষাগারের জন্য লাভ এই দুটিই ছিল প্রধান বিচার্য বিষয় যা প্রকল্পটির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার সম্প্রসারণ করার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রদেশগুলির অধিবাসীদেরও এক সম্ভাব্য তৃতীয় পক্ষ হিসাবে পরিগণিত করা হয়ে থাকতে পারে যাদের অনুমোদন এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় কারণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারত। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হতে পারত এটা সম্পূর্ণভাবে অনুমানের বিষয়। অন্য দিকে, রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য সাধারণ মানুষের দাবির বৈশিষ্ট্যটি সম্বন্ধে যারা ভালভাবে পরিচিত তারা সহজেই কল্পনা করে নিতে পারে যে, কর দাতাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয়টি না ছিল সাম্রাজ্যিক সরকারের বা প্রাদেশিক সরকারের কল্যাণসাধন। বরং তা ছিল ব্যয়ের বিভিন্ন খাত বাবদ তারা যা দিত সেই অর্থের সঠিক বণ্টন এবং প্রকল্পের ফলাফলটির অনুমোদনকে যদি অগ্রগতির প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে গণ্য করা হত, তবে সম্ভবত প্রাদেশিক বিত্তের বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন পথে হতে পারত।

এমন কি সেই সময়েও একটা প্রস্তাব এসেছিল যে দেশের আর্থ-ব্যবস্থার ব্যাপারে দেশবাসীদের কিছু মতামত দেবার অধিকার থাকা উচিত। ১৮৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর তারিখের প্রস্তাবের ১৯ নং অনুচ্ছেদে সাময়িক বিত্তের প্রকল্প ঘোষণা করতে গিয়ে ভারত সরকার এই বিধি নিয়মটি রচনা করেছিল যে,

'প্রতিটি স্থানীয় সরকার স্থানীয় ঘোযপত্রে (Gazette) তার নিজস্ব প্রাদেশিক পরিষেবার সম্ভাব্য করের হিসাবের ক্ষমতা এবং হিসাব অবশ্যই প্রকাশ করবে, সেই সঙ্গে থাকবে, বিত্ত বিষয়ক ব্যাখ্যা (যা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে করতে হবে স্থানীয় বিধান পরিষদের সামনে) এবং যে ব্যাখ্যাটি বড়লাটের বিধান পরিষদে দেওয়া ব্যাখ্যার অনুরূপ হবে।'

এই প্রস্তাব যদি বাস্তবায়িত হত, তবে ভারতের করদাতারা ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে আর্থ-ব্যবস্থার নির্ধারণে নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার পেত। অবশ্য কয়েকটি আইনগত অসুবিধা ছিল এই প্রস্তাবটি কার্যকর করার ব্যাপারে। যদি পরিষদে আয়-ব্যয়ক প্রবর্তিত হত এবং তার পরে তাই নিয়ে বিতর্ক হত তবে ঐ ধরনের কার্যধারা ভারত পরিষদীয় আইনের (২৪ এবং ২৫ ভিআইসি, অধ্যায়—৬৭) ৩৮ নং ধারাটিকে লঙ্ঘন করত এবং তার ফলে আয় ব্যয়কে কর সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের কিছু প্রস্তাব জড়িত না থাকলে তা অবৈধ হয়ে যেত। কারণ ঐ আইনে বলা আছে যে বিধান পরিষদের কর্মতৎপরতাকে কঠোর ভাবে আইন প্রণয়নের ব্যাপার ছাড়া অন্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বলা যাবে না। যদি অপরপক্ষে বিতর্ক না হয় তাহলে আয়-ব্যয়কে এই পদ্ধতিতে প্রচার চালানোতে লাভ কি, যা সরকারি ঘোষ পত্রে প্রকাশ করেও সমভাবে সুনিশ্চিত

করা যায় নি। এই সব অসুবিধার অবসানে মাদ্রাজ সরকার একটা প্রস্তাব[১] দিয়েছিল ভারত সরকারকে।

'যে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ক যেন একটি উপযোজন বিধেয়কের তফসিলের আকারে রূপায়িত হয়, এবং সব রকম প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও আলোচনার পর যার বিষয়বস্তুগুলি সমর্থিত হবে প্রতিটি ধারা পরম্পরাক্রমে।'

কিন্তু ভারত সরকার, যারা প্রথমে এই বিষয়টির সূত্রপাত করেছিল, তারা এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত বৈপ্লবিক হওয়ায় দারুণ মর্মাহত হয়েছিল। প্রত্যুত্তরে[২] ভারত সরকার মন্তব্য করেছিল :

'২। সপরিষদ বড়লাট মনে করে না.....যে .... বার্ষিক বিত্তীয় বিবরণ ভারত পরিষদ আইনের শর্তাধীন করার জন্য .... প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি যথাযথ বা সম্ভব হবে। ইংল্যাণ্ডের লোকসভায় উপযোজন বিধেয়ক অনুমোদন করার বিষয়টি একটি কার্যধারা যার দ্বারা লোকসভার প্রস্তাবটিকে সরবরাহ কমিটিতে কার্যকর করার অধিকার দেওয়া হয়; যা উপযোজন বিধেয়ক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত আইন হয়ে উঠতে পারে নি। সমগ্র অধিবেশনের মধ্যে যে সব অনুদান দেওয়া হয়েছে বিধেয়কটি তার প্রত্যেকটিকে হিসাবের মধ্যে ধরে এবং সরবরাহ কমিটি কর্তৃক সমন্বিত কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রতিটি পৃথক পৃথক পরিষেবার জন্য প্রেরণ ও প্রয়োগ করার অধিকার দিয়েছিল। এর মধ্যে এমন একটি শর্তও ছিল যে নানা ধরনের সাহায্য ও সরবরাহ যেগুলি উল্লেখ করা আছে সেগুলি ছাড়া অন্য কোনও ভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রেরিত বা প্রযোজ্য হবে না'।

'৩। এই ধরনের কার্যধারা, সপরিষদ বড়লাট মনে করেন, ভারতের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে এবং সকল সরকারি অর্থ বিলি-ব্যবস্থা করার ক্ষমতা কার্য নির্বাহী থেকে বিধান পরিষদে হস্তান্তরিত করার ফল দিতে পারে। অতএব বড়লাট উপযোজন বিধেয়ক প্রবর্তন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না'।

এই বিনির্দেশের (Ruling) বিরুদ্ধে মাদ্রাজ সরকার আবেদন জানান মন্ত্রীর[১] কাছে এবং সনির্বন্ধ মিনতি জানায় যে, হয় একটি বার্ষিক উপযোজন আইনের প্রস্তাবটি অনুমোদিত হোক অথবা—

---

১) ভারত সরকারকে লেখা চিঠি, বিত্ত বিভাগ, নং ১৪৭, ১৮৭১ সালের ১৮ এপ্রিল তারিখের

২) বিধানিক পত্র মাদ্রাজে প্রেরিত হয়েছিল, তারিখ ১১ জুলাই ১৮৭১, সংখ্যা ৭৬৫।

১) মাদ্রাজ সরকার, বিত্ত বিভাগ, এর তরফ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ সালের মন্ত্রীকে লেখা চিঠি এবং তার সঙ্গে প্রেরিত সব চিঠি-পত্র।

'পরিষদের আইনে এমন ধরনের পরিবর্তন করা হোক যা স্থানীয় বিধান পরিষদে বিত্ত সম্পর্কিত বিবরণটিকে বৈধভাবে স্বীকৃতি দেওয়া ও আলোচনা করার সুযোগ দেবে।'

কিন্তু মন্ত্রী ভারত সরকারের[১] সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করল এই কারণে যে—

'এই জাতীয় কার্য পরিচালনার প্রণালীর রীতিটি একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক বিধানসভায় প্রযোজ্য হয়। যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে নির্বাহিকের উপর এবং সেই ধরনের ক্ষমতাও আছে যা পরামর্শক্রমে ব্রিটিশ সংসদ ভারতের বিধান পরিষদের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে রেখেছে।'

ফলে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় এবং ১৯২১ সালের আগে পর্যন্ত তা কার্যকর করা হয় নি। যেহেতু সাম্রাজ্যিক ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বিত্ত সংক্রান্ত চুক্তি রচনায় জনগণের অভিমত প্রাধান্য[২] পায় নি, তাই যদি এই ব্যাপারে তাদের বক্তব্য পেশ করার অনুমতি থাকত তবেই তাদের আগ্রহ থাকতে পারত এর ফলাফল থেকে তারা প্রত্যক্ষভাবে কি সুবিধা পেতে যাচ্ছে। যতকাল পর্যন্ত অতীতের পরিণামগুলি ভবিষ্যতের নীতিকে প্রভাবিত করে এসেছিল ততকাল পর্যন্ত শুধু ফলাফল জানার জন্য আমাদের কেবল অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যে ফলাফল সম্বন্ধে চুক্তির অপর অবশিষ্ট পক্ষ দুটি প্রধানত আগ্রহী ছিল, যথা সাম্রাজ্যিক কোষাগারের লাভ এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির পর্যাপ্ততা। প্রদেশগুলির পর্যাপ্ততার পরীক্ষার ব্যাপারে প্রথমে নিজেদের মনোনিবেশ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত ফলাফলের পরিমাণ মাপা যেতে পারে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের পদ্ধতির চৌহদ্দির মধ্যে আনা বিভিন্ন প্রদেশগুলির প্রত্যেকটির আর্থ ব্যবস্থায় বার্ষিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি থেকে।

---

১) বিধানিক সরকারি আদেশ সংখ্যা ৪। তারিখ : ১৮ জানুয়ারি ১৮৭২, ভারত সরকারকে লিখিত।

২) প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রতিনিধিদের উপর রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ না করে বিকেন্দ্রীকরণ করার বিষয়টি সম্প্রসারিত করা উচিত নয় এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে উত্থাপিত হয় নি ১৯০৮ সালের আগে পর্যন্ত, এবং তাও করা হয়েছিল ভারতে বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে রানি কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে প্রয়াত মাননীয় শ্রী গোখলের সাক্ষ্যে; দ্রষ্টব্য।

প্রাদেশিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি

প্রদেশ	১৮৭১-৭২	১৮৭২-৭৩	১৮৭৩-৭৪	১৮৭৪-৭৫	১৮৭৫-৭৬	১৮৭৬-৭৭
	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড
ম. প্র.	২০,৯৮৮	—৮,৪২৩	২,২৬৮	১৩,১০৮	৮,৩০৭	১৬,৮০০
বৃ: ব্রহ্মদেশ	২৭,৬৩৪	৩৩,৮৩২	—৯,৯২২	—২১,৮৮৯	—৫,৪৭১	৫,১০০
অসম	...	...	...	৫,১৫৯	৫৯০	৯,৮৩৩
বঙ্গদেশ	১,৮০,৬২২	৭৪,৬২২	৩,৯৩,৯৫৫	২,৭১,০৪৪	২৭,৩৯৭	৪৬,৯৭৮
উ.প. প্রদেশ এবং অযোধ্যা	৩১,৫৯৫	৬৪,০৩৬	৩৬,৩৫৮	১১,৬৯৩	২০,৯৪৫	১২৮,৫০১
পঞ্জাব	১,০৯,৮২৮	২৮,০০৮	—৩৩,৩৪৭	—১,১৭,৬৪৪	—৯২,৭২৪	২৬,৯০৮
মাদ্রাজ	৪০,৭৮৭	—১৯,২৬৪	—৫৬,৩৮১	৪,৩০৩	—১৪,২১৩	৫০৪
বোম্বাই	৬৫,৫৫৩	১,২৮,৮০৫	—৬৪,৩৭৩	৯,৯২৯	—১৮,৩৫৪	—১,৪০,৭১৮

অনুরূপ বছরগুলির জন্য ভারত সরকারের বার্ষিক বিত্ত ও রাজস্বের হিসাব থেকে সংকলিত।

এই সংখ্যাতত্ত্বগুলি থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, উদ্বৃত্তগুলি পৌনঃপুনিকতা ও পরিমাণে ঘাটতিগুলির চেয়ে অনেক বেশি হয়, এবং এমন পরিমাণে যে ঘাটতিগুলি সহজেই সঞ্চিত উদ্বৃত্ত (balance) থেকে মেটানো যেতে পারে, সেগুলিকে প্রচণ্ডভাবে নিঃশেষিত না করেই প্রাদেশিক সরকারগুলির এই আপাত প্রতীয়মাণ সমৃদ্ধির কারণটি ব্যাখ্যা করার জন্য অবশ্যই যত্ন নিতে হবে। সাম্রাজ্যিক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত (রাজস্ব) নিয়োগ ও আয়গুলি থেকে বাঁচিয়ে সঞ্চয় করা অর্থ থেকে প্রদেশগুলি নিজেদের উদ্বর্তগুলি গড়ে তুলতে সফল হত কি না সেটাই খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। এই প্রশ্নের উত্তর সুনিশ্চিত রূপে দেওয়া যেতে পারে না, কারণ উপরোক্ত সংখ্যাতত্ত্বগুলি যে মোট সম্পদ ও পরিবর্তনগুলিকে উল্লেখ করছে, তার মধ্যে প্রদেশ পরিচালন ব্যবস্থার জন্য আলাদা করে রাখা আয় ও (রাজস্ব) নিয়োগের চেয়ে অনেক বেশি অন্তর্ভুক্ত আছে। সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলির সাম্রাজ্যিক নিয়োগ ও আয় ছাড়াও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে তার একটি অংশ যা এযাবৎকাল স্থানীয় তহবিল নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। একথা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে সাম্রাজ্যিক বিত্ত থেকে প্রাদেশিক বিত্তের পৃথকীকরণ হবার বহু আগেই, ব্রিটিশ ভারতে ১৮৫৫ সাল থেকে সাম্রাজ্যিক ও স্থানীয় বিত্তের মধ্যে পৃথগীকরণ করা হয়েছিল। পৃথক হবার পর স্থানীয় তহবিল ছিল কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন এবং তার মধ্যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ছিল : (ক) যেগুলি

আইন অথবা প্রচলিত প্রথার দ্বারা বাধ্য ছিল যে জেলা থেকে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছিল এবং যে বিশেষ উদ্দেশ্যে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলির জন্য ব্যয় করতে এবং (খ) যে-গুলি সারা প্রদেশ থেকে সংগৃহীত হত এবং যেগুলি খরচ করার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের ছিল অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। যখন প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্পটি ঘোষিত হল স্থানীয় তহবিলের ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে প্রাদেশিক তহবিলের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়াটাই স্বাভাবিক বিবেচিত হয়েছিল। এর ফলে প্রাদেশিক সম্পদের কতটা বাড়তি বৃদ্ধি হয়েছিল তা জানা কঠিন। কিন্তু তৎকালীন অর্থমন্ত্রী স্যার জন স্ট্র্যাচির[১] মতে ঐ সংযোজন ছিল 'নগণ্য' এবং তাই তা নতুন পদ্ধতির[২] আর্থিক পরিণামগুলিকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি।

সাম্রাজ্যিক কোষাগারে কি লাভ হয়েছিল তার হিসাব করার প্রশ্নটি নিয়ে দীর্ঘ কালক্ষেপণ করা আমাদের উচিত নয়। প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক পরিষেবাগুলির বিচক্ষণ পরিচালন ব্যবস্থার জন্য অপ্রত্যক্ষ লাভের বিষয়টি পরে আলোচিত হবে যখন প্রাদেশিক বিত্তের বিবর্তনে দ্বিতীয় স্তরটি প্রবর্তিত করার জন্য যে প্রভাবগুলি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সেগুলি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করতে শুরু করব। সাম্রাজ্যিক কোষাগার যে প্রত্যক্ষ লাভ করতে শুরু করেছিল তা কার্যকর হয়েছিল ইতিমধ্যে উল্লেখিত প্রাদেশিক নিয়োগে আগাগোড়া ব্যয় সংকোচ করে একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে ভারত সরকার হস্তান্তরিত পরিষেবাগুলি থেকে বছরে দশলক্ষ পাউন্ড পরিমাণ অর্থ সাহায্য হিসাবে পাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই ভারত সরকার বুঝতে পেরেছিল যে এই সব ব্যয়সংকোচের জন্য প্রয়োজন হবে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত কিছু করের সাহায্য। বিদ্রোহের পর থেকে বোঝাটি বাড়তে শুরু করেছিল এবং এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সাম্রাজ্যিক খাজনা তোলা বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রাদেশিক খাজনা তোলার মাধ্যমে সেই বোঝা যাতে আর না বাড়ে তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সাহায্য তা দিতে চেয়েছিল তার পরিমাণ হ্রাস করতে প্রাদেশিক নিয়োগে ব্যয়-সংকোচ ১,০০০,০০০ পাউন্ড থেকে ৩৫০,০০০ পাউন্ডে কমিয়ে এনে অথবা আরও সঠিক ভাবে বলা যায় ৩৫০,৮০১ পাউন্ডে এনে যদি আমরা বাদ দিই, যা আমরা অবশ্যই করব, ব্রহ্মদেশকে ১৯,১৯৯ পাউণ্ড ফিরিয়ে দিয়ে, যেটা আসলে ছিল ঐ প্রদেশের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য তার সাহায্যের বরাদ্দ অংশ।

১। তাঁর সংক্ষিপ্তসার দ্রষ্টব্য, তারিখ ১৫ মার্চ, ১৮৭৭, ১৮৭৭-৭৮ সালের বিত্তীয় বিবরণের সঙ্গে সংযোজিত।

২। এই সংযোজন যদিও ১৮৭৬ সাল থেকে পরিত্যক্ত হয়েছিল যাতে ভারত সরকার জানতে পারে পুরনো পদ্ধতির তুলনায় নতুন পদ্ধতির বিত্তীয় পরিণামগুলি সম্বন্ধে।

এই অধ্যায়ের ফলাফলগুলি সম্বন্ধে সার-সংক্ষেপ করে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে ভারত সরকার ৩৩০,৮০১ পাউন্ডের বার্ষিক সাহায্যের দ্বারা যে সুফল পাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল তার পূর্ণ অংশ আদায় করে, প্রাদেশিক বিত্তে যত কমই হোক না কেন অপ্রতুলতার কারণ না ঘটিয়ে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রদেশগুলির উপর যে বোঝা চাপানো হয়েছিল তার জন্য ফলাফলের মাধ্যমে প্রকাশিত তাদের অবস্থাকে আদৌ দুভার্গ্যজনক বলা যেতে পারে না।

একটি অবাঞ্ছিত উপাদান প্রাদেশিক বিত্তের প্রবর্তনের ক্ষতি করেছিল। ঐ উপাদানটি হল স্থানীয় উন্নতিবিধানের জন্য স্থানীয় কর ও উপকর ধার্যের ব্যাপারে প্রচণ্ড বিবৃদ্ধি।

১৮৭০ সাল থেকে বর্ধিত আয়কর এবং উপকরের নতুন সম্পদগুলি থেকে আয়

প্রদেশ	১৮৭০-৭১	১৮৭১-৭২	১৮৭২-৭৩	১৮৭৩-৭৪	১৮৭৪-৭৫	১৮৭৫-৭৬
	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড
অযোধ্যা—						
সাধারণ উপকর সম্পর্কে						
ভূমি রাজস্ব	৩৮,৮১৩	২৯,০১৮	৩৪,৩৫৪	৩৪,২৫৯	৩৩,২০৮	৩৩,১৪৬
উপান্ত তহবিল	৭,৩৬৩	৩,৪৬১	...	...	...	...
স্থানীয় কর	...	৩৬,৮১০	৪২,৫৩৫	৪২,৮৮৩	৪১,৫৯৭	৪১,৪৬১
মোট	৪৬,১৭৬	৬৯,২৮৯	৭৬,৮৮৯	৭৭,১৪২	৭৪,৩৫৫	৭৪,৬০৭
অসম—						
সাধারণ উপকর জমিতে :						
রা: পুরানো তহবিল	৬,৫০৬	৪,৩৩৩	৭১১	১,৯১৬	১৭,১৪৯	...
নতুন তহবিল	...	...	...	...	১৫,২৬৭	১৬,৩০০
মোট	৬,৫০৬	৪,৩৩৩	৭১১	১,৯১৬	৩২,৪১৬	১৬,৩০০
বঙ্গদেশ—						
সড়ক উপকর তহবিল	...	...	২২,৯১৭	৫৯,০৩৯	১২০,১২৮	১৫৮,৫১৬
উ: প. প্রদেশ	১৬৮,৫৩২	২০১,৫৪৮	২১৬,৮১৮	২১৭,৬৭২	২১৫,৯৬৮	১৫০,৬১৯
পঞ্জাব	৫৮,৩৩০	২১৪,৪৪১	২১৬,১৯৪	২০৮,০৬৩	২১১,৮৬২	১৯৩,৫৭৩
মাদ্রাজ—সড়ক উপকর	২১২,৮১৩	২৩৪,৫৬৭	৩৭৭,০৩১	৩৬৮,০৩১	৩৭১,৩১১	৩৬৯,৩২৫
মাদ্রাজ—পথ শুল্ক উপকর	...	...	১২,১৪৪	১২,২৩৪	১৪,৮৩০	২৬,৫৩১
সর্বমোট	৪ ,৯২,৩৫৭	৭,২৪,১৭৮	৯,২২,৭০৪	৯,৪০,৩৩৩	১,০৪০,৮৫০	৯,৮০,৫৪৫

পূর্ব পৃষ্ঠার সারণি প্রসঙ্গে :

বঙ্গদেশ থেকে সড়ক ও সরকারি ভূ-সম্পত্তির উন্নয়ন তহবিল থেকে আদায় করা উদ্বৃতগুলির উপরে প্রদত্ত আয়কর ও উপকরের নতুন সম্পদগুলির জন্য উল্লিখিত কর স্থানীয় সরকারগুলির বিত্তীয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত প্রবন্ধ ইত্যাদি, পৃ: ৪৯৪।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে ১৮৭০-৭১-এর চেয়ে ১৮৭৫-৭৬ সালে বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪,৮৮,১৮৮ পাউন্ড উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, এবং পঞ্জাব ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে উপকর বাড়বে, শেষোক্ত দুটি প্রদেশে ভূমি রাজস্ব ৬১/৪ শতাংশ বৃদ্ধি করে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে (গ্রামীণ পুলিশখাতে খরচ বাদ দেওয়ার পর) বঙ্গদেশে সড়ক উপকর বাড়িয়ে এবং সাম্রাজিক খরচে, রায়তদের উপর অনুরূপ অংকের উপকর ধার্য করা মুলতুবি রেখে ভূমি রাজস্বের উপর ৩ শতাংশের পরিবর্তে ৬১/৪ শতাংশ নিয়োগ অসমকে অনুদান দিয়ে (বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে কয়েক বছর আগে ৬১/৪ শতাংশ ধার্য করা হয়েছিল এবং তাই তা উপরোক্ত সারণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। অতিরিক্ত কোনও উপকর ধার্য করেনি যে, একমাত্র প্রদেশ ছিল তা হল মধ্য প্রদেশ, যদিও ১৮৭০ সালে ভূমি রাজস্বের উপর ৬১/৪ শতাংশ উপকর ধার্য করা সম্ভব বিবেচিত হলেও, তা সময়োচিত বিবেচিত হয় নি।

ছিদ্রান্বেষীরা বলতে পারে যে, যদি বাড়তি কর ধার্য করার প্রয়োজন আগে থাকতেই পরিহার করে থাকে তবে প্রাদেশিক বিত্তের প্রবর্তন করার লাভ কি? বাড়তি কর ধার্য করার বিষয়টি যদি অপরিহার্য হয়ে থাকত তবে কেন সাম্রাজ্যিক সরকার প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের ছদ্ম আবরণে এর সম্মুখীন হবার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল প্রাদেশিক সরকারের উপর, যখন তা সাম্রাজ্যিক সরকার নিজেই করতে পারত। প্রত্যুত্তরে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে, প্রাদেশিক বিত্তের গুণাগুণের অনুসন্ধান করতে হবে অন্য দিকে এবং যথাস্থানে দেখানো যাতে যে সেগুলি এর প্রবর্তনকে সমর্থন করে, যদিও এরই অববাহিকা হয়ে এসেছিল নির্দিষ্ট পরিমাণের বর্ধিত করভার। সাধারণভাবে কর আরোপের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা অবশ্যই অবিবেচনা-প্রসূত হবে, কারণ দায়বদ্ধতা ছাড়া কোনও সুফলই পাওয়া যায় না। আবার যে ধরনের করের আশ্রয় নেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করাটাও সম-পরিমাণে অবিবেচনা প্রসূত হবে, কারণ আসলে বিবেচ্য বস্তুটি হল কর বৃদ্ধি করা নয়, কর আরোপে অবিচার করা। প্রাদেশিক বিত্তে ঘাটতি মেটাবার জন্য যে

কর পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল তা ছিল ইতিমধ্যে অতিরিক্ত করভারাক্রান্ত শ্রেণীর করদাতাদের উপর অভিকর (rates) এবং উপকর ধার্য করা, যথা ভূমি মালিকদের উপর। প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত করা পরিষেবাগুলি, যার সমর্থনে এই অভিকর ও উপকর ধার্য করা হয়েছিল, সেগুলিকে স্থানীয় বলা হলেও কার্যত ততটা স্থানীয় ছিল না সেই অর্থে যে সেগুলি সাম্রাজ্যিক সরকার কর্তৃক নিজ অধিকার রাখার চেয়ে বিশিষ্ট এলাকাগুলির পক্ষে বেশি উপযোগী ছিল। অপর দিকে, প্রথমোক্তটি এলাকাগুলির দৃষ্টিকোণের বিচারে ততটাই দায়িত্বপূর্ণ ছিল যতটা ছিল শেষোক্তের কাছে এবং তৎসত্ত্বেও সেগুলির জন্য অর্থ জুগিয়েছিল এলাকাগুলির উপর ধার্য করা অভিকর ও উপকর যেন সেগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের পক্ষে উপকারী ছিল, অথচ বস্তুত সেগুলি আদৌ তা ছিল না। এটা আরও দুঃখজনক হয়ে ওঠে যখন মনে পড়ে যে এই সব অভিকর ও উপকর ধার্য করার মূলে ছাঁটাইয়ের যে প্রয়োজনীয়তা ছিল তার উদ্ভব হয়েছিল আয়কর বাতিল হবার ফলে। ন্যায্যতার প্রশ্নে সরকার এবং কর দাতাদের সাহায্যার্থে আয়কর অব্যাহত থাকুক সেটাই আমাদের আশা করা উচিত ছিল। কিন্তু ভারত সরকারের বিত্ত বিভাগীয় মহাকরণের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরে অনুপস্থিত ছিল। মুষ্টিমেয় মানুষ এ ব্যাপারে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নয়, বরং মতবাদের দিক দিয়ে চিন্তা করত। কিন্তু কেউই প্রাদেশিক বা এলাকার বিত্তের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বনে একে বিচার-বিবেচনার যোগ্য বিষয় বলে মনে করে নি; এবং যেহেতু এটা ছিল অস্বীকৃত, তাই প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক এর উল্লঙ্ঘন প্রাদেশিক বিত্তের বিকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক ছিল না।

অধ্যায়-৫

নিয়োজিত রাজস্বের দ্বারা আয়-ব্যয়ক ১৮৭৭-৭৮ থেকে ১৮৮১-৮২

প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের প্রকল্পটি, যার দ্বিতীয় স্তরটি আমরা বর্তমানে অধ্যয়ন করব, তা মিশ্র-মনোভাব নিয়েই প্রবর্তিত হয়েছিল। এক আকাশ-ছোঁয়া আশার কথা পরিপোষণ করা হয়, যদিও তার সঙ্গে আশঙ্কার বোধটি যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিল না তা নয়। প্রকল্পটি থেকে ঠিক কি আশা করা হয়েছিল তা সঠিক ভাবে পরিমাপ করা যায় স্যার রিচার্ড টেম্পলের মন্তব্য থেকে, যিনি, ১৮৭০ সালে প্রকল্পটি প্রবর্তিত করার সময় বলেছিলেন :-

'আমরা আশা করি যে এই সুবিধাদান (রাজস্ব এবং ব্যয়ের উপর বর্দ্ধিত নিয়ন্ত্রণের) স্থানীয় সরকারগুলিকে ব্যয়ের ব্যাপারে মিতব্যয়িতা বলবৎ করা এবং তার সমীক্ষায় অতিরিক্ত আগ্রহ সৃষ্টি করবে; এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্ররোচিত করার সুযোগ দেবে তাদের স্থানীয় আয়গুলিকে মাঝে মাঝে অনুপূরণ করতে (supplement) এমন এক পদ্ধতির দ্বারা যা হয় বেশির ভাগ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বা জনগণের তরফ থেকে ন্যূনতম আপত্তির কারণ হবে; এবং রাজস্ব সম্পদের বিকাশ সম্পর্কে কর-দাতা শ্রেণীগুলি এবং কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের মধ্যে যাতে আরও নিখুঁত বোঝাপড়া সৃষ্টি করবে; প্রাদেশিক বিত্তে ব্যবহারিক ভাবে কী করে অংশ নিতে হয় তা শেখাবে জনগণকে, এবং ক্রমশ তাদের পৌঁছে দেবে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের একটি স্তরে এবং এইভাবে প্রশাসনিক ও সেই সঙ্গে বিত্তীয় উন্নয়নের সহায়ক হবে।'[১]

এই আশাগুলি হৃদয়ে পোষণ করে তিনি পরিষদকে একথা বলে রাখার সুযোগও দেন যে পরিষদকে ব্যর্থতার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ তিনি একথাও বলেছিলেন :

'যে আশাগুলির কথা আমি বলছি, সেগুলি যতটা প্রত্যয়ের সঙ্গে বা দৃঢ়

---

১) ১৮৬০-৬১ থেকে ১৮৭৩-৭৪ সরকারি বছরগুলির জন্য বার্ষিক বিত্তীয় বিবরণ, পরিশিষ্ট সমেত। কলকাতা, সরকারি ছাপাখানার অধীক্ষক (Superintendent), ১৮৭৩, পৃ: ৩৪৮।

বিশ্বাসে গৃহীত হোক না কেন, সেগুলি তৎসত্ত্বেও আশা ছাড়া আর কিছু না, এবং অন্য সব আশার মতই মোটামুটি ভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু এগুলি যেন ফলস্বরূপ যা ঘটাতে পারে তাই যেন ঘটায় এবং সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছাড়াই সুনিশ্চিত ভাবে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী, যে এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ ভারতের সাম্রাজ্যিক আয়-ব্যয়কের পক্ষে লাভদায়ক। কারণ বর্তমানে তা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করবে অসামরিক ব্যয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার উপর সাধারণ সরকারি রাজস্ব বিভাগ থেকে ব্যয়কে নিশ্চিতভাবে সীমিত করে রাখতে, বিশেষ করে সেই নির্দিষ্ট শাখাগুলিতে, যেখানে যুগের প্রগতিশীল অবস্থা থেকে বর্দ্ধিত ব্যয়ের চাহিদা বেশির ভাগ উদ্ভূত হয়েছে এবং যেখানে ঘটনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে আদৌ সমর্থ হয় না সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক।'

প্রকৃত ফলাফলগুলি অবশ্য এইসব অত্যন্ত পরিমিত আশাগুলিকে বহুল মাত্রায় অতিক্রম করে গিয়েছিল এবং যারা প্রাদেশিক বিত্তের প্রবর্তনকে এক অনিশ্চিত উপযোগিতার প্রকল্প হিসাবে দেখত তাদের মনের মধ্যে যে আশঙ্কা তখনও দীর্ঘায়িত হয়েছিল তা দূর করার জন্য এগুলি ছিল প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। ভারত সরকার বা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিতকারী বিচার্য-বিষয়গুলির মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখে, এটা পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রমাণিত হয়েছিল যে প্রাদেশিক পরিচালন ব্যবস্থা অনেক বেশি বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালিত হত সাম্রাজ্যিক পরিচালন ব্যবস্থার তুলনায়। পরিষেবাগুলি যখন সাম্রাজ্যিক দায়বদ্ধতা ছিল তখন তাদের জন্য ব্যয়িত অর্থের সঙ্গে সেগুলির প্রাদেশিকীকরণ হবার পর তাদের জন্য যা ব্যয় করা হত তার তুলনা আমরা যদি করি, তবে প্রাদেশিক পরিচালন ব্যবস্থা যে দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার অনেক শ্রেষ্ঠ তা অভূতপূর্ব মাত্রায় প্রমাণিত হয়।

বৎসর	সাম্রাজ্যিক পরিচালন ব্যবস্থার অধীনে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য যে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল সেটা বাদে অন্য সব প্রদত্ত অর্থ সহ হস্তান্তরিত পরিষেবাগুলি থেকে মোট আয়ের উপর নিবন্ধভুক্তকরণ বাদে বাকি সব ঐরূপ হস্তান্তর-করণের উপর মোট অতিরিক্ত খরচাদি।	বৎসর	প্রাদেশিক পরিচালন ব্যবস্থার অধীনে বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য যে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল সেটা বাদে অন্য সব প্রদত্ত অর্থ সহ হস্তান্তরিত পরিষেবাগুলি থেকে মোট আয়ের উপর নিবন্ধভুক্তকরণ বাদে বাকি সব ঐরূপ হস্তান্তর-করণের উপর মোট অতিরিক্ত খরচাদি।

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

	পাউন্ড		পাউন্ড
১৮৬৩-৬৪	৫১,১১,২৯৭	১৮৭১-৭২	৪৮,৩৫,২৩৮
১৮৬৪-৬৫	৫৬,৩৬,২৪৮	১৮৭২-৭৩	৪৯,৬৪,৪০৭
১৮৬৫-৬৬	৫৫,৮৭,৭৭৯	১৮৭৩-৭৪	৫৩,২৯,১৮০
১৮৬৭-৬৮	৫৮,২১,৪৩৮	১৮৭৪-৭৫	৫৩,৭৯,৫০৯
১৮৬৮-৬৯	৬০,৩০,২১৪	১৮৭৫-৭৬	৫১,৩৫,৬৭৭
১৮৬৯-৭০	৫৮,৫৬,৩১০	প্রা: ক:	
১৮৭০-৭১	৫১,৯৭,২৫০		

সাম্রাজ্যিক, প্রাদেশিক সংস্থানীয় বিত্তের উপর লিখিত টিপ্পনীর সরকারি গ্রন্থ থেকে সংকলিত, ১৮৭৬।

অতএব এর উপযোগিতা সম্বন্ধে বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং এমন কি এক বিমুক্তি বোধ নিয়ে ভারত সরকার অগ্রসর হয়েছিল প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে কিছু অতিরিক্ত স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট অথবা সহজে স্থানীয় নিয়ন্ত্রণের আরও বেশি পরিমাণে আনা যায়, এমন পরিষেবাগুলিকে সন্নিবেশিত করতে। কিন্তু সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলিতে এই সংযোজনগুলি প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্থ সরবরাহের সমস্যাটিকে অধিকতর অনুপাত-বিশিষ্ট করে তুলেছিল। প্রথম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং সেগুলির জন্য মোট ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধানটি তুলনামূলক ভাবে কম ছিল বর্তমান ব্যবস্থায় যা ঘটতে দেখা যাচ্ছিল। কেবলমাত্র নিয়োগের দ্বারা এই ব্যবধানের অসুবিধাগুলি দূর করার প্রণালীটিকে পরিবর্ধিত আকারে প্রকল্পটির সাফল্যের ব্যাপারে অনুপযুক্ত মনে করা হয়েছিল। নিয়োজিত রাজস্বের দ্বারা আয়-ব্যয়ক রচনার পদ্ধতিটির অত্যন্ত মৌলিক ত্রুটিটি ছিল তার কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে। সরবরাহের একটি প্রণালী হিসাবে একে সমর্থন জানায় নি প্রদেশগুলি এই কারণে যে, তাদের পরিচালনাধীন পরিষেবাগুলির জন্য ব্যয় যখন সম্প্রসারিত হয়েই চলেছিল তখন সে গুলির জন্য নিয়োগ এক নির্দিষ্ট অঙ্কে স্থির হয়েছিল। এই প্রকল্পটিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব যাঁর ছিল সেই স্যার জন স্ট্র্যাচি পদ্ধতিটির এই দুর্বলতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ ছিলেন। নির্দিষ্ট নিয়োগের পরিবর্তে তিনি প্রদেশগুলিকে কয়েকটি রাজস্বের উৎস প্রদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন, যা থেকে প্রাপ্তির ব্যাপারটি প্রধানত নির্ভর করত সঠিক পরিচালন ব্যবস্থার উপর। এই কাজটি করার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিকীকরণ করা পরিষেবাগুলির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনগুলির

জন্য উন্নততর এবং আরও সম্প্রসারণশীল ব্যবস্থা করা। কিন্তু তাঁর আরও একটা এবং তিনি যা অনুমান করেছিলেন, আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল নিয়োজিত রাজস্বের নিয়োগগুলির প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে। ভাল পরিচালন ব্যবস্থার সুফল যে ব্যয়সংকোচ সেটা তখন সর্বজনবিদিত সাধারণ সত্য হয়ে গেছে, কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুষই সঠিকভাবে জানত ভাল পরিচালন ব্যবস্থা কি কি উপাদানে গঠিত। স্যার জন স্ট্র্যাচিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি নির্ভুল ভাষায় ভাল পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন, যা তার সময় থেকে প্রাদেশিক বিত্তের উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় প্রযোজ্য হচ্ছিল। তাঁর মতে বিত্তের ভাল পরিচালন ব্যবস্থা উপলব্ধ হতে পারে।

'কলকাতা বা সিমলায় শতশত বা হাজার হাজার মাইল দূরে নিজেদের দপ্তরে বসে বিত্ত বিভাগের বা সর্বোচ্চ সরকারের অন্য কোনও বিভাগের ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক গৃহীত কোনও কার্যের দ্বারা নিশ্চয়ই নয়; সংখ্যাতত্ত্ব যাচাই করে বা পরিপত্র লিখে নয়, বরং তা পাওয়া যেতে পারে স্থানীয় সরকারগুলিকে .... একটি এবং বলা যেতে পারে, দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আগ্রহ সৃষ্টি করে।'[১]

এ ব্যাপারে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার জোরদার সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন, কারণ, বিগত পর্যায়ের ফলাফল প্রয়োগ করে প্রদেশগুলি সাম্রাজ্যিক শাসন ব্যবস্থায় যা হত তার চেয়ে রাজস্বের উপর অপেক্ষাকৃত কম খরচের ভার চাপিয়ে পরিষেবাগুলির শুধু যে পরিচালনাই করত তা নয়, বরং বহু দূরবর্তী, সুপরিজ্ঞাত নয় এবং তার ফলে সাম্রাজ্যিক সরকারের দুর্বল তদারকির অধীনে সেগুলি যা করত তার চেয়ে অনেক বেশি রাজস্ব আদায় হত পরিষেবাগুলি থেকে প্রদেশগুলির আরও প্রত্যক্ষ এবং সযত্ন পোষকতার দ্বারা।

স্যার জন স্ট্র্যাচি দীর্ঘকাল এই অভিমত পোষণ করতেন যে, যতদিন পর্যন্ত প্রদেশগুলি রাজস্ব ভারত সরকারের জন্য আদায় করছিল, ততদিন তারা ব্যতিহার (Evosion) আটকাবার জন্য কোন যত্ন নেয় নি, যা তারা অবশ্যই করত যদি তারা তাদের আশু লাভের জন্য আদায় করত, অথবা তিনি যেভাবে বলেছেন,

'স্থানীয় সরকারগুলি যখন মনে করবে যে রাজস্বের শাখাগুলির যথোচিত প্রশাসন তাদের কেবলমাত্র ভারত সরকারকেই একক ভাবে না দিয়ে, বর্ধিত আয় এবং উন্নয়নের কাজগুলি সম্পন্ন করার বর্ধিত উপায় করে দেবে, যা তারা মনে মনে কল্পনা করত, তখন পর্যন্ত এবং তার আগে পর্যন্ত নয়। এবং তা ছিল প্রত্যেকের

১) বিত্তীয় বিবরণ, ১৮৭৭-৭৮।

নিগমবদ্ধ করা (Incorporated) পরিষেবাগুলি থেকে আয়

বিভাজিত পরিষেবা পরিষেবাগুলি	সাম্রাজ্যিক পরিচালনব্যবস্থার অধীনে					প্রাদেশিক পরিচালনব্যবস্থার অধীন				
	১৮৬৫-৬	১৮৬৭-৮	১৮৬৮-৯	১৮৬৯-৭০	১৮৭০-১	১৮৭১-২	১৮৭২-৩	১৮৭৩-৪	১৮৭৪-৫	১৮৭৫-৬
	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড
কারাগার	৮৯,২৬০	৯৬,৯১০	১৪১,২১৮	১৩৩,৮০৬	১২৮,৭৭৩	১৪৯,৮৮৮	১৯৫,৭৫৫	২৭১,৯১৫	২৩৭,১৯৮	৩২৬,০২৩
পুলিশ	১৪০,১৬৬	২৩১,৮৫৯	২৭৭,১৭৯	২৮৭,৫২৯	২৭০,৮৫৫	২০৩,৬২৪	৯৭,৭৩৫	৯০,৭০৮	৮০,৫০৯	৮৯,৮৯৫
শিক্ষা	৫৩,২৫৬	৬৩,৮৬৯	৬৭,২০৭	৭২,৮৪৮	৬০,৭৪০	৭৬,৭৮৯	৮০,৮৬৯	১০১,৩০৬	৯৯,৫৩৭	১০১,৯০৯
নিবন্ধভুক্তকরণ	৮৬,৯৯৭	১২৭,০৭০	১৫৩,৪৮৮	১৬৫,০৪৮	১৪৭,১৫২	১৫৫,২৬২	১৭১,৭৩৫	১২১,৪৭০	১৭২,১১১	১৮৪,৪৬১
ছাপাখানা	৩,৩৩৩	৩,২৮২	২,৮০৩	৩,৭১৮	৯,২৪৪	১০,৯২৩	১৪,৩৮৩	২১,১৭৪	১৮,২২০	১৮,০৬৬
চিকিৎসাবিষয়ক	...	...	...	...	৩,২৭৩	২০,৫৯৪	৩০,৬৪৯	৩৬,৩৭০	৪৩,০৯৭	২৬,৫৮৩
বিবিধ	৪,০৭০	৫,৬৬৬	৪,০৭৬	৪,৪৮৯	৬,১১৬	২০,৯৯১	৩১,৩৪৫	৩২,৩৯৬	৩৯,৬৬৬	৩৬,২৩৪

উপরিউক্ত অভিন্ন উৎস থেকে সংকলিত

কাঙ্ক্ষিত যথোচিত সৎ প্রশাসন।'

প্রাদেশিকীকরণ করা পরিষেবাগুলি থেকে বর্ধিত আয়ের এই সাক্ষ্য প্রমাণ ফলে হয়ে উঠেছিল এক অপ্রত্যাশিত আনন্দের কারণ, এবং তা পর্যাপ্ত পরিমাণে তার সমর্থিত ধারণাটিকেই সত্য বলে অনুমোদন করেছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে এক দ্বিবিধ উদ্দেশ্য, রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে স্থিতি-স্থাপকতার প্রবর্তন করার জন্য স্যার জন স্ট্র্যাচি প্রদেশগুলিকে সরবরাহ করার জন্য নিয়োগের পরিবর্ত হিসাবে নিয়োজিত রাজস্বকে প্রবর্তন করেন।

স্যার জন স্ট্র্যাচি কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনায় নতুন কিছু ছিল না, বা সেই প্রথম তা সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত হয়নি। ১৮৭০ সালে প্রাদেশিক বিত্ত সম্বন্ধে আলোচনায় যারা যোগদান করেছিলেন তাদের মাথায় এটা ছিল, এবং তার সপক্ষে প্রকৃত পক্ষে প্রচার চালান স্যার জন স্ট্র্যাচি ১৮৭২[২] সাল থেকেই। ভারত সরকার যে ১৮৭০ সালে পরিকল্পনাটিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখে নি তার কারণ ছিল এই যে, ভারত সরকার রাজস্বের উৎস গুলিকে পাকাপাকি ভাবে হস্তান্তরণ করতে ভয় পাচ্ছিল, যে রাজস্বের বৃদ্ধির উপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ইত্যবসরে অবশ্য ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছিল এবং প্রাদেশিক পরিচালন ব্যবস্থার ছ'বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও প্রকল্পটি সম্বন্ধে আরও বেশি পরিমাণ আস্থা সৃষ্টি করেছিল সেই সব মানুষদের মনে যারা প্রকল্পটির প্রশাসনিক উপযোগিতাকে কখনই পুরোপুরি মেনে নেয় নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর মিতব্যয়িতার ব্যাপারে যা হয়েছিল সেই মত তাদের সম্পদগুলির ক্ষেত্রে বর্ধিত উৎপাদনের মাধ্যম হয়ে ওঠা প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। এইসব উপাদানগুলির শক্তি একত্রিত হয়ে প্রাদেশিক বিত্তের বিবর্তনে এক নতুন অধ্যায় যোগ করেছিল, সরবরাহের বিশিষ্ট প্রণালী গৃহীত হবার ফলে যাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে নিয়োজিত রাজস্বের দ্বারা আয়-ব্যয়কের এক অধ্যায় হিসাবে।

নিঃসন্দেহে, (রাজস্ব) নিয়োগ এই নতুন পদ্ধতির একটা অংশ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা হয়েছিল সেই ধরনের রাজস্ব গুলিকে নিয়োগ করার অসুবিধার জন্য, যার উৎপাদ সন্নিবেশিত ব্যয়ের সম্পূর্ণ সমান হতে পারত। যে কোনও পরিস্থিতিতেই কিছু পার্থক্য তো থাকতে বাধ্য। দেখা গেল যে সমর্পিত রাজস্বের স্বাভাবিক প্রাক্‌কলিত উৎপাদ প্রয়োজনের চেয়ে কম পড়ে গেল এবং পার্থক্যের অতিরিক্ত অংশটিকে পূরণ করতে হয়েছিল প্রতিটি প্রদেশের ক্ষেত্রে সমন্বিত করা কিছু নিয়োগের দ্বারা।

---

১) দ্রষ্টব্য তাঁর সংক্ষিপ্তসার, তারিখ ২৭ জুলাই, ১৮৭২।

বিভিন্ন প্রদেশের জন্য সমন্বিত করা নিয়োগের পরিমাণ নির্দিষ্ট করার পদ্ধতিটি মোটের উপর সামান্য একটু জটিলও ছিল, এবং বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের গঠন বিন্যাস, তাদের বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ভাবে বিধি-বদ্ধ আছে, তা পরীক্ষা করতে যাওয়ার আগে উপযুক্ত রূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রদেশগুলির মোট সম্পদগুলি বিন্যস্ত হয়েছিল এই পদ্ধতির অধীনে (১) সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলি থেকে উদ্ভূত আয়, (২) নিয়োজিত রাজস্বগুলির উৎপাদ, (৩) সমন্বিত করা নিয়োগ। কোনও একটি বিশেষ প্রদেশের জন্য একটি সমন্বিত নিয়োগ কিভাবে স্থির করা হবে এই প্রশ্নটির সঙ্গে সুবিবেচিত হিসাব নিরূপন করার বিষয়টি জড়িত। সমন্বয় করা নিয়োগের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাতত্ত্বে পৌঁছবার আগে সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলি থেকে এবং প্রদত্ত রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয়ের স্বাভাবিক উৎপাদকটিকে স্থির করা সুস্পষ্টতই প্রয়োজন ছিল। স্বাভাবিক উৎপাদের পরিমাণ নির্ধারণ ছিল বিতর্কিত বিষয়। সাধারণ কাজের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে ভারত সরকার পর্যায়ক্রমে কয়েকটি বছরের সমষ্টিকে একক ধরে তার গড় উৎপাদকে স্বাভাবিক উৎপাদ হিসাবে গ্রহণ করেছিল, এবং সেগুলিকেই ভিত্তি হিসাবে নিয়েছিল (রাজস্ব) নিয়োগগুলির হিসাব-গণনা করতে। অনুরূপ ভাবে বিগত বছরগুলিতে রাজস্বের বার্ষিক বৃদ্ধির ভিত্তিতে ভারত সরকার প্রতিটি উৎসের নির্দিষ্ট স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার অনুমান করে নিয়েছিল, যাতে আগামী বছরগুলির জন্য যা স্বাভাবিক তা পূর্ববর্তী বছরের স্বাভাবিকের চেয়ে অনুমিত বার্ষিক ক্রমবৃদ্ধির স্বাভাবিক হারে বেশি। এবং যেহেতু নিয়োজিত রাজস্বের স্বাভাবিক উৎপাদ তাদের অনুমিত স্বাভাবিক বৃদ্ধির হারে বর্দ্ধিত হয়েছিল, তাই পরবর্তী বছর গুলির জন্য নির্দিষ্ট করা নিয়োগ সমান অনুপাতে হ্রাস পেয়েছিল। নিয়োজিত রাজস্বের জন্য অনুমিত এই বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার মাঝে মাঝে এমন অনুমানে পরিণত হয়েছিল, যা তাদের অতীতের উৎপাদনশীলতার দ্বারা অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়। যে কোনও অবস্থায় যেহেতু বৃদ্ধির উচ্চতর হারের অর্থ হল হ্রাসপ্রাপ্ত নিয়োগ, তাই প্রদেশগুলি এর আয়তন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। প্রদেশগুলিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য এবং প্রাক্কলন করার ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তির জন্য ন্যায্য অধিদেয় (allowance) দেবার জন্য ভারত সরকার অত্যন্ত কৌশলে উদ্ভাবিত বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছিল। ভারত সরকার স্বীকার করেছিল যে, প্রকৃত ফলাফল প্রাক্কলিত স্বাভাবিক উৎপাদ থেকে বিচ্যুতির পরিচয় দিয়েছিল, হয় কম বা বেশি, এবং সেগুলি প্রাদেশিক এবং সাম্রাজ্যিক সরকারগুলির মধ্যে সমভাবে বন্টন করা উচিত। যদি প্রকৃত উৎপাদ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয় তবে নির্দিষ্ট বছরের জন্য

সাম্রাজ্যিক সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্ধারিত সমন্বিত করা নিয়োগ হ্রাস পাবে অতিরিক্তের অর্ধেক পরিমাণ এবং তা যদি স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয় তবে নিয়োগ ঘাটতির অর্ধেক পরিমাণ বাড়তে পারে।

এইসব সূক্ষ্ম ক্রিয়াকৌশল অবলম্বিত হয়েছিল প্রধানত সেই সুবিধাজনক প্রণালীর জন্য যার মাধ্যমে ভারত সরকার সমর্থ হয়েছিল উভয় পক্ষের উপর অযথা কষ্টের বোঝা না চাপিয়ে নিয়োগগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে। এছাড়াও একটা সুবিধা ছিল, যদিও তা সে সময়ে ঠিকমতো উপলব্ধি করা যায় নি, অথচ তৎসত্ত্বেও সেটা ফলপ্রসূ ছিল। স্বাভাবিক প্রাক্কলনে সম্ভাব্য ঘাটতির বোঝার অর্ধেক বহন করার জন প্রদেশগুলি কাছ থেকে আদায় করা সম্মতি হস্তান্তরিত রাজস্বের মিতব্যয়ী ও বিচক্ষণ প্রশাসনের উপর প্রত্যক্ষভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল এক অধিহার (premium) যদি ভারত সরকার প্রাক্কলিত স্বাভাবিকের চেয়ে কম ঘাটতির সবটাকে বহন করতে রাজি হত তবে প্রদেশগুলি নিজেদের সম্পদকে সেই মাত্রায় উন্নিত করতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিজেদের সচেষ্ট করে তুলত কি যাতে তাদের উৎপাদ স্বাভাবিকের স্তরে উঠে আসতে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কিন্তু ঘাটতির অর্ধেক বহন করার ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব অধিকতর অনুপাতে বাড়তে পারে এই আশংকা এবং নিঃসন্দেহে তাই ঘটতে পারে যদি রাজস্বের পরিমাণ ভালমত কমে যায়, তাদের বাধ্য করেছিল অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করত অন্য অবস্থায় যা করত তার তুলনায়। এইভাবে শিথিলতার উপর যখন ফলপ্রসূ বিধিনিষেধ আরোপের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তখন প্রকল্পটির মধ্যে উদ্যমে উৎসাহ যোগানোর অভাব ছিল না। স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্তের অর্ধেক লাভ করার সম্ভাবনা প্রদেশগুলিকে আরও প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ জুগিয়েছিল তাদের সম্পদগুলিকে স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়িয়ে নিতে অন্তত তার তুলনায় যা ঘটতে পারত, যদি সাম্রাজ্যিক সরকার মোট অতিরিক্তের সবটাই আত্মসাৎ করে নিত। সংক্ষেপে, ঘাটতির বাধাকারক প্রভাব সহ্য করা এবং লাভের উৎসাহবর্ধক প্রভাব থেকে সুবিধা অর্জন করার বিষয়টি প্রাদেশিক বিত্তের কার্য-সাধনোপায়কে যতটা সম্ভব নিখুঁত করা তা করেছিল ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা এবং সম্পদগুলির উৎপাদনশীলতার দৃষ্টিকোণের বিচারে।

প্রাদেশিক বিত্তের ক্ষেত্রে এই নতুন পদক্ষেপের ধারণা ও তা কার্য করা এবং এর অভিনবত্বের লক্ষণ বৈশিষ্ট্যগুলির মূলে যে উপাদানগুলি ছিল তা লক্ষ করার পর আমরা এবার অগ্রসর হতে পারি প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে ও তাদের মধ্যে সন্নিবেশিত রাজস্ব ও খরচাদি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করতে। দুর্ভাগ্যবশত প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা সম্ভব নয়,

কারণ সকল প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে সমভাবে খরচগুলি সন্নিবেশিত করা হয়নি। আয় এটাই আমাদের বাধ্য করছে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ক গুলিকে বিশ্লেষণ করার কাজে অগ্রসর হত, যেভাবে যেগুলি পুনর্গঠিত হয়েছিল ১৮৭৭-৭৮ সালে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যা[১]

প্রদেশের আয়-ব্যয়কটি ইতিমধ্যে বরাদ্দ করা দফাগুলির সঙ্গে যুক্ত করে পরিবর্ধন করার বদলে নতুন করে হিসাব করা হয়েছিল, যেমনটি করা হয়েছিল অন্য কয়েকটি প্রদেশ সম্বন্ধে। এই নতুন আঙ্গিকে এ দেশের আয়-ব্যয়ক ব্যয় এবং রাজস্বের নিম্নলিখিত হিসাবের খাতে সন্নিবেশিত হয়েছিল :

খরচের হিসাবের খাত	রাজস্বের হিসাবের খাত
৩। সব নিয়োজিত রাজস্ব প্রত্যার্পন।	
৪। ভূমি রাজস্ব (বন্দোবস্ত, জেলা ও গ্রামের আধিকারিকদের এবং বাহবার এস্টেটের জন্য প্রদত্ত ভাতা, এবং উ: প: প্রদেশে চুক্তিবদ্ধ জন-পালন কৃত্যকের আধিকারিকদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ সামরিক ক্ষতিপূরণ বাদে)	১। ভূমিরাজস্ব—তরাই অঞ্চল থেকে আদায় করা। মির্জাপুরের ডুডি এস্টেট এবং পাথরের খনি থেকে।
৬। অন্তঃশুল্ক	৪। অন্তঃশুল্ক
১০। প্রমুদ্রা (Stamps)	৯।প্রমুদ্রা
১৪। প্রশাসন (হিসাব এবং পত্রমুদ্রাধিকারিকগণ বাদে)	
১৬। আইন এবং বিচার (উ: প: প্রদেশে চুক্তিবদ্ধ জনপালন কৃত্যকের আধিকারকদের প্রদত্ত বিশেষ সাময়িক ভাতা বাদে)	১৩। আইন ও বিচার
১৭। পুলিশ	১৪। পুলিশ
১৯। শিক্ষা	১৬। শিক্ষা

১। বিত্ত বিভাগের বিজ্ঞপ্তি নং ১৮০৭, ভারতের গেজেট, প্রথম খণ্ড, ৩১ মার্চ ১৮৭৭, পৃ: ১৭২।

খরচের হিসাবের খাত	রাজস্বের হিসাবের খাত
২১। চিকিৎসা সংক্রান্ত (অসামরিক স্থানীয় দপ্তরগুলির ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক আধিকারিকদের বেতন বাদে)	
২২। লেখ্য-সামগ্রীও ছাপাখানা	
২৮। বিবিধ (সঞ্চিত সম্পদ এবং ১০ হাজার টাকার বেশি যে কোনও গণনা-বহির্ভূত দফা বাদে) বাস্তুকর্ম সাধারণ; সড়ক ও বিবিধ জন উন্নয়নমূলক কর্ম, অসামরিক ভবনাদি (অফিস, ডাকঘর ও তার ভবনাদিবাদে), এবং সাধনযন্ত্র এবং শিল্পশালা; বাস্তুকর্ম বিভাগের সকল বাস্তুকর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিও সামরিক কর্ম ও জলসেচ শাখাগুলি বাদে; সাম্রাজ্যিক সরকার খরচের উপর তাদের ব্যয়ের ২০ শতাংশ দিত সাম্রাজ্যিক তহবিল থেকে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা কৃত কর্ম ও মেরামতির কাজের জন্যও।	২০। বিবিধ ('বিনিময়ের মাধ্যমে আয়' আদেয়কের (Bill) উপর অধিহার (Prem ium), দাবিদারহীন আদেয়ক এবং প্রতিটি ১০০০০ টাকার বেশি কোনও গণনা বহির্ভূত দফা বাদে)।

রাজস্বের হিসাবের খাত নির্দিষ্ট করার জন্য ভারত সরকার এই শর্তটি জুড়ে দেয় যে,

'উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যার সরকারগুলি অবশ্যই সাম্রাজ্যিক কোষাগারে সমর্পণ করতে যে-কোনও পরিমাণ অর্থের অর্ধেক যা অন্তঃশুল্ক, প্রমুদ্রা এবং আইন ও বিচার (কারা ও নিবন্ধভুক্তকরণ বাদে) থেকে প্রাপ্ত নিট রাজস্ব এইসব হিসাবের খাত থেকে প্রত্যার্পণের পরিমাণ এবং অন্তঃশুল্কের ৬ নং-এর অধীনে ও প্রমুদ্রার ১০ নং-এর অধীনে খরচাদিবাদে, ৮৩,৭৫,০০০ টাকার অতিরিক্ত হবে এবং উৎপাদন যদি উপরোক্ত অর্থের পরিমাণের চেয়ে কম হয় তবে ঘাটতির অর্ধেকের সমতুল্য পরিমাণ অর্থ প্রদেশকে পরিশোধ করতে রাজি হয়েছিল। এই সমন্বয় কার্যকর করা হয়েছিল প্রদেশের উদ্বর্তকে কাজে লাগিয়ে যাতে করে যদি সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলির বাবদ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যার ব্যয় বেশি হয়ে যায় হিসাবীকৃত রাজস্ব ও তার সঙ্গে সংযোজিত সেগুলির সমর্থনে প্রাদেশিক অর্থ-সাহায্য ৮৩,৭৫,০০০ টাকার চেয়ে কম পরিমাণে, তবে পার্থক্যটি যোগ করতে হবে; এবং যদি ঐ অতিরিক্ত ব্যয় ৮৩,৭৫,০০০ টাকার চেয়ে বেশি হয়ে যায়

তবে পার্থক্যটি সাম্রাজ্যিক কোষাগারে থাকা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং অযোধ্যা সরকারের যে উদ্বর্ত থাকবে তা থেকে বাদ দিতে হবে।

বঙ্গদেশ

বঙ্গদেশ আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত ব্যয়ের দফা	অনুদান যা ১৮৭৭-৭৮ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল	ছাঁটাই	প্রস্তাবিত একীকৃত অনুদান
৩। অন্তঃশুল্ক, প্রমুদ্রা, আইন ও বিচার থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ও আমানতের প্রত্যার্পণ।	৪,৯১,০০০	.....	৪,৯১,০০০
৪। ভূমি রাজস্ব (সমাহর্তা, উপ-মহাধ্যক্ষ ইত্যাদি, ভূমি-রাজস্ব আদায়ের প্রতিষ্ঠান ও খরচ)	২২,৬২,০০০	.....	২২,৬২,২০০
৬। সুরাসার ও ভেষজ পদার্থের উপর ধার্য অন্তঃশুল্ক	২,৯২,০০০	.....	২,৯২,০০০
৮। বহিঃশুল্ক	৬,৯৩,০০০	.....	৬,৯৩,০০০
৯। লবণ	৩৯,০০০	.....	৩৯,০০০
১১। প্রমুদ্রা	২,৩৮,০০০	.....	২,৩৮,০০০
১৫। প্রশাসন (হিসাবরক্ষার দপ্তর, প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদত্ত ভাতা, প্রেসিডেন্সিতে লেখ্য-সামগ্রীর দপ্তর এবং দেশে লেখ্যসামগ্রীর খরিদ বাদে)।	১২,৬১,০০০	.....	১২,৬১,০০০
১৬। গৌণ বিভাগগুলি (আবহবিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগগুলি, আদমসুমারি ও সরকারি সাংবাদিক বাদে)	১,৬৮,০০০	.....	১,৬৮,০০০
১৭। আইন এবং বিচার (আইন বিষয়ক আধিকারিকরা বাদে)	৬৩,৯৭,০০০	১,০০,০০০	৬২,৯৭,০০০
১৮। নৌ-বিভাগ	১০,৯২,০০০	.....	১৩,৯২,০০০
২৩। রাজনৈতিক (সরকারি ভবনের পুলিশ পাহারা)	৭,০০০	.....	৭,০০০
২৬। বিবিধ (সঞ্চিত সম্পদ প্রেরণ বাদে)	২৫,০০০	.....	২৫,০০০
লেখ্য-সামগ্রী ও প্রমুদ্রা	৪,৯৮,০০০	৫০,০০০	৪,৪৮,০০০
২৭। প্রাদেশিক বরাদ্দ যা বিদ্যমান আছে	১,১০,৫৯,০০০	৪,৪০,০০০	১,০৬,১৯,০০০
বিশপের প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি	৭,০০০	.....	৭,০০০
মোট	২,৪৫,২৯,০০০	৫,৯০,০০০	২,৩৯,৩৯,০০০

বঙ্গপ্রদেশের[১] আয়-ব্যয়ক ইতিমধ্যে সন্নিবেশিত রাজস্ব ও ব্যয়ের খাতগুলির সঙ্গে সংযোজনের দ্বারা পুনরায় রচিত হওয়ার বদলে পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল। প্রকল্পের দ্বিতীয় অধ্যায়ের জন্য পূর্ব পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সারণিতে প্রদত্ত খরচাদির জন্য বঙ্গদেশ সরকারকে দায়ী করা হয়েছিল।

এই খরচাদি বহন করার জন্য নিম্নলিখিত রাজস্ব বঙ্গদেশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল তার ব্যবহারার্থে :—

নিয়োজিত রাজস্ব (০০০ বাদ দেওয়া হয়েছে)

রাজস্বের হিসাবের খাত	অনুমিত উৎপাদ ১৮৭৬-৭ সালে	কল্পিত বৃদ্ধির হারে অনুমিত উৎপাদ				
		১৮৭৭-৮	১৮৭৮-৯	১৮৭৯-৮০	১৮৮০-১	১৮৮১-২
	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:
৪। সুরাসার ও ভেষজ পদার্থের অন্তঃশুল্ক	৬,৩০০	৬,৪০০	৬,৫০০	৬,৬০০	৬,৭০০	৬,৮০০
৬। বহিঃশুল্ক (দ্রষ্টব্য, বহিঃ শুল্ক, বিবিধ এবং গুদাম ও জেটি ভাড়া)	৩,৬০০	৩,৬০০	৩,৬০০	৩,৬০০	৩,৬০০	৩,৬০০
৭। লবণ (গুদাম ঘরের ভাড়া, জরিমানা এবং বাজেয়াপ্ত করাও বিবিধ	২২০	২২০	২২০	২২৩	২২০	২২০
৯। প্রমুদ্রা	১০,৩০০	১০,৫৭৫	১০,৮৫০	১১,১২৫	১১,৪০০	১১,৬৭৫
১০। আইন ও বিচার						
১৪। নৌ-বিভাগ (চালকের পারিশ্রমিক বাবদ প্রাপ্য, নিবন্ধ-ভুক্তকরণ এবং অন্যান্য) ফিজ এবং বিবিধ	১,০৯১	১,০৮৪	১,০৮৪	১,০৮৪	১,০৮৪	১,০৮৪
১৫। বিবিধ (সবকিছুই শুধু আদেয়কের অধিকার, দাবিহীন আদেয়ক, এবং ১০০০০ টাকার ঊর্ধ্বে যে কোনও গণনা বহির্ভূত দফা	৭৭১	৭৯২	৭৯২	৭৯২	৭৯২	৭৯২
মোট	.....	২২,৬৭১	২৩,০৭৬	২৩,৪২১	২৩,৫৯৬	২৪,১৭১

উপরে উল্লেখিত গেজেট অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত বিবরণ থেকে সংকলিত

১। গেজেট অফ ইণ্ডিয়া, খণ্ড-১, পৃ. ১৭৪, মার্চ ৩১, ১৮৭৭।

কিন্তু যেহেতু নিয়োজিত রাজস্ব হস্তান্তরিত ও সন্নিবেশিত ব্যয়গুলি বহন করার পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। তাই ভারত সরকারকে দিতে হবে এমন স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্তগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরার পর, সরকার সাম্রাজ্যিক কোষাগার থেকে বঙ্গদেশ সরকারকে নিম্নলিখিত নিয়োগগুলি দিতে রাজি হয় :—

বৎসর	নিয়োগ
	টাকা
১৮৭৭-৭৮	৪৮,৩২,০০০
১৮৭৮-৭৯	৪৪,৫৭,০০০
১৮৭৯-৮০	৪০,৮২,০০০
১৮৮০-৮১	৩৭,০৭,০০০
১৮৮১-৮২	৩৩,৩২,০০০

মধ্যপ্রদেশ[১]

মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে তার আয়-ব্যয়কে নিম্নলিখিত দফাগুলি সন্নিবেশিত হয়েছিল :—

ব্যয়ের হিসাবের খাত	অনুদান যা ইতিমধ্যে ১৮৭৭-৭৮ সালের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল	ছাঁটাই	প্রস্তাবিত নিট একীকৃত অনুদান
অন্তঃশুল্ক, প্রমুদ্রা, আইন ও বিচার	টা:	টা:	টা:
এবং বিবিধের প্রত্যর্পণ	৪৭,০০০	....	৪৭,০০০
অন্তঃশুল্ক	৫২,০০০	....	৫২,০০০
প্রমুদ্রা	১৪,০০০	....	১৪,০০০
ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যয় ব্যতিরেকে	৬,৬৬,০০০	....	
প্রশাসন (হিসাব ও মুদ্রা দপ্তর ছাড়া)	৩,৩৯,০০০		
গঠন বিভাগ (আবহ-বিজ্ঞান ও	৪,০০০	৯০,০০০	১৭,৭৪,০০০
প্রত্নতত্ত্ব ছাড়া) আইন ও বিচার	৬,৯১,০০০		
লেখ্য-সামগ্রী ও প্রমুদ্রা	৬৯,০০০		
বিবিধ (সঞ্চিত সম্পদ পাঠান এবং			
সরবরাহ আদেয়কে প্রদত্ত ছাড়া বাদে)	৫০০০		
যোগ দাও—			
প্রাদেশিক পরিষেবাগুলির জন্য বর্তমান			
বরাদ্দ পরিষেবার জন্য মোটা অনুদান	২৭,৭৩,০০০	....	২৭,৭৩,০০০
যা চাপানো হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের			
আয়-ব্যয়কে	৪৬,৬০,০০০	....	৪৫,৭০,০০০

১। গেজেট অফ ইন্ডিয়া ; তাং ২ জুন ১৮৭৭, পৃ: ২৭৪

এই ব্যয়গুলি বহন করার জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকারকে নিম্নলিখিত রাজস্ব-উৎসগুলির উৎপাদকে নিজের কার্যে ব্যবহার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল :—

নিয়োজিত রাজস্বের খাত	১৮৭৬-৭ সালে অনুমিত উৎপাদ	কল্পিত বৃদ্ধির হারে অনুমিত উৎপাদ এই বছরগুলিতে		
		১৮৭৭-৮	১৮৭৮-৯	১৮৭৯-৮০
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
অন্তঃশুল্ক	১৩,৯০,০০০	১৪,৫০,০০০	১৫,১০,০০০	১৫,৭০,০০০
প্রমুদ্রা	৯,৭০,০০০	৯,৭৫,০০০	৯,৮০,০০০	৯,৮৫,০০০
আইন ও বিচার	১,৬৭,০০০	১,৭৫,০০০	১,৮৩,০০০	১,৯১,০০০
বিবিধ (আদেয়কের অধিহার, কাটা হয়নি এমন হুন্ডি এবং প্রতিটি ১০ হাজার টাকার ঊর্দ্ধে যে কোনও হিসাব বহির্ভূত দফা	৭,০০০	৭,০০০	৭,০০০	৭,০০০
মোট	....	২৬,০৭,০০০	২৬,৮০,০০০	২৭,৫৩,০০০

পূর্বোক্ত গেজেট থেকে সংকলিত।

এইসব রাজস্বগুলি পর্যাপ্ত না হওয়ায় ভারত সরকার যেগুলিকে পূরণ করার জন্য সাম্রাজ্যিক রাজস্ব থেকে নিম্নলিখিত নিয়োগগুলি দেওয়ার দায়িত্ব নেয় :—

বৎসর	নিয়োগ
	টাকা
১৮৭৭-৭৮	১৯,৬৩,০০০
১৮৭৮-৭৯	১৮,৯০,০০০
১৮৭৯-৮০	১৮,১৭,০০০

এই নিয়োগগুলি অবশ্য নিয়োজিত রাজস্বের পক্ষে প্রযোজ্য অনুবিধির জন্য পরিবর্তন সাপেক্ষ। এই অনুবিধির বলে ভারত সরকার তাদের হিসাবীকৃত স্বাভাবিকের অতিরিক্ত সম্মিলিত বার্ষিক উৎপাদের নিট বৃদ্ধির অর্ধেক দাবি করতে পারত এবং যদি তাদের প্রকৃত সম্মিলিত উৎপাদ স্বাভাবিকের চেয়ে কম হত তবে ঘাটতির অর্ধেক তাকে বহন করতে হত। যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি বেশি হত তবে নিয়োগগুলি থেকে বৃদ্ধির অর্ধেকের সম

পরিমাণ অর্থ কমাতে হত এবং যদি হ্রাস পেত তবে নিয়োগগুলি বাড়াতে হতে হ্রাসের অর্ধেকের সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে।

বোম্বাই

বোম্বাই সরকারের প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের[১] প্রসঙ্গে এসে আমরা দেখতে পাই যে, নিম্নলিখিত খরচগুলি এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে :—

খরচের হিসাবের খাত	১৮৭৮-৮-এর জন্য ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট করা অনুদান	ছাঁটাই	একীকৃত অনুদান
	টাকা	টাকা	টাকা
৩। প্রত্যর্পণ	১,১০,০০০		
৪। ভূমি রাজস্ব	৬৫,০৭,০০০		
৬। অন্তঃশুল্ক	৮০,০০০		
৭। বহিঃশুল্ক	৮,০৯,০০০		
৮। লবণ	৫,৬৯,০০০		
১৪। প্রশাসন	১১,৪৩,০০০		
১৫। গৌণ বিভাগ	১,১৩,০০০		
১৬। আইন ও বিচার	৪৩,১২,০০০	৫,৬৭,০০০	২,১৩,৯৬,০০০
১৮। সামুদ্রিক	৩১,০০০		
২০। গির্জা সম্পর্কীয়	৩,২৫,০০০		
২১। চিকিৎসা বিষয়ক	২,৬৮,০০০		
২২। লেখ্য সামগ্রী ও প্রমুদ্রা	২,২৯,০০০		
২৪। ভাতা ও নিয়োগ	৬৪,৮১,০০০		
২৬। বার্ধক্য (Superannuation) ভাতা	৮,০০,০০০		
২৮। বিবিধ	২৮,০০০		
যোগ দাও—			
প্রাদেশিক পরিষেবাগুলির জন্য বর্তমান বরাদ্দ	১,০৪,৫৪,০০০	....	১,০৪,৫৪,০০০
মোট	৩,২৪,১৭,০০০	৫,৬৭,০০০	৩,১৮,৫০,০০০

১। গেজেট অফ ইন্ডিয়া, প্রথম খণ্ড, তাং ৪ আগস্ট ১৮৭৭, পৃঃ ৪৬৮।

ইতিমধ্যে সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলি থেকে উদ্ভূত আয়গুলি ছাড়া ভারত সরকার রাজস্বের নিম্নলিখিত উৎসগুলি নিয়োগ করেছিল বোম্বাই সরকারকে: —

নিয়োজিত রাজস্ব (০০০ বাদ দেওয়া হয়েছে)

নিয়োজিত রাজস্বের হিসাবের খাত	হিসাবীকৃত উৎপাদ ১৮৭৬-৭৭ সালে	অনুমিত বৃদ্ধির হারে হিসাবীকৃত উৎপাদ এই বৎসরে				
		১৮৭৭-৮	১৮৭৮-৯	১৮৭৯-৮০	১৮৮০-১	১৮৮১-২
	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:
১। ভূমিরাজস্ব (ইনামদারি থেকে প্রাপ্ত আয়ের সমন্বয় সাধন এবং নিষ্ক্রয়ণ (Communication) পরিষেবা)	৫,১৯৯	৬,৬২৪	৬,৬২৪	৬,৬২৪	৬,৬২৪	৬,৬২৪
৪। অন্তঃশুল্ক	৩,৯৪৬	৪,০০০	৪,১০০	৪,২০০	৪,০০০	৪,৪০০
প্রমুদ্রা	৪,১৮৬	৪,৩০০	৪,৩৫০	৪,৫০০	৪,৫৫০	৪,৬০০
আইন ও বিচার	২৭৭	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০	২৭০
মোট	....	৮,৫৭০	৮,৭২০	৮,৯৭০	৯,১২০	৯,২৭০
বিবিধ (বিনিময় থেকে লাভ, আদেয়কের উপর অধিহার এবং মানি-অর্ডার ও তামাদি হয়ে যাওয়া মানি অর্ডার, বিক্রয়, দরবার উপহারের বিক্রয় লব্ধ অর্থ ও হিসাব বহির্ভূত দফার উপর প্রতিটি ১০ হাজার টাকার বেশি বাদে)	৫২	৭০	৭০	৭০	৭০	৭০
মোট	....	১৫,২৬৪	১৫,৪১৪	১৫,৬৬৪	১৫,৮১৪	১৫,৯৬৪

গেজেট অফ ইন্ডিয়া থেকে সংকলিত

বোম্বাই আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত ব্যয় ও রাজস্বের মধ্যে পার্থক্যকে বহন করার জন্য সমন্বয় করা নিয়োগগুলি ছিল নিম্নরূপ : —

বৎসর	নিয়োগ
	টাকা
১৮৭৭-৭৮	১,৫৩,২০,০০০
১৮৭৮-৭৯	১,৫১,৭০,০০০
১৮৭৯-৮০	১,৪৯,২০,০০০
১৮৮০-৮১	১,৪৭,৭০,০০০
১৮৮১-৮২	১,৪৬,২০,০০০

এ কথা অবশ্যই লক্ষ করতে হবে যে, এই নিয়োগগুলি সেইসব অনুবিধির শর্তাধীন ছিল যা মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে উপলব্ধ ছিল।

পঞ্জাব

নিয়োজিত রাজস্বের নীতির ভিত্তিতে যে একমাত্র অবশিষ্ট প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ক রচিত হয়েছিল সেই প্রদেশটি হল পঞ্জাব। এই আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত খরচাদির হিসাবের খাতগুলি অতঃপর এখানে বিশদে বর্ণিত হল —

সন্নিবেশিত ব্যয়ের হিসাবের খাত	১৮৭৭-৮ সালের জন্য স্থিরীকৃত অনুদান	ছাঁটাই	প্রস্তাবিত নিট একীকৃত অনুদান
	টা:	টা:	টা:
প্রত্যর্পণ	৬৫,০০০		
ভূমি-রাজস্ব, ভূবাসন খরচ বাদে	১৬,২১,০০০		
অন্তঃশুল্ক	৫৮,০০০		
প্রমুদ্রা	৭২,০০০		
প্রশাসন (হিসাব এবং মুদ্রা দপ্তর ও ভূ-বাসন সচিব বাদে)	৯,৭৪,০০০		
গঠন, বিভাগগুলি	১৬,০০,০০০	২,২৪,০০০	৫১,৩৮,০০০
আইন ও বিচার	২০,৯৪,০০০		
বার্ধক্য ও অবসর ভাতা, কৃপা ভাতা এবং আনুতোষিক (Gratuity)	৩,৩৮,০০০		

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সন্নিবেশিত ব্যয়ের হিসাবের খাত	১৮৭৭-৮ সালের জন্য স্থিরীকৃত অনুদান	ছাঁটাই	প্রস্তাবিত নিট একীকৃত অনুদান
	টা:	টা:	টা:
বিবিধ, সঞ্চিত সম্পদ প্রেরণ	৪১,০০০		
লেখ্য-সামগ্রী ও প্রমুদ্রা	৮৩,০০০		
যোগ দাও			
প্রাদেশিক পরিষেবাগুলির			
জন্য বর্তমান বরাদ্দ	৫৪,২২,০০০		৫৪,২২,০০০
মোট	১,০৭,৮৪,৩০০	২,২৪,০০০	১,০৫,৬০,০০০

এই সব খরচ বহন করার জন্য নিম্নলিখিত রাজস্বগুলি পঞ্জাব সরকারকে নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছিল : —

নিয়োজিত রাজস্বের হিসাবের খাত	নিট রাজস্ব ১৮৭৬-৭ সালে	হিসাবীকৃত নিট উৎপাদ এই বছরগুলিতে		
		১৮৭৭-৮	১৮৭৮-৯	১৮৭৯-৮০
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
ধার্যকরা কর	....	....	১২,০০,০০০	১২,০০,০০০
প্রমুদ্রা		২৪,৮৫,০০০	২৫,০৫,০০০	২৫,২৫,০০০
আইন ও বিচার	....	৪,১৫,০০০	৪,১৫,০০০	৪,১৫,০০০
অন্তঃশুল্ক	....	১০,৩০,০০০	১০,৫০,০০০	১০,৭০,০০০
	....	৩৯,৩০,০০০	৩৯,৭০,০০০	৪০,১০,০০০
বিবিধ (বিনিময়ের দ্বারা লাভ আদেয়কের উপর অধিহার তামাদি হুন্ডি বাদে)	....	৬০,০০০	৬০,০০০	৬০,০০০
মোট	....	৩৯,৯০,০০০	৫২,৩০,০০০	৫২,৭০,০০০

এই রাজস্বগুলি হস্তান্তর করতে গিয়ে ভারত সরকার প্রমুদ্রা, আইন ও বিচার এবং অন্তঃশুল্ক থেকে প্রাপ্ত নিট উৎপাদে উন্নতির একটা অংশ নিজের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছিল। হিসাবীকৃত নিট উৎপাদ হিসাবীকৃত ব্যয়ের চেয়ে কম হয়ে যাওয়ায় ভারত সরকার পঞ্জাব সরকারকে তার আয়-ব্যয়কে সমন্বয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিম্নলিখিত নিয়োগগুলি করতে রাজি হয়েছিল : —

বৎসর	নিয়োগ	অন্তঃশুল্ক, প্রমুদ্রা, আইন ও বিচার থেকে প্রাপ্ত নিট রাজস্বের উন্নয়নে অংশ বাদে	নিট নিয়োগ
	টা:	টা:	টা:
১৮৭৭-৮	৬৫,৭০,০০০	১,০৭,০০০	৬৪,৬৩,০০০
১৮৭৮-৯	৫৪,৪০,০০০	৮৫,০০০	৫২,৫৫,০০০
১৮৭৯-৮০	৫৩,১০,০০০	....	৫৩,১০,০০০

এ কথা লক্ষ করা উচিত যে, নিয়োজিত রাজস্বের এই নতুন নীতির ভিত্তিতে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ক রচনার দায়িত্ব নিতে মাদ্রাজ সরকার রাজি হয়নি। পুরনো নিয়মের ভিত্তিতেই থাকা অধিকতর পছন্দ করেছিল তারা। অসম ও ব্রহ্মদেশের আয়-ব্যয়ক এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যেহেতু তাদের সংবিধানের সঙ্গে জড়িত নীতির সংশ্লিষ্ট ছিল পরবর্তী অধ্যায়ের গবেষণার সঙ্গে, তাই বর্তমানে তা অন্তর্ভুক্ত করা উপযুক্ত মনে করা হয়নি।

প্রাদেশিক আয়-ব্যয়গুলির বিকাশের দ্বিতীয় অবস্থার গবেষণা সমাপ্ত করার আগে প্রাদেশিক সরকারগুলির পর্যাপ্ততার এবং রাজকীয় রাজস্বের লাভের দৃষ্টিকোণের বিচারে এটা চালু থাকাকালীন যে সাফল্য অর্জন করা হয়েছিল তার মূল্যায়ন করা যুক্তিযুক্ত। প্রদেশগুলির পর্যাপ্ততর দৃষ্টিকোণের বিচারে এই অবস্থার কি সুফল পাওয়া গিয়েছিল তার উদাহরণ নিম্নরূপ : —

প্রদেশগুলি	বার্ষিক উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি				
	১৮৭৭-৮	১৮৭৮-৯	১৮৭৯-৮০	১৮৮০-১	১৮৮১-২
	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড
ম: প্রদেশ	৫,৯৯২	৭,০৪৯	-২৮,১৩৩	২,৯৫৬	৯৫,২২১
বঙ্গদেশ	১৭৩,৩৮০	১৫৮,৯৩২	৮২,৫২৩	-১১,৩১৩	২৫৫,১৮৯
উ:প:প্রদেশ ও অযোধ্যা	৪,৪৬৯	২৩৭,১০০	৩২০,৭২৯	২৮০,৭৯০	৬৬৭,৬১৩
পঞ্জাব	১৮,৫৭৮	৪৮,১৯৫	৭,০১৭	৫৯,৪৯৭	১৩৫,৯৭৯
বোম্বাই	-৬০৯,৬৭২	৬১,২৪৯	-১১,২০১	৩৭,৮৫৫	৪১৮,৭৮৩

ভারত সরকারের বিত্ত ও রাজস্ব হিসাব থেকে সংকলিত।

এ থেকে এটা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, বোম্বাই ছাড়া রাজকীয় সরকার কর্তৃক সরবরাহ করা অর্থ প্রাদেশিক আয়-ব্যয়গুলিতে সন্নিবেশিত পরিষেবাগুলিকে চালু রাখার উদ্দেশ্যে শুধু যে পর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছিল তা নয়, সেই সঙ্গে যেগুলি এমন ধরনের ছিল যে, তা ব্যয়ের অতিরিক্ত রাজস্বের এক নিরাপদ অতিরিক্ত অংশ যোগাতে সক্ষম। প্রদেশগুলির সম্পদ যে যথেষ্ট এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় ১৮৭৯-৮০ এবং ১৮৮০-১ সালে নিজেদের আর্থিক অবস্থায় তত ক্ষতি সাধন না করে রাজকীয় সরকারকে সহায়তা দান। ১৮৭১ সালে রাজকীয় সরকারের আর্থিক অবস্থা বেশ সঙ্কটপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। টাকার মূল্যমানের হ্রাস এবং আফগানদের সঙ্গে বিরোধিতার সূত্রপাতের জন্য আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে ১৮৭৯-৮০ সালে প্রায় ১,৩৯৫,০০০ পাউন্ডের ঘাটতি হতে পারে। আত্মরক্ষার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ভারত সরকার কয়েকটি স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়েছিল দেশের সাধারণ ব্যয়গুলিকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত সীমার মধ্যে ধরে রাখার প্রয়োজন সম্বন্ধে এবং নির্দেশ দিয়েছিল যে, সকল ঐচ্ছিক ব্যয়, তা সেটা রাজকীয়, প্রাদেশিক বা স্থানীয়, যাই হোক না কেন সেগুলি নিলম্বিত বা মুলতুবি রাখার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, এবং প্রকৃত প্রয়োজন[১] ছাড়া বেতন অথবা কর্মচারিবৃন্দের সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত নয়। আত্মরক্ষার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে ভারত সরকার নির্দেশ দিয়েছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত না—

'স্থানীয় সরকারগুলির সঙ্গে ব্যবস্থা পাকাপাকি হচ্ছে ...... ২৫০০ টাকার বেশি খরচ পড়ে এমন কোনও নতুন কাজ শুরু করা হবে না রাজকীয় অথবা প্রাদেশিক তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে, এমন কি সরকারের অনুমোদন আগে পাওয়া হয়ে গিয়ে থাকলেও।'[২]

এবং উৎপাদনশীল বাস্তুকর্মের খাতে ব্যয়ের পরিমাণে বড় আকারের হ্রস্বীকরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, ব্যয়ের উপর এইসব প্রতিবন্ধকতা রাজকীয় আয়-ব্যয়কে ভারসাম্য আনার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তখন ভারত সরকার বর্দ্ধিত করের অপেক্ষাকৃত ভাল বিকল্প হিসাবে প্রাদেশিক উদ্বর্তের উপর বাধ্যতামূলক ঋণ চাপিয়ে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। এটা অবশ্যই প্রাদেশিক বিত্তের অত্যন্ত মৌলিক শর্তগুলির অন্যতমটি রদ করার সামিল, যে শর্তটি ছিল এই যে রাজকীয় সরকারের দখলে থাকা সত্ত্বেও প্রাদেশিক উদ্বর্তগুলি ছিল এক পবিত্র ন্যাস, যা একমাত্র প্রদেশগুলির প্রয়োজনেই বন্ধনমুক্ত করা যাবে। কিন্তু ভারতের আর্থিক সচ্ছলতাকে প্রাদেশিক বিত্তের শর্তাবলির সাধুতার চেয়ে বেশি পবিত্র বলে গণ্য করা হত। তাই প্রাদেশিক সরকারগুলির উদ্বর্ত থেকে রাজকীয় সরকার নিম্নলিখিত অর্থ উপযোজন করেছিল :—

১) বিত্ত বিভাগের গৃহীত প্রস্তাব সংখ্যা ৪০৬৩, তাং ৯ নভেম্বর, ১৮৭৮।

২) বিত্ত বিভাগের ১৮৭৯ সালের ১ মে তারিখের প্রস্তাব, গেজেট অফ ইন্ডিয়া, প্রথম খণ্ড, ৩ মে ১৮৭৯, পৃ: ৩২৯।

প্রদেশগুলি	রাজকীয় সরকারকে প্রদত্ত কর		
	১৮৭৯-৮০	১৮৮০-১	মোট লক্ষ
	টা:	টা:	টা:
উ:প প্রদেশ	১০	১০	২০
উ:প প্রদেশ	৭½	৭½	১৫
বোম্বাই	৪	৪	৮
পঞ্জাব	৩	৩	৬
ব্রহ্মদেশ	৩	৩	৬
মধ্যপ্রদেশ	২½	২½	৫
মাদ্রাজ	২	২	৪
অসম	১½	১½	৩
মোট	৩৩½	৩৩½	৬৭

এই করগুলি পরিশোধ করা হয়েছিল ১৮৮২-৩ সালে ; কিন্তু সাময়িকভাবে সেগুলি কার্যত ছিল এক ধরনের প্রাপ্তি অথবা অন্ততঃপক্ষে রাজকীয় কোষাগারে সাহায্য দান। রাজকীয় কোষাগারে প্রকৃত প্রাপ্তির মধ্যে ছিল প্রদেশের পরিচালনাধীনে হস্তান্তরিত পরিষেবাগুলির বরাদ্দ নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ব্যয়সংকোচগুলি। প্রতিটি প্রদেশের ক্ষেত্রে সংগৃহীত ছাঁটাইয়ের অর্থের পরিমাণ সংক্ষেপে বলা যায় নিম্নলিখিতভাবে : —

প্রদেশ	ব্যয়-সংকোচ				
	টাকা				
উ:প:প্রদেশ	৩,৫৪,০০০	মোট	বরাদ্দের	৫	শতাংশ
অযোধ্যা	৭৩,০০০	”	”	”	”
বঙ্গদেশ	৫,৯০,০০০	”	”	”	”
মধ্যপ্রদেশ	৯০,০০০	”	”	”	”
বোম্বাই	৭৩,০০০	”	”	”	”
পঞ্জাব	২,৪১,০০০	”	”	”	”

এটা কিন্তু রাজকীয় সরকার কর্তৃক সংগৃহীত মোট প্রাপ্তিকে নিঃশেষিত করে না। এর সঙ্গে প্রাপ্তির আরও দুটি উপায়কেও উল্লেখ করা দরকার। একথা মনে রাখা দরকার যে, নিয়োজিত রাজস্বের প্রামাণ্য উৎপাদকে এমন এক উচ্চতর স্তরে নিয়ে গিয়ে যা তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যেটা সঙ্গতিপূর্ণ তার চেয়েও বেশি তা মেনে নিয়ে ভারত সরকার প্রাদেশিক পরিষেবাগুলির জন্য হ্রস্বীকৃত অর্থ নির্দিষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল তার তুলনায় যা করার প্রয়োজন হতে পারত যদি প্রামাণ্য উৎপাদ নির্দিষ্ট করা হত নিম্নতর স্তরে। হস্তান্তরিত রাজস্বের অস্বাভাবিক প্রাক্কলনের জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে এই হ্রস্বীকরণ ছিল এক প্রত্যক্ষ লাভ। প্রামাণ্যের চেয়ে অতিরিক্তগুলিও লাভের বাড়তি সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল রাজস্ব আদায়ে বিরত থাকার বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রকরণের (Clause) জন্য, যদিও একথা স্বীকার করতেই হবে যে ঐ একই প্রকরণের অধীনে প্রকৃত রাজস্ব প্রামাণ্যের চেয়ে কম হলে ভারত সরকারের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। এই সব শর্তাধীন লাভের খাত দিয়ে এর কি লাভ হয়েছিল তা বলা কঠিন। সব মিলিয়ে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, রাজকীয় কোষাগারের ভালই লাভ হয়েছিল।

এইভাবে ফলাফলগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে নিয়োজিত রাজস্বের ভিত্তিতে রচিত প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্পটি প্রাদেশিক এবং রাজসিক সরকার উভয়ের-দৃষ্টিকোণের বিচারে ছিল এক সাফল্য, যার ফলে উভয় সরকার পারস্পরিকভাবে রাজি হয়েছিল প্রকল্পটির বিকাশে আরও বেশি কাজ করা যা নিয়ে গঠিত হবে এর তৃতীয় অধ্যায়টি।

অধ্যায়-৬

অংশীদারি রাজস্বের দ্বারা আয়-ব্যয়ক
১৮৮২-৮৩ থেকে ১৯২০-২১

প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কগুলিকে পরিবর্ধিত করার জন্য অগ্রসর হওয়ার পথে প্রতিটি পদক্ষেপে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি, যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, ছিল তার মধ্যে সন্নিবেশিত করার প্রস্তাবিত রাজস্ব ও খরচাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে। ইতিপূর্বে যে দুটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, একটি ১৮৭১ সালে, অপরটি ১৮৭৭ সালে, প্রাদেশিক বিত্তের বিবর্তনের পথে, সেগুলি চিহ্নিত হয়ে আছে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের দুটি বিশিষ্ট পদ্ধতির দ্বারা। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে রাজকীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সরবরাহ করত নির্দিষ্ট নিয়োগের থোক অর্থ রাজকীয় কোষাগার থেকে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সরবরাহের এই প্রণালীটির পরিবর্তে রাজস্বের কয়েকটি উৎস নিয়োজিত হয় প্রাদেশিক সরকারগুলির ব্যবহারের জন্য। নিয়োজিত রাজস্বের পরিকল্পনা, ১৮৭১-২ সালে গৃহীত ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটিগুলি দূর করার ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করা সত্ত্বেও বৃদ্ধি পাওয়ার সুনিশ্চিত প্রবণতা বিশিষ্ট খরচাদি বহন করার দায়িত্ব হস্তান্তরিত করা হয়েছিল স্থানীয় সরকারগুলির কাছে সেই আয় থেকে, যা সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও, বিকাশের অবকাশ ছিল খুবই কম, তা স্থিতিস্থাপকতার দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে প্রাদেশিক বিত্তের প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। ১৮৭১ সালের গৃহীত ব্যবস্থাগুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ১৮৭৭ সালের গৃহীত ব্যবস্থাগুলি বিত্তের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার পূর্ণতম মাত্রার প্রয়োজনগুলির তুলনায় এতই কম ছিল যে মাদ্রাজ সরকার পরিবর্ধিত প্রকল্পটি মেনে নিতে অস্বীকার করল এবং ১৮৭১ সালের বন্দোবস্ত মেনে চলাটাই বেশি পছন্দ করল। ১৮৭৭ সালের প্রকল্পটি ব্রহ্মদেশ বা আসামকে দেবার প্রস্তাব করা হয়নি। কিন্তু ১৮৭৯ সালে ভারত সরকার যখন ঐরকম প্রস্তাব দিল তখন তা উন্নততর অধ্যায়ের সূচনা করতে বাধ্য হল, কারণ, যদিও নির্দিষ্ট নিয়োগগুলি দিয়ে ক্রমবর্ধমান খরচাদি বহন করা কঠিন হলেও তা কয়েকটি প্রদেশে মিতব্যয়িতা ও দক্ষ পরিচালনার জন্য তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গিয়েছিল এবং তা ভালভাবে উপলব্ধি হয়েছিল ব্রহ্মদেশে। প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্প শুরু হবার বিগত

৭ বছরে এই প্রদেশের ব্যয়ের মোট পরিমাণ ছিল ১,৯৮,৪৫,৯৭০ টাকা, যখন কি তার পরবর্তী ৭ বছরে নিয়োগের মোট পরিমাণ হয়েছিল ২,২০,২২,৭৭০ টাকা, বিশেষ সংযোজনগুলি ছাড়াই, এ থেকে দেখা যায় অতিরিক্ত হয়েছিল ২১,৭৬,৮০০ টাকা, সর্বসাকুল্যে অথবা প্রায় তিন লাখ টাকা বছরে। কিন্তু ঐ একই সময়কালের মধ্যে ব্যয়ের পরিমাণ হয়েছিল ২,৪০,৭৭,৮৮৫ টাকা, অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ৪২,৩১,৯১৫ টাকার বাড়তি খরচ অথবা বছরে প্রায় ৬ লাখ টাকা। অতএব ৩ লাখের অতিরিক্ত নিয়োগ এবং ৬ লাখের অতিরিক্ত ব্যয়ের পার্থক্যটি পূরণ করতে হয়েছিল রাজকীয় সরকার কর্তৃক গড়ে প্রতি বছর ২½ লাখ করে বিশেষ অনুদান প্রদান করে প্রদেশের[1] আর্থিক সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য। পরিপূরক নিয়োগগুলি দেবার সময় ভারত সরকার এই ধরনের ভিক্ষাদানের মনোবল নষ্ট করার প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। কার্যত একথা স্বীকার করা হয়েছিল যে, মিতব্যয়িতা ও দক্ষ পরিচালনার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক পরিপূরক সাহায্যের আকারে সমপরিমাণ অর্থ অনুদান দিতে বাধ্য হওয়ার পরিবর্তে শুরুতেই প্রয়োজনের পূর্বাভাস পেয়ে ব্রহ্মদেশকে যদি ২২½ লক্ষ টাকার প্রাদেশিক নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া অনেক বেশি ভাল হত। ব্রহ্মদেশের অভিজ্ঞতা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল সরবরাহের প্রণালী হিসাবে নিয়োগের দুর্বলতার দিকটিকে এবং ভারত সরকার বুঝে ছিল যে রাজস্বের স্থিতিস্থাপকতা প্রাদেশিক বিত্তের সাফল্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। অতএব ব্রহ্মদেশকে রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়াটা ছিল অপরিহার্য। প্রদেশটির চাহিদার অত্যধিক চাপে নিপীড়িত হয়ে এবং প্রদেশ কর্তৃক রাজকীয় কোষাগারে যথেষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্ত যোগান দেওয়ার বিষয়টির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারত সরকার একথা মেনে নিয়েছিল যে প্রদেশটি 'তার প্রকৃত চাহিদাগুলি আগের চেয়ে আরও উদারভাবে পাওয়ার অধিকারী'।[2] প্রদেশ ব্রহ্মদেশের সঙ্গে উদার আচরণ করার উদ্দেশ্যে যে পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশগুলিকে সরবরাহ করার পদ্ধতিতে নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশ, উ:প: প্রদেশ ও অযোধ্যা, পঞ্জাব, বোম্বাই এবং বঙ্গদেশ—এই পাঁচটি প্রদেশের সঙ্গে ১৮৭৭-৮. সালে যে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাতে ভারতের আয়-ব্যয়কে সম্বলিত রাজস্ব ও ব্যয়ের অধীনে হিসাবের খাতগুলি দুটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছিল : (১) পুরা মাত্রায় রাজকীয় এবং (২) পুরা মাত্রায় প্রাদেশিক। কিন্তু ব্রহ্মদেশের ব্যাপারে হিসাবের খাতগুলি তিনটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিন্যস্ত হয়েছিল : (১) পুরা

১) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ১৪৮৮ তারিখ ২৬ মার্চ ১৮৭৯, অনুচ্ছেদ ২।

২) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব সংখ্যা ১৪৮৮, তাং ২৬ মার্চ ১৮৭৯, অনুচ্ছেদ ২২।

মাত্রায় রাজকীয়, (২) পুরা মাত্রায় প্রাদেশিক, এবং (৩) সেইভাবে রাজকীয় ও প্রাদেশিক।[১] যেহেতু রাজস্ব ও ব্যয়ের দফাগুলি সম্পূর্ণভাবে রাজকীয় ও প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল, তাই অন্যান্য প্রদেশে উপলব্ধ বন্দোবস্তের সঙ্গে এর মূলগত কোনও পার্থক্য ছিল না। পার্থক্যটি বিদ্যামান ছিল হিসাবের এক তৃতীয় শ্রেণী তৈরি করা যা রচিত হবে **যৌথভাবে রাজকীয় ও প্রাদেশিক** নিয়ে। এতদ্বারা কিছু রাজস্ব ও খরচাদি অন্যগুলির চেয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল এবং একটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা অনুপাতে রাজকীয় ও প্রাদেশিকের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ছিল তার বদলে স্থিতিস্থাপকতা আনা। অন্যান্য প্রদেশের আর্থিক ব্যাপারে স্থিতিস্থাপকতা ছিল যেহেতু সেখানে তাদের নিয়োগগুলির পরিবর্তে রাজস্বের নিয়োজিত উৎসগুলি প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়োগগুলি নিয়ে গঠিত তাদের রাজস্বগুলি যে মাত্রা পেয়েছিল তার ফলে তাদের আর্থিক ব্যবস্থা অপরিহার্যভাবে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ব্রহ্মদেশের ক্ষেত্রে অবশ্য নির্দিষ্ট নিয়োগের পরিবর্ত হিসাবে ক্রমবর্ধমান রাজস্বের উপস্থাপনা প্রাদেশিক রাজস্বকে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করেছিল, যা না থাকলে সম্প্রসারণশীল খরচাদি বহন করার দায়িত্ব বহন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠত।

অংশীদারি রাজস্বের নীতির ভিত্তিতে ব্রহ্মদেশের প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের কাঠামো নতুন করে রচনা করতে গিয়ে আয় ও খরচের সবকটি হিসাবের খাত সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক করা হয়েছিল। শুধু নিম্নলিখিতগুলি বাদে, যে গুলিকে সম্পূর্ণভাবে রাজকীয় বলে গণ্য করা হত :—

(১) সৈন্যবাহিনী .... আয় এবং খরচাদি

(২) ডাকঘর .... ,,

(৩) তার বিভাগ .... ,,

(৪) হিসাবরক্ষা বিভাগ .... ,,

(৫) আবহাওয়া বিভাগ .... ,,

(৬) রাজনৈতিক .... ,,

(৭) সঞ্চিত সম্পদ প্রেরণ .... ,,

---

১) বিত্ত বিষয়ক বিবরণ, ১৮৭৯-৮০, অনুচ্ছেদ ২৪।

এবং হুন্ডি ও তামাদি

হুন্ডির অধিহার

রাজস্ব ও খরচাদির তৃতীয় শ্রেণীটি হঠাৎ যৌথভাবে রাজকীয় ও প্রাদেশিকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল নিম্নলিখিত দফাগুলি :—

(১) ভূমিরাজস্ব, প্রতিশীষ কর (Capitation Tax) সহ, কিন্তু মীন কর (fishery) বাদে, তৎসহ সেই ধরনের ভূমি রাজস্ব প্রত্যর্পণ, আদায় ও বন্দোবস্তের খরচাদি যা শুধুমাত্র মীনকরের উপর আরোপ করা যেতে পারে না।

(২) বন রাজস্ব, ব্যয় ও প্রত্যর্পণ।

(৩) চালের উপর রপ্তানি শুল্ক এবং প্রত্যর্পণ।

(৪) লবণ রাজস্ব, ব্যয় ও প্রত্যর্পণ।

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত দফাগুলি রাজকীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে প্রথমোক্তের ছয়ের পাঁচ অংশে ও শেষোক্তের ছয়ের এক অংশে ভাগ করা হয়েছিল। সরবরাহের এই পদ্ধতি গ্রহণ করে অন্যান্য প্রদেশের মত ব্রহ্মদেশও স্থিতিস্থাপক চরিত্রের তহবিল সংগ্রহ করেছিল, কারণ ভাগগুলি নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও যে কোনও একটি বৎসরে যে পরিমাণ অর্থ তা আনত তা নিয়োজিত বা অংশে বিভক্ত রাজস্বের মোট উৎপাদের তারতম্য অনুসারে কম বেশি হত। অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করত কী ভাবে ব্রহ্মদেশ তার নিয়ন্ত্রণাধীনে অর্পিত রাজস্বের পুষ্টিসাধন করবে। কিন্তু অন্য প্রদেশগুলি যা করেনি, তার বিপরীতে ব্রহ্মদেশ যদি নিজ এই কর্তব্য পালন করত, তবে তার শ্রম নিষ্ফল হত না।

অংশীদারি রাজস্বের ঐ অভিন্ন নীতি অসম প্রদেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা এতকাল ১৮৭১ সালের পুরনো নীতির ভিত্তি অনুসরণ করে আসছিল ব্রহ্মদেশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নেবার পর অসমের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা সত্ত্বেও প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার প্রণালী হিসাবে অংশীদারি রাজস্বের নীতিটি সন্তোষজনক মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়নি। নীতিটির এই প্রগতিশীল বাস্তবায়িতকরণে এই ছেদ পড়ার কারণটির মূলে কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোনও দ্বিধার মনোভাব ছিল না, বরং তার কারণ হিসাবে দেখানো যেতে পারে প্রধানত বিষয়টির প্রয়োজনীয়তাকে। যেহেতু অসমকে আবার বঙ্গদেশের সঙ্গে সম্মিলিত করার কথা ভাবা হচ্ছিল তাই আসামের প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে সেই কাঠামোতেই রচনা করা উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল যে পরিকল্পনার

ভিত্তিতে বঙ্গদেশের আয়-ব্যয়ক রচিত ছিল যাতে করে এই দুই প্রদেশের আর্থিক ব্যাপারটা প্রশাসনের মতই সহজে মিশে যেতে পারে। এইভাবে রাজস্ব ও ব্যয়ের হিসাবের খাতগুলি যা বঙ্গদেশে ১৮৭৭ সাল থেকে প্রাদেশিক ছিল সেগুলিকে ১৮৭৯ সালে অসমেও প্রাদেশিক করে ফেলা হল, যার মধ্যে 'আইন আধিকারিকরাও' অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা সাময়িক কারণে বঙ্গদেশে রাজকীয় হিসাবে সংরক্ষিত রাখা হয়। একমাত্র সেই বিষয়ে নতুন নীতিটি প্রয়োগ করা হয়েছিল যার মধ্যে আসামে ভূমি রাজস্ব খাতকে যৌথ খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা রাজকীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে নিট উৎপাদের, পাঁচের চার অংশ এবং শেষোক্তের পাঁচের এক অংশের অনুপাতে[১]।

এই প্রদেশ দুটির সঙ্গে নতুন বন্দোবস্তের সুফলগুলি সহজেই দেখা যায় পুরনো নীতির ভিত্তিতে প্রস্তাব ও নতুন নীতির ভিত্তিতে পুনর্গঠিত তাদের আয়-ব্যয়কের হিসাবের তুলনামূলক সারণি থেকে :—

০০০ বাদ দেওয়া হয়েছে

	অসমের আয়-ব্যয়কের হিসাব				ব্রি: ব্রহ্মদেশের আয়-ব্যয়কের হিসাব			
	পুরনোভিত্তিতে		নতুনভিত্তিতে		পুরনোভিত্তিতে		নতুনভিত্তিতে	
	১৮৭৮-৯	১৮৭৯-৮০	১৮৭৮-৯	১৮৭৯-৮০	১৮৭৮-৯	১৮৭৯-৮০	১৮৭৮-৯	১৮৭৯-৮০
	পা:	পা:	পা:	পা:	পা:	পা:	পা:	পা:
রাজস্ব	২১১৫	২১১০	৩৬৫৭	৩৫৯৬	৪০১৩	৪০৭৮	৯৪৫৯	৯৬৭৩
ব্যয়	২২৫৩	২২৬১	৩৪৮০	৩৫৬৬	৪১৬৯	৫১১১	৮৯২৬	১০১১৯
উদ্বৃত্ত	....	....	১৭৭	৩০	....	....	৫৩৩	....
ঘাটতি	১৩৮	১৫১	....	....	১৫৬	১০৩৩	....	৫২৬
অন্ত উদ্বর্ত (Closing Balance)	২০৬	৫৫	৫২১	৫৫৫	৮৭৩	১৬১	১৫৬২	১৪৩৬

বিত্ত ও বাণিজ্য বিভাগে ভারত সরকারের প্রস্তাব নং ১২৪৯, তাং ১৩ মার্চ ১৮৭৯ থেকে।

অংশীদারি রাজস্বের এই নতুন নীতিটি একবার ব্রহ্মদেশ ও অসমের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর ঐ নীতি অন্যান্য প্রদেশগুলিতে প্রয়োগ স্থগিত রাখা

---

১) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ১৫৯৮, ১৭ এপ্রিল, ১৮৭৯।

অসম্ভব হয়েছিল ভারত সরকারের পক্ষে। কয়েকটি প্রদেশের সঙ্গে ১৮৭৭ সালে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল যেগুলি শুধু যে স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল তা নয়। তাদের স্থায়িত্বকালও ছিল অ-সম। একমাত্র বঙ্গদেশ ও বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল পাঁচ বছরের জন্য ১৮৭৭-৮ সাল থেকে শুরু হয়ে। মধ্যপ্রদেশ ও পঞ্জাবের জন্য সময়টি নির্দিষ্ট হয়েছিল তিন বছরের জন্য, যখন কি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মাত্র দুই বছরের জন্য ১৮৭৭-৮ সাল থেকে। এ থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অন্য কয়েকটি প্রদেশের সঙ্গে বন্দোবস্তটি ব্রহ্মদেশ ও অসমের সঙ্গে বন্দোবস্তের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হবার প্রায় অল্প পরেই মেয়াদ-উত্তীর্ণ হবার ছিল এবং অংশীদারি রাজস্বের ভিত্তিতে তা পুনর্গঠিত হবার প্রয়োজন দেখা দিত। ভারত সরকার অবশ্য প্রক্রিয়াটিকে কার্যকর করতে দেরি করিয়ে দেয় এবং সেটা সুবুদ্ধিরই কাজ হয়েছিল, কারণ অংশীদারি রাজস্ব ও খরচাদির নতুন নীতিটি সর্বজনীন প্রয়োগের ভিত্তি করে তোলার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করাটা অবাঞ্ছিত ছিল। এটা যে শুধু পরীক্ষামূলক স্তরেই আছে এমন মনে করাটাই ছিল বিচক্ষণতার কাজ। দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ক সম্বন্ধে **এক-তরফা** ব্যবস্থা করার অসুবিধাগুলি ততখন বেশ বুঝা যাচ্ছিল। তারপর ভারতের সরকারের জ্ঞানোদয় হল যে, কতিপয় প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ক ছিল এক সমগ্র সুসম্বন্ধ অর্থাৎ রাজকীয় ব্যয়-ব্যয়কের অংশ মাত্র, এবং অন্য সকলের দাবি প্রয়োজন এবং অত্যাবশ্যকতাগুলিকে বিবেচনা না করে প্রতিটি প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কগুলি রচনা করা সুস্পষ্টভাবে অযৌক্তিক। কিন্তু যাতে একের দাবিগুলি বিচার করার ব্যাপারে এই তুলনামূলক ও আপসপূর্ণ ক্রিয়া প্রণালী অন্যদের চাহিদার আলোকে বিভিন্ন প্রদেশগুলির সম্বন্ধে। পক্ষপাতহীনভাবে কাঙ্খিত ফললাভের অনুশীলনসহ সম্পাদন করা সম্ভব হয় তা দেখা। এই বিবেচনার গুরুত্ব এবং আসাম ও ব্রহ্মদেশ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে মুনাফা পেতে সময় নেওয়ার ইচ্ছাটা ভারত সরকারকে, প্রাদেশিক সরকারগুলির সম্মতিসহ পরিচালিত করেছিল, ক্ষেত্র অনুসারে, প্রদেশগুলির সঙ্গে তাদের বিত্তীয় চুক্তিগুলির মেয়াদ-কাল সম্প্রসারিত করতে বা কমিয়ে আনতে যাতে করে সবকটি প্রদেশের মেয়াদকাল যুগপৎ অবসান ঘটে ৩১ মার্চ ১৮৮২ সালে।

১৮৮২-৮৩ সালের বিত্ত সম্পর্কিত বন্দোবস্ত

১৮৮২-৮৩[১] সাল থেকে বলবৎ সকল দেশের সঙ্গে সম্পাদিত নতুন

১) বিত্ত ও বাণিজ্য বিভাগে ভারত সরকারের প্রভাব নং ৩৫৩, তাং ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।

বন্দোবস্তগুলি চিহ্নিত হয়ে আছে ১৮৭৮ সাল থেকে ব্রহ্মদেশে প্রয়োগ করা নীতিটির সম্প্রসারণের দ্বারা। যথাসম্ভব কম সংখ্যায় কয়েকটি রাজস্বের ও খরচের হিসাবের খাত হয় সম্পূর্ণভাবে বা শুধুমাত্র নগণ্য স্থানীয় ব্যতিক্রম বাদে, বিন্যস্ত হয়েছিল রাজকীয় খাত হিসাবে। অন্যগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয়েছিল পূর্ণ মাত্রায় প্রাদেশিক হিসাবে। বাকিগুলিকে রাখা হয়েছিল এক মধ্যবর্তী শ্রেণীতে, যার নামকরণ করা হয় যৌথ হিসাবে এবং তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজকীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। সেইসব ক্ষেত্রে অবশ্য যেখানে প্রাদেশিকীকৃত ব্যয়গুলি প্রাদেশিকীকৃত ও সেই সঙ্গে অংশীদারি রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত সম্পদগুলিকে ছাড়িয়ে যায়, সেক্ষেত্রে উদ্বর্তটি যা এতকাল রাজকীয় রাজস্ব ভাণ্ডার থেকে নির্দিষ্ট নিয়োগের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়ে আসছিল তা সংশোধিত হয়েছিল প্রতিটি প্রদেশের ক্ষেত্রে তার ভূমি রাজস্বের এক নির্দিষ্ট অনুপাতে—যা সম্পূর্ণভাবে ছিল রাজস্বের রাজকীয় খাত, শুধু ব্রহ্মদেশ বাদে, যেখানে অনুপাতটি সম্প্রসারিত হয়েছিল রাজকীয় চাল রপ্তানি শুল্ক ও সেই সঙ্গে লবণ রাজস্ব পর্যন্ত।

১৮৮২ সালে প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্পটির পরিবর্ধনের পাশাপাশি ভারত সরকার তৎকালে প্রতিষ্ঠিত তিনটি শ্রেণীর অধীনে রাজস্ব ও ব্যয়ের বিভিন্ন হিসাবের খাতগুলিকে বর্গভুক্ত করার ব্যাপারে সরলতা ও অভিন্নতা প্রবর্তন করতেও উৎসুক ছিল। এ কথা স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৮৭৭ সালে কার্যকর করা চুক্তিগুলি চিহ্নিত হয়েছিল বৈচিত্র্য ও জটিলতার দ্বারা। একই খরচ সব প্রদেশে প্রাদেশিকীকৃত করা হয়নি। যে খরচটি এক জায়গায় ছিল প্রাদেশিক, অন্যত্র তাই ছিল রাজকীয়। আবার খরচগুলি হস্তান্তরিত করার সময় অনুদানকে এমনভাবে ভাগ করা হত যাতে একটি ভাগকে প্রাদেশিক ও অন্য ভাগটিতে রাজকীয় হিসাবে সংরক্ষিত রাখা যেত। রাজস্বের ব্যাপারে ব্যবস্থাটিতে জটিলতা যে খুব কম ছিল তা নয়। নিয়োজিত রাজস্বের অনুবিধি অনুসারে হিসাব গণনা করা গণনার ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলেছিল। এই ত্রুটি দুটি অবশ্য অপসৃত হয়েছিল ১৮৮২ সালের বন্দোবস্ত পরিকল্পিত হয়েছিল, এবং তার কাজ ছিল রাজস্বের ও ব্যয়ের কোন্ কোন্ হিসাবের খাতের প্রাদেশিকীকরণ ও কোন্ কোন্ গুলিকে রাজকীয় করা হচ্ছে তা নির্দেশ করা এবং কোন্গুলি ছিল বিভক্ত এবং কী পরিমাণে, তা জানাবার জন্য নিম্নলিখিত প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

রাজস্ব

	রাজকীয়	প্রাদেশিক
১। ভূমি রাজস্ব	প্রাদেশিক খাতে লিপিবদ্ধ করা-গুলি বাদে সমগ্র	**ব্রহ্মদেশে**— মীনকর; উ:প: প্রদেশ ও অযোধ্যাতে তরাই, ভাবর ও ডুধি জমিদারী থেকেআয়, জল-মিল ও পাথর-খনির, খাজনা; বোম্বাইতে পুনর্গৃহীত চাকরাণ জমির খাজনা ও চাকুরি নিষ্ক্রিয়ণ। সকল প্রদেশে প্রাদেশিক রাজস্ব ও প্রাদেশিক ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটি পূরণ করার জন্য রাজকীয় ভূমি-রাজস্বের উপর এক নির্দিষ্ট অনুপাত।
২। অধীনতার নিদর্শন-স্বরূপ সমগ্র প্রদত্ত কর।		শূন্য
৩। বন	অর্ধেক	অর্ধেক
৪। অন্তঃশুল্ক	ঐ	ঐ
৫। নিরূপিত কর	ঐ	ঐ
৬। প্রাদেশিক হার	শূন্য	সমগ্র
৭। বহিঃশুল্ক	প্রাদেশিক খাতে লিপিবদ্ধ-গুলি বাদে	বহিঃশুল্ক ছাড়া বাকি সব দফা; এবং শুধু **ব্রহ্মদেশে** ভূমিরাজস্বের মতই বহিঃশুল্কের উপর একই অনুপাতে।
৮। লবণ	প্রাদেশিক খাতে লিপিবদ্ধ-গুলি বাদে	লবণ বিক্রয় ও লবণের উপর ধার্য শুল্ক বাদে বাকি সব দফা; এবং শুধু **ব্রহ্মদেশে** ভূমি-রাজস্বের মতই বহিঃশুল্কের উপর একই অনুপাতে
৯। আফিম	সমগ্র	শূন্য
১০। প্রমুদ্রা	অর্ধেক	অর্ধেক
১১। নিবন্ধভুক্তকরণ	ঐ	ঐ

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

	রাজকীয়	প্রাদেশিক
১৩। ডাকঘর	শূন্য	সমগ্র
১৪। গৌণ বিভাগ	ঐ	ঐ
১৬। আইন ও বিচার	ঐ	ঐ ঐ
১৭। পুলিশ	ঐ	ঐ
১৮। সামুদ্রিক	যেমন বর্তমানে আছে	যেমন বর্তমানে আছে
১৯। শিক্ষা	শূন্য	সমগ্র
২০। চিকিৎসা	ঐ	ঐ
২১। লেখ্য সামগ্রী ও ছাপাখানা	শূন্য	সমগ্র
২২। সুদ	প্রাদেশিক খাতে লিপিবদ্ধগুলি বাদে সব	সরকারি ঋণপত্রের উপর সুদ (প্রাদেশিক)
২৩। উত্তর বেতন (Pension)	সামরিক ও চিকিৎসা বিষয়ক তহবিল থেকে খতিয়ানে জের টানা ও ঐ তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	বক্রী অংশ
২৪। বিবিধ	রাজকীয় লেনদেনের বিনিময়ে লাভ, আদেয়কের উপর ও তামাদি হুন্ডির উপর অধিহার।	বক্রী অংশ
২৫। রেলপথ	যেমনটি বর্তমানে আছে।	প্রতিটি প্রদেশে যা বর্তমানে প্রাদেশিক হিসাবে আছে।
২৬। জলসেচ ও নৌবাহ	ঐ	ঐ
২৭। অন্যান্য বাস্তুকর্ম	সামরিক কর্ম থেকে আয়	বক্রী অংশ
৩১। লন্ডনের সঙ্গে লেনদেনের উপর বিনিময় থেকে লাভ	সমগ্র	শূন্য

ব্যয়

	রাজকীয়	প্রাদেশিক
১।সুদ..........	প্রাদেশিক খাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তা বাদে বাকি সব।	স্থানীয় ঋণপত্রের ঋণের উপর সুদ। বৎসরের প্রারম্ভে পুঁজির জন্য ব্যয়ের উপর ৪½ এবং বৎসর চলাকালীন পুঁজির জন্য ব্যয়ের উপর ২½ শতাংশ—সব বাস্তুকর্মের জন্য, তা সেটা **উৎপাদনশীল বাস্তুকর্ম** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ হোক বা না হোক, যেগুলি সম্বন্ধে পুঁজি ও রাজস্ব হিসাব রাখা হত।শুধু সর্বদা তাদের যে-কোনও অংশের জন্য প্রাদেশিক রাজস্ব বা স্থানীয় ঋণপত্রের ঋণ থেকে সরবরাহ করা খরচ বাদে। **সংরক্ষিত বাস্তু কর্মের** খরচের উপর ধার্য সুদের হার নির্ধারিত হয়ে বিশেষ চুক্তির শর্তানুসারে।
২।পরিষেবা তহবিলের ও অন্যান্য হিসাবের সুদ	পরিষেবা তহবিলের উপর ও সেভিংস ব্যাঙ্কের জমার উপর সুদ	
৩। প্রত্যর্পণ ও আমদানিকৃত মাল পুনরায় রপ্তানির সময় আমদানি শুল্কের প্রত্যর্পণ	রাজস্বের রাজকীয় অংশের	রাজস্বের প্রাদেশিক অংশের

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

ব্যয়

	রাজকীয়	প্রাদেশিক
৪। ভূমি রাজস্ব	ভূমিরাজস্ব আদায় এবং জরিপের (কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাবে এযাবৎ দাবি করা ব্যয় সহ) এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ ছাড়া অন্য সব জায়গায় বন্দোবস্ত-গুলির জন্য খরচের উপর একই অনুপাতে, যা ভূমি রাজস্ব থেকে আলাদা করে ধরে রাখা হত।	বক্রী অংশ
৫। বন-বিভাগ	অর্ধেক	অর্ধেক
৬। অন্ত:শুল্ক	অর্ধেক	অর্ধেক
৭। নির্দ্ধারিত কর	ঐ	ঐ
৮। প্রাদেশিকতার	শূন্য	সমগ্র
৯। বহি:শুল্ক	ঐ	ঐ
১০। লবণ	মাদ্রাজে সমগ্র। অন্যত্র লবণ তৈরি ও খরিদ; এবং বঙ্গদেশে নিবারণ-মূলক পন্থা ও ক্রিয়া প্রণালী; বোম্বাইতে পর্তুগিজ অধিকৃত ভারতে লবণ রাজস্বের প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত খবরাদি।	বক্রী অংশ
১১। আফিম	সমগ্র	শূন্য
১২। প্রমুদ্রা	অর্ধেক	অর্ধেক
১৩। নিবন্ধভুক্তকরণ	অর্ধেক	অর্ধেক
১৫। ডাকঘর	শূন্য	সমগ্র
১৬। তার বিভাগ	ঐ	ঐ
১৭। প্রশাসন	হিসাবে গণনা ও মুদ্রার দপ্তর এবং প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলিতে প্রদত্ত ভাতা	বক্রী অংশ

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

ব্যয়

	রাজকীয়	প্রাদেশিক
১৮। গঠন বিভাগ	প্রত্নতত্ত্ব ও আবহবিদ্যা বিষয়ক বিভাগ, আদমসুমারি এবং সরকারি সাংবাদিক ও পরি-সংখ্যান গত পর্যবেক্ষণের ফলাফল	বক্রী অংশ
১৯। আইন ও বিচার	শূন্য	সমগ্র
২০। পুলিশ	সীমান্ত পুলিশ এবং রাজকীয় সরকারী রেলপথে লবণ নিবারক কর্তব্যে নিযুক্ত পুলিশদের জন্য	বক্রী অংশ
২১। নৌ-বিভাগ	বর্তমানে যা কিছু রাজকীয় হিসাবে আছে	যা কিছু বর্তমানে প্রাদেশিক
২২। শিক্ষা	ঐ	ঐ
২৩। গির্জা সম্বন্ধীয়	সমগ্র	শূন্য
২৪। চিকিৎসা সম্পর্কিত	শূন্য	সমগ্র
২৫। লেখ্য-সামগ্রী ও ছাপাখানা	কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারের জন্য খরিদ করা লেখ্য সামগ্রী	বক্রী অংশ, তৎসহ কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত লেখ্য-সামগ্রী বাবদ খরচ
২৬। রাজনৈতিক	সমগ্র	শূন্য
২৭। ভাতা ও নিয়োগ	প্রাদেশিকখাতে প্রদত্তগুলি বাদে সমগ্র অংশ	বোম্বাইতে, দফাগুলি বর্তমানে প্রাদেশিক
২৮। অসামরিক বিভাগে দীর্ঘ ছুটি ও অনুপস্থিতি ভাতা	সমগ্র	শূন্য

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

ব্যয়		
	রাজকীয়	প্রাদেশিক
২৯। বার্ধক্য	প্রাদেশিক খাতে উল্লেখিত না হওয়া দফা	উত্তর বেতন ও আনুতোষিক, ভারতে হিসাবভুক্ত করা সামরিক ও চিকিৎসা বিষয়ক তহবিল থেকে প্রদত্ত উত্তর বেতন বাদে; প্রতিটি সরকার দায়ী থাকবে উত্তর বেতন ও আনুতোষিক প্রদানের জন্য, যা বর্তমানে দিচ্ছে বা অতঃপর অনুমোদন বা সুপারিশ করবে, তা যে ভাবেই উপার্জিত বা প্রদত্ত হোক না কেন।
৩০। বিবিধ	সঞ্চিত সম্পদ প্রেরণ এবং সরবরাহ আদেয়কের জন্য প্রদত্ত বাটা	বক্রী অংশ
৩১। দুর্ভিক্ষে ত্রাণ সাহায্য	গৌণ দায়িত্বভার	সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক
৩২। রেলপথ	বর্তমানে যা আছে	বর্তমানে যা কিছু প্রাদেশিক
৩৩। জলসেচ	ঐ	ঐ
৩৪। অন্যান্য বাস্তুকর্ম	সামরিক বাস্তুকর্ম এবং শুধু **ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ**, সরকারের দপ্তরগুলি, লবণ, আফিম, ডাকঘর, রাজকীয় তার বিভাগ এবং গির্জা বিষয়ক বিভাগগুলি এবং টাঁকশাল ও মুদ্রা দপ্তর; এবং বঙ্গদেশ জরিপ মহাধ্যক্ষের দপ্তরগুলি বাদে	বক্রী অংশ
৩৮। বিনিময়ের জন্য ক্ষতি	সমগ্র	শূন্য

১৮৮১-৮২ সালের লেনদেন থেকে সরকার বছরে ৪৭০০০০ পাউন্ড লাভ করার আশা করেছিল। এই পরিমাণ অর্থের মধ্যে অবশ্য সরকার মধ্য প্রদেশকে ৭৭,৯০০ পাউন্ড ফিরিয়ে দিয়েছিল অধস্তন জনপালন কৃত্যক ও অন্যান্য সাধারণ কাজকর্মের অবস্থার উন্নতির জন্য, মাদ্রাজকে ফিরিয়ে দিয়েছিল প্রাদেশিক বাস্তুকর্মের জন্য ২০,০০০ পাউন্ড এবং উ: প: প্রদেশ ও অযোধ্যাকে ৩,২৬,০০০ পাউন্ড যার মধ্যে ১০,০০০ পাউন্ড ছিল অযোধ্যার অতিরিক্ত কানুনগোদের জন্য এবং বাকি ৩,১৬,০০০ পাউন্ড স্থানীয় কর রেহাই দেবার জন্য। এইসব লোক হিতকর দান ছাড়া ভারত সরকার ভাল ভাবে কাজ শুরু করবার জন্য বঙ্গদেশকে ২৮৫,০০০ পাউন্ড দিয়েছিল; ব্রহ্মদেশকে ২০,০০০ পাউন্ড, উ:প: প্রদেশকে ৫৫,০০০ পাউন্ড দিয়েছিল ১৮৮১-৮২ সাল বর্ষপূর্তির আগে তাদের উদ্বর্তের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য। এই লোকহিতকর দানগুলি, যা বছরে প্রায় ৪,৯৬,০০০ পাউন্ড হত, সেগুলি রাজকীয় রাজস্বে বছরে ৪৭০,০০০ পাউণ্ড লাভের বদলে বছরে ২৬,০০০ পাউন্ড লোকসানে পরিণত করবে এমন আশঙ্কা করা হয়েছিল।[১]

এই প্রসঙ্গে একথাও অবশ্য স্মরণ করতে হবে যে, ভারত সরকার ১৮৭৯-৮০ সালে ও ১৮৮০-৮১ সালে প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর যে বাধ্যতামূলক ঋণ ধার্য করেছিল তা ফেরত দিয়েছিল। কিন্তু ১৮৮২ সালের পুনরীক্ষণ (Rerision) করার অনতিকাল পরেই ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা, যা ঐ ধরনের উদার ব্যবস্থার অনুমোদন করেছিল, সেই সরকার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির উদ্বর্তের জন্য বাধ্যতামূলক ঋণ ধার্য করার প্রয়োজন আবার দেখা দিয়েছিল। ঐ বছরের জন্য বিত্ত বিষয়ক বিবরণ পেশ করতে গিয়ে ভারত সরকারের বিত্ত-সদস্য যুক্তি দেখিয়েছিলেন : —

'২২। ১৮৮৫-৮৬ সালের জন্য প্রাক্‌কলন উপস্থাপিত হবার পর থেকে.........ভারতীয় প্রশাসন ও বিত্ত ব্যবস্থা এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। এই স্বল্পকালের সুস্থিত অবস্থা যা দেশ ১৮৮২ সাল থেকে সুখে অতিবাহিত করছিল তার অবসান আসন্ন হয়ে আসছিল.......মধ্য এশিয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলির ঘটনাবলির দ্বারা ভারত বৃহৎ ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে একটির সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ স্থাপন করার অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল, এবং নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য পারিপার্শ্বিকতার চাপের ফলে উদ্ভূত প্রয়োজনের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশা করতে পারেনি। আসন্ন ঘটনাবলি ঘটে গিয়েছিল যা বদলে দিয়েছিল

---

১) ১৮৮২-৮৩ সালের বিত্ত সম্পর্কিত বিবরণ পৃ: ১৫।

এবং সেগুলি যে বদলে যাবে তা সবারই জানা ছিল। আমাদের প্রাক্কলনের রূপটি বদলে দিয়েছিল এবং অভ্যন্তরীণ উন্নতির শান্তিপূর্ণ পথ থেকে জোর করে আমাদের বহিষ্কার করে দিয়েছিল যেখানে আমরা আশা করেছিলাম কেউ আমাদের বাধা দেবে না।'

ঝড়ের এই ঝাপটা সহ্য করার জন্য অন্যান্য পন্থার মধ্যে ভারত সরকার দ্বিতীয় বারের জন্য প্রাদেশিক সম্পদগুলি থেকে কিছু কিছু করে আদায় করে নেবার পন্থার আশ্রয় নিয়েছিল, এবং প্রাদেশিক সম্পদগুলির উদ্বৃত্ত থেকে উপযোজনের মাধ্যমে ১৮৮৬-৮৭ সালে ৪,০০,০০০ পাউণ্ডের মত অর্থ সংগ্রহ করেছিল।

প্রাদেশিক বিত্তের অবস্থা এই অধ্যায়ে যা ছিল তা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হচ্ছে নিম্নলিখিত সারণিতে :—

	বার্ষিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি				
প্রদেশগুলি	১৮৮২-৩	১৮৮৩-৪	১৮৮৪-৫	১৮৮৫-৬	১৮৮৬-৭
	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড
ম: প্রদেশ	৩৩,৭৭৫	৭৬,২১২	১৮,০৪৭	২২,০৮০	১১৫,৬৫৬
ব্রহ্মদেশ	১৭১,২০৭	-৯০,০৩০	-৮৯,৭২৫[১]	[২]	৭১,৭৪৩[৩]
অসম	১৩,৮৮৭	-৫,২১৬	-৪০,৫৭৭	২৫,২৯৯	২৮,৫৭৬
বঙ্গদেশ	৫৩৯,৬১১	১৪৬,০২৭	৪৮,৯১০	২৬,২৭৭	৫২,৯১১
উ:প: প্রদেশ					
ও অযোধ্যা		২৮১,২২২	৩৫৭,৬৩০	-৬৯,২৭৬	-১৮০,০৬০
-১২,৪০৮					
পঞ্জাব	-১১০,৯৬৬	-১৫,৭৬৫	-৪১,৫৪৫	৪২,৪৪৭	৩,১০৬
মাদ্রাজ	১০৮,৪২১	১০,৮২০	-৮৭,২৮৪	১৪৬,৬৯২	-৭৮,৬৮৯
বোম্বাই	-১৪৯,৮৯৪	-২,৫৮৫	৬,০০৬	২৯১,৯৭৬	-১৬১,৩৬৯

ভারত সরকারের বার্ষিক বিত্ত ও রাজস্ব হিসাব থেকে সংকলিত।

১। বছরের শেষে কোনও উদ্বর্ত ছিল না।

২। ভারসাম্য।

৩। বছরের চলতি ব্যয়ের চেয়ে চলতি রাজস্বের অতিরিক্ত হিসাবে পাওয়া উদ্বর্ত।

১৮৮২-৮৩ সালে প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে যে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তা শুধু যে পূর্ববর্তী বন্দোবস্ত গুলির সঙ্গে ভিন্নতর ছিল রাজকীয় রাজস্বে নির্দিষ্ট নিয়োগের পরিবর্তে অংশভাগ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে, তা নয়, সেই সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও ভিন্নতর ছিল অর্থাৎ তাদের স্থায়িত্ব। প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্পটির ফলাফলটি যদিও একটি মাত্র সারণিতে উপস্থাপিত করা হয়েছিল ১৮৭১-৭ সাল পর্যন্ত সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে একথা অনুমান করে নেওয়া উচিত নয় যে বিভিন্ন প্রদেশগুলির সঙ্গে ছয় বছর কালের জন্য বন্দোবস্ত করেছিল। অপর দিকে, বন্দোবস্তগুলি ছিল শুধুমাত্র এক বছরের জন্য এবং অবিরাম পুনর্নবীকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ফলাফলগুলি একত্রিতভাবে এক অবিচ্ছিন্ন সময়কালের জন্য উপস্থাপিত হয়েছিল ঐ সময়কালের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছিল বলে নয়, করা হয়েছিল এই কারণে যে যে-নীতির ভিত্তিতে সেগুলি করা হয়েছিল তা ঐ সময়কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল বলে। ১৮৭৭ সালের পর নিঃসন্দেহে বন্দোবস্তগুলি করা হয়েছিল আরও দীর্ঘ কালের জন্য। দুটি ক্ষেত্রে তা করা হয়েছিল পাঁচ বছরের জন্য এবং বাকি ক্ষেত্রগুলিতে সেগুলি ছিল দুই থেকে তিন বছরের পর্যায়ে। নির্দিষ্ট নিয়োগ প্রথা মত স্বল্পকাল স্থায়ী পদ্ধতি রাজকীয় কোষাগারের পক্ষে ছিল প্রচুর সুবিধাজনক। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই সব বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত রাজকীয় সরকারের আগে থেকেই অত্যন্ত অপ্রতুল সম্পদের উপর প্রাদেশিক সরকারগুলির দাবির উপর এক নির্দিষ্ট সীমা আরোপ করা। সুস্পষ্টতই এই উদ্দেশ্য ভালভাবে সফল হত যদি বন্দোবস্তগুলির স্থায়িত্ব যা ছিল তার বেশি হত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে চুক্তির রাজস্বের দিকটির যথাসম্ভব শীঘ্র পুনঃপরীক্ষার দ্বারা রাজকীয় কোষাগারকে তার মুনাফা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারত। দীর্ঘকাল টাকা-কড়ি হীন অবস্থায় না থাকতে চাওয়ার এই কারণটিই ছিল, যা এযাবৎ কাল পর্যন্ত ভারত সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, যতটা সম্ভব চুক্তির স্থায়িত্বের সময়টিকে কমিয়ে আনা। কিন্তু রাজকীয় কোষাগারের পক্ষে যা ছিল লাভজনক তাই আবার প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টিকোণের বিচার ছিল এক গুরুতর অসুবিধা। বন্দোবস্তের স্বল্পকালীন স্থায়িত্বের কারণে প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের আয়ত্ত্বাধীন অর্থ সম্মিলিত পরিষেবাগুলির জন্য বণ্টন করার অবস্থায় থাকে না যাতে তাদের আর্থিক জগতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে। তারা এক নির্দিষ্ট আর্থিক নীতি গ্রহণ করতে পারেনি কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল যে পুনর্ণবীকরণের নতুন শর্তগুলি তাদের বাধ্য করতে পারে হয় নীতিটিকে

বর্জন করতে বা এতটাই গুরুত্ব সহকারে পরিবর্তন করতে যাতে তার পরিণাম ক্ষতিকারক না হয়। একটি স্বতন্ত্র আয়-ব্যয়ক বছরের আর্থিক ঘটনাবলির সংক্ষিপ্তসারের চেয়ে বেশি কিছু বলে প্রতীয়মান হয় না যার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে, তৎসত্ত্বেও যে রাজস্বাধ্যক্ষ বছরের পর বছর তা রচনা করে থাকেন, তাদের মধ্যে এক নির্দিষ্ট নীতি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা তার সম্পূর্ণতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু যত বিচক্ষণতার সঙ্গেই গৃহীত হোক না কেন একটি নীতি ব্যর্থ হতে পারে শর্তাবলির অভিন্নতাজনিত অবিবেচনাপ্রসূত গণ্ডগোলের দ্বারা যার উপর তার স্বার্থকতা নির্ভর করে। এটাই ছিল ঠিক সেই ত্রুটি যা প্রাদেশিক বিত্তের বলিষ্ঠ রূপায়ণে অবনতি এনে দিয়েছিল। অবিরাম পুনর্ণবীকরণের এক সাধারণ বিঘ্ন সৃষ্টিকারী প্রভাব ছিল এবং যে কোনও দুটির মধ্যে স্থায়িত্বকাল এতই কম হত যে এক সুদৃঢ় স্থায়ী পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারত না। রাজকীয় কোষাগারের সঙ্গে স্বল্পাকাল স্থায়ী চুক্তির সুযোগ-সুবিধাগুলি যে প্রচুর মাত্রায় প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে তার চুক্তিজনিত অসুবিধাগুলির দ্বারা তুল্যশক্তি সম্পন্ন বিরোধিতার সৃষ্টি করে থাকে এই ঘটনাটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারত সরকার ১৮৮২-৩ সালে বন্দোবস্তগুলির পুনর্বিচার করার সময় এটাকে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মে পরিণত করেছিল যে ওগুলির স্থায়িত্বকাল হবে পঞ্চবর্ষকাল, অর্থাৎ সেগুলি শুরু হবার পর পঞ্চম বর্ষ শেষ হবার আগে তাদের পুনর্বিচারের আওতায় আনা হবে না।

১৮৮৭-৮ সালের পুনর্বিচার

এই নিয়মের বলে ১৮৮২-৩ সাল যে সব বন্দোবস্ত হয়েছিল সেগুলির মেয়াদ শেষ হয় ১৮৮৭ সালে। তারপর সেগুলির ও সেইসঙ্গে পরবর্তী বন্দোবস্তগুলিরও পুনর্বিচারের যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল তা সাধারণভাবে রাজস্ব ও ব্যয়ের দুটি শ্রেণীতে বাধার সৃষ্টি করেনি, যে শ্রেণী দুটি হল, সমগ্র প্রাদেশিক ও সমগ্র রাজকীয় রাজস্ব ও ব্যয়। ১৮৮২ সালে পৃথগীকরণ হবার পর থেকে সেগুলি যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় থাকতে দেওয়াটাই ছিল এক ধরনের প্রচলিত নিয়ম, যখন প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের গঠন-বিন্যাস আগাগোড়া নানাভাবে পরীক্ষা করা ও পুনর্বিন্যাসের দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছিল। পুনর্বিচার করার কাজটি করণীয় হয়ে ওঠায়, রাজস্ব ও ব্যয়ের যে খাতগুলির পুনর্বিচার করা হয়েছিল সেগুলি ছিল সেই সব খাত যা তৃতীয় শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছিল যথা যৌথভাবে রাজকীয় ও প্রাদেশিক, অন্যভাবে তা পরিচিত ছিল 'বিভক্ত খাত' নামে।

১৮৮৭-৮ সালের পুনর্বিচারের সময় চূড়ান্ত কারণটি ছিল ইতিমধ্যে উল্লিখিত রাজকীয় বিত্তের অসন্তোষজনক অবস্থায়। তার আর্থিক অবস্থা উন্নত করার জন্য যৌথ খাতের অংশগুলিকে বদলানো হয়েছিল যাতে প্রতিটি স্থানীয় সরকারকে প্রমুদ্রার তিন-চতুর্থাংশ ও অন্তঃশুল্কের রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ নিজেদের কাজে লাগাবার অনুমতি দেওয়া হয়, এবং ঐসব খাতের অধীনস্থ ব্যয়গুলিকে অনুরূপ অনুপাতে বহন করতে বলা হয়। ভূমি রাজস্বের অনুপাতগুলিকেও বদলানো হয় যাতে করে এর তিন-চতুর্থাংশকে রাজকীয় এবং এক-চতুর্থাংশকে প্রাদেশিক করা যায়। কিন্তু রাজকীয় কোষাগারের আবশ্যকতা এতই বেশি ছিল যে যার জন্য ভারত সরকার এমন কি অন্যদুটি শ্রেণীর কয়েকটি খাত যথা, লবণ, বহিঃশুল্ক, সুদ, জলসেচ এবং রেলপথের পুনর্বিচার করেছিল নিজেদের সুবিধার্থে। রাজকীয় কোষাগারের লাভের বিশদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল : —

রাজস্ব	রাজকীয় অংশ বর্ধিত-হ্রাসপ্রাপ্ত	নিট লাভ
ভূমি রাজস্ব	৪,৩৭,৫০০	
প্রমুদ্রা (ভাগ ১/২ থেকে ১/৪-এ কমানো হয়)	-৮,১০,০০০	
অন্তঃশুল্ক (ভাগ ১/২ থেকে ৩/৪-এ বাড়ানো হয়)	৯,৪৭,৫০০	
ব্রহ্মদেশের লবণ রাজস্ব রাজকীয় খাতভুক্ত করা	৫,০০০	
	১,৫৫,০০০	
ব্রহ্মদেশের বহিঃশুল্ক রাজস্ব রাজকীয় খাতভুক্ত করা	-২৯০,০০০	২১৫,০০০
নির্ধারিত খাজনা—অর্ধাংশে বিভক্ত		
সরকারি রেলপথ (মোট আয়) নাগপুর-ছত্তিশগড়		
পাটনা-গয়া		
কানপুর-আচনিয়েরা	-৩১০,০০০	
পূর্ববঙ্গদেশ, প্রাদেশিককৃত	-৫৪০,০০০	

ব্যয়	বর্ধিত হ্রাসপ্রাপ্ত	নিট লাভ
ভূমি রাজস্ব, জরিপ ও বন্দোবস্তের সমগ্র প্রাদেশিকীকরণ	১৪৫,০০০	
বোম্বাইতে লবণ রাজকীয় খাতভুক্ত করা	-৯০,০০০	
বোম্বাই বহি:শুল্ক রাজকীয় খাতভুক্ত করা	-৫০,০০০	
সরকারি রেলপথ—		
কাজের জন্য খরচ :	৩০৫,০০০	৩৯৫,০০০
প্রাদেশিকীকৃত		
রাজকীয় খাতভুক্ত	-২১৫,০০০	
সুদ—প্রাদেশিকীকৃত	-৭০,০০০	
রাজকীয় খাতভুক্ত	-৬৫,০০০	
জলসেচ—প্রাদেশিকীকৃত বঙ্গদেশ	৬৫,০০০	
জলসেচ—প্রাদেশিকীকৃত মাদ্রাজ	২৩০,০০০	
যোগ দাও—গণনা বহির্ভূত হিসাবের ছোট ছোট দফা	....	২০,০০০

রাজকীয় কোষাগারের এই লাভ নিম্নলিখিত অনুপাতে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল : —

প্রদেশ	১৮৮২ এবং ১৮৮৭ সালের তুলনার ভিত্তিতে প্রাক্কলিত রাজস্বের প্রধান প্রাদেশিক হিসাবের খাতের অধীনে বার্ষিক সম্পদের বৃদ্ধি			১৮৮৭ সালের পুনর্বিচারের ফলে যে পরিমাণ অর্থের দ্বারা বার্ষিক প্রাদেশিক সম্পদগুলি হ্রাস পেয়েছিল
	ভূমি রাজস্ব	প্রমুদ্রা ও অন্ত:শুল্ক	মোট	
	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড
ম. প্রদেশ	২,২০০	৪৫,৫০০	৪৭,৭০০	১৫,৬০০
ব্রহ্মদেশ	৪,৭০০	৯,২০০	১৩,০০০	....
অসম	২২,৩০০	২১,৩০০	৪৩,৬০০	২৪,৬০০
বঙ্গদেশ	১৯,২০০	১৭১,৫৫০	১৯০,৭৫০	১০৩,৬০০

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

উ:প: প্রদেশ	৮,০০০	১৩০,১৫০	১৩৮,১৫০	১০০,০০০
পঞ্জাব	৩২,৮০০	২৩,১০০	৫৫,৯০০	....
মাদ্রাজ	২৭,৭৫০	১৪২,৫৫০	১৫০,৩০০	১৭৪,৪০০
বোম্বাই	৯৯,০০০	১৯৮,৫৫০	২৯৭,৫৫০	২২১,৯০০
মোট	১৯৫,৯৫০	৭৪১,৯০০	৯৩৭,৮৫০	৬৪০,১০০

ব্রহ্মদেশের অনুকূলে ১০,০০০ পাউন্ড প্রদান না করলে রাজকীয় কোষাগারে এটাই হয়ত নিট লাভ হত। কিন্তু এইভাবে নীট লাভ দাঁড়িয়েছিল বছরে ৫৩০,১০০ পাউন্ড।

প্রাদেশিক বিত্তের অবস্থা ১৮৮৭-৯২ সালের সময়কালে কেমন ছিল তা জানা যায় নিম্নলিখিত সারণি থেকে যাতে প্রতিটি আলাদা আলাদা প্রদেশের বার্ষিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি দেওয়া আছে : —

প্রদেশগুলি	বার্ষিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি				
	১৮৮৭-৮	১৮৮৮-৯	১৮৮৯-৯০	১৮৯০-১	১৮৯১-২
	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড
ম: প্রদেশ	১৩,১৪৮	২২,৫৮৩	-১২,৩২২	-৩১,৫২৩	১৭,৫৪০
ব্রহ্মদেশ	৭৭,০২৮	১১,৫৬০	৬৪,০৭২	১৩৬,২১৬	৫০,৫৯৮
আসাম	৭,৭৫১	২৬,৩৪৩	২০,৩৯০	-১৭,৮৭১	৩১,১৮৫
বঙ্গদেশ	১৩১,০৪৭	-৬৫,৭৯২	১০২,৫৪৭	-১২০,৩৭৭	-১১,৯৩৪
উ:প:প্র: ও অযোধ্যা	-৫৩,৯০০	৪৫,৯৪৯	১০২,৭১০	-১২,৫৪৪	-৪,৩৯৯
পাঞ্জাব	১২,৪৪৬	৩২,১৪২	২৯,২৬৪	৩১,৩৬৭	-১,৭১৯
মাদ্রাজ	১০৫,৩৭১	১১৩,৯৩২	১৪৫,৫৭১	-১৩৬,৭৩৯	-২৪১,১৭০
বোম্বাই	-২৪,৫৭৪	১৮,৩২২	৪১,৩৬১	-১২৩,৮৮৭	-৫৩,১৮৯

ভারত সরকারের বার্ষিক বিত্ত ও রাজস্ব হিসাব থেকে সংকলিত।

১৮৯২-৯৩ সালের পুনর্বিচার

পঞ্চবার্ষিকী পুনর্বিচারের নিয়ম অনুসারে প্রাদেশিক বন্দোবস্তগুলির পরবর্তী পুনর্বিচার করা হয়েছিল ১৮৯২-৩ সালে। উক্ত বছর থেকে আরম্ভ হওয়া নতুন

বন্দোবস্তগুলি নীতিগতভাবে ১৮৮৭-৮ সালের বন্দোবস্তগুলির ভিন্নতর ছিল না। যৌথ রাজস্বের অংশগুলি এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছিল যাতে রাজকীয় কোষাগার প্রাদেশিকীকৃত উৎসগুলির ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন থেকে আরও বেশি লাভ করতে পারে। অংশগুলির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে এই পুনর্বিচার থেকে রাজকীয় সরকার যে পরিমাণ অর্থ পুনর্গ্রহণ করেছিল তার হিসাব নিম্নরূপ :—

প্রদেশ	১৮৮৭-৮ থেকে ১৮৯১-২ সালের চুক্তির জন্য প্রাক্কলনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ১৮৯১-২ সালের রাজস্ব বৃদ্ধি (সংশোধিত হিসাব)	ভারত সরকার কর্তৃক পুনরায় গৃহীত অর্থের পরিমাণ
	টাকা	টাকা
ম: প্রদেশ	১১৯,২০০	২২,৭০০
নিম্নব্রহ্মদেশ	৩৩৪,৯০০	৫৮,৯০০
বঙ্গদেশ	৫১৭,৭০০	৫১,৯০০
উ:প: প্রদেশ ও অযোধ্যা	৫৩,৩০০	৫৬,৯০০
পঞ্জাব	১৯৫,৪০০	৪১,০০০
মাদ্রাজ	৩১৩,২০০	১০৩,৮০০
বোম্বাই	৩৯৯,২০০	১৩১,১০০
অসম	৯৯,৮০০	....
মোট	২,০৪২,৭০০	৪৬৬,৩০০

কিন্তু রাজকীয় কোষাগারের এই লাভ আসন্ন অধ্যায়ের জন্য স্বাভাবিক রূপে প্রাক্কলিত প্রদেশগুলির ব্যয় ও তাদের হাতে ভার ছেড়ে দেওয়া রাজস্বগুলির প্রাক্কলিত স্বাভাবিক উৎপাদের মধ্যে ভারসাম্যকে গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। তাদের স্বাভাবিক ব্যয় ও স্বাভাবিক রাজস্বের মধ্যে ভারসাম্য পুন:প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারত সরকার নির্ধারিত সমন্বয় করা নিয়োগগুলির বাতিল করা পদ্ধতিতেই আবার প্রত্যাবর্তন করেছিল, যার ফলে বন্দোবস্তের অধ্যায়টির জন্য যা স্বাভাবিক হিসাবে প্রাক্কলিত হয়েছিল তা থেকে যখন প্রকৃত রাজস্ব ও ব্যয়গুলি বিচ্যুত হচ্ছিল, তখন প্রতিটি প্রদেশকে রাজকীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সমন্বয় সাধনকারী লিপিবদ্ধ বিষয়গুলি সমগ্র অধ্যায় জুড়ে নির্দিষ্ট হয়েই ছিল। নতুন অধ্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট হিসাবে বিভিন্ন প্রদেশের প্রাক্কলিত স্বাভাবিক ব্যয় ও রাজস্বের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ সমন্বয় সাধনকারী নিয়োগগুলির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :—

প্রাদেশিক রাজস্ব

প্রদেশ	সাধারণ রাজস্ব যা ছিল কয়েকটি আয়ের অংশ	সমন্বয়সাধনকারী নিয়োগ	মোট	প্রাদেশিক ব্যয়
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
ম: প্রদেশ	৫৬৭,৬০০	২২০,৫৫০	৭৮৮,১০০	৭৮৮,১০০
নিম্ন ব্রহ্মদেশ	১,৪২৭,৫০০	৪১৪,৩০০	১,৮৪১,৮০০	১৮৪১৮০০
অসম	৬৫৭,৭০০	-১১২,৭০০	৫৪৫,০০০	৫৪৫,০০০
বঙ্গদেশ	৪,২৪৯,৩০০	-১৪৩,৯০০	৪,১০৫,৫০০	৪,১০৫,৯০০
উ:প:প্রদেশ ও অযোধ্যা	৩,৪০৩,৫০০	-২৫০,০০০	৩,১৫২,৯০০	৩১৫২,৯০০
পঞ্জাব	১,৩৭,৪০০	৩৪৮,৫০০	১,৭১৮,৯০০	১,৭১৮,৯০০
মাদ্রাজ	২,৪৭৯,৩০০	৩২৫,৪০০	২,৮০৪,৭০৭	২,৮০৪,৭০০
বোম্বাই	৩,১২৩,৯০০	৭৭১,৪০০	৩,৮৯৫,০০০	৩,৮৯৫,৩০০

বন্দোবস্তের অধ্যায় জুড়ে বার্ষিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি থেকে যা নির্দেশিত হচ্ছে সেই হিসাবে প্রাদেশিক বিত্তের অবস্থার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে বিপুল পরিমাণ পুনর্গ্রহণ ও নির্দিষ্ট নিয়োগের কুফলগুলি : —

প্রদেশগুলি	বার্ষিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি				
	১৮৯২-৩ টা:	১৮৯৩-৪ টা:	১৮৯৪-৫ টা:	১৮৯৫-৬ টা:	১৮৯৬-৭ টা:
ম: প্রদেশ	-২১,৭৯৮	-৬০,৭৭২	-১০৫,১০৮	১৯,৬৫৩	-৩৭,৪০৮[১]
ব্রহ্মদেশ	৬৬,৬৪২	-৯০,৬৫৩	-২৭২,৩১৯	২২৬,৫০৫	৭৮০
অসম	৯,৩৩৬	২৮,৫৩২	-২৭,৪২২	৩০,৫০৭	-২৫,৪২১
উ:প: প্রদেশ ও অযোধ্যা	-১৬,৭৫২	-২৫,১৫৫	-১৬৫,৯৮৭	-১৩৯,৭৯৮	-১৬৪,৭৪০
বঙ্গদেশ	-৯,৮২৬	৩৬,৮৮৭	১৬৯,৭৯৬	১৪৯,৮০৮	-১৮৬,৫৫৮
পঞ্জাব	-১০৬,০৫০	-২২,৬৯৯	-২৪,৮১১	-৭,১৫৬	-৬৪,০৭৩
মাদ্রাজ	-১৫৯,০৮১	৩৩,৬৩৬	৯২,৩২৮	৪৪,১১৮	-২০০,৫৭৯
বোম্বাই	-২৩,৮৮৮	১৯,৪৪৩	-১০২,৪৭২	১০০,৬৯০	-২২১,১১৯

১। কোনও অন্ত্যস্থিতি (Closing balance) ছিল না। ভারত সরকারের বার্ষিক বিত্ত ও রাজস্ব হিসাব থেকে সংকলিত।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এই অধ্যায়ের মধ্যে প্রদেশগুলির আর্থিক ব্যবস্থাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বিঘ্নিত হয়েছিল বন্দোবস্তগুলির মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হবার শেষের দিকে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের জন্য। এই দুটি বিষম দুর্দৈবের মোকাবিলা করতে প্রদেশগুলি যে খরচ করতে বাধ্য হয়েছিল তা সকলের সম্পদকে নিঃশেষ করে দেয় এবং মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিকে দেউলিয়ার প্রান্ত সীমায় পৌঁছে দিয়েছিল, যা থেকে তাদের উদ্ধার করেছিল ১৮৯৬-৭ সালে তাদের উদ্বর্তে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নলিখিত অনুদানের দ্বারা :—

মধ্যপ্রদেশকে	৫২৬ লাখ টাকা
উ: প: প্রদেশ ও অযোধ্যাকে	১৬০৯ লাখ টাকা

১৮৯৬-৯৭ সালের পুনর্বিচার

১৮৯২ সালে প্রদেশগুলিকে প্রদত্ত অনুদানের চেয়ে তাদের ব্যয় ও রাজস্বের আরও উচ্চতর স্তর প্রবর্তন করে ১৮৯৬-৭ সালের সংশোধিত বন্দোবস্তগুলিতে অন্তত কিছুটা পরিমাণে প্রাদেশিক বিত্তের এই মন্দা কমানো গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আনুপাতিক পার্থক্য সহ ব্যয়ের পুরনো ও নতুন স্তরটিকে পেশ করা হয়েছে নিম্নলিখিত সারণিতে :—

প্রদেশ	মোটামুটি নিট খরচ		শতাংশের হিসাবে বৃদ্ধি
	১৮৯২	১৮৯৭	
	টাকা	টাকা	
মধ্যপ্রদেশ	৬৫৩,৩০০	৭১০,৭০০	৮.৮
নিম্নব্রহ্মদেশ	১,০৬৪,৬০০	১,২০৬,১০০	১৩.৩
অসম	৪৬৭,৬০০	৫৬৪,৯০০	২০.৮
বঙ্গদেশ	২,৮১৬,৭০০	৩,১২৫,৫০০	১০.৯
উ: প: প্রদেশ	২,২১৫,৪০০	২,৪২৮,৭০০	৯.৬
পঞ্জাব	১,৩৮৪,৬০০	১,৫৩৭,৩০০	১১.০
মাদ্রাজ	২,০৫৪,৮০০	২,২৩৮,৬০০	৮.৯
বোম্বাই	২,০৪৯,৫০০	২,৫৪৪,১০০	৫.৮
মোট	১৩,০৬৬,৫০০	১৪,৩৫৫,৯০০	৯.৯

এই নতুন ও বর্ধিত ব্যয়ের মানটি যৌথ রাজস্বে রাজকীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির অংশের সংশোধনের দাবি জানাল। কিন্তু এই সংশোধন এমন কৌশলে করা উচিত ছিল যাতে প্রদেশগুলিকে আরও বেশি সম্পদ দেবার সময় নির্দিষ্ট নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারটি যথাসম্ভব কম করা যায় ; ভারত সরকার নিজেদের অসুবিধার মাধ্যমেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল যে ব্যাপক হারে নির্দিষ্ট নিয়োগগুলি প্রাদেশিক বিত্তের সম্পদের দিকটিকে এমন এক অস্বস্তিকর মাত্রায় অনমনীয় করে রাখতে চাইছিল যাতে ব্যয়ের পরিবর্তনশীলতা যদি প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত রাজস্বের সম্প্রসারণসাধ্যতাকে অতিক্রম করে যায় তবে তা প্রয়োজনবশত অবশ্যই বাধ্য হবে দানস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ বণ্টন করে দিতে ব্যাপারটিকে সহজ করার জন্য, যার অন্যথায় পরিস্থিতি অসুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়ত, এইসব নির্দিষ্ট নিয়োগগুলিও অনুন্নত ও অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রদেশগুলির মধ্যে কিছু মাত্রায় অসমতা সৃষ্টি করেছিল। উন্নত প্রদেশগুলিতে নির্দিষ্ট নিয়োগগুলি তুলনামূলকভাবে অনুন্নত প্রদেশগুলির চেয়ে তাদের সম্পদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অংশ গঠন করত এবং কেবলমাত্র তাদের রাজস্বের সম্প্রসারণের সময় প্রদেশগুলি আরও বেশি মাত্রায় ব্যয়ভার গ্রহণ করতে পারত, যে প্রদেশগুলির সম্পদের একটা বৃহত্তর অংশ ছিল সম্প্রসারণশীল চরিত্রের, শুধু তারাই অধিকতর অনুকূল আচরণ লাভ করত তুলনামূলকভাবে অনুন্নত প্রদেশগুলির চেয়ে, যাদের সম্পদের বৃহত্তর অংশ ছিল অনাদায়ী অবস্থায়। অনুন্নত প্রদেশগুলির প্রয়োজনগুলি উন্নতদেশগুলির প্রয়োজনগুলির তুলনায় যে বেশি জরুরি ছিল এই ঘটনার কথা বিবেচনা করে এটাই ভারত সরকার সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিল যে যা হওয়া উচিত ছিল তার বিপরীত ঘটনা হিসাবে। এই অবিচারকে পরিহার করার জন্য ভারত সরকার শেষ পুনর্বিচারে স্থির করা নির্দিষ্ট নিয়োগগুলি বরং হ্রাস করিয়ে যৌথ রাজস্বে অনুন্নত প্রদেশগুলির অংশভাগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কেবলমাত্র .২৫ শতাংশের পরিবর্তে ভূমি রাজস্বের .৪ শতাংশ পঞ্জাবকে ও .৫ শতাংশ মধ্যপ্রদেশকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্রহ্মদেশের অংশে ভূমিরাজস্ব .৬৬ শতাংশ বাড়ানো হয়, উচ্চ ব্রহ্মদেশ সংযোজনের ফলে বর্দ্ধিত ব্যয়ের জন্য ব্যবস্থা করার জন্য, এবং প্রত্যাহৃত রেল রাজস্বের পরিবর্তে ব্রহ্মদেশকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল অন্তঃশুল্কের মাত্র .২৫ শতাংশের পরিবর্তে .৫ শতাংশ নেবার জন্য। উত্তর-পশ্চিমে প্রদেশের আর্থিক অবস্থা ততটা সন্তোষজনক ছিল না। এর রাজস্ব এতটাই প্রগতিবিরোধী ছিল যে তাকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ২ শতাংশ ১৮৯২ এবং ১৮৯৭ সালের মধ্যে ১৮৯২ সালের পুনর্বিচারে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছিল তা কিছুটা

পরিমাণে ছিল অন্যায্য। পুনর্বিচারের ফলে প্রচলিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে রাজস্বে পাঁচ লাখের ঘাটতি দেখা দেয়, যা পূরণ করার জন্য এর উদ্বর্তগুলি কমানো হয়েছিল। এই ত্রুটির সংশোধনের জন্য ভারত সরকার ভূমি রাজস্বের অংশগুলির পুনর্বণ্টন করেছিল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সুবিধার্থে। এর অতিরিক্ত ভারত সরকার ঐ প্রদেশকে ১৮৯৭-৮ সালের জন্য আরও ৪ লাখের অনুদান দেয়, যাতে ঐ প্রদেশ সমর্থ হয় আর্থিক দিক দিয়ে স্বাধীন ভিত্তির উপর জেলার অর্থসংস্থানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যে কাঙ্খিত ফলটি ব্রিটিশ ভারতের অন্য সব প্রদেশে দীর্ঘকাল আগেই পাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনুন্নত ও উন্নত উভয় প্রদেশগুলির সম্বন্ধে পক্ষপাতশূন্য আচরণ করার জন্য, ভারত সরকার বুঝে ছিল যে একটি অসম আচরণ করাটাই হবে একমাত্র উপযুক্ত পথ। তাই বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মত উন্নততর প্রদেশগুলির সঙ্গে বন্দোবস্তের শর্তগুলি সংশোধন করার ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। অনুন্নত প্রদেশগুলির তুলনায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ আনুপাতিক বৃদ্ধি করতে দিয়েছিল, যা উপরোক্ত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দেখা যাবে এবং রাজস্বের ক্ষেত্রে তাদের অংশগুলি সামান্য পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছিল। এই সংশোধনের অবসরে রাজকীয় রাজস্ব-বিভাগের লাভ ছিল কার্যত যৎসামান্য। ১৮৭৭ সালে ছাটাইয়ের ফলে রাজস্ববিভাগের মোট লাভের পরিমাণ হয়েছিল বছরে ৪০ লাখ ; ১৮৮২ সালে রাজকীয় সরকারের সমৃদ্ধি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে লাভের জন্য পন্থা উদ্ভাবন করার বদলে রাজকীয় বার্ষিক রাজস্ব থেকে ২৬ লক্ষ প্রত্যর্পণ করেছিল প্রদেশগুলিকে। কিন্তু ১৮৮৭ সালে আবার ফিরিয়ে নেয় ৬৩ লাখ এবং ১৮৯২ সালে ৪৬ লাখ। এই অবসরে অবশ্য রাজস্ব বিভাগের আয় ছিল শূন্য। কারণ উন্নত প্রদেশগুলি থেকে যা পেয়েছিল তা দিয়ে দিতে হয়েছিল অনুন্নত প্রদেশগুলিকে।

বন্দোবস্তের শর্তগুলি ন্যায্য ও উদার হওয়া সত্ত্বেও বন্দোবস্তের সমগ্র সময়-কালটিকে বিশৃঙ্খলতায় ভরিয়ে রেখেছিল যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তা প্রাদেশিক উৎসগুলির কাছ থেকে এত বেশি দাবি জানিয়েছিল যে উৎসগুলি পর্যাপ্ত হলেও, সেগুলি প্রদেশগুলির চাহিদার তুলনায় অনেক কম ছিল। ১৮৯৬ ও ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ অসম মাত্রায় হলেও সবকটি প্রদেশকে প্রভাবিত করেছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং ব্রহ্মদেশে প্রভাবটি অতিমাত্রায় দুঃসহ হয়েছিল। মাদ্রাজ, বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবে তা ছিল গুরুতর, পঞ্জাবে অত্যন্ত গুরুতর ভাবে, এবং বাকি প্রদেশগুলিতে সামান্য পরিমাণে। এবং অসম, এই দুটি দুর্ভিক্ষের দ্বারা প্রভাবিত না হলেও, ১৮৯৭ সালের জুন মাসের ভূমিকম্পে প্রচণ্ড ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষ ছাড়া প্লেগ তার তাণ্ডব চালিয়েছিল ও তার মাসুল আদায় করেছিল। এই সব অদৃষ্টপূর্ব চরম দুর্দৈবের ফলে সবকটি প্রদেশ বাধ্য হয়েছিল প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করতে, কারণ বন্দোবস্তের সময়কালটির জন্য নির্ধারিত প্রচলিত রাজস্বে কোনও ব্যবস্থা করা হয় নি। এইসব অদৃষ্টপূর্ব চরম দুর্দৈবের জন্য ব্যয় ভারটি এক অদ্ভুত ধরনের হওয়ায় সে গুলিকে রাজকীয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল এবং রাজকীয় রাজস্ব বিভাগ থেকে তার ভার বহন করা হয়েছিল, কিন্তু এতটা সহায়তা দান করা সত্ত্বেও তা প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে পর্যাপ্ত হয়ে উঠতে পারে নি এবং ভারত সরকার বাধ্য হয়েছিল প্রাদেশিক রাজস্বের বিশেষ সহায়ক-অনুদান (Grant in-aid) দিতে বাধ্য হয়েছিল যা প্রদর্শিত হয়েছে ২০৭ পৃষ্ঠায়।

এইভাবে ভারত সরকার শুধু দুর্ভিক্ষের ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্যছিল তা নয়, সেই সঙ্গে সেই সময়ের ঐ অভূতপূর্ব পরিস্থিতির জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলি যে-সব প্রয়োজনীয় জন কল্যাণমূলক পরিষেবাগুলিকে স্থগিত রাখতে বা ছাঁটাই করতে চাইছিল সেগুলির জন্য অর্থ যোগান দিতে ও ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে অর্থদানও করেছিল। এই সমগ্র সময়-কালে রাজকীয় আর্থিক অবস্থা এতই সমৃদ্ধ ছিল যে রাজকীয় সরকারের পক্ষ থেকে এইসব সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। সাধারণ ভাবে সব প্রদেশগুলির সব সময়ে দীন দশার মধ্যে থাকাটা ভাল ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও, রাজকীয় বিত্তে উদ্বৃত্ত হওয়াটা এক সময়োচিত সম্পদ প্রমাণিত হয়েছিল, যার সদুপযোগ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল যে প্রশংসনীয় পদ্ধতিতে তা খরচ করা হয়েছিল তার ফলে। জনহিতকর বাস্তু কর্মের জন্য অর্থ দান করা ছাড়াও রাজকীয় সরকারের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রদেশগুলির সাহায্যার্থে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য :

(১) রাজকীয় ভূমি রাজস্ব মকুব ৫,০৯৪,০০০ টাকা এবং প্রদেশগুলিকে তাদের অংশ প্রেরণের জন্য ব্যয়পূরণ (reimbursement) ৫৯,৮১,০০০ টাকা, সব মিলিয়ে ১,১০,৭৫,০০০ টাকা।

(২) মধ্যপ্রদেশে পিণ্ডারি খাজনার অবলুপ্তি, বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ৭,০০০ টাকা।

(৩) আজমীর পাটওয়ারির হারে লাঘব ১০ শতাংশ থেকে ৬১/৪ শতাংশে; প্রেরিত স্থানীয় রাজস্বের পরিমাণ—১৩,০০০ টাকা, কিন্তু স্থানীয় তহবিলে অনুদান দেওয়া হয়েছিল ২৩,০০০ টাকা।[১]

১) ভারত সরকারের ১৯০২-০৩ সালের বিত্ত-বিবরণ, অনুচ্ছেদ ১৪৬।

প্রাদেশিক রাজস্বের সাহার্য্যার্থে এইসব বিবিধ অনুদানের পরিমাণগুলি বিবেচনা করে নিম্নলিখিত সারণিটি উপস্থাপিত করা হয়েছে বন্দোবস্তের এই অধ্যায়ে প্রাদেশিক বিত্তের অবস্থা সম্বন্ধে নির্দেশক হিসাবে :

প্রাদেশিক উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি

প্রদেশ	১৮৯৭-৯৮	১৮৯৮-৯৯	১৮৯৯-১৯০০	১৯০০-১৯০১	১৯০১-১৯০২	১৯০২-১৯০৩	১৯০৩-১৯০৪
	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:
ম: প্রদেশ	(ক)	১২,২৮৮	-১২২,৮৮৩	(ক)	২২,৪২,৪০৮	-৭০৫	-৭,৪০,৭৪২
ব্রহ্মদেশ	১,৬৯,৪৩৫	৪,১১,৪৯৪	২৬,১৪,৩১২	১৫,১৬,২২০	৭,৫৫,২৮৫	...	...
অসম	-৪৫,৫৮০	৮৬,৭৪২	-৮,১৫,৪৮৮	-৮৬,৮২৯	১,৪৭,৩৫৩	১০,০৮,৩৯৩	১১,৪০,৫১৭
বঙ্গদেশ	-৩,০৩,২৫০	২,১৯,৪৪৯	৭,০১,৮৯৯	৪,৪৩,২২৪	৬,৪৪,১৭০	৬,২৩,৬৪০	৮৭,২৩,৪৯৬
উ: প্রদেশ	(ক)	৩,২৮,৫৬২	৭,৫৩,৮১৫	৮,০৪,৭৮৯	...	...	...
পঞ্জাব	-২,২৭৮	১,১৫,৩৭৯	-১৬,৫৩,৭৯৪	(ক)	১৪,৯৬,৩৫০	১০,২৮,৭৭০	৬,৭৪,৮৮০
মাদ্রাজ	-১৫৭,৭০৭	১,৬০,৭০৬	-১৭,৫৮,০২৯	-৩,২১,০১৩	৪০,৪১,২৯৭	-১৫,৮১০	৫২,৪০,৮০৯
বোম্বাই	-১,২৯,৬৬৩	১০০,৪২৭	-১৫,০৪,২৭১	(ক)	৫৮,২৩,২৩৫	-২৪,২৩,২৩৫	-১,২৩,০০০
আগ্রা ও অযোধ্যার উ: প্রদেশ	...	...	...	...	-৯,৬৩,৭৮৮	-৬৪,৩৭২	৩৭,১১,২৮১

আয়-ব্যয়কের ভারসাম্যের জন্য অন্ত উদ্বৃত্ত ছিল না। ভারত সরকারের বার্ষিক বিত্ত ও রাজস্ব হিসাব থেকে সংকলিত।

১৯০২-০৩ সালের পুনর্বিচার

১৮৯৭ সালে প্রদেশগুলির সঙ্গে যে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেগুলি স্বাভাবিক নিয়মে ১৯০২-৩ সালে শেষ হওয়া উচিত ছিল। বন্দোবস্তগুলির পর্যাবৃত্ত (Periodic) পুনর্বিচারে কেন্দ্রীয় ক্রিয়াপ্রণালী আগামী পাঁচ বছরের জন্য আদর্শ প্রাদেশিক ব্যয়ে পর্যবসিত হওয়া উচিত ছিল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাদা-মাটা কাজকর্মের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে মেয়াদ শেষ হয়ে আসা পঞ্চবর্ষকালের গড় ব্যয়কে গ্রহণ করা হয়েছিল প্রারম্ভিক পঞ্চবর্ষ কালের জন্য আদর্শ ব্যয় হিসাবে। এই ধরনের প্রণালীতে জাজ্বল্যমান ভুলভ্রান্তি কিছু থাকে না যদি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পঞ্চবর্ষকালগুলি সমভাবে স্বাভাবিক হয় তাদের ঘটনাবলির ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু আমরা যা দেখেছি বিগত পঞ্চবর্ষকালের ঘটনাবলি ছিল সম্পূর্ণ

প্রদেশগুলিকে রাজকীয় বিশেষ সহায়ক অনুদান*

বছর	ভারত	ম.প্র.	আসাম	বঙ্গদেশ	উ.প.প্র. ও অযোধ্যা	পঞ্জাব	মাদ্রাজ	বোম্বাই	ব্রহ্মদেশ
	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:
১৮৯৭-৯৮	...	৭,৭২,০০০	৮,০০,০০০	...	১০,২৭,০০০	...	...	১২,১৮,০০০	...
১৮৯৮-৯৯	...	৫,০০,০০০	১৮,০০,০০০	১৭,০০,০০০	১০,০০,০০০	৫,০০,০০০	২৬,৯৬,০০০	৪৮,৭৫,০০০	...
১৮৯৯-১৯০০	...	১৯,৩২,০০০	...	...	...	৯৫,০০০	৩,৪৯,০০০	৩৪,৩৭,০০০	...
১৯০০-০১	...	৩৪,১৫,০০০	...	...	...	৫,৯৮,০০০	...	৬৪,৭৯,০০০	...
১৯০১-০২	...	২৬,৮৯,০০০	২,০০,০০০	...	...	১২,৪০,০০০	৩২,১৪,০০০	৯১,০০,০০০	...
		৬,৫০,০০০	...	...	...	৪,০০,০০০	১০,০০,০০০	১৯,৫০,০০০	...
১৯০২-০৩ (১)		২,০০,০০০	১,০০,০০০	১০,০০,০০০	৫,০০,০০০	৪,০০,০০০	৮,০০,০০০	৬,০০,০০০	৪,০০,০০০
১৯০২-০৩ (২)	ক ৭০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৬,০০,০০০	৪,৫০,০০০	৫,০০,০০০	৫,৫০,০০০	৫,৫০,০০০	...
১৯০২-০৩ (৩)	খ ১,০০,০০০	২,০০,০০০	১,৫০,০০০	...	৩,৫০,০০০	৩,০০,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	...
১৯০৩-০৪ (১)	...	২,০০,০০০	১,০০,০০০	১০,০০,০০০	৫,০০,০০০	৪,০০,০০০	৮,০০,০০০	৬,০০,০০০	৪,০০,০০০
১৯০৩-০৪ (২)	...	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০	১০,০০,০০০	৫,০০,০০০	১০,০০,০০০	...
১৯০৩-০৪ (৩)	...	১,৯০,০০০	১,১১,০০০	...	২,২৬,০০০	২,৭৬,০০০	৩,৫০,০০০	৩,৫০,০০০	...

*ভারত সরকারের বার্ষিক বিত্ত বিবরণ থেকে সংকলিত।

(১) শিক্ষা বাবদ (আবর্তক)

(২) বাস্তু কর্মের ব্যবহারের জন্য

(৩) জিলা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য

(ক) বালুচিস্তান, রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের বাস্তুকর্মের জন্য বরাদ্দ

(খ) "ভারত" খাতে অর্থ গৃহীত হয়েছিল পরবর্তীকালে প্রদেশগুলিকে বণ্টন করার জন্য।

ভাবে অস্বাভাবিক এবং সেগুলিকে যেকোনও হিসাব-নিরূপণের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি করা যেতে পারে না। প্রয়োজনাধিক পূর্বাহ্নিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক বন্দোবস্তের আগাগোড়া পুনর্বিচারের কাজ হাতে নেওয়ার আগে স্বাভাবিক সময় ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করাকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল। অতএব ১৯০২-০৩ সালের পুনর্বিচারের উপলক্ষ্যটিকে ব্রহ্মদেশ বাদে অন্য সর্বত্র স্থগিত রাখা হয়। কারণ, সর্বশেষ বন্দোবস্তটি অন্যান্য প্রদেশগুলির তুলনায় ব্রহ্মদেশের পক্ষে অতিমাত্রায় অনুকূল ছিল, ১৮৯৬-৯৭ সালের বন্দোবস্তগুলির ভিত্তিতে করা অত্যন্ত সুবিবেচিত ও ন্যায্য হিসাব নিরূপণ করা সত্ত্বেও। রাজস্বগুলি কি পরিমাণে ব্যয়ের চেয়ে অধিক হয়ে গিয়েছিল তা জানা যায় নিম্নলিখিত সারণি থেকে :—

ব্রহ্মদেশ	প্রাক্‌কলিত আদর্শ মান ১৮৯৭-৯৮ থেকে ১৯০১-০২ সালের বন্দোবস্ত-গুলির জন্য	১৯০২-০৩ সালের সংকলন	পার্থক্য
	টাকা	টাকা	টাকা
রাজস্ব	২,৯৩,৮১,০০০	৩,৭৩,৮৬,০০০	৮০,৬৫,০০০
ব্যয়	২,৯৩,৮১,০০০	৩,৩১,৮৬,০০০	৩৮,০৫,০০০
উদ্বৃত্ত	...	৪২,০০,০০০	...

এই ধরনের ফলাফলের ধারাবাহিকতাকে রাজকীয় সরকারের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রতি অন্যায্য বলে গণ্য করা হয়েছিল। ব্রহ্ম প্রদেশের বিত্তীয় বন্দোবস্ত সেইভাবে সংশোধিত হয়েছিল যুগপৎ সংশোধনের প্রতিষ্ঠিত অনুশাসন থাকা সত্ত্বেও, যখন উপলক্ষটি ১৯০২-০৩ সালে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সংশোধনের ফলে যৌথ রাজস্বে প্রদেশের অংশগুলি পুনর্বিন্যাসের দ্বারা এই উদ্ধৃতটি ভারত সরকার কর্তৃক পুনর্গৃহীত হয়েছিল। ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে অংশটি দুই-তৃতীয়াংশ থেকে একের দুই অংশে হ্রাস করা হয়েছিল এবং অন্তঃশুল্কে একের-দুই অংশ থেকে একের তিন অংশে, এবং ব্যয়ের ইতিমধ্যে প্রাদেশিকীকরণ করার সঙ্গে কয়েকটি গৌণ হিসাবের খাত যুক্ত করা হয়েছিল। এইসব পরিবর্তনের ফলে ১৯০৩ থেকে ১৯০৬ সালের নতুন বন্দোবস্তের জন্য ব্রহ্মদেশের আদর্শ মানের রাজস্ব ও ব্যয় নিম্নলিখিত মোট পরিমাণে অনুমিত হয়েছিল :—

রাজস্ব	সমন্বিত করা নিয়োগ	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
২,৭৮,৩১,০০০	৫৩,০২,০০০	৩,৩১,৩৩,০০০	৩,৩১,৩৩,০০০

অপর যে প্রদেশের বন্দোবস্ত সংশোধিত হয়েছিল তা ছিল পঞ্জাব, কিন্তু তার কারণ ছিল অন্য। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধীনস্থ অঞ্চল বিভাজিত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আগ্রা ও অযোধ্যার সংযুক্ত প্রদেশে যা সাধারণভাবে উত্তরপ্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। এর সঙ্গে পঞ্জাবের কয়েকটি জেলা তা থেকে পৃথক করা হয়েছিল, এবং নতুন সৃষ্ট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। এর ফলে প্রাদেশিক রাজস্ব ও আয়ের মধ্যে পুনর্বিন্যাস করতে হয়েছিল, কিন্তু বন্দোবস্তের সামগ্রিক সংশোধন কোনও কিছু করা হয়নি। পরিবর্তনগুলি সীমাবদ্ধ ছিল সমন্বয় সাধনকারী নিয়োগে প্রয়োজনীয় অদল বদল করার মধ্যে।

প্রায়-স্থায়ী সংশোধন ১৯০৪-০৫

উপরোক্ত ব্যতিক্রমগুলি সহ ১৮৯৭ সালের বন্দোবস্তগুলি ১৯০৪ সালের শেষ পর্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল। উপরে বিশদীকৃত সংশোধনের মুলতুবি রাখাটার মুখ্য কারণ ছিল ১৯০১-০২ সালে বিদ্যমান থাকা পরিস্থিতির অস্বাভাবিকতা। সংশোধনের ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেবার আগে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত সরকার কেন এত উদ্বিগ্ন ছিল তার আরও একটি কারণ ছিল। এই সময়েই ভারত সরকার প্রাদেশিক বিত্তে স্থায়িত্বকরণের প্রবর্তন করার কথা চিন্তা করছিল। পঞ্চবার্ষিকী আয়-ব্যয়ক পদ্ধতি যা প্রাদেশিক বিত্তের ভিত্তি হিসাবে বার্ষিক আয়-ব্যয়ক পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপন করেছিল। তা ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্বের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য উন্নতি আনলেও, পূর্ণ মাত্রায় পর্যাপ্ত বলে গণ্য করা হয় নি। এর অধীনে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল পাঁচ বছরের জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাদের মিতব্যয়িতার ও নিজেদের সম্পদগুলির সফল পরিষেবার সুফল ভোগ করতে। এর ফলাফল যথাসম্ভব উপকারী হওয়া সত্ত্বেও সময়ের এই প্রতিবন্ধকতাকে প্রাদেশিক বিত্তের উপর এক অত্যন্ত অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করতে দেখা গিয়েছিল। পঞ্চবর্ষব্যাপী আয়-ব্যয়ক পদ্ধতির অধীনে এটা ঘটতে দেখা গিয়েছিল যে নতুন পরিবেশের অধীনে কার্য-সম্পাদনে অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বনের ফলে প্রাদেশিক সরকারগুলি প্রথম কয়েক বছরে মিতব্যয়ী ছিল অন্যথায় তাদের ব্যয় তাদের রাজস্বের তুলনায় খুব বেশি হয়ে যেতে পারত। এবং শেষের

কয়েক বছর অপচয়ী হয়ে উঠত অন্যথায় যাতে তাদের ব্যয় যেন আদর্শ মানের নীচে নেমে না যায় এবং বিরাট অংকের উদ্বৃত্ত না রাখে যাতে ভারত সরকার সেগুলির সঙ্গে করা বন্দোবস্তগুলির সংশোধন করতে গিয়ে বাতিল না করে দেয়। পাঁচ বছরের এই স্বল্প সময়ের মধ্যে উন্নতিবিধানের জন্য সতর্কতার সঙ্গে পূর্ণ রূপ দানকারী ও সুবিবেচিত প্রকল্প কোনও স্থানীয় সরকার কার্যকর করবে এটা আশা করা যেত না। তারা যা করতে পারত তা এই যে, প্রথম দুই অথবা তিন বছর কাটিয়ে দিত একটি প্রকল্প রচনা করতে এবং শেষ দুই অথবা তিন বছর তাড়াহুড়ো করে তা কার্যকর করার চেষ্টা করত, বেশির ভাগ প্রদেশেই যা হয়ে আসছিল। এই ধরনের প্রকল্পের দায়িত্বভার গ্রহণ করার প্রবণতা, যার একমাত্র গুণ ছিল এই যে ঐ প্রকল্পগুলি সংশোধন করার আগেই তা কার্যকর করা যেত এবং প্রধানত আদর্শ মানের ব্যয়ের মাত্রায় পৌঁছবার জন্যও, এবং ঐ প্রবণতা ছিল পঞ্চবর্ষব্যাপী আয়-ব্যয়ক পদ্ধতির প্রত্যক্ষ পরিণাম। এটা ছিল নিঃসন্দেহে এক অবরোহী প্রণালীতে লব্ধ সিদ্ধান্ত। প্রদেশগুলির বার্ষিক উদ্বৃত্তের উপর এক বার দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাব যে কি ভাবে পঞ্চবর্ষকালের প্রারম্ভে সেগুলি বাড়ছিল এবং শেষ ভাগে কমছিল। মিতব্যয়িতা ও অপচয়ের এই অনিষ্টকর দিকগুলি পরিহার করার জন্য প্রতিকারের একমাত্র পথ ছিল পঞ্চবার্ষিকী সংশোধনের নীতিটিকে বর্জন করা; এবং ভারত সরকার সাহসের সঙ্গেই একাজ করতে উদ্যত হয়েছিল। সংশোধনের অধিকার ছিল এবং বহু কাঙ্ক্ষিত অধিকার, এবং প্রদেশগুলির পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারত সরকার তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়নি। এটা পরিত্যক্ত হয়েছিল একমাত্র এই কারণে যে এর প্রয়োগটি ক্ষতিকারক বলে মনে হয়েছিল।

১৯০৩-০৪ সালটিকে স্বাভাবিক বর্ষ হিসাবে গ্রহণ করে, ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশগুলির প্রাদেশিক বন্দোবস্তগুলির সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রাজকীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের নিজ নিজ মোট ব্যয় যে ভাবে নিয়ন্ত্রণ করত তার ভিত্তিতে রাজস্বকে সমন্বিত করারই উদ্দেশ্য ছিল এটা। দেখা গিয়েছিল যে মোট প্রাদেশিক ব্যয় সমগ্রের এক চতুর্থাংশেরও কম হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছিল, যখন কি রাজকীয় ব্যয়, যার মধ্যে সেনাবাহিনী ও স্বরাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যয় গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা সমষ্টিগত ভাবে তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি হত। ব্যয়ের এই অনুপাতগুলিকে রাজকীয় ও প্রাদেশিকের মধ্যে রাজস্ব বিভাজনের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, এবং যৌথ হিসাবের খাতে রাজস্ব ও ব্যয়ের নিম্নলিখিত আদর্শ মানের অংশ স্বীকৃতি লাভ করেছিল :—

	রাজকীয়	প্রাদেশিক
বঙ্গদেশ, উ. প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ	৩/৪	১/৪
পাঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ	৫/৮	৩/৮
ম. প্রদেশ অসম	১/২	১/২

পঞ্জাব, ব্রহ্মদেশ, ম. প্রদেশ ও অসমের ক্ষেত্রে বিভাজনের আদর্শ মানের হার স্বীকার করে নেওয়ার কারণ ছিল অনুন্নত প্রদেশগুলিকে বিকাশের সুযোগ দেওয়া সেই অনুপাতে যা উন্নত প্রদেশগুলির নাগালের মধ্যে ছিল।

১৯০৪-০৫ সালে কৃত বন্দোবস্তগুলির মধ্যে বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, অসম ও উ: প্রদেশ ইত্যাদি প্রদেশগুলির সঙ্গে কৃত বন্দোবস্তগুলিকে স্থায়ী বলে ঘোষণা করেছিল ভারত সরকার এবং সেগুলি ভবিষ্যতে সংশোধনের আওতায় না আনারও, শুধু সেই সব ক্ষেত্র বাদে যেখানে দেখা যাবে যে একটি প্রদেশের পক্ষে বা তুলনামূলক ভাবে অন্যদের পক্ষে বিত্তীয় পরিণামগুলি অন্যায্য, বা ভারত সরকারের পক্ষে যখন তাকে অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। এই অনুবিধির জন্য তাদের বন্দোবস্ত গুলিকে আধা-স্থায়ী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বন্দোবস্তগুলি চালু থাকাকালীন অন্যায়গুলির পুনঃপ্রকাশকে বিদূরিত করার জন্য আধা-স্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে আনা প্রদেশগুলির রাজস্ব ও ব্যয়ের যৌথ-খাতের বিভাজনের আদর্শ মানের অনুপাতে কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন মনে করেছিল ভারত সরকার। সেগুলি নিম্নরূপ :—

রাজস্ব	প্রাদেশিক অংশ				প্রাদেশিক অংশ		
	বঙ্গদেশ	মাদ্রাজ	উ: প্রদেশ	ব্যয়	বঙ্গদেশ	মাদ্রাজ	উ: প্রদেশ
অন্তঃশুল্ক	৭/১৬	...	...	অন্তঃশুল্ক	৭/১৬	...	...
প্রমুদ্রা	১/২	১/২	১/২	প্রমুদ্রা	১/২	১/২	১/২
নিবন্ধভুক্তকরণ	সমগ্র	সমগ্র	...	নিবন্ধভুক্তকরণ	সমগ্র	...	...
জলসেচ	...	...	সমগ্র	ভূমি রাজস্ব	সমগ্র	সমগ্র	সমগ্র

১৯৬৪-৬৫ সালের ভারত সরকারের বিত্তীয় বিবরণ থেকে সংকলিত, পৃ: ৬৭।

এইসব পরিবর্তনগুলি ছাড়া ভারত সরকার নিম্নলিখিত অনুদান দিয়েছিল :—

বঙ্গদেশ	মাদ্রাজ	যুক্ত প্রদেশ
১। শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গুলির বেতন উন্নত করার জন্য নির্ধারে বাড়তি ৪ লাখ। ২। অনধিক ২½ লাখের আয়ও বাড়তি অর্থ প্রদান উপ-সমাহর্তার কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। মাদ্রাজ	১। জরিপ ও বন্দোবস্তের জন্য ২০ লাখের অনুদান। ২। কয়েকটি স্থানীয় সংস্থার সাহায্যার্থে প্রতি বছর ৭৫,০০০ টাকার অনুদান। ৩। কৃষি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বছরে ৫০,০০০ টাকা। ৪। জেলা প্রশাসন সুসংগঠিত করার জন্য ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্বভার গ্রহণ।	১। জলসেচ রাজস্ব ৪০ লাখ পর্যন্ত প্রত্যাভূত। ২। স্থানীয় সংস্থাগুলির সাহায্যার্থে বছরে ২½ লাখের অনুদান। ৩। জেলা বোর্ডের বিত্তের সংস্কার সাধনে বছরে অর্ধলক্ষ।

ভারত সরকারের একই বিত্তীয় বিবরণ থেকে সংকলিত, পৃ: ৬৭

আধা-স্থায়ী ভাবে বন্দোবস্ত করা প্রদেশগুলির আদর্শ মানের রাজস্ব ও ব্যয়, যৌথ রাজস্বে তাদের নিজ নিজ অংশে অদল-বদলগুলি বিবেচনা করার পর সেগুলি ছিল নিম্নরূপ :—

(হাজার টাকার ভিত্তিতে)

প্রদেশ	ব্যয়	রাজস্ব		
		রাজস্ব	নিয়োগ	মোট
মাদ্রাজ	৩৫,০৪৮	২,৯০,৮২	৫,৯৬৬	৩,৫০,৪৮
বঙ্গদেশ	৪,৯৮,৮৭	৪,৪৯,৮৪	৪,৯৫৩	৪,৯৮,৮৭
উ: প্রদেশ	৩,৬৬,৬৪	৩,৬২,৬৪	৪০০	৩,৬৬,৬৪
অসম	৭২,০৭	৬০,০৭	১,২০০	৭২,০৭

রাজস্বের দিকে রাজকীয় কোষাগারের যে লাভ হয়েছিল আধা-স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা প্রদেশগুলির সংশোধনের দ্বারা তার পরিমাণ ছিল ২০৬,০০০ টাকা। কিন্তু এই সংশোধন রাজকীয় সরকারের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়েছিল ৩৬,০০০ টাকা মোট খরচের যা এ যাবৎকাল পর্যন্ত প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ক কর্তৃক বহন করা হত। এইভাবে স্বাভাবিক ভাবে বছরে নিট লাভ হয়েছিল মাত্র ১,৭০,০০০ টাকা।

প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের সূত্রপাতের সময় ভারত সরকার সঙ্গত মনে করেছিল আধা-স্থায়ী ভাবে বন্দোবস্ত করা প্রদেশগুলিকে নিম্নলিখিত অনুদান দিতে যাতে তারা ভাল ভাবে কাজ শুরু করতে পারে :—

বঙ্গদেশকে	৫০ লাখ টাকা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত ৫০ লাখ বাদে)
মাদ্রাজকে	৫০ লাখ টাকা (জরিপ বন্দোবস্তের জন্য প্রদত্ত ২০ লাখ সহ) টাকা
উ: প্রদেশকে	৩০ লাখ টাকা (দায়বদ্ধ থাকা এস্টেট ক্রয় করার জন্য ব্যয় বাবদ ক্ষতিপূরণের ১$^{১}/_{৪}$ লাখ বাদে)
অসমকে	২০ লাখ টাকা।

বাকি প্রদেশগুলির মধ্যে বোম্বাই ও পঞ্জাব এর পরেই পেতে চলেছিল আধা-স্থায়ী বন্দোবস্ত যা ১৯০৫-০৬ সাল থেকে কার্যকর হয়েছিল।

তাদের বন্দোবস্তগুলি পুনর্গঠন করতে গিয়ে ভারত সরকার ১৯০৪-০৫ সালে আধা-স্থায়ী বন্দোবস্ত করা প্রদেশগুলিতে যে-ভাবে প্রয়োগ করা হত বিভাজনের সেই আদর্শ মানের হার থেকে একটু সরে এসেছিল। নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে রাজস্ব ও ব্যয়ের যৌথ খাতগুলি আধা-আধি ভাবে ভাগ করা হয়েছিল, বোম্বাইয়ের জলসেচ সহ, রাজকীয় ও প্রাদেশিকের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ এবং এক চতুর্থাংশের পরিবর্তে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম গুলি এইরূপ :—

রাজস্ব হিসাবের খাত	প্রাদেশিক অংশ		ব্যয় হিসাবের খাত	প্রাদেশিক অংশ	
	বোম্বাই	পঞ্জাব		বোম্বাই	পঞ্জাব
ভূমি রাজস্ব	সুনিশ্চিত করা ১৮৯$^{১}/_{৪}$ লাখ পর্যন্ত	$^{৩}/_{৮}$	ভূমি রাজস্ব	সমগ্র	সমগ্র
নিবন্ধভুক্তকরণ	সমগ্র	সমগ্র	...	...	...
জলসেচ	$^{১}/_{২}$	$^{৩}/_{৮}$ ২৮ লাখ পর্যন্ত সুনিশ্চিত করা			

ভারত সরকারের বিত্তীয় বিবরণ থেকে সংকলিত।

আধা-স্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে এই দুটি প্রদেশের আদর্শ মানের রাজস্ব ও ব্যয় নিম্নরূপ :—

প্রদেশ	ব্যয়	রাজস্ব		
		রাজস্ব	নির্দিষ্ট নিয়োগ	মোট
	টা:	টা:	টা:	টা:
বোম্বাই	৪,৯১,৭৫,০০০	৪,৪৮,৯৮,০০০	৪২,৭৭,০০০	৪,৯১,৭৫,০০০
পঞ্জাব	২,৪৯,৫০,০০০	২,৪৬,৫০,০০০	৩,০০,০০০	২,৪৯,৫০,০০০

এই সব দুর্ভিক্ষ ও প্লেগাক্রান্ত প্রদেশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে উদার মাত্রায় অংশ বৃদ্ধি করার এবং (রাজস্ব) নিয়োগ নির্ধারিত করার বিষয়টি লেনদেনের ব্যাপারে রাজকীয় সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এই নতুন আদর্শমানের রাজস্বের ভিত্তিতে ভারত সরকার একত্রে ঐ দুই প্রদেশের জন্য ৫,৯৫,০০০ টাকা লোকসান দিয়েছিল। ব্যয়ের যৌথ খাতের প্রাদেশিক অংশে অনুরূপ বৃদ্ধি অবশ্য রাজকীয় ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়েছিল বছরে ২,২১,০০০ টাকা। অতএব সব মিলিয়ে রাজকীয় সরকার ৩,৭৪,০০০ টাকার স্বাভাবিক লাভ হারাতে হয়েছিল ঐ দুই প্রদেশের আর্থিক অবস্থা স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা দেবার জন্য। তাদের প্রত্যেককে ৫০,৪০,০০০ টাকার প্রাথমিক অনুদানের অতিরিক্ত হিসাবে এটা দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা সব বাধা অতিক্রম করে এগোতে পারে।

এক বছর পরে, মধ্যপ্রদেশের বন্দোবস্ত আধা-স্থায়ী করা হয়েছিল ১৯০৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে। রাজস্ব ও ব্যয়ের যৌথ দফায় অংশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং বিশেষ করে বেরার-এর সংযুক্তি যা এযাবৎ কাল পর্যন্ত রাজকীয় সরকার কর্তৃক সরাসরি শাসিত হয়ে আসছিল, এবং তা তিন-চতুর্থাংশ ও এক-চতুর্থাংশ থেকে একের দুই অংশ বেড়ে ছিল রাজকীয় ও প্রাদেশিকের মধ্যে, ভূমি রাজস্বের অংশ সুনিশ্চিত করা হয়েছিল ৮২½ লাখ। অসম বিভাজনের এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল নিবন্ধভুক্তকরণের রাজস্ব যা সম্পূর্ণ ভাবে প্রাদেশিক করা হয়েছিল। রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বছরে ২৭,০৭,০৪৭ টাকার নিয়োগ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং ভালভাবে শুরু করার জন্য ৩০,০০,০০০ টাকার প্রাথমিক অনুদান দেওয়া হয়।

মধ্যপ্রদেশের বন্দোবস্তের পাশাপাশি কিছু প্রশাসনিক পরিবর্তনের জন্য আধা-স্থায়ী বন্দোবস্ত বিশিষ্ট বঙ্গদেশ ও অসম প্রদেশের আয়-ব্যয়ককে পুনরায় সংগঠিত করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। এই প্রদেশ দুটি পুনর্গঠিত হয়েছিল (১) বঙ্গদেশ

এবং (২) পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে। এদের আর্থিক বন্দোবস্তের সংশোধন প্রক্রিয়ায় বঙ্গদেশের এই নতুন প্রদেশকে যৌথ রাজস্বের সেই একই অনুপাতে অংশ দেওয়া হয় যা অনুমোদিত হয়েছিল বোম্বাই ও পঞ্জাবের ক্ষেত্রে—যথা, সকল যৌথ খাতের অর্ধেক অংশ। নিবন্ধভুক্তকরণ এবং রাজকীয় সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন সরকারি ভূসম্পত্তির থেকে প্রাপ্ত ভূমি রাজস্বের সেই অংশগুলি অবশ্য পুরোপুরি প্রাদেশিক করা হয়েছিল। এই পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহারের পরিবর্তে প্রদেশের নির্দিষ্ট নিয়োগ ৪৯.০৩ লাখ থেকে কমিয়ে করা হয়েছিল ৫.৭২ লাখ।

নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামে সমভাবে বণ্টনের নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল রাজস্ব ও ব্যয়ের সকল যৌথ খাতে, শুধু নিবন্ধভুক্তকরণ বাদে, যা পুরোপুরি প্রাদেশিক করা হয়েছিল। অংশের এই বৃদ্ধিকরণ প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের সম্পর্কের দিকটিকে এতই বাড়িয়ে দিয়েছিল যে উদ্বর্তকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল প্রাদেশিক থেকে রাজকীয় তহবিলে একটি নির্দিষ্ট সমন্বয় সাধনকারী নিয়োগের নেতিবাচক প্রয়োগের দ্বারা।

নিম্নলিখিত সংখ্যাতত্ত্বগুলি থেকে দেখা যাবে আধা-স্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় আনা তিনটি প্রদেশের জন্য আদর্শমানের ব্যয় ও আদর্শমানের রাজস্বগুলিকে :—

প্রদেশ	ব্যয়	রাজস্ব		
		রাজস্ব	নিয়োগ	মোট
	টা:	টা:	টা:	টা:
ম: প্রদেশ	১,৭৬,৪৩,০০০	১,৪৯,৩৬,০০০	২৭,০৭,০০০	১,৭৬,৪৩,০০০
পূর্ববঙ্গ ও অসম	২,১২,১৯,০০০	২,১৮,৪২,০০০	৬,২৩,০০০	২,১২,১৯,০০০
বঙ্গদেশ	৪,৭২,৭৩,০০০	৪,৬৭,০১,০০০	৫,৭২,০০০	৪,৭২,৭৩,০০০

প্রদেশের বন্দোবস্তের ব্যাপারে পরে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল, যাতে রাজকীয় থেকে বছরে প্রাদেশিকের ৬০,০০০ টাকার একটা নিয়োগ করে ইতিবাচক সমন্বয় সাধন করা গিয়েছিল।

আধা-স্থায়ী পদ্ধতির সীমার বাইরে একমাত্র যে প্রদেশটি ছিল সেটি হল ব্রহ্মদেশ। এই প্রদেশের সঙ্গে ১৯০২-০৩ সালে শেষ যে পঞ্চবর্ষব্যাপী বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তা শেষ হয়ে যাওয়াতে ভারত সরকার ব্রহ্মদেশকে আধা-স্থায়ী বন্দোবস্ত ১৯০৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে প্রদান করে অন্যান্য প্রদেশগুলির সঙ্গে সমতা আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পূর্ণমাত্রায় নিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্রহ্মদেশকে রাজস্ব ও ব্যয়ের প্রধান প্রধান যৌথ খাতে সমান অংশও দেওয়া হয়েছিল, যদিও অন্যান্য

প্রদেশের মত লবণকে রাজকীয় অংশভুক্ত করে রাখা হয়েছিল। এই প্রদেশটির আদর্শমানের ব্যয়ে ঘাটতি মেটাবার জন্য বছরে ৯০,৬৮,০০০ টাকার একটি সমন্বয় সাধনকারী নিয়োগ ও ৫০,০০,০০০ টাকার প্রাথমিক অনুদান দেওয়া হয়েছিল।

১৯০৭ সালের মধ্যে সবকটি প্রদেশকে আধা-স্থায়ী বন্দোবস্তের আওতার মধ্যে আনা হয়েছিল, এবং আমরা আশা করতে পারতাম যে প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্পটি স্বাভাবিক নিয়মেই তার পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে আর কোনও পরিবর্তনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে, যা অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়েছিল, ১৯০৪ সালে মাদ্রাজ ও উঃ প্রদেশের সঙ্গে কৃত আধা-স্থায়ী বন্দোবস্তগুলি তাদের প্রতি কিছুটা পরিমাণে পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে সেইসব শর্তাবলির তুলনায় যা দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে আওতাভুক্ত করা প্রদেশগুলিকে। এই অধিকারের কারণটিকে দূর করার জন্য, যে কারণটি ছিল আধাস্থায়ী বন্দোবস্তগুলিকে সংশোধনের শর্তাধীন করার জন্য স্বীকৃত কারণগুলির অন্যতম, যৌথ খাতে এই দুটি প্রদেশের অংশগুলিকে একের দুই অংশ বাড়িয়ে দেওয়া হয় ১৯০৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে, নিম্নলিখিতগুলি বাদে :—

মাদ্রাজ	যুক্তপ্রদেশ
রাজস্ব	রাজস্ব
১। নিবন্ধভুক্তকরণ, পুরোপুরি প্রাদেশিক। ২। ভূমি রাজস্ব, ন্যূনতম ৩০৮ লাখের আয় সুনিশ্চিত করা হয়েছিল যদি প্রদেশের অংশ তার চেয়ে কম হয়।	১। ভূমি রাজস্ব, ৩/৮ অংশ প্রাদেশিক, ন্যূনতম ২৪০ লক্ষ সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। ২। জলসেচ। ৫০ লাখের ন্যূনতম আয় গুরুত্বপূর্ণ জলসেচ কর্ম থেকে সুনিশ্চিত করা হয়েছিল, যদি প্রাদেশিক অংশ ঐ পরিমাণের চেয়ে কম পড়ে যায়।
ব্যয়	
১। নিবন্ধভুক্তকরণ, পুরোপুরি প্রাদেশিক। ২। ভূমিরাজস্ব পুরোপুরি প্রাদেশিক।	

আদর্শমানের, রাজস্বের চেয়ে আদর্শমানের ব্যয়াধিক্যের মধ্যে পার্থক্যটি পূরণ করার জন্য নির্দিষ্ট নিয়োগগুলি ছিল :—

মাদ্রাজকে	টাঃ ২২,৫৭,০০০
উঃ প্রদেশকে	টাঃ ১৩,৮৯,০০০

এইভাবে ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্পটির অগ্রগতি হয়েছিল ধীরে ধীরে অথচ নিয়োজিত আয়-ব্যয়ক, নিয়োগ করা রাজস্বের আয়-ব্যয়ক ও অংশীদার

রাজস্ব আয়-ব্যয়কের সুস্পষ্ট পদক্ষেপে এমন একটা অধ্যায় পর্যন্ত যার শর্তাবলিকে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কর্তৃক পর্যাপ্ত ভাবে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়েছিল। তাদের প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছিল তার বিচার করা যায় নিম্নলিখিত সারণিতে প্রদত্ত প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে বার্ষিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি থেকে এবং তাদের বিচ্যুতির পরিমাপ থেকে :—

প্রাদেশিক উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি

প্রদেশ	১৯০৪-৫	১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮	১৯০৮-৯	১৯০৯-১০	১৯১০-১১	১৯১১-১২
	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:
ম. প্রদেশ[১]	-৭,০১,০০০	৩২,৩৫,০০০	১৭,৫০,৬০৭	-৯,৩০,৬১৭	-৩০,৯৭,৮৬৫	৭,২১,৭৫৫	২,৮০,৫৫৬	১২,১৪,৫৭৩
ব্রহ্মদেশ	-১৫,৯১,৭৯৬	-২৬,১৩,৮৯০	১৮,৯০,৫১৬	-৩১,২৯,৫৯০	-২০,৬০,৬৭৮	২৫,১৫,৩৭১	১৯,০০,২৯৭	-১২,৬০,০৪০
অসম[২]	-২,৬৯,৩১৬	-৩৭,২০,০২৭	-২,০০,১৪০	-২৫,৯৬,৬৮২	-২৩,৫৭,৬৮৭	৫,৪৯,২৭০	৫৫,৩৯,৬৯৮	৫২,১৮,৮০২
বঙ্গদেশ	-১২,৫২,৮১৮	-১৯,৫২,৩১২	-১৮,৭৭,৪৫৫	-২২,৫৬,৯৯৪	-১৩,৩০,৩৭১	৩২,৭৪,০৬৫	৩৯,৬০,৬১২	৮২,৯৬,২৩৩
উ: প্রদেশ	-৮,৬৯,০৯৯	-২৮,৭৯,১৯২	৭,৯৫,৬০০	-৩৫,৮৭,০৬৬	১০,০৭,২৬০	২০,৪৫,২২১	৩৬,৩৫,৯০৪	১,৪৪,২৪০
পঞ্জাব	৪৭,৯৪,৩৮৭	-২৭,৯৬,০৫২	-৬,৬১,২১৪	-২৪,০৮,৮১৮	-১৫,৭৬,৯৮১	১৩,০০,৫৫৯	৪১,৯৯,১২১	৩৩,৯৮,০৫৫
মাদ্রাজ	-১৪,০২,৩৪৪	২,২০,৩২৮	১২,১৭,৭৪৫	-৪৪,৯৯২	২০,২৫,১০৯	১২,৬৬,৩২৬	২৩,১৬,৩৮৩	২৯,৩৮,৫০২
বোম্বাই	৪৩,৯৬,০০৯	-৪২,৮৯২	১৭,৫২,২০২	-৩,০৮,৯২৫	২৬,১৮,৯২৬	৭১,৩৭,৯৯৬	৭৫,৮৫,৪৬০	-৫,৪১,৪১১

ভারত সরকারের বার্ষিক বিত্ত ও রাজস্ব হিসাব থেকে সংকলিত।

এই ফলাফলগুলির বিচার করতে গেলে ঐ একই অধ্যায়ের মধ্যে সহায়ক অনুদান হিসাবে প্রদেশগুলিকে প্রদত্ত ভারত সরকারের নানাবিধ জনহিতকর দানগুলিকে অবশ্যই বিবেচনাধীন করতে হবে। এই দানগুলি ছিল এইরূপ :—

প্রদেশগুলিকে রাজকীয় সহায়ক অনুদান

প্রদেশ	১৯০৪-৫	১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮	১৯০৮-৯	১৯০৯-১০	১৯১০-১১	১৯১১-১২
	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:
ম. প্রদেশ[৩]	২৮,৫৩,৭১০	৬৯,৫৭,৭৯৩	১,১০,৫০০	২৭,৫২,০১০	২৯,০৩,৬৬৮	৩৫,৮৮,২৭০	৩৪,৬৫,৫০০	২০,৮০,৮৪৫
ব্রহ্মদেশ	৫,৬৭,৫০০	১৮,৪৫,০০০	৭২,১৯,০০০	৬,৮২,০০০	২,১২,২৫৩	১৮,২০,৯৫২	৪২,৩২,৭৪২	৩৬,০৫,১৬৪
আসাম	...	৩৩,৬২,৯১৬	৩,২৭,২৯৪	২,৮০,০৩০	২৩,৫৮,৯৪৭	৪৪,৬৪,৪৩৫	৪৬,০৮,৯৬৫	৬১,০০,৭৩২

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

১। ১৯০৬ সাল থেকে বেরার অন্তর্ভুক্ত

২। পূর্ববঙ্গ ও অসম ১৯০৬ সাল থেকে

৩। ১৯০৬ সাল থেকে বেরার অন্তর্ভুক্ত।

প্রদেশ	১৯০৪-৫	১৯০৫-৬	১৯০৬-৭	১৯০৭-৮	১৯০৮-৯	১৯০৯-১০	১৯১০-১১	১৯১১-১২
	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:
বঙ্গদেশ	২৪,৭৯৪	৪৮,০৬,৯৮৪	৪,৭৫,৫৪৮	১৩,৬২,৬৩৪	৪১,৫৭,৩৯৩	৫৭,৫৩,৬৯২	৬১,৩৭,০১৩	১,১১,৩১,২৭৬
উ: প্র:	১,৩৬,৬০০	৪০,৩৬,৩০৭	৭৬,৪১,৬৯৭	৯৮,৭৯,৬৬৭	৮৭,৭০,৩৪৫	১৬,২৪,৩২৯	৪৫,১৩,৭২৯	৩১,৩৬,১০৭
পাঞ্জাব	৭৫,২৬,৪০৬	২৪,৬৭,৫৭৯	৪২,০৯,৫৩১	৫৫,৪১,৫২৯	৬০,৩৭,৯৯০	৫৮,০৯,০১৪	৯৫,৯২,৮৪৪	৩১,০১,৬৮১
মাদ্রাজ	৭,০০,৯৪৬	৪৪,৩০,৭১৪	৯৯,৮০,৪০০	৯৪,৭৩,৩০৪	৭,০৪,৮৮৫	৬,১২,৯৪১	৩৬,৯১,৪২৬	৫,০০,৮৮৯
বোম্বাই	১,০৩,১২,৯২৮	৩৪,২৭,৩২৫	৪০,২৪,৫১২	৪৫,৭৪,২৮৪	৫৭,২৬,১৬২	৫৭,৯৭,৬০৩	১,২০,০৯,৩৬০	৪৯,৩৫,১৫৯
মোট	২,২১,২২,৯১৪	৩,১৩,৩৪,৬১৮	৩,৪৯,৮২,৯৮২	৩,৪৫,৪৩,৪৫৮	৩,০৮,৭৪,৬৪৩	২,৯৫,০২,২৮৬	১,৫৪,৭৫,৩৬০	৩,৯০,৯৯,৮৫৩

ভারত সরকারের বিত্ত ও রাজস্ব হিসাব থেকে সংকলিত।

কিন্তু এই লোক হিতকর দানগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করতে গিয়ে একথা ধরে নেওয়া অবশ্যই উচিত হবে না যে, দুই-একটি স্বতন্ত্র ঘটনা বাদে, প্রাদেশিক বিত্তের আর্থিক স্বচ্ছলতা সুরক্ষিত করা প্রয়োজন ছিল, যা নির্ভুলভাবে বর্ণিত আছে বিভিন্ন প্রদেশগুলির সঙ্গে করা বন্দোবস্তের শর্তাবলির দ্বারা। অপ্রতুল হওয়া দূরের কথা বিভিন্ন প্রদেশগুলির সঙ্গে নির্ধারিত করা রাজস্বগুলি তাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট পর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল যদি আমরা গত কয়েক বছরকে হিসাবের মধ্যে ধরি, এবং যে বছরগুলি অতিমাত্রায় আদর্শ স্বরূপ ছিল।

১৯১২ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে পরপর বেশ কয়েকটি আধা-স্থায়ী বন্দোবস্তগুলি সম্পাদিত হবার অব্যবহিতকাল পরে, সমধর্মী অন্যান্যগুলির সঙ্গে বৃটিশ ভারতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বিত্তের বিষয়টি সম্বন্ধে বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ক রয়্যাল কমিশন কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিক্ষীত হয়েছিল। ১৯০৯ সালে এই কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে রাজকীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব ও ব্যয়গুলি বরাদ্দ করার প্রচলিত পদ্ধতিটি নীতিগত ভাবে সমর্থিত হয়েছিল। কমিশনের সামনে হাজির হওয়া সাক্ষীদের বহু বিরূপ সমালোচনার মধ্যে মাত্র দুটিকে বিবেচনার যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছিল : (১) সমন্বয় সাধনকারী নিয়োগ এবং (২) সহায়ক অনুদান বা ভিক্ষাদান (doles) বিদ্রুপাত্মক পরিভাষায় বলা হত। বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল, এবং তার মধ্যে কিছুটা সত্যও ছিল, যে সমন্বয় সাধনকারী নিয়োগগুলি প্রাদেশিক রাজস্বের স্থিতিস্থাপকতায় বাধার সৃষ্টি করেছিল এই কারণে যে যখন ব্যয় বাড়ছিল; তখন প্রাদেশিক রাজস্বের সেই অংশ যা নিয়োগ দ্বারা গঠিত হয়েছিল, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা বেশ উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে

ছিল, তা অপরিবর্তিত থেকে যায়। দ্বিতীয়ত যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে ঐ ভিক্ষাদান ছিল নৈতিক অধঃপতনের কারণ, এবং তার পরিবর্তে ক্রমবর্দ্ধমান রাজস্বের অংশ প্রদান করা অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ হবে। মনে হয় বড় আকারের সমন্বয়সাধনকারী নিয়োগের অসুবিধাগুলির ব্যাপারে ঐ কমিশনে পুরোপুরিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু কমিশন সঙ্গত ভাবেই ভিক্ষাদানের ব্যাপারে সমালোচনা সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়েছিল। সকলেই প্রদেশগুলির বিকেন্দ্রীকরণের সুফলগুলির প্রশংসা করেছিল। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক মানুষ এ ব্যাপারে ভারত সরকারের উদ্বেগের বিষয়টি সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছিল। এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়ার দ্বারা ভারত সরকার প্রদেশগুলিকে মোটামুটি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল তাদের পরিচালনাধীন পরিষেবাগুলির ব্যাপারে ইচ্ছামত তাদের অর্থ বণ্টন করার। যখন কি ভারত সরকার দায়ি ছিল প্রদেশগুলির সুদক্ষ সংরক্ষণের ব্যাপারে আইনের সেই সব শর্তাদির দ্বারা যা তার নিজস্ব শাসনতন্ত্রকে পরিচালিত করত। কিন্তু প্রদেশগুলি তাদের বিশেষ নিয়ন্ত্রণাধীনে পেয়েছিল যে-সব পরিষেবাগুলিকে তাদের আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য তারা যে স্বাধীনতা পেয়েছিল তার সঙ্গে জড়িত ছিল প্রদেশের অধিবাসীদের পক্ষে যেটি আশু প্রয়োজন বলে গণ্য হত সেই সব নির্দিষ্ট পরিষেবাগুলির উন্নতি বিধান করার দায়িত্ব এবং অপরাপর গুলিকে অবহেলা করা যার উপকারিতা, প্রদেশগুলির পক্ষে সুদূর পরাহত হলেও, সমস্ত দেশের পক্ষে অবশ্যই বাস্তবসম্মত ছিল। রাষ্ট্রগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পুলিশ, বিশেষভাবে পরিহারযোগ্য ছিল প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের সময়ে। কিন্তু এই জাতীয় পরিষেবাগুলির ব্যাপারে প্রাদেশিক তহবিল বণ্টন করার বিষয়টি বলবৎ করতে পারেনি ভারত সরকার; কারণ প্রাদেশিক বিত্তের অন্যতম শর্ত ছিল প্রাদেশিকীকৃত পরিষেবাগুলির ব্যাপারে অর্থ উপযোজন করার স্বাধীনতা; যার মধ্যে বাধ্যতামূলক এবং ঐচ্ছিক্যের পার্থক্য সুচিহ্নিত করা হয় নি যা ছিল স্থানীয় বিত্তের মহাদেশীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে। ভারত সরকার ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় সরকারের মত ক্ষমতাহীন ছিল না, যা, একথা সর্বজনবিদিত, আদালতের হুকুমনামায় (Mandamus) আজ্ঞালেখের সহায়তা ছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবহেলার ঘটনাগুলির সংশোধন করা যায় না। কিন্তু অবাধ্য প্রদেশকে সঠিক পথে আনয়নের পথটি, সহজতর হলেও, সুখকর ছিল না। কারণ ঐ ধরণের পরিস্থিতি শোধরাবার একমাত্র পথ ছিল প্রাদেশিক বিত্তের ক্রিয়াকলাপকে নিলম্বিত করে এর অবসান ঘটানো। এই ধরণের গুরুতর ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিবর্তে ভারত সরকার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পরিষেবার সহায়ক অনুদানের উপর যথাযথ আঘাত হানলো প্রদেশের

গাফিলতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও সুপরীক্ষিত[১] সংশোধনী হিসাবে এবং সেই সব পরিষেবায় একটি 'জাতীয় ন্যূনতম' স্তর বজায় রাখা প্রয়োজন মনে করেছিল যেটা উপকারী[২] হওয়ার চেয়ে গুরুভার হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি ক্রমশ খারাপ হয়ে যেতে থেকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ব্যাপারে সহায়ক অনুদানের অন্তর্নিহিত শক্তিটি নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করবে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়ে কমিশন শুধু সুপারিশ করেছিল যে (রাজস্ব) নিয়োগগুলিকে যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিমাণে নামিয়ে এনে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে যথাসম্ভব বেশি স্থিতিস্থাপকতা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কমিশনের সুপারিশ মেনে নিয়ে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজস্ব ও ব্যয়ের বর্তমান বরাদ্দে কিছু পরিবর্তন ঘটানোর এবং আধা-স্থায়ী বন্দোবস্তগুলিকে ১৯১২ সাল থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করার। যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তগুলি যে কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ে আধা-স্থায়ী বন্দোবস্তের স্থান দখল করেছিল তার সঙ্গে বরাদ্দের নীতির ব্যাপারে কোনও পার্থক্য ছিল না। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্যের যে কারণটি ছিল তা হল নির্দিষ্ট সমন্বয় সাধনকারী নিয়োগের পরিবর্তে আংশিক ভাবে বর্ধিত রাজস্বকে প্রতিষ্ঠা করা নিম্নলিখিত রাজস্ব ও ব্যয়ের যৌথ খাতে :—

অংশের সংশোধন

রাজস্ব		ব্যয়	
হিসাবের খাত	প্রাদেশিক অংশ	হিসাবের খাত	প্রাদেশিক অংশ
১। ভূমি রাজস্ব জলসেচে জমা দেওয়া অংশ সমেত	৫/৮ ব্রহ্মদেশকে ১/২ পঞ্জাব	১। ভূমি রাজস্ব	৫/৮ ব্রহ্মদেশ ১/২ পঞ্জাব
২। অন্তঃশুল্ক	পূর্ববঙ্গ, বোম্বাই ও অসমে সমগ্র ম: প্রদেশ, বঙ্গদেশ ও উ: প্রদেশ ৩/৪	২। অন্তঃশুল্ক	রাজস্ব খাতের মত
৩। নিরূপিত খাজনা (বাস্তুকর্ম বিভাগ)	১/২	...	...

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

১। সম্ভবত: এই পদ্ধতিটি ইংল্যাণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছিল

২। এস. ওয়েব, সহায়ক অনুদান, ১৯১১, পৃ: ২৫

রাজস্ব		ব্যয়	
হিসাবের খাত	প্রাদেশিক অংশ	হিসাবের খাত	প্রাদেশিক অংশ
৪। বন	সমগ্র	৪. বন	সমগ্র
৫। গুরুত্বপূর্ণ সেচকর্ম (এতে জমা দেওয়া ভূমি রাজস্বের অংশ বাদে)	১/২ পঞ্জাবে, সুনিশ্চিত করা হয়েছিল ন্যূনতম ৪ লাখ	৫। গুরুত্বপূর্ণ জলসেচ	১/২
৬। গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষুদ্র জলসেচ	১/২ বঙ্গদেশে	৬। গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষুদ্র জলসেচ	১/২ বঙ্গদেশ

রাজস্ব ও ব্যয়ের যৌথ খাতে অংশের ব্যাপারে এই সংশোধনের ফলাফলটি সমন্বয় সাধনকারী নিয়োগকে নিম্নলিখিত সংখ্যাতত্ত্বে কমিয়ে এনেছিল :—

প্রদেশ	রাজকীয় থেকে প্রাদেশিক নিয়োগ লক্ষ টাকার হিসাবে	প্রাদেশিক থেকে রাজকীয়তে
মধ্যপ্রদেশ	২১.৪০	...
ব্রহ্মদেশ	১৩.১২	...
পূর্ববঙ্গ ও অসম	১৩.৫৫	...
বঙ্গদেশ	...	১৮.৪০
উ: প্রদেশ	...	১৯.২৬
পঞ্জাব	৬.৭৭	...
মাদ্রাজ	...	২১.৪৩
বোম্বাই	...	৯.৩৮

পঞ্চবর্ষব্যাপী এবং আধা-স্থায়ী বন্দোবস্তের স্থিতিকালের মত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্থিতিকালে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট পরিষেবার সহায়ক অনুদান, বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন কর্তৃক যেগুলি সম্বন্ধে আপত্তি জানান হয় নি, সেগুলি সমগ্র অধ্যায় জুড়ে বিভিন্ন প্রদেশগুলি প্রদান করা অব্যাহত ছিল যদিও তার পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেয়ে আসছিল, যা নিম্নলিখিত সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যাবে :—

বিশেষ সহায়ক অনুদান (টাকায়)

প্রদেশ	১৯১২-১৩	১৯১৩-১৪	১৯১৪-১৫	১৯১৫-১৬	১৯১৬-১৭	১৯১৭-১৮	১৯১৮-১৯
	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:
ম. প্রদেশ	৪৭,৯০,৪৮০	২৬,৪৩,২৬৪	৫১,৩৮,২৫৬	৪৪,০৭,৮০২	৩৭,৯৫,৭৮৪	৩৮,১৭,৫৪০	২৭,৬০,০০৮
ব্রহ্মদেশ	৮৫,৩৮,৯৪৮	২২,৬৩,৯৩৯	৩৮,৪৯,৭৬৩	৩৮,৬৯,৪৭২	২,১৬,৯৭৯	-২৪,৭৮,৪৮২	২,৪৯০
অসম	৫৫,৩০,৯৯১	৩২,৮৩,০১১	৭৫,৩৩,৮৭৮	৬৫,৭৭,৬১৯	২৪,৯৭,৮৬১	১৯,২২,২৫২	২৪,৪৪,৩৭০
বঙ্গদেশ	১,৫৪,০১,৮৮৫	৬৪,৮০,৮০০	৭৫,৯৪,৮৯৪	৭১,৮৬,৪৩৬	৬৫,৩৮,৭৩২	৭০,৭৪,৭৭৩	৯৮,৮৯,৭১৭
বিহার ও							
ওড়িশা	৬৩,৭৯,৪২০	৪৭,৬১,০২৮	৩৫,২৬,৫৬৭	৪২,৭৮,৮৫৪	৩২,৬২,২১৪	৪২,৩৫,২০৫	৪১,৭৯,৪২৫
উ: প্রদেশ	১,১৪,৭০,৬৩৩	৮৫,৪২,২৭৯	৩৮,৪২,৬২৪	৩২,২৯,৯২৪	২৪,৫৩,৯৬৯	২৭,০৬,১৬৪	৩৫,৯০,৫৩০
পঞ্জাব	৬৭,০০,৯২৪	২৪,২৪,৪০৪	৩৯,৮৮,১১৭	৫৯,০৮,৯২৩	৪৯,২৫,৮৩০	৪৮,৬২,৬১৬	৫৫,৬৩,৬৬৫
মাদ্রাজ	১,২২,৭৭,৫৯১	৫০,৬৬,৩৪৩	১৬,৯৭,৮০৩	১২,২০,৭৮৫	১৩,৯৯,১৬৫	১৪,৮৩,৭০৮	১৫,৭৭,৪৪৫
বোম্বাই	১,১১,৯২,৭২৩	৩৯,৯৬,৭২৯	১৪,৬৮,৮৩৭	১২,০০,২৫৪	১০,৬৫,৯৬৪	১১,৫৪,৭২৫	২৪,৭৯,৫১০
মোট	৮,২২,৮৩,৫৬৫	৩,৯৪,৬১,৭৯৭	৩,৮৬,৪০,৭৩৯	৩,৭৮,৮০,০৬৯	২,৫৮,৫৬,৪৯৮	২,৪৭,৭৮,৫০১	৩,৫৪,৫৩,৫২১

ভারত সরকারের বার্ষিক বিত্ত ও রাজস্ব হিসাব থেকে সংকলিত।

প্রদেশগুলি যে গভীর আগ্রহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকবে এটাই স্বাভাবিক, কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল স্থায়ী লাভের বা স্থায়ী ক্ষতির। এ ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ যে একেবারে কমানো যেতে পারত না তার পর্যাপ্ত প্রমাণ হল উদ্বৃত্তের পুনরাবৃত্তি যা দৃষ্টি গোচর হবে এটা চালু থাকা কালীন তাদের উদ্বৃত্তে বার্ষিক বৃদ্ধি এবং হ্রাস করায় পরপৃষ্ঠার সংখ্যাতত্ত্বের উপর চোখ বুলোলে :—

প্রাদেশিক উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি (টাকায়)

প্রদেশ	১৯১২-১৩	১৯১৩-১৪	১৯১৪-১৫	১৯১৫-১৬	১৯১৬-১৭	১৯১৭-১৮	১৯১৮-১৯
	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:	টা:
ম. প্রদেশ	৫০,৮৫,২৪৬	১৮,৮১,২৪৫	-৬৫,৪৪,৪১৬	-১৩,৮৩৬	৪২,৩৫,৭০৪	৪৮,৭০,৫১৭	৯,২০,১২১
ব্রহ্মদেশ	৮৮,৭৪,১৭৪	৯,১৪,০২৬	-৩৭,২৯,৮০৮	১৮,৯৬,৬২১	৯৪,২৭,৭০২	১,২০,৬৭,৭০৮	৪৮,৭৩,৫৮৭
অসম	৫,৫৩০,৯৯১	৩,২৮৩,০১১	৭,৫৩৩,৮৭৮	৬,৫৭৭,৬১৯	২,৪৯৭,৮৬১	১,৯২২,২৫২	২,৪৪৪,৩৭০
বঙ্গদেশ	১৫,৪০১,৮৮৫	৬,৪৮০,৮০০	৭,৫৯৪,৮৯৪	৭,১৮৬,৪৩৬	৬,৫৩৮,৭৩২	৭,০৭৪,৭৭৩	৯,৮৮৯,৭১৭
বিহার ও							
ওড়িশা	৬,৩৭৯,৪২০	৪,৭৬১,০২৮	৩,৫২৬,৫৬৭	৪,২৭৮,৮৫৪	৩,২৬২,২১৪	৪,২৩৫,২০৫	৪,১৭৯,৪২৫
উ: প্রদেশ	১১,৪৭০,৬৩৩	৮,৫৪২,২৭৯	৩,৮৪২,৬২৪	৩,২২৯,৯২৪	২,৪৫৩,৯৬৯	২,৭০৬,১৬৪	৩,৫৯০,৫৩০
পঞ্জাব	৬,৭০০,৯২৪	২,৪২৪,৪০৪	৩,৯৮৮,১১৭	৫,৯০৮,৯২৩	৪,৯২৫,৮৩০	৪,৮৬২,৬১৬	৫,৫৬৩,৬৬৫
মাদ্রাজ	১২,২৭৭,৫৯১	৫,০৬৬,৩৪৩	১,৬৯৭,৮০৩	১,২২০,৭৮৫	১,৩৯৯,১৬৫	১,৪৮৩,৭০৮	১,৫৭৭,৪৪৫
বোম্বাই	৭০,৮৩,২৮১	১৫,৫৮,৫৬৬	-২৬,৩৯,৯২৪	-৯,৫১,০৯৯	১,২২,৪৩৪	৬,১১,৩২১	১৬,৮১,০৬৬

ভারত সরকারের বার্ষিক বিত্ত এবং রাজস্ব হিসাব থেকে সংকলিত।

প্রাদেশিক বিত্তের অবস্থা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধিশালী থাকাকালীন, প্রাদেশিক উদ্বৃত্তগুলির অস্থির-প্রকৃতির আচরণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাছ থেকে কাঙ্খিত সু-শৃঙ্খলভাবে প্রগতির আশার বাণী বহন ঠিক মত করছিল না। একথা অবশ্য লক্ষ করতে হবে যে যে-সময়সীমার মধ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ছিল তা পুরোমাত্রায় স্বাভাবিক সময় ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটা অংশ নিঃসন্দেহে শান্তির অধ্যায় ছিল, কিন্তু তা পঞ্চবর্ষকালের মত দীর্ঘ ছিল না, এবং তা যদি পঞ্চবর্ষকালব্যাপী বন্দোবস্তের দোষত্রুটিগুলি ফাঁস করত তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাবলী খর্ব করতে পারে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতাভুক্ত বেশির ভাগ পরিব্যপ্তি কালটি অবশ্য ছিল মহাযুদ্ধের অধ্যায়, যার অস্বাভাবিক ঘটনাবলি প্রাদেশিক বিত্তকে বিপর্যস্ত করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

অভিপ্রেত উদ্দেশ্যের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যথেষ্ট ছিল কিনা যদি পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হত পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে সুস্থিত হবার জন্য তবে কি হত তা আমরা বলতে পারি না। কারণ ১৯২১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক বিত্ত এক সম্পূর্ণ নতুন পর্বে প্রবেশ করেছিল। এর ঐ অধ্যায়টি সম্বন্ধে পরের খণ্ডে আলোচনা করা হবে। পুরনো পর্বের অধীনে প্রাদেশিক বিত্তের প্রতিটি পর্যায়ে যে ভাবে বিকাশ লাভ করেছিল তার গবেষণা এখানেই শেষ। কিন্তু এই গবেষণা সম্পূর্ণ হবে না যথক্ষণ না পর্যন্ত আমরা আলোচনা করব সেই ক্রিয়া-কৌশল সম্বন্ধে যা পুরনো পর্বের অধীনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। কিন্তু তা শুরু করার আগে এটা গভীর আগ্রহ ও অর্থ পূর্ণও হতে পারে যে প্রাদেশিক বিত্তের বিকাশে চূড়ান্ত পর্যায়ের গবেষণা শেষ হতে পারত প্রাদেশিক রাজস্ব ও ব্যয়ের নিম্নলিখিত অতীত সম্বন্ধে অণুচিন্তা যা অন্য সব কিছুর তুলনায় একমাত্র উপায়ে দেখাতো অকিঞ্চিৎকর ভাবে শুরু করা, দ্রুত উন্নতি করা ও বিশাল অনুপাতগুলিকে যাকে অর্ধ শতাব্দী ধরে কার্যকর হতে দিয়ে প্রাদেশিক বিত্ত যে-স্তরে পৌঁছেছিল।

প্রাদেশিক বিত্তের ক্রমিক বৃদ্ধি

প্রদেশ	প্রাদেশিক রাজস্ব ভারতের মোট রাজস্বের শতকরা হার হিসাবে						প্রাদেশিক ব্যয় ভারতের মোট ব্যয়ের শতকরা হার হিসাবে					
	১৮৭১-২	১৮৮২-৩	১৮৯২-৩	১৯০৪-৫	১৯১২-৩	১৯১৮-৯	১৮৭১-২	১৮৮২-৩	১৮৯২-৩	১৯০৪-৫	১৯১২-৩	১৯১৮-৯
	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড	পাউন্ড		
মধ্যপ্রদেশ	.৬৫৫	১.০৫৫	.৮৬৩	.৯০৫	২.৫২	১.৭১৫	.৬৫২	১.০০৮	.৮৭	.৯৮৪	২.১৯	১.৬৮৫
ব্রহ্মদেশ	.৫৭২	১.৬৬	২.২৫৬	৩.০২৩	৪.৭৩	৩.৫৭	.৫৯২	১.৯১৪	২.১৬	৩.৩১	৪.১৪	৩.১৫
বঙ্গদেশ	২.৮	৫.৯	৪.৭২	৪.১২	৫.৫৬	৪.০০	.২.৭	৬.৬৮	৪.৫২	৪.২৬	৪.৫৬	৩.৮৪
উ:প্র: ও অযোধ্যা	১.৯৯	৪.১৬	৩.৬	...	...	...	২.০৪	৪.৪	৩.৩২	...	...	...
পঞ্জাব	১.৬৬	১.৫৯	১.৮৮৮	২.০৮	৩.৯৬	৩.১১	১.৫৫	২.১৬৫	২.০৮	১.৮৩	৩.৪৭	২.৮১
মাদ্রাজ	১.৫৯৫	৩.৩২	৩.৩	২.৮৮	৬.২৭	৪.৭৫	১.৬১	৩.২৪	৩.৪	৩.০৯	৬.১	৪.৫৩
বোম্বাই	১.৮	৪.৯	৪.৪৯	৪.০৫	৬.১৭	৫.৪৫	১.৮৩৬	৫.০৮	৪.৪	৩.৭৭	৫.৭	৫.০০
অসম	...	.৬১	.৭৩৮	.৫৯৭	১.৩৮	১.০০	...	.৫০৫	.৬১৭	.৬১৮	১.১৩	.৮৫৭
উ প্রদেশ	...	...	...	২.৯৯	৫.৫	৪.১৫	...	...	...	৩.০১	৪.৮৭	৩.৯৪
বিহার ও ওড়িশা	...	...	...	...	২.৬	১.৯	...	...	...	...	২.১১	১.৭৭৫
মোট প্রাদেশিক	১১.১১	২২.৮	২১.৭৫	২০.৪	৩৮.৬	২৯.২	১০.৮	২৫.০০	২১.৩	২০.৮	৩৪.৩	২৭.৬

ভারত সরকারের বার্ষিক বিত্ত ও রাজস্ব হিসাব থেকে সংকলিত।

ভাগ-III

প্রাদেশিক বিত্ত : তার কার্যসাধনের বন্দোবস্ত

অধ্যায়-৭

প্রাদেশিক বিত্তের সীমাবদ্ধতা

প্রাদেশিক বিত্তের প্রয়োজনীয় সম্পূরক (Complement) ব্যতীত প্রাদেশিক সরকারের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত অনিয়ম, প্রশাসনের ইতিহাসে যা নজিরহীন, সে সম্বন্ধ যারা তথ্য জানবেন বলে আশা করা যায় তাদের পক্ষে গবেষণার ব্যাপারটি গভীর আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠতে পারে সেই পদ্ধতিটি প্রকাশ করে যে ভাবে ১৮৩৩ সালে সৃষ্ট অনিয়মটি সংশোধিত হয়েছিল বা সংশোধিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয় ১৮৭০ সালে।[১]

বিষয়টি নিছক কারণ-দৃষ্টে কার্য নির্ণয় করার ভিত্তিতে এটা অনুমান করে নেওয়া যে অতিমাত্রায় স্বাভাবিক হবে যে এই ভাবে ব্রিটিশ ভারতে প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক বিত্ত পদ্ধতি তার সংগঠনতন্ত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। এই ধরনের বিশ্বাস তার মধ্যে নিঃশব্দে বদ্ধমূল হয়ে ওঠা ছাড়া প্রাদেশিক বিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ

---

১) এমন একটা ধারণা অবশ্য প্রচলিত আছে যে, প্রাদেশিক বিত্ত ১৮৭০ সালেরও আগে বর্তমান ছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহে এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। যা এখানে বরং সংশোধন করা যেতে পারে ১৮৭০ সালের আগে বিত্ত বিষয়ে বিকেন্দ্রীকরণের ইতিহাস সংক্ষেপে স্মৃতিচারণ করে। ভারতের বিত্ত ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণের ইতিহাসে ১৮৫৫ সালটি সব সময়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ঐ বছরটি থেকেই স্থানীয় বিত্তের সূত্রপাত হয়। এ কথা অবশ্যই ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, ১৮৫৫ সালের আগে স্থানীয় রাজস্বের অস্তিত্ব ছিল না। পক্ষান্তরে, অত্যন্ত সামান্য পরিমাণের অর্থ—তহবিল ছিল। যেমন খেয়াঘাট তহবিল। উপশুল্ক (toll) তহবিল, উপকর ইত্যাদির অস্তিত্ব ছিল এবং স্থানীয় ব্যাপারে উপযোগী কাজকর্মের উন্নতিবিধানে তা ব্যয় করা হত, কিন্তু যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষ করতে হবে তা হল এই যে, ঐ ধরণের অর্থ-তহবিলের উদ্বর্তগুলি কোনও পৃথক হিসাবে জের টানা হত না। বরং সচরাচর দেশের সাধারণ উদ্বর্তের মিশিয়ে দেওয়া হত, কেবলমাত্র সম্ভবত: বঙ্গদেশ ও উত্তর—পশ্চিম প্রদেশ বাদে, যেখানে মনে হয় ঐ ধরনের উদ্বর্তগুলিকে পৃথক স্থানীয় অর্থ—তহবিল হিসাবে জের টানা হত (তুলনীয়, **ক্যালকাটা রিভিউ**, ১৮৫১, খণ্ড ৬, পৃ: ৪৬৪ এবং ৪৬৬)। ১৮৫৫ সালের ১১ মে তারিখের বিত্তীয় প্রস্তাব দ্বারা স্থানীয় অর্থ—তহবিলকে সম্পূর্ণভাবে রাজকীয় অর্থ—তহবিল থেকে পৃথক করে দেওয়া হয় এবং সেগুলিকে 'জমা' হিসাবে গণ্য করা হত— যা ছিল 'ঋণ' শীর্ষক হিসাবের খাতের একটি উপবিভাজন মাত্র (তুলনীয়, ওরাই. ভেঙ্কটরামাইয়া রচিত **অ্যাকাউন্টেন্টস ম্যানুয়েল**, খণ্ড ১, মাদ্রাজ, ১৮৬৬, পৃ: ৭৯) এবং ১৮৬৩ সালের সেপ্টেম্বরের প্রস্তাব দ্বারা স্থানীয় বিত্তের প্রচলন করা হয় এক পৃথক অবস্থার ভিত্তিতে প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্য রাজকীয় আয়-ব্যয়ক থেকে ভিন্নতর এক স্থানীয় অর্থ-তহবিল আয়-ব্যয়ক প্রবর্তন করে। বাস্তবে যা ঘটেছিল তা এই যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে ভারত সরকার স্থানীয় অর্থ তহবিল আয় ব্যয়ক প্রস্তুত করা ও তা কার্যকরার দায়িত্বভারটি অর্পণ করেছিল নিজ নিজ প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর যেহেতু তারা স্থানীয় চাহিদাগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিল।

সম্বন্ধে গবেষণা থেকে কি করে তিনি বেরিয়ে আসবেন এটা কল্পনা করা কষ্টকর। কিন্তু প্রাদেশিক বিত্ত যদি তার সংগঠনতন্ত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে থাকে, তবে আমাদের অবশ্যই চোখে পড়া উচিত প্রদেশগুলির বিত্তীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকার বিষয়টি যা স্বাধীন রাষ্ট্রের ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে সাধারণভাবে যুক্ত থাকে। প্রাদেশিক বিত্ত বিত্তের এক স্বাধীন পদ্ধতি ছিল কি ছিল না তা আশু অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আমরা আয়-ব্যয়ক প্রস্তাব করার ব্যাপারে স্বাধীনতা এবং এই সব ক্ষমতার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ এর সঙ্গে জড়িত যা কিছু সেগুলিকে গ্রহণ করতে পারি। আয়-ব্যয়ক তৈরি করার স্বাধীন ক্ষমতাগুলির সঙ্গে জড়িত থাকবে পরিষেবাগুলি নির্ধারণ করার ক্ষমতা যা দেশের চাহিদা অনুসারে এক দক্ষ সরকারের উচিত দায়িত্বভার নেওয়া। এবং কর আরোপণ বা ঋণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করার প্রণালীটি স্থির করা যাতে ঐ সব পরিষেবার জন্য যে ব্যয় হবে তা মেটানো যেতে পারে। এই ক্ষমতাগুলির পাশাপাশি আয়-ব্যয়ক প্রথা অপরিহার্যভাবে হিসাব রক্ষা করা এবং তা নিরপেক্ষ আয়-ব্যয়ক পরীক্ষার জন্য পাঠানো বাধ্যতামূলক করে।

এই আকস্মিক ঘটনাটিই অনেককে বিভ্রান্ত করেছিল এটা অনুমান করে নিতে যে এটাই ছিল মূলত প্রাদেশিক বিত্ত। কিন্তু এর চেয়ে বড় ভুল আর কি হতে পারে। ১৮৭০ সালের আগে যা ছিল তা সহজভাবে এক কথায় স্থানীয় বিত্ত, যদিও তা ছিল প্রাদেশিক সরকারের তত্ত্বাবধানের অধীনে, যাদের হাতে স্থানীয় অর্থ তহবিল থাকত মূলত এক ধরনের ন্যাস হিসাবে। স্থানীয় অর্থ তহবিলের আওতাভুক্ত আয় ও ব্যয়গুলিকে সমগ্র প্রদেশের জন্য স্থানীয় অর্থ তহবিল হিসাবের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক নিছক একত্রীভূত করাকে আদৌ এই অর্থে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না যে এটা সেই পরিমাণ অর্থকে বুঝায় যা প্রদেশগুলির নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকত— এবং একমাত্র এই অর্থেই প্রাদেশিক বিত্ত বাস্তবসম্মত সত্য হয়ে উঠতে পারে— (ইংল্যান্ড) যুক্তরাজ্যে ধার্য করা স্থানীয় অভিকর (Rates) গুলিকে গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান অর্থমন্ত্রীর আয়-ব্যয়কে একত্রিত করাটাও এর আর্থিক অবস্থার নির্দেশকের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু হতে পারে না। স্থানীয় অর্থ তহবিলগুলি প্রাদেশিক সরকারের সম্পূর্ণ অধিকারে থাকত না। কারণ সেগুলির সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্য কোনও ব্যাপারে তা খরচ করা যেত না এই অর্থে সেগুলি ছিল স্থানীয় বিত্ত, প্রাদেশিক কিন্তু নয়। অনেকে এটাকে প্রাদেশিক বিত্ত বলে ভুল করে। সম্ভবত এই কারণে যে 'স্থানীয় সরকার' নামটির প্রাদেশিক সরকারের সমার্থক শব্দ বলে ব্যবহৃত হয় কিন্তু যখন স্থানীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে পরস্পর বিনিময়যোগ্য শব্দ হিসাবে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, তখন একথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, স্থানীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলিকে ঐ ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে। ভারতে বিত্তীয় সংগঠনের ইতিহাসে একটা অধ্যায় ছিল, যখন সঠিক ভাবে বললে বলা যায় যে, স্থানীয় সরকার ছাড়াই স্থানীয় বিত্ত ছিল, এবং সম্ভবত যতদিন প্রাদেশিক সরকারকে স্থানীয় সরকার বলে অভিহিত করার অভ্যাস চালু থাকবে। ততদিন পর্যন্ত উক্ত ধারণা সম্পর্কিত এই গোলমাল একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। অনেকে যেমন জোরের সঙ্গে দাবি করেন যে ১৮৭০ সালের বহু আগে থেকেই প্রাদেশিক বিত্তের অস্তিত্ব ছিল। ১৮৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বরের প্রস্তাব টিকে, যা প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্পটিকে প্রবর্তিত করেছিল। বলা হত। 'স্থানীয় বিত্ত সম্পর্কিত প্রস্তাব', যেন এরই ফলে স্থানীয় বিত্তের উদ্ভব হয়েছিল। প্রাদেশিক বিত্তের নয়। এই ধরনের অসঙ্গতি পরিহার করা যায় পরিভাষার যথার্থতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

এই গবেষণার পূর্বোক্ত খণ্ডগুলিতে প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে। সেই আয়-ব্যয়কের উপরে এই পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে আমরা স্বাধীনতার এক দশমাংশ সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না যা সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির আয়-ব্যয়কের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। পক্ষান্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে ভারতে যে আয়-ব্যয়ক প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত সীমাবদ্ধতা। তাদের দেওয়া হয়েছিল এমন একটি আয়-ব্যয়ক যার কোনও ক্ষমতা ছিল না, এবং ঐ প্রদেশগুলি হিসাব রক্ষা ও আয়-ব্যয় পরীক্ষার দায়িত্ব ভার নিয়েছিল নিছক এই কারণে যে, তাদের আয়-ব্যয়কের সীমার মধ্যে তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। কেন এই সব বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল তার ব্যাখ্যা করা হবে যখন আমরা প্রাদেশিক বিত্তের কর্মপরিধিটিকে সম্প্রসারিত করার পন্থাগুলির সমীক্ষা করত।

অবশ্য এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতেই হবে যে, এই সীমাবদ্ধতাগুলি প্রকল্পটির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এবং পূর্বোক্তগুলির কঠোরতা যুগপৎ বেড়ে উঠেছিল শেষোক্তটির কর্মপরিধি ও অনুপাতের সঙ্গে। বস্তুত সেগুলি প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কের গঠন বিন্যাসের নিয়মাবলীকে ব্যাখ্যা করেছিল। ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক বিত্তের কার্যকারিতার সম্পূর্ণ উপলব্ধি সেগুলির পরিচালনার নিয়মাবলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এই নিয়মাবলির গুরুত্বগুলি এই ধরনের হওয়ায় এই পর্যায়ে সেগুলির বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে আমাদের পক্ষে সুবিধাজনকই হবে।

১৮৭০ সালে যখন প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্পটি রূপায়িত হয়েছিল এবং ১৯১২ সালে যখন প্রকল্পটি এক ক্রমবিকাশের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তার চূড়ান্ত ও স্থায়ী অধ্যায়ে পৌঁছে ছিল, এর মধ্যবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে এই নিয়মগুলি রচিত হয়েছিল বিত্ত বিভাগে ভারত সরকারের প্রস্তাবের আকারে।

১৮৭০ সালে রচিত [১] নিয়মগুলি সংখ্যায় ছিল কম ও সবল। সেই সময় গঠিত অত্যন্ত নগণ্য আয়-ব্যয়কের কার্যকারিতার বিষয়টি পরিচালনার জন্য জটিল সংহিতার (Code) কোনও প্রয়োজনও ছিল না। নির্দেশ ও প্রক্রিয়ার কতকগুলি দুঃখজনক ক্ষেত্রের নিষ্পত্তির জন্য বহু সম্পূরক নিয়মাবলি প্রবর্তিত হয়েছিল; কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের বিত্তীয় লেন-দেন পরিচালনার জন্য নিয়মাবলি ও প্রনিয়মের অত্যন্ত বিস্তারিত গুচ্ছগুলি আমরা পাইনি ১৮৭৭ [২] সালের আগে। ১৮৭৭ সালের

১) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ৩৩৩৪, তাং ১৪ ডিসেম্বর ১৮৭০

২) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ১৭০৯, তাং ২২ মার্চ, ১৮৭৭

নিয়মাবলিগুলিই ছিল পরবর্তী কালে প্রবর্তিত নিয়মাবলির। অত্যন্ত সামান্য পরিশিষ্ট (Aldenda) ও শুদ্ধিপত্র (Corrigendam) সহ সেগুলি বলবৎ ছিল দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে। যখন সেগুলি ১৮৯২[1] সালে ঘোষিত এক গুচ্ছ নতুন নিয়মের দ্বারা নিবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চবর্ষকালের এক সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই এই গুচ্ছ নিয়মগুলি স্থলাভিষিক্ত হয় অপর গুচ্ছের দ্বারা যা প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে[2]; এবং শেষোক্তটি নিয়মাবলির পরিচালন সংস্থা হিসাবে থেকেছিল ১৯১২ সাল পর্যন্ত যখন উক্ত বছরে কৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক নতুন গুচ্ছ ঘোষিত হয়েছিল।[3] ঐ একই নিয়ম পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল ১৯১৬ সালের ২৪ জুলাই তারিখের বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ৩৬১-ই-এ-তে। কিন্তু যেহেতু তার মধ্যে করা পরিবর্তনগুলি কোনও অর্থেই পরিণাম ছিল না। তাই ১৯১২ সালে (নিয়মের) গুচ্ছগুলিকে প্রাদেশিক বিত্তের চূড়ান্ত প্রনিয়মের প্রবর্তন হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

নিয়মাবলির বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিয়ে। আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল পূর্বাহ্নেই দৃষ্টিকোণ বা দৃষ্টিকোণগুলিকে নির্ধারণ করা যেখান থেকে আমরা বিশ্লেষণ শুরু করতে পারি। প্রারম্ভেই এটা উল্লেখ করতে হবে যে, নিয়মাবলি পরীক্ষা করতে লক্ষ্যমাত্রা দ্বিবিধ: (১) জানতে হবে কি কি সীমাবদ্ধতা ছিল এবং (২) কেন সেগুলিকে রাখা হয়েছিল। একথা সত্য যে আমাদের অণু আগ্রহের বিষয়টি হল ব্যক্ত করা কি কি সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু এটা তো শুধু প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা নগণ্য না হলেও। এই দুটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে দ্বিতীয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সীমাবদ্ধতাগুলির জন্য প্রয়োজনটির কারণগুলিকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করার সহায়ক হিসাবেই শুধু এগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। সীমাবদ্ধতার প্রত্যক্ষ লক্ষ্যমাত্রাগুলিকে ব্যক্ত করার কথা স্মরণে রেখে আগে থেকে না জানার চেষ্টা করাটা অকল্পনীয় হবে যে, পরবর্তী অধ্যায়ে, যে অধ্যায়ে আমরা অল্প পরেই যেতে চলেছি, আমরা জানতে পারব যে এই সীমাবদ্ধতাগুলির প্রয়োজনের উদ্ভব হয়েছিল প্রাদেশিক বিত্তের নিজস্ব অতি-বিচিত্র প্রকৃতি থেকে। অপর দিকে, এই সিদ্ধান্তটি পূর্বাহ্নে অনুমান করে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন এবং যে শ্রেণী-পরম্পরায় (Tradition) নিয়মগুলির উদ্ভব হয়েছিল সেগুলি উপস্থাপিত করার পরিবর্তে এমন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত যাতে সেগুলি প্রাদেশিক বিত্তের অভ্যন্তরীণ ধারনার

১) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ১১৪২, তাং ১৭ মার্চ, ১৮৯২

২) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ৩৫৫১, তাং ১১ আগস্ট ১৮৯৭

৩) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ২৪৯, ই. এ: তাং ১৫ জুলাই, ১৯১২

বহিরঙ্গ নিবন্ধ গ্রন্থ হয়ে উঠবে, যা সেগুলির উদ্যোক্তাদের মনের মধ্যে বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যটি সফল করার জন্য প্রাদেশিক বিত্তের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের যাঁরা এই নিয়মগুলি রচনা করেছিলেন, তাঁদের শ্রম বিফলে গেল। তাঁদের কাছে এই নিয়মগুলি ছিল বিত্ত নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার মাত্র। এবং তাই কোন্ ক্রমপর্যায়ে সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হচ্ছে সেটা তত বড় ব্যাপার ছিল না। অপর দিকে, এই নিয়মগুলির পিছনে কি ধারনা ছিল তা জানার জন্য সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ও দলবদ্ধ করা প্রয়োজন ছিল যে উদ্দেশ্য সাধনের উন্নতি বিধানে সেগুলি পরিকল্পিত হয়েছিল সেই অনুযায়ী। কিন্তু শ্রেণীবদ্ধ করার ব্যাপারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টি অন্তর্নিহিত ছিল সেই সম্ভাব্য উদ্দেশ্যগুলির ব্যাখ্যার মধ্যে, যা ভারতে উপলব্ধ প্রাদেশিক বিত্তের ঐ ধরনের এক পারস্পরিক সম্বন্ধ বদ্ধ প্রকল্পের উদ্ভাবকদের মাথায় অবশ্যই ছিল। আদৌ কোনও বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী না হয়ে। একথা বলা যেতে পারে যে, ঐ ধরনের প্রকল্পকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করার জন্য নিয়ম রচনা করতে হবে প্রাদেশিক সরকারের (১) প্রশাসনিক এবং (২) বিত্তীয় ক্ষমতার সংজ্ঞা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। প্রাদেশিক বিত্তের প্রকৃতিটি সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণার জন্য ঐ দুই শ্রেণীর আরও উপ-বিভাজন প্রয়োজন হতে পারে। এই ভাবে প্রশাসনিক ক্ষমতা সংক্রান্ত নিয়মাবলি আবার উপ-বিভাজিত করা যেতে পারে (১) পরিষেবা এবং (২) কর্মচারিবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি অংশে। অনুরূপভাবে বিত্তীয় ক্ষমতার স্বরূপ নির্ধারণকারী নিয়মাবলিকে সুবিধামত নিম্নলিখিত দুটি সহায়ক শ্রেণীতে দলবদ্ধ করা যেতে পারে: যেগুলি (১) সাধারণ চরিত্রের এবং যেগুলি সম্বন্ধযুক্ত (২) প্রাদেশিক রাজস্ব; (৩) প্রাদেশিক ব্যয়, (৪) আয়-ব্যয়ক অনুমোদন এবং (৫) হিসাব পরীক্ষা ও হিসাবের সঙ্গে।

উদ্দেশ্যকে **মৌলিক বিভাজন** হিসাবে গ্রহণ করে, উপরোক্ত শ্রেণীগুলিকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সেগুলি সম্ভাব্য উদ্দেশ্যগুলিকে নিঃশেষিত করে দেবে যা প্রকল্পের রচয়িতাদের কল্পনায় ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এই শ্রেণীগুলির ভিত্তিতে অতএব আমরা অগ্রসর হতে পারি অসংখ্য অনিবন্ধী নিয়মগুলিকে একটি সার সংগ্রহে সংক্ষিপ্ত করে আনতে এবং আশা করা যেতে পারে যে, তা একই সঙ্গে সুবিধাজনক ও শিক্ষামূলক হবে।

I প্রশাসনিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

(১) আন্তঃ-প্রাদেশিক পরিষেবাগুলির নিয়মাবলি

বিভিন্ন প্রদেশের পৃথক আয়-ব্যয়ক সৃষ্টির ফলে উদ্ভূত আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্ত-

বিভাগীয় সম্পর্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে—

১। কোনও রকমের আন্তঃপ্রাদেশিক সমন্বয়সাধনের অনুমতি দেওয়া হবে না।

২। প্রাদেশিক সরকারগুলির নিয়ন্ত্রণাধীনে দেওয়া বিভাগের পরিচালনাধীনে থাকা অন্য কোনও বিভাগে পূর্বে প্রদত্ত কোনও পরিষেবাগুলিকে বাতিল করা যাবে না। এবং অন্য বিভাগে পরিচালনাধীনে থাকা এই বিভাগগুলিকে পূর্বে প্রদত্ত কোনও পরিষেবাকে বাড়ানো চলবে না।

৩। সরাসরি যোগাযোগের কোনও যোগসূত্র পরিত্যক্ত বা মেরামতির অযোগ্য করে রাখা চলবে না।

(২) কর্মচারিবৃন্দ সংক্রান্ত নিয়মাবলি

প্রাদেশিকীকৃত পরিষেবাগুলির কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত কর্মচারিবৃন্দ সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা দিতে—

১। স্থায়ী পদসৃষ্টি করা বা কোনও পদে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে।

১৯১২ সালের আগে এটা প্রায় ছিল মাসিক ২৫০ টাকা বা তদূর্ধ্ব বিশিষ্ট পদের ক্ষেত্রে।[১] কিন্তু ১৯১২ সালের পর থেকে এটা প্রযোজ্য ছিল সেই সব পদ সম্বন্ধে যেগুলি সাধারণ ভাবে অধিকার ভুক্ত ছিল ঘোষিত আধিকারিকদের অথবা জনপালন কৃত্যক প্রনিয়মের ২৯-খ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাজকীয় কৃত্যকের আধিকারিকদের দ্বারা।[২]

২। কোনও আধিকারিকের জন্য অস্থায়ী পদ সৃষ্টিকারী বা প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠানো।

১৯১২ সালের আগে এটা প্রযোজ্য ছিল মাসিক ২৫০ টাকা বা তদূর্ধ্ব বেতন বিশিষ্ট পদের ক্ষেত্রে।[৩] কিন্তু ১৯১২ সালের পর এই আদেশটি শুধু সেই ধরনের পদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হচ্ছিল যার বেতন মাসিক ২৫০০ টাকা অধিক ছিল না বা মাসিক ৮০০ টাকার। যদি অস্থায়ী নিযুক্তি বা আশা করা হচ্ছিল যে প্রতিনিধি (Deputation) দুই বছরের বেশি চলবে না।[৪]

---

১) নিয়ম ৪ (৩) (ক) ১৮৯৭ সালের

২) ১৯১২ সালের নিয়ম ১০ (১)

৩) ১৮৯৭ সালের নিয়ম (৩) (খ)

৪) ১৯১২ সালের নিয়ম ১০ (৪) (ক)

৩। স্থায়ীপদের বিলোপ করা বা ঐ ধরনের পদের বেতন ও ভাতা হ্রাস করা।

গোড়ার দিকে এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল শুধু সেই ধরনের পদে যার বেতন মাসিক ২৫০ টাকার বেশি ছিল।[১] ১৯১২ সালের পর এটা সীমিত ছিল শুধু সেই ধরনের পদে যাতে ইংল্যান্ড থেকে নিযুক্ত হওয়া ঘোষিত অসামরিক আধিকারী বহাল থাকত বা জনপালন কৃত্যক প্রনিয়মের ২৯-খ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ছিল যেভাবে।[২]

৪। সরকারে নিযুক্ত অসমারিক আধিকারিককে প্রদত্ত অনুদান বা পরিষেবা-জনিত উত্তর বেতন (Pension) প্রাপ্তিতে।

(ক) ভূমি, শুধু সেই ভূমিবাদে যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সাধারণ রাজস্বের নিয়মাবলি অনুসারে অনুদান দেওয়া হয়েছিল টাকা-পয়সায় কোনও বিশেষ রকমের সুবিধা যেখানে জড়িত থাকে না বা তার সম-পরিমাণ কিছু সেই ঘটনাকে উপেক্ষা করেই যেখানে অনুদান-প্রাপক (Gratuity) অন্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার পায় অনুদান পাওয়ার ব্যাপারে।[৩]

অথবা (খ) ভূমিরাজস্বের নিয়োগ যেখানে অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ৬০০ টাকার বেশি হয়। অথবা যেখানে নিয়োগ, ঐ পরিমাণ অর্থের সীমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, তিন পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না এবং প্রতিবার উত্তরাধিকার পাওয়ার সময় ঐ অর্থের পরিমাণ অর্ধেক করে কমে যাবে। প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক অসামরিক আধিকারিকদের প্রদত্ত ভূমি রাজস্বের নিয়োগ হিসাবে সব রকমের অনুদানকে সেই সব ব্যাপারে যেখানে পরিষেবাগুলি এক অত্যন্ত বিশিষ্ট এবং ব্যতিক্রমী চারিত্রের ছিল।[৪]

৫। **পুন:পরীক্ষা করা হোক** (ক) স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি যার সঙ্গে বার্ষিক ৫০,০০০ টাকার উর্ধ্বে অতিরিক্ত ব্যয় জড়িত থাকে; অথবা (খ) কেবলমাত্র বার্ষিক ২৫০০০ টাকার বেশি খরচ হয় যে কৃত্যকে তার পরিষেবার যে কোনও একটি শাখার স্থায়ী বেতনের হার; অথবা (গ) একটি পরিষেবার গড় বেতন যার সর্বোচ্চ বেতন মাসিক ৫০০ টাকার বেশি নয় এবং গড় হারের চেয়ে তা বৃদ্ধি করা যে হারটি

১) ১৮৯৭ সালের নিয়ম ৪ (৪)

২) ১৯১২ সালের নিয়ম ১০ (৩)

৩) ১৯১২ সালের নিয়ম ১০ (৯) (ক)

৪) ১৯১২ সালের নিয়ম ১০ (৯) (খ)

ভারত সরকার অথবা মন্ত্রী কর্তৃক পরিষেবা সংক্রান্ত বিগত পুনঃপরীক্ষার দ্বারা সংশোধনের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল; অথবা (খ) স্থানীয় ভাতা জীবনযাত্রার দুমূর্ল্যের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে বা কোনও এলাকায় ভাড়া বৃদ্ধি হওয়ার জন্য।[১]

II বিত্তীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

(১) সাধারণ

প্রাদেশিক সরকারগুলির বিত্তীয় ক্ষমতার উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রকৃত অর্থে আলোচনার আগে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রদেশগুলির সঙ্গে বিত্ত বিষয়ক বন্দোবস্ত করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজস্ব ও ব্যয়ের কয়েকটি খাত তাদের হাতে তুলে দেওয়া। এই আপতিক (Accidental) লক্ষণ বৈশিষ্ট্য থেকে এ কথা অনুমান করে নেওয়া উচিত হবে না যে বন্দোবস্তগুলি প্রাদেশিক আয়-ব্যয়কে সন্নিবেশিত রাজস্ব ও ব্যয়ের প্রতিটি খাতের জন্য পৃথক পৃথক বন্দোবস্তের সংকলন মাত্র। প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক এই ধরণের ব্যাখ্যা ও তার পরিণামগুলিকে পরিহার করার জন্য, এই ধরনের নিয়ম করা হয়েছিল যে—

১। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এটা বুঝতে হবে যে তাদের জন্য যে তহবিল নিয়োগ করা হয়েছে তা তাদের নিজ নিজ প্রশাসনের উপর **দলবদ্ধভাবে** (en masse) অর্পিত হওয়া সকল পরিষেবার জন্য থোক অনুদানের রূপ নিয়েছিল। এবং থোক অনুদানের হিসাব-নিকাশে যে পরিমাণ অর্থ সম্বন্ধে অনুমান করা হয়েছিল তা যদি কোনও পরিষেবার প্রকৃত খরচের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তবে ঐ কারণে রাজকীয় কোষাগারের বিরুদ্ধে কোনও রকম দাবি উত্থাপন করা যাবে না।[২]

২। এবং রাজকীয় কোষাগারের উপর তারা কোনও বাড়তি দাবি চাপাবে না, এবং যে-সব কৃত্যক গুলির পরিচালন ভার তাদের উপর অর্পন করা হয়েছিল সেগুলিকে প্রশাসনিক দক্ষতার অবস্থায় রাখার জন্য ব্যয়ভার বহন করতে হতো যে তহবিল তাদের দেওয়া হয়েছিল তা থেকে।[৩]

নিজেদের তহবিলের জিম্মা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতাবলি সম্বন্ধে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে:—

---

১) ১৯১২ সালের নিয়ম ১০ (৬)

২) ১৮৭৭ সালের ৭নং নিয়ম ও ১৮৯৭ সালের ১৪নং নিয়ম

৩) ১৮৭৭ সালের ৭নং ও ১৮৯৭ সালের ১৪নং নিয়ম

৩। নিজেদের ব্যবহারের জন্য তাদের যে তহবিল বরাদ্দ করা হত তা রাজকীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে। এবং তা অন্যত্র বিনিয়োগ বা জমা করার জন্য সরানো চলবে না; এবং সরকারি কাজে ব্যয় করা ছাড়া অন্য কোনও ব্যাপারে ঐ অর্থ তুলে নেওয়ার অধিকার প্রাদেশিক সরকারগুলির ছিল না।[১]

(২) রাজস্ব সংক্রান্ত নিয়মাবলি

প্রদেশগুলির রাজস্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই সব সাধারণ সীমাবদ্ধতাগুলি থেকে সরে এসে, এ কথা লক্ষ করা উচিত যে প্রতিটি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকটি প্রদেশকে যে তহবিল বরাদ্দ করেছিল তাই দিয়ে নিজেদের কাজ চালানোর কথা ছিল।

কোনও সম্ভাব্য উপায়ের দ্বারা নিজেদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে উৎপাদের সীমা ছাড়িয়ে নিজেদের সম্পদ বাড়াতে পারত না প্রদেশগুলি, কারণ এমনই ব্যবস্থা ছিল যে প্রাদেশিক সরকারগুলি ছিল—

১। রাজস্ব পরিচালনার বর্তমান পদ্ধতিতে কোনও পরিবর্তন সাধন করা বা বাড়তি কর ধার্য্য না করা।[২]

২। প্রমুদ্রার খুচরা বিক্রয় আদালতের ফিয়ের লেবেল, এবং সুরাসার ও ঔষধের শুল্কের উপর বাটার (Discount) হার নিজ এলাকায় পরিবর্তন বা বৃদ্ধি না করা।[৩]

৩। খোলাবাজারে সম্পূর্ণ নিজস্ব বিত্তের জন্য ঋণ গ্রহণ না করা।[৪]

নিজেদের বিত্ত বৃদ্ধিকরার ব্যাপারে ক্ষমতা না থাকায় প্রাদেশিক সরকারগুলির স্বাধীনতা ছিল না তাদের অধীনস্থ অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের হাতে তা সমর্পণ করত। এই ধরনের কোনও সম্ভাব্য ঘটনা থেকে সুরক্ষিত করে রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে প্রাদেশিক সরকারগুলির অধিকার ছিল না—

---

১) ১৮৭৭ সালের নিয়ম নং ১ (৮), ১৮৯৭ সালের নিয়ম নং ৪(১১), এবং ১৯১২ সালের নিয়ম নং ৫ (৬)

২) ১৮৭৭ সালের নিয়ম নং ১ (১) এবং পরবর্তী প্রস্তাবগুলি।

৩) ১৮৭৭ সালের নিয়ম নং ১ (৬), পরবর্তী প্রস্তাবেও সন্নিবেশিত।

৪) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ৫ (১৩) । এটা বেশ অশ্চর্যের বিষয় যে ১৯১২ সালের আগে প্রাদেশিক বিত্ত বিষয়ের নানা প্রস্তাবে এই বিনির্দেশটি ছিল না। যদিও এটা কিছুতেই সন্দেহ করা যায় না যে, প্রাদেশিক বিত্তের সূত্রপাত হওয়ার সময় থেকে এটা কার্যকর ছিল। ১৯১২ সালের আগে সুনির্দিষ্ট বিনির্দেশ না থাকায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে ১৮৭৯-৮০ সালের বিত্তীয় বিবরণের পুনর্মূল্যায়নকারী প্রস্তাবের প্রতি; যাতে বলা হয়েছিল যে, 'অতএব যতদিন না পর্যন্ত স্থানীয় সরকার হিসাবে ঋণ গ্রহণ না করে' (যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল) সেক্ষেত্রে ইত্যাদি বি: বি: ১৮৭৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৫।

৪। রাজকীয় বা প্রাদেশিক কোনও সাধারণ রাজস্বে জমা দেওয়া কোনও দফাকে আলাদা করা, যাতে তা স্থানীয় বা বিশেষ তহবিলের এক পরিসম্পদ গড়ে তুলতে পারে।

প্রদেশগুলির হস্তে সমর্পিত রাজস্বের সম্পদগুলির অ-হস্তান্তরকরণ সম্পর্কিত এই শর্তটি কিছুটা পরিমাণে শিথিল করা হয়েছিল ১৯১২ সালের বিধি-নিয়মাবলির দ্বারা যাতে করে তাদের পক্ষে এটা অনুমোদনীয় ছিল নিয়োগ করা কোনও স্থানীয় সংস্থাকে বা বিশেষ তহবিলে, যা আইন মাধ্যমে সংগঠিত জনপালন কৃত্যকের প্রনিয়মের ৩৩ নং অণুচ্ছেদে আবর্তক চারিত্র-বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট পুরোপুরি প্রাদেশিক রাজস্বের ছোটখাট দফাগুলিতে, যা সাধারণ আদায়ীকৃত করের আয় থেকে প্রাপ্ত হত না এবং বছরে ২৫০০০ টাকার বেশি গড়ে অর্জন করত না।[১]

৫। নিজেদের আয়ত্তাধীন তহবিল থেকে স্থানীয় বা পৌর সংস্থাগুলিকে কোনও অনুদান, সরকারি অর্থ সাহায্য বা নিয়োগ না করা যার ফলে ভারতের রাজস্বের উপর স্থায়ী দায়ভার সৃষ্টি হতে পারে। এটা অবশ্যই প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক তার তহবিল থেকে স্থানীয় বা পৌরসংস্থা গুলিকে অনুদান, সরকারি সাহায্য বা নিয়োগ প্রদানে আদৌ বাধার সৃষ্টি করে নি যদিও ভারত সরকার প্রদেশগুলির কাছে এক সতর্কতামূলক বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল বন্দোবস্তগুলির মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও অনুদানে চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিজেদের বাধ্য- বাধকতা অস্বীকার করে বা পরবর্তী বন্দোবস্তগুলির সময় তাদের জন্য কোনও ব্যবস্থা করার ব্যাপারে।[২] যদিও ১৯১২ সালের বিধি-নিয়মাবলির দ্বারা ঐ ধরনের অনুদান দেওয়ার ক্ষমতা আরও সুস্পষ্টভাবে পরিলিখিত (Circumscirbed) করা হয়েছিল যাতে করে প্রাদেশিক সরকার দিতে না পারে (১) কোনও একটি ক্ষেত্রে বছরে ১,০০,০০০ টাকার বেশি অর্থ প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে কোনও স্থানীয় সংস্থাকে আবর্তক অনুদান,[৩] বা (২) কোনও একটি ক্ষেত্রে ১০,০০,০০০ টাকার বেশি কোনও স্থানীয় সংস্থাকে অনাবর্তক অনুদান,[৪] বা (৩) শিক্ষা সংক্রান্ত বাদে অন্য কোনও দাতব্য বা ধর্মীয় ভারতবর্ষ বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানকে আবর্তক হলে বছরে ১০,০০০ টাকার অধিক এবং অনাবর্তক হলে ৫০,০০০ টাকার অধিক অনুদান।[৫]

---

১) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ৫ (৫)

২) ১৮৯৭ সালের নিয়ম নং ৪ (১০)

৩) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (১২) (ক)

৪) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (১২) (খ)

৫) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (১০)

৬। কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কোনও রকম অনুদান না দিতে (১) রাজনৈতিক বিবেচনায় (ক) ভূমি সম্পর্কে, রাজস্ব দায় থেকে মুক্ত করে বা অনুকূল শর্তে, বা (খ) ভূমি রাজস্বের নিয়োগের ভিত্তিতে, যদি ভূমি অথবা ভূমি রাজস্বের মূল্য বার্ষিক ১০০০ টাকার অধিক হয়।[১] (২) সরকারের সেবা করতে গিয়ে পরিণামে বা সেবাকালীন মৃত্যু ঘটলে ব্যক্তিটির নিজস্ব বা তার পরিবারের ক্ষতির বিচারে, অথবা (৩) সরকারের প্রতি বিশেষ সেবার বিচারে বার্ষিক ১,০০০ টাকার বেশি অবসরকালীন ভাতা বা কোনও একটি ক্ষেত্রে অনধিক ৩,০০০ টাকার আনুতোষিক (Gratuity)[২]।

(৩) ব্যয়ের নিয়মাবলি

প্রাদেশিক সরকারকে অনুমোদিত ব্যয় মঞ্জুর করার ক্ষমতাগুলি রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতার মতই ছিল সীমিত। তাদের উপর দায়িত্ব ভার ন্যস্ত কৃত্যকগুলির ব্যাপারে নিজেদের তহবিল থেকে খরচ করার স্বাধীনতা তাদের থাকলেও, কয়েকটি সীমাবদ্ধতা তাদের উপর আরোপিত হয়েছিল প্রাদেশিক অধিক্ষেত্র থেকে ব্যয়ের কয়েকটি উদ্দেশ্য ও বিষয়গুলিকে সুস্পষ্টভাবে বাদ দেওয়ার জন্য।

নিজেদের ব্যয়ের **উদ্দেশ্য** সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারগুলির করণীয় ছিল—

১। ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ব্যয়ের উদ্দেশ্যগুলির শ্রেণীর বাইরে অন্য কোনও বিষয়ে সরকারি অর্থ থেকে কোনও রকম ব্যয় অনুমোদন না করা।[৩]

২। বন্দোবস্তের শর্ত অনুসারে তাদের উপর বিশেষ ভাবে অর্পিত কৃত্যকগুলির কাজকর্ম চালানোর মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা।

১৯১২ সালের আগে প্রাদেশিক সরকারগুলি এক 'নতুন সাধারণ পরিষেবা বা কর্তব্য ভার' গ্রহণ করতে পারত একমাত্র তখনই যখন তারা ভারত সরকারকে বোঝাতে পারত যে তারা প্রয়োজনীয় তহবিল জোগাতে পারবে কাজটি সাময়িক হলে সাময়িক ভাবে এবং স্থায়ী হলে স্থায়ী ভাবে।[৪] ১৯১২ সালে এই ব্যবস্থাটি বদলানো হয় যাতে একটি প্রাদেশিক সরকার এক নতুন সাধারণ পরিষেবা বা কর্তব্যের ভার নিতে পারত যদি না তা (ক) অস্বাভাবিক ধরনের হয় বা (খ)

---

১) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (৭)

২) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (৮)

৩) ১৮৯৭ সালের নিয়ম নং ১১ পরবর্তী প্রস্তাবগুলির মধ্যেও সন্নিবেশিত।

৪) ১৮৯৭ সালের নিয়ম নং ৪ (২)

প্রশাসনের সাধারণ কাজকর্ম বহির্ভূত উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে একান্তভাবে নিয়োজিত হয়, অথবা (গ) পববর্তী কোনও এক সময়ে তার মঞ্জুর করার ক্ষমতা বহির্ভূত সম্ভাব্য ব্যয়ের সঙ্গে জড়িত হতে।[১]

৩। ব্যয় না করতে—

(ক) সরকারি উৎসব এবং সভার জন্য, এবং ভারতে আগত বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতদের সরকারি খরচে আপ্যায়নের জন্য ১,০০,০০০ টাকার বেশি।[২]

(খ) রেলগাড়ির কামরা সম্পর্কে বিশেষ করে তা যদি পদস্থ কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত থাকে। কেবলমাত্র কামরার রক্ষণাবেক্ষণের সম্পর্কিত ব্যয় বাদে।[৩]

(গ) প্রদেশের কর্তার সঙ্গে 'চুক্তিকৃত অনুদান' বাদে সরকারি আধিকারিকের ব্যবহারের জন্য মোটর গাড়ি বা মোটর সাইকেল কেনা সম্পর্কে বা সেগুলির রক্ষশাবেক্ষণের জন্য।[৪]

(ঘ)প্রদেশের কর্তার সঙ্গে 'চুক্তিকৃত অনুদান' বৃদ্ধি সম্পর্কে।[৫]

(ঙ) অন্তর্দেশীয় নৌপরিবহন এবং বন্দরে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জনযান ক্রয় করা বা নির্মাণ করা সম্পর্কে যার ব্যয় ১,০০,০০০ টাকার চেয়ে বেশি হবে।[৬]

(চ) জলসেচ বা অন্যান্য বাস্তুকর্ম প্রকল্পগুলি সম্পর্কে যার অনুমিত ব্যয় সাধারণ রাজস্ব থেকে আদায় করা যেতে পারে যা সরকারি দপ্তর। সাধনযন্ত্র এবং শিল্পশালা সহ ২০, ০০,০০০ টাকার বেশি যেন না হয়। যদিও প্রাদেশিক সরকারের অধিকার ছিল মূল অনুমোদিত বরাদ্দের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ পর্যন্ত ব্যয় করার এই শর্তে যে ঐ ধরনের অতিরিক্ত খরচ যেন সরকারি দপ্তর, সাধনযন্ত্র ও শিল্পশালা সহ ১২১/২ লাখ টাকার বেশি না হয়।[৭]

---

১) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ৫ (১১)

২) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (১১)

৩) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (৪)

৪) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (৬)

৫) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (১৫)

৬) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (১৭)

৭) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (১৮)

প্রাদেশিক ব্যয়ের বিষয়গুলি সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে। এই নিয়ম করা হয়েছিল যে সরকারি অর্থ ব্যয় করার জন্য সকল কর্তৃত্ব অর্পণের ব্যাপারে সাধারণ পূর্বশর্তগুলির প্রয়োগ করার অধিকারে, দেখতে হবে যে তা যথার্থই জনস্বার্থে করা হচ্ছে, এবং এ ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের তহবিল ব্যয় করতে পারবে না সুবিধা দিতে—

(১) ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নিয়ম অথবা ঘোষিত বা প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসারে না হলে কোনও ব্যক্তি বিশেষকে বা বেসরকারি ব্যক্তিদের সংস্থাকে।[১]

(২) দেশীয় রাজ্যগুলিকে সরাসরি বছরে ১০,০০০ টাকার বেশি দিতে যে কোনও একটি প্রকল্প সম্পর্কে বা খরচটি অনাবর্তক হলে ৫০,০০০ হাজার টাকার বেশি নয়।[২]

(৪) আয়-ব্যয়ক সম্পর্কিত বিধিনিয়ম

১৮৬০ সালে মি: উইলসন কর্তৃক সর্বপ্রথম ভারতে প্রবর্তিত আয়-ব্যয়ক পদ্ধতির সাধারণ নিয়মাবলির অনুগত হয়ে থাকতে বাধ্য হওয়া ছাড়া,[৩] যার দ্বারা তারা বাধ্য থাকত তাদের বাজেটের পরিমাণ অনুমোদনের জন্য ভারত সরকারের কাছে পেশ করতে, এবং অনুদানগুলি কার্য করার ব্যাপারে উপযোজনের নিয়মাবলি পালন করতে, প্রাদেশিক সরকার গুলিকে এ কথাও বিদিত করা হয়েছিল যে, ভারত সরকারের কাছ থেকে আগে থেকে সম্মতি না নিয়ে তারা—

১। রাজকীয় কোষাগারে তাদের উদ্বর্তগুলিকে নিঃশেষিত করতে পারবে না।

১৮৮৭ সালের আগে প্রাদেশিক সরকার তাদের আয়-ব্যয়ক প্রাক্কলনে তার সমগ্র উদ্বর্ত (Balance) তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারত। কিন্তু তার পরে রচিত নিয়মাবলির দ্বারা প্রাদেশিক সরকার বাধ্য ছিল সবসময়ে এক ন্যূনতম উদ্বর্ত রাজকীয় কোষাগারে রাখতে, যার পরিমাণে প্রতিটি পরবর্তী বন্দোবস্ত অনুসারে তারতম্য হত।

২। ঘাটতি আয় ব্যয়ক করতে পারবে না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বৎসরে প্রাদেশিক ব্যয় প্রাদেশিক রাজস্বের চেয়ে বেশি হতে পারবে না।

---

১) ১৮৭৭ সালের নিয়ম নং ১০, পরবর্তী প্রস্তাবগুলিতেও সন্নিবেশিত।

২) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ১০ (১৩)

৩) ১৮৯২ সালের নিয়ম নং ১১, ১৮৯৭ সালের ১৩ এবং ১৯১২ সালের ১৯।

এই নিয়মের[১] কঠোরতা কিছুটা শিথিল করা হয়েছিল যাতে প্রদেশ ১৯১২ সালের পর ঘাটতি আয়-ব্যয়ক করতে পারবে, যদি সেই প্রদেশ ভারত সরকারকে বোঝাতে পারে যে, কারণটি একটি ব্যতিক্রমী কারণ এবং অনাবর্তক।[২] কিন্তু সেই সঙ্গে এই শর্তও আরোপিত হয়েছিল যে যদি ঘাটতি পূরণের জন্য উদ্বর্তগুলি থেকে এইভাবে টাকা তুলে নেওয়ার ফলে উদ্বর্ত যদি নিধারিত ন্যূনতমের চেয়ে কম হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে ঘাটতি আয় ব্যয়ক একমাত্র তখনই অনুমোদিত হতে পারবে যদি ভারত সরকার বিবেচ্য প্রাদেশিক সরকারকে সেই পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ তোলার অনুমতি দিতে সক্ষম হবে যা প্রয়োজন হবে সাধারণ উদ্বর্তগুলির তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উদ্বর্তকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে যা ফেরৎ দিতে হবে সেই সুদের হারে ও কিস্তিতে যা যে ভাবে নির্ধারিত হবে সেই ভাবে।[৩]

৩। বৎসরটি চলাকালীন ভারত সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদনের পর হিসাবের যে কোনও খাতে ঐ বৎসরের জন্য বরাদ্দের অতিরিক্ত হতে পারবে না।

প্রাদেশিক সরকার ব্যয় বাড়াতে পারে যদি ঐ বৃদ্ধি পুনঃ উপযোজনের দ্বারা সমভার করা যায় তবেই। অর্থাৎ অনুমোদিত অনুদানের অতিরিক্তের সমপরিমাণ অর্থ তার নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোনও হিসাবের খাত থেকে কমানো যায়।[৪] প্রাদেশিক সরকারগুলির পুনঃ-উপযোজনের ক্ষমতাগুলি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ তারা তাদের আয়-ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত প্রাদেশিক ব্যয়ের জন্য অনুদানগুলির মধ্যে পুনঃউপযোজন মঞ্জুর করতে পারত তা সেটা সামগ্রিকভাবে প্রাদেশিক বা বিভাজিত প্রধান, বা অপ্রধান খাতের অধীনে হোক না কেন এই শর্তে যে তা যেন প্রাদেশিক ব্যয়ের মোট অনুদানকে ছাড়িয়ে না যায়।[৫]

(৫) আয়-ব্যয় পরীক্ষা ও হিসাবের নিয়মাবলি

নিজেদের, আয়-ব্যয়কের মধ্যে পুনঃউপযোজনের পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদেশগুলিকে দেওয়া সত্ত্বেও তারা যে অর্থব্যয় করত তার আয়-ব্যয়ের পরীক্ষা ও হিসাব করানোর দায়িত্ব আরোপিত হয়েছিল তাদের উপর। এই প্রসঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ

---

১) ১৮৯২ সালের নিয়ম নং ৮

২) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ২১

৩) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ২১-২২

৪) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ২৪

৫) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ২৫; (১)

বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হল এই যে হিসাব রাখা এই বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও সেগুলিকে আয়-ব্যয় পরীক্ষার জন্য পেশ করাটা ছিল বাধ্যতামূলক কাজ যার জন্য প্রদেশগুলি তাদের বিধান মণ্ডলীগুলির কাছে বাধ্য থাকত না। কিন্তু সেটা ছিল এক উত্তর দায়িত্ব যার জন্য তারা বাধ্য থাকত ভারত সরকারের কাছে। উপরন্তু, ভারত সরকার প্রদেশগুলিকে তাদের নিজেদের ইচ্ছামত এই উত্তরদায়িত্ব পালন করার ভার ছেড়ে দিত না আয়-ব্যয় পরীক্ষা ও হিসাবরক্ষার জন্য নিজেদের কর্মচারী নিয়োগ করিয়ে। পক্ষান্তরে এই উত্তর দায়িত্ব বাস্তবায়িত করার ভারটি ন্যস্ত করা হত বিভিন্ন প্রদেশে মোতায়েন করা আয়-ব্যয় পরীক্ষা ও হিসাব যাচাই করার সরকারি আধিকারিকদের উপর। যারা উপরে আলোচিত বিধিনিয়মগুলির ব্যাখ্যা করা ও প্রশাসনের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার গুলির সমালোচনা করতেন এবং পথনির্দেশ দিতেন। এঁদের কাজকর্মে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—

১। সরকারি হিসাবের পদ্ধতির ফর্মে কোনও রকম পরিবর্তন না করতে [১] অথবা দুই বা তার অধিক হিসাবের খাতের মধ্যে প্রভাবের (Charge) বিভাজন করার নির্দেশ দিতে। ঐ ধরনের সব ব্যাপারে প্রদেশগুলি বাধ্য থাকত রাজকীয় সরকারের আধিকারিক কম্পট্রোলার জেনারেলের (মহা-নিয়ামক) সিদ্ধান্ত মেনে চলত।[২]

২। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ভারত সরকারকে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারের কৈফিয়ত সহ ব্যয় সম্পর্কিত উপযোজন বা অনুমোদনের বিরুদ্ধে রাজকীয় নিরীক্ষা আধিকারিকের আপত্তি জানিয়ে দিতে।[৩]

এই ধরনেরই সীমাবদ্ধতা ছিল প্রাদেশিক সরকারগুলির বিত্তীয় ক্ষমতা। এই সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতাগুলি ছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের জন্য বরাদ্দ করা ক্ষেত্রের মধ্যে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলার নিয়ন্ত হবার স্বাধীনতা ছিল না; কারণ এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে যে-কোনও বিভাগে তদারক ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তখনও ন্যস্ত ছিল সপরিষদ বড় লাটের, এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির কর্তব্য ছিল বড়লাটকে তাদের কার্যনির্বাহী ও বিত্তীয় গৃহীত ব্যবস্থা গুলি সম্বন্ধে

---

১) ১৮৯৭ সালের নিয়ম নং ১(ক), পরবর্তী প্রস্তাবগুলিতেও সন্নিবেশিত।

২) ১৮৯৭ সালের নিয়ম নং ৪(২)।

৩) ১৯১২ সালের নিয়ম নং ৩০ এবং ৩১।

বিস্তারিত ভাবে জানান যাতে সপরিষদ বড়লাট সমর্থ হয় শান্তি, শৃঙ্খলা ও সৎসরকারের জন্য তার দায়িত্ব পালন করতে।[১] প্রদেশগুলির বিত্তীয় স্বাধীনতার উপর এগুলির সাধারণ প্রভাব আদৌ চেপে রাখা যেত কিনা সন্দেহ। এইসব কর্মশক্তি ক্ষুণ্ণ করা সীমাবদ্ধতার বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রাদেশিক বিত্তের স্বাধীনতার বিশ্বাস হারান নি, যিনি তিনি অবশ্যই ছিলেন এক লৌহমনা সুবিবেচক এবং এই মোহময় প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাগুলি আসলে কি সে প্রশ্নও করেন নি?

---

১) ১৮৭৭ সালের নিয়ম নং ৫; ১৮৯৭ সালের নিয়ম নং ১৫; এবং ১৯১২ সালের নিয়ম নং ৬ এবং ৭।

অধ্যায়-৮

প্রাদেশিক বিত্তের স্বরূপ

প্রাদেশিক বিত্ত সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণকে সম্পূর্ণ বলা চলবে না যদি না তা শেষ পর্যন্ত যে প্রশ্নটির উদ্ভব হবেই, অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে পুরনো পরিকল্পের (Scheme) অধীনে পরিণামী বিত্তীয় সম্পর্কটি কেমন ছিল তার সঠিক উত্তর দিতে পারে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রাদেশিক বিত্ত বা সে সম্পর্কিত যে কোনও বিষয় সম্বন্ধে সমালোচনা ও প্রস্তাবগুলির বৈধতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের সঠিক জ্ঞানের উপর। দুভার্গ্যবশত এর গুরুত্ব যে মনোযোগ দাবি করে তা দেওয়া হয় নি এবং তার ফলে আমরা যথেষ্ট দুঃখজনক ঘটনাটি দেখতে পাই যে, অন্য কোনও বিষয় এত আস্থা সহকারে আলোচিত না হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ ভারতে প্রদেশিক বিত্তের পুরানো পদ্ধতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের মত অন্য কোনও বিষয়কে তত স্থূলভাবে ভুল বোঝা হয় নি। অত এব এটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ ভারতে প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক বিত্তের পদ্ধতির সঠিক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যটি কেমন ছিল।

পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, যেমন ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি যে ভাবে গঠিত ছিল। সে ক্ষেত্রে তাদের বিত্তীয় সম্পর্কের সঠিক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবন করা সব সময়েই বেশ কঠিন কাজ; কারণ উপর থেকে যা দেখা যায় তা অত্যন্ত ভিন্নতর হতে পারে প্রকৃত পক্ষে তা যা হবে তার তুলনায়। তৎসত্ত্বেও, এই অভিমতই সকলে পোষণ করত যে, ভারতীয় পদ্ধতিটি গড়ে উঠেছিল প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলির মধ্যে বিদ্যমান উৎসগুলির পৃথগীকরণের। এবং প্রথমোক্তের পক্ষ থেকে শেষোক্তকে উৎপাদ থেকে অংশ প্রদান করার ভিত্তিতে, যার সঙ্গে প্রচুর মিল আছে জার্মান সাম্রাজ্যে প্রচলিত বিত্তের যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেমনটি দেখা যেত। এই ধরনের অভিমত ঠিক বা ভুল যাই হোক না কেন ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে সম্পর্কের নানাবিধ ঘটনা ছিল আর এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ঐ ধরনের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল ঐ অভিমতটিকেই পরিপোষণ করতে। ঐ ধরনের ঘটনাবলির মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে কেন্দ্রীয় ও প্রদেশিক সরকার গুলির মধ্যে কাজকর্মের বিভাজন। একজন

দর্শকের দৃষ্টি এটা এড়াত না যে, কাজকর্মের এই অবস্থা যে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করত সামরিক বিষয়, পররাষ্ট্র বিষয়। সাধারণ করাবোপন। মুদ্রা, ঋণ, শুল্ক, ডাক ও তার বিভাগ। রেলপথ ও আয় ব্যয় পরীক্ষা এবং হিসাব সংক্রান্ত বিষয়গুলি; যখন কি শেষোক্ত অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারগুলি পরিচালনা করত সাধারণ অভ্যন্তরীণ প্রশাসন। যেমন পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, জনসেচ, পথ ও ভবন, বন সংক্রান্ত বিষয়গুলি এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির উপরও নিয়ন্ত্রণ থাকত তাদের। এই ঘটনা যদি উক্ত অভিমতটিকে প্রোৎসাহিত করে থাকে যে কৃত্যকগুলির মধ্যে পৃথগীকরণ করা হয়েছিল তবে সম্পর্ক সম্বন্ধে অপর একটি ঘটনা ছিল যা এই অভিমতটিকে প্রোৎসাহিত করেছিল যে, ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার গুলির মধ্যেও রাজস্বের পৃথগীকরণ হয়েছিল। ঐ ঘটনাটি ছিল এই যে ভারতে অধিকাংশ কর সংগৃহীত হত প্রাদেশিক সরকারগুলির নিযুক্তকস্থানের (Agency) মাধ্যমে। ভারতীয় ব্যয়ের রাজকীয় তদন্ত কমিশনের মন্তব্য অনুসারে:[১]

'যুক্ত রাজ্যে রাজস্ব-প্রশাসন কেন্দ্রীভূত থাকে .... লণ্ডনস্থিত গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান অর্থমন্ত্রীর অধীনে। ভারতে রাজস্বের কয়েকটি শাখার প্রশাসন কেন্দ্রীভূত। যদিও তা সবসময়ে (ভারত সরকারের) বিত্ত মন্ত্রীর অধীনে থাকে না। অন্য শাখাগুলির নিয়ন্ত্রণ বিকেন্দ্রীভূত। ভূমি রাজস্ব কলিকাতায় কেন্দ্রীয় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু বিভাগটি বিত্ত মন্ত্রীর অধীনস্থ ছিল না। ছিল স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অধীনে। তার বিভাগ ছিল বাস্তুকর্ম বিভাগের মন্ত্রীর অধীনে। কেন্দ্রীয় সরকার লবণ করের অংশ বিশেষ, আফিম রাজস্বের অংশ বিশেষ, ডাকবিভাগের রাজস্ব ও অন্যান্য রাজস্বের আদায় নিয়ন্ত্রণ করত... রাজস্বের অবশিষ্ট ভাগগুলি আদায় করত প্রাদেশিক সরকার .... রাজস্বের এক বড় অংশের ... ব্যাপারে ... প্রাদেশিক সরকারগুলি ছিল প্রশাসনের একক-মাত্রা এবং তাদের কর্তব্যপালনের ব্যাপারে পরিপূর্ণ ভাবে দক্ষ ছিল।

ঐ একই অভিমত সমর্থনকারী তৃতীয় ঘটনা হিসাবে ইংল্যান্ডের সরকারি ব্যবস্থাপক সভার বিবরণী পুস্তকে (Blue Book) গৃহীত ভারতের হিসাবগণনা উপস্থাপিত করার বিচিত্র পদ্ধতির কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে, ভারত সরকারের সাধারণ হিসাব গণনার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল একটি অতিরিক্ত হিসাব যা থেকে দেখানো যায় যে কী ভাবে আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন খাতগুলি বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। ব্রিটিশ ভারত যে প্রদেশগুলিতে তখন বিভক্ত ছিল। হিসাব গণনার

১) চূড়ান্ত প্রতিবেদন, অনুচ্ছেদ ২৫।

প্রকাশ করার এই প্রণালীটি নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিকর। মনে হয় যে উদ্দেশ্য ছিল শুধু যেন প্রদেশগুলির আর্থিক অবস্থা দেখনো। কিন্তু কার্যত প্রাদেশিক অবণ্টনে প্রদর্শিত রাজস্ব ও ব্যয় সন্নিবেশিত জমা-খরচের খাতে যে সংখ্যাতত্ত্ব প্রদত্ত হত তা কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশগুলির নিজ নিজ দাবি ও দায়িত্বকে যথাযথভাবে তুলে ধরত না। প্রদেশগুলির আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করা দূরের কথা, জমা খরচের খাতে উল্লেখিত সংখ্যা তত্ত্বগুলি কেবল মাত্র বিভিন্ন নিযুক্তক স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানকে দেখায়। যে নিযুক্তক স্থানগুলির মাধ্যমে ভারত সরকারের বিত্তীয় কাজ-কারবার পরিচালিত হত, এবং যেগুলির মাধ্যমে রাজস্ব সংগৃহীত ও ব্যয় নির্বাহ করা হত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'বোম্বাই' শীর্ষনামের নিচে যে সব রাজস্ব ও ব্যয় উল্লিখিত হত সেগুলি বুঝাত আয় ও খরচপত্রকে, যা বোম্বাইয়ে স্থিত ভারত সরকারের মহাগাণনিকের (Accountant General) হিসাবের বহিখাতার মাধ্যমে অনুমোদিত হত। এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার গুলির খাতের নিচে যে সব সংখ্যাতত্ত্ব লিপিবদ্ধ থাকত সেগুলি সম্বন্ধেও একথা সত্য। সংখ্যাতত্ত্বগুলি প্রকৃত অর্থেই ভৌগোলিকভাবে ছড়িয়ে থাকা ভারত সরকারের লেনদেনের নিদর্শ স্বরূপ, এবং এ ব্যাপারে সেগুলি আদৌ প্রদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত নয়। যাই হোক। হিসাব গণনার এই ধরনের পদ্ধতি এই ধারণা জন্মাতে সাহায্য করে যে, ভারতে বিত্ত বিষয়ক পদ্ধতিটি মুখ্যত ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয়।

চিন্তাক্ষেত্রে এই তিনটি ঘটনাকে সামনে রেখে ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বিত্তীয় সম্পর্ক সম্বন্ধে যুক্তি খাড়া করতে গেলে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় লাইনে চিন্তা করার পথে সহজেই চলে আসতে হয়।

উৎপাদ থেকে উৎস ও বরাদ্দ দান করার বিষয়টির পৃথকীকরণ করা যে ভারতীয় পদ্ধতির একটি অঙ্গ ছিল এই অভিমতটি এতই গভীর বিশ্বাসের অনুবর্তী ছিল যে, ভারতে ব্যয় সম্পর্কিত (১৮৯২) এবং ব্রিটিশ ভারতে বিকেন্দ্রীকরণ (১৯০৯) সম্পর্কিত রয়্যাল কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বহু সাক্ষী তীব্র ভাষায় কমিশনারদের আক্রমণ করেছিলেন পদ্ধতিটির অন্যায্যতা ও তার সংশোধনের জন্য প্রস্তাবগুলি যা সাক্ষীদের মতে ন্যায় বিচারের জন্য প্রয়োজন ছিল সে সম্বন্ধে সমালোচনা করে। সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁরা কোথাও তাঁদের অনুমান করে নেওয়ার কারণগুলির কথা উল্লেখ করেন নি।[১] যদিও তাঁদের প্রস্তাবগুলি তাঁরা যে অভিমত পোষণ করতেন তার সন্দেহাতীত প্রমাণস্বরূপ ছিল। এ কথা যদি তাঁরা ধরে না নিতেন যে প্রদেশগুলি পৃথক রাজস্ব ও পৃথক কৃত্যক ছিল, তবে এটা তাঁদের কাছ থেকে আশা করা যেত

১) তুলনীয় ভারতের ব্যয় সম্পর্কিত কমিশনের সাক্ষ্যের কার্যবৃত্ত, খণ্ড-৩, প্র:১৮০৯৪ এবং বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনের সাক্ষ্য, খণ্ড-২, প্র: ৯৪৯৭

না যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তার জন্য বিভিন্ন প্রদেশগুলি তাদের রাজস্ব থেকে যে অসম বন্টন করত তার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠা অন্যায়ের প্রতিরূপ হিসাবে যা প্রতিপন্ন হয়েছিল তার প্রতিবিধান করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে তাহলে নিজেদের কর্মশক্তির অযথা অপব্যবহার করতেন না।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বিত্তীয় সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত যদি গ্রহণ যোগ্য হত, তবে তাঁদের সমালোচনা ও তাদের প্রস্তাবগুলির অনুকূলে অনেক কিছু মেনে নেওয়া হত না। বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে করপ্রদান, যদি অবশ্য একে রাজকীয় অংশ হিসাবেই ধরে নেওয়ার কথা চিন্তা করা হয়। তাদের রাজস্ব বা জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারেই যদি হয়ে থাকে তবে তা প্রদেশের মধ্যে আদায় করা সব রাজস্ব প্রদেশেরই থাকে এই সাধারণ ভাবে কিছুটা আপত্তি জনক হলেও স্বীকৃত অনুমিত প্রকল্পের ভিত্তিতে গণনা করলে অসম হিসাবেই দেখা যাবে।

অনুরূপভাবে, (১) নির্দিষ্ট অংকের অর্থ যা কয়েক বৎসর পর পর সংশোধনযোগ্য, অথবা (২) প্রাদেশিক রাজস্বের থেকে অনুপাত, বা (৩) নিজেদের জনসংখ্যা, রাজস্ব অথবা সম্পদের ভিত্তিতে প্রদেশগুলি থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে এমন কর প্রদানগুলির আকারে প্রদেশগুলি কর্তৃক অর্থ সাহায্য করে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুকূলে পরিপূরক হিসাবে রাজস্বের বিভাজিত খাত পদ্ধতিকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক খাতে পরিবর্তিত করার প্রস্তাবগুলির[১] তুলনামূলক গুণাবলি সম্বন্ধ যাই বলা হোক না কেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, সেগুলির একটাই লক্ষ্য ছিল এবং তা হল এই যে, অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা বা অর্থপ্রদান করার সক্ষমতা হিসাবে রাজকীয় রাজস্ব দপ্তরের উপর যে বোঝা থাকে তা বন্টন করার কোনও একটা সুস্পষ্ট সূত্রে পৌঁছানো। প্রাদেশিক বিত্তের প্রকৃত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যটিকে যে খুঁটিয়ে দেখার জন্য চেষ্টা করে নি তার কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না যে, সে এই প্রস্তাবগুলিকে ততটাই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে যতটা গুরুত্ব দিয়ে সেগুলি উপস্থাপিত করেছিল তাদের রচয়িতারা। খুব বিচিত্র লাগলেও, দুটি কমিশনের বোর্ডই এগুলির উপযুক্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে নি। খুব জোর দিয়ে না করলেও বিকেন্দ্রীকরণের রয়্যাল কমিশন এটা সুস্পষ্ট করে বলেছিল যে, সমান হারে কর-প্রদান সব সময়েই যে ন্যায় সঙ্গত কর-প্রদান হবে তা নয়, কিন্তু এই কমিশন বা ভারতীয় ব্যয় বিষয়ক রয়্যাল কমিশন কেউই সেই বক্তব্যটি সম্বন্ধে আপত্তি জানায় নি, যাতে বলা হয়েছিল প্রদেশগুলি

---

১) দ্রষ্টব্য বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে রয়্যাল কমিশনের রিপোর্ট (অতঃপর সংক্ষেপে র. ক. বি. হিসাবে উল্লিখিত হবে)।

রাজকীয় সরকারকে প্রদত্ত প্রাদেশিক কর প্রদান

প্রদেশ	প্রদেশে আদায়ীকৃত মোট রাজস্বের সঙ্গে ভারত সরকারকে অর্পিত পরিমাণের অনুপাত					প্রদেশের জনসংখ্যার সঙ্গে ভারত সরকারকে অর্পিত মাথাপিছু পরিমাণের অনুপাত				
	১৮৭১-২	১৮৮২-৩	১৮৯২-৩	১৯০৪-৫	১৯১২-১৩	১৮৭১-২	১৮৮২-৩	১৮৯২-৩	১৯০৪-৫	১৯১২-১৩
ম: প্র:	.৬৫৫	.৪৬৪	.৬১৫	.২৯৭	.২০৪	.৯	.৬৯	১.৩	.৫৫	.৫৯
ব্রহ্মদেশ	.৭২৮	.৫৭৫	.৫৯৮	.৪৯৭	.৩৮	৩.৪	.৩৯	.৭	৪.৩৭	৩.০৮
অসম	...	.৪৩৮	.৩৯০	.৩৭৬	...	...	.৭৫	.৭৫	.৮৭	...
বঙ্গদেশ	.৯০৩	.৭৪৬	.৭৬১	.৭৪২	.৫৯৬	২.৪	১.৯৯	২.৯	২.২৯	২.৩৯
উ:প:প্র: এবং অযোধ্যা	.৭৮৫	.৬১৭	.৪৩৫	...	...	১.৫	১.২৪	১.৪	...	...
পঞ্জাব	.৭৬৮	.৬৪৮	.৭২৬	.৫১২	.৩৯১	১.৭	১.৫	১.৪	১.৫৭	১.৬৪
মাদ্রাজ	.৮২৮	.৬৬৪	.৬৬৭	.৬৩৮	.৪৭৯	২.৩	২.০	২.৩	২.৩৪	১.৭৯
বোম্বাই	.৮৪৫	.৬৪৮	.৬৬	.৬১৪	.৫৮	৫.০	৪.১	৫.৪	৪.৭৫	৫.৬
উ: প্র:	...	...	...	.৫৬৭	.৩৮১	...	...	...	১.৪৮	.৯৩
বিহার ও ওড়িশা	...	...	...	...	.২২০	...	...	...	...	.১৭

ভারত সরকারের বিত্ত এবং রাজস্ব হিসাব এবং দশলামা আদমসুমারির প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।

তাদের কৃত্যকগুলির জন্য প্রদেয় অর্থ দেওয়ার পর তাদের রাজস্বকে অর্পণ করবে রাজকীয় কোষাগারকে অর্থসাহায্য করার জন্য। উৎপাদ থেকে অর্থসাহায্য করা ও উৎসগুলির পৃথকীকরণের নীতির ভিত্তিতে ঐ পদ্ধতিটি গড়ে উঠেছিল এই যুক্ত যারা দেখায় তাদের সেই অভিমতকে সমর্থনকরার কারণগুলিকে কিছুটা পরিমাণে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অতএব আরও জরুরি হয়ে ওঠে। এ কথা ঠিক যে, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রদেশগুলির এমন রাজস্ব থাকবে যা তারা নিজের বলে দাবি করতে পারবে এবং তারা মুখ্যত যে ব্যাপারে দায়িত্বশীল সেটা দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করার মত কৃত্যকগুলি থাকবে ততক্ষণ কর-প্রদান সংক্রান্ত ন্যায্যতার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা আদৌ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

প্রদেশগুলি কখন তাদের রাজস্বও কৃত্যকগুলিকে নিজেদের বলে দাবি করতে পারবে তার বিচার করার মানদণ্ডটি কি? অবশ্য প্রশাসনিক মানদণ্ডটি তো আছে, যার সাহায্যে একথা বলা সম্ভব যে, যা-কিছু একটি প্রদেশ পরিচালনা করে তাইই প্রাদেশিক কিন্তু এই মানদণ্ডটি চূড়ান্ত মানদণ্ড হতে পারে না। কারণ, প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল উৎস সম্বন্ধে বা আদর্শ সংগঠনে তাদের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে অভিমত যাই হোক না কেন, আধুনিক কালে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আঞ্চলিক সকল অধিকার প্রধানত প্রযোজ্য হয়। কোনও সামাজিক পারস্পরিক শর্তের অধিকারে নয় বা নিছক কিছু কর্ম সম্পাদনেও নয়। বরং সাধারণ আইনের অধিকার। অতএব সমস্যাটির সমাধান করতে হবে আইনের পরিপ্রেক্ষিতে যা ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক সরকারগুলির অবস্থানগত মর্যাদার সংজ্ঞা নির্ধারিণ করেছিল।

রাজস্বের ব্যাপারে প্রদেশগুলির কোনও বৈধ স্বত্ব ছিল কি? যদিও যারা প্রাদেশিক রাজস্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রাদেশিক শব্দটিকে একটি বৈধ মর্যাদা দিয়েছিল কি দেয় নি এটা অনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, সাধারণ আলোচনায় শব্দটি ঐ ধরনেরই অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এমন কি প্রাদেশিক সরকারগুলি, যাদের অনেক বেশি ভাল জানা উচিত, তারাও মনে করত এবং যুক্তি দেখাত যে, রাজস্বের প্রাদেশিকীকরণ যা ভারত সরকার তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। তা শুধু উপস্বত্ব ভোগাধিকার নয়। বরং রাজস্বের উপর স্বত্বাধিকার। কিন্তু ভারত সরকার এই ধরনের মিথ্যা দাবির বিষয়টি চাপা দেবার জন্য সবসময়েই তৎপর থাকত। কিন্তু প্রকৃত তথ্যগুলি স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, প্রাদেশিক বন্দোবস্ত গুলি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সংশোধনযোগ্য ছিল; এবং উপস্বত্ব ভোগধিকার চিরস্থায়ী ছিল না

এবং চাইলে ভারত সরকার প্রতি পাঁচ বছরে শেষে তা আবার আরম্ভ করতে পারত। ১৮৮২ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখের পত্র সংখ্যা ২৮৪-তে বঙ্গদেশ সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত মিথ্যা দাবির উত্তরে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। যা থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে:—

'বিরোধ কমাবার জন্য ও অন্যান্য সুপরিচিত বিষয়ের জন্য যা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, রাজকীয় সরকার তার প্রশাসন ব্যবস্থার একটা অংশ অর্পণ করেছিল স্থানীয় সরকারগুলিকে। ঐ সরকার একটি মোটামুটি হিসাব করেছিল যে, সাধারণ আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ, তার বৃদ্ধি সমেত, পর্যাপ্ত হবে ব্যয়ভার বহন করতে যা তা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং বাকীটা তুলে দেয় স্থানীয় সরকারগুলির হাতে এই দায়িত্ব দিয়ে যে, তা থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটাতে হবে। কিন্তু তারা অনন্তকাল ধরে এই অনুপাতটি অবশ্য পালনীয় করে রাখতে পারে না। কারণ এই হিসাব-নিরুপণকে অবশ্যই মোটামুটি একটা হিসাব হতে হবে এবং তা অকার্য্যকর হয়ে উঠতে পারে সম্পদের অভাবিত ব্যর্থতা বা খরচের বৃদ্ধির ফলে। তা সেটা বিত্ত পরিচালনার অংশ হিসাবে যা তা ধরে রাখে অথবা যে ক্ষেত্রে তা প্রত্যভিযোজন (Delegate) করে। উপযোজনের পরীক্ষা করা এবং বিশেষ কোনও অর্থ-তহবিলের (Fund) প্রয়োজনীয়তার পুনর্বিন্যাসকরণ ছিল অপরিহার্য। এর কাছে কোনও অধিকারকে অর্পণ করা হয়ে উঠবে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যাপারে এর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের অনুরূপ।'

প্রদেশগুলির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেও সংশোধনগুলি মুখ্যত করা হয়েছিল রাজকীয় সরকারের স্বার্থে যা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হয় পুনরারম্ভের দ্বারা। এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলম্বিত করা হয়েছিল এই কারণে যে, ভারত সরকার তার রাজস্বের উপর তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল না। পঞ্চবার্ষিকী বন্দোবস্তের অধীনে উপস্বত্বের ভোগাধিকার কেবলমাত্র পাঁচ বছরের জন্য বাধা-বন্ধহীন থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যা এমন কি পাঁচ বছরের জন্য হলেও রাজ্যসচিব[১] কর্তৃক অযৌক্তিক বিবেচিত হওয়া এই আত্মসমর্পণ যে কতটা অসময়োচিত ছিল তা ভারতসরকার কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছিল। যা তার সহজাত অধিকারকে প্রয়োগ করার ব্যাপার থেকে গুটিয়ে নেয় নি নিজের পছন্দ মত যে কোনও সময়ে তার রাজস্বের উপস্বত্বের ভোগাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে যেমনটি নির্দেশিত আছে খুব একটা অপ্রচালিত নয় এমন উপগ্রহণ (Levy) অথবা বাধ্যতামূলক ঋণ, যে নামে তারা

১) তুলনীয়: ভারত সরকারের কাছে প্রেরিত সরকারি সংবাদ নং ৫১ ; তাং ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২, এবং নং ২০৮, তারিখ ৬ জুলাই ১৮৮২।

পরিচিত ছিল। তার দ্বারা, যা প্রাদেশিক স্থিতির উপর জোর করে চাপানো হয়েছিল। এমন কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেও এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না যার অর্থ হবে এই যে, বিভিন্ন প্রদেশগুলির উপর ধার্য রাজস্ব আইনগত অর্থে যে কোনও ভাবে তাদের রাজস্ব হয়ে উঠতে পারে। কারণ আইনের দৃষ্টিতে প্রাদেশিকীকরণ করা রাজস্ব সহ সকল রাজস্বই তখনও পর্যন্ত সংবিধানগত হিসাবে ভারত সরকারেরই অধিকারে ছিল। প্রদেশগুলির অনুকূলে ভারতের রাজস্বকে পরিবর্জন করে ভারত সরকারের পক্ষে এক বৈধ বিভাজন ফলপ্রদ করা সম্ভব ছিল কিনা তা সন্দেহের বিষয়। পার্লামেন্টের আইন যা ভারতের রাজস্বকে ভারত সরকারকে ভোগদখলের অধিকার দিয়েছিল তা ভারত সরকারের বিধানিক ক্ষমতাগুলিকে সীমিত করে দিয়েছিল এমন একটি প্রকরণের (Clause) দ্বারা যা ঐ সরকারকে বাঁধা দিত:

'এমন কোন আইন বা প্রবিধান তৈরি করতে যা যে-কোনো ভাবে এই (১৮৩৩ সালের) আইনের শর্তগুলির যে কোনওটিকে অথবা পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব বা সম্রাটের বিশেষ অধিকারকেও বাতিল, পরিবর্তন বিলম্বিত করণ বা প্রভাবিত করতে পারে।'

অন্তত এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে, এটা করার জন্য ভারত সরকারের প্রয়োজন ছিল পার্লামেন্ট অনুমোদিত আইন। কিন্তু রাজস্বের স্বত্ব সম্পর্কে কোনও বৈধ বিভাজন করে নি ভারত সরকার; এবং যদি নিজস্ব আইনের বলে তা করত তবে তা বাতিলও করতে পারত। আবার এ কথাও বলা যেতে পারে না যে, প্রাদেশিক বাজস্বের পৃথকীকরণের সঙ্গে জড়িত ছিল পৃথক অধিকার। যদি প্রাদেশিকীকরণ করা রাজস্ব থেকে সংগৃহীত অর্থ গ্রহণ করার জন্য তাদের নিজস্ব কোষাগার তৈরি কবার অধিকার প্রাদেশিক সরকার গুলিকে দেওয়া না হত, তবে পৃথক অধিকারের অর্থে প্রাদেশিক রাজস্বগুলির একটা মনে বোঝা যেত। কিন্তু বিধি-নিয়মাবলি অনুসারে প্রাদেশিক সরকারগুলি রাজকীয় সরকারের কোষাগার ছাড়া তাদের তহবিল অন্য কোথাও জমা রাখতে পারত না। পরিণামে রাজস্বের অধিকার ভারত সরকারেই হাতে থাকত এবং প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে অর্থ প্রদান করার কাজটি করা হত, রাজকীয় সরকারের আধিকারিক গণ কর্তৃক রাজকীয় কোষাগার থেকে। তৎসত্ত্বেও এই অভিমতটি সহজে নিশ্চিহ্ন হবার ছিলনা। কিন্তু এই ধরনের ভ্রান্ত অভিমত মাননীয় মি: সায়ানির (Sayani) আগে কেউ অত আস্থা সহকারে বলে নি এবং স্যার জেমস ওয়েস্টল্যান্ডের মত এত জোর দিয়ে তা খণ্ডনও কেউ করেন নি ভারত সরকারের পরিষদীয় হলে বাজেট বিতর্কের সময় ঐ দুজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের সময় যা হয়েছিল, তা থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃত দেওয়া হল:—

মাননীয় মিঃ সায়ানি বলেনঃ—

'(প্রাদেশিক বিত্তের) এই পদ্ধতির অধীনস্থ সমগ্র তত্ত্বটি এই যে, দেশের রাজস্ব যে প্রদেশগুলি তা আদায় করে বা তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রাপ্য হিসাবে রাখা হয়, তা তো হয়ই না বরং এক যৌথ তহবিল গড়ে তোলে যা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তাধীন থাকে, যা থেকে কি পরিমাণ অর্থ দান হিসাবে বিতরণ করা হবে প্রদেশের কৃত্যকগুলিকে তা নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুসারে।'

এইসব মন্তব্যের নিন্দাসূচক ঝাঁঝটি ধরতে পেরে বিত্ত মন্ত্রী স্যার জেমস ওয়েস্টল্যান্ড ভাষণ দিতে উঠে বলেনঃ—

'আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি তবে মনে হয় মাননীয় মিঃ সায়ানি বলেছেন যে, ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলি সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল যে রাজস্বগুলি পৃথক পৃথক প্রদেশের রাজস্ব নয়, এবং তা কয়েকটি প্রদেশের ব্যয়ের ব্যাপারে প্রযোজ্যও নয়। বরং তা হল যৌথ তহবিলের রাজস্ব এবং স্থানীয় সরকারগুলি শুধু তা আদায় করার ব্যাপারে ভারত সরকারের প্রতিনিধি মাত্র। আমার মনে হয় তত্ত্বটি সম্বন্ধে এই ধরনের কিছু শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল তত্ত্বটির নিছক নিন্দা করা। বেশ, আমি কিন্তু ঐ তত্ত্বটি সম্বন্ধে যতটা ইতিবাচক ভাবে সম্ভব ততটা জোর দিয়েই বলতে চাই—রাজস্বগুলি ভারত সরকারেরই রাজস্ব—তার সংবিধানগত অধিকার। ভারত সরকার পার্লামেন্টের আইন দ্বারা সৃষ্ট একটি সংস্থা। এবং পার্লামেন্টের ঐ আইনটির উল্লেখ যদি করা যায় তবে দেখা যাবে যে ভারতের রাজস্বগুলি ভারত সরকারের রাজস্ব, এবং শুধু ঐ সরকারেরই। ঐ রাজস্বগুলি সম্বন্ধে স্থানীয় সরকারগুলি কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি ব্যবস্থাকে ভারত সরকারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশের দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। স্থানীয় সরকারগুলি তাদের ক্ষমতাগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হয় ভারত সরকারের কাছে থেকে এবং ঐ সরকার ছাড়া তারা আর কোনও ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারে না।'[১]

আবার, ভারতে কেন্দ্রীয়, ও প্রাদেশিক সরকার গুলির মধ্যে বিত্ত বিষয়ক সম্পর্কটি যদি উৎসের পৃথকীকরণ ও উর্দ্বত থেকে দান করার নীতির ভিত্তিতে রচিত হয়ে থাকে। তবে যেটা অবশ্যই দেখান উচিত ছিল তা হল এই যে, যে পরিষেবাগুলির পরিচালন ভার তাদের হাতে ছিল সেগুলির বৈধ দায়িত্ব ভারও ছিল তাদের উপর। একথা সত্য যে, ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার গুলির মধ্যে স্বভাবিক কাজকর্মে একটা নির্দিষ্ট বিভাজন ছিল বেশির ভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক

---

১) বিত্তীয় বিবরণ, ১৮৯৭-৮, পৃঃ ১১০ ইত্যাদি।

সরকারগুলির মধ্যে যে-ধরনের কাজ কর্মের অস্তিত্ব ছিল তার অনুরূপ। অবশ্য এটা মনে রাখতেই হবে যে, স্বাভাবিক কাজকর্মের এই বিভাজনের কোনও আইনগত অনুমোদন ছিল না এবং যে-কোনও কৃত্যকের জন্য, এমনকি যেগুলির প্রাদেশিকীকরণ হয়েছিল সেগুলির ক্ষেত্রেও। প্রদেশগুলির উপর কোনও দায়িত্ব অর্পিত হয় নি। আইনগত ভাবে সমগ্র দায়িত্ব চাপানো হয়েছিল রাজকীয় সরকারের স্কন্ধে এবং যে-কোনও প্রদেশের হাতে সেই দায়িত্ব হস্তান্তর করে নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারত না। কিছু রাজকীয় কৃত্যকের আর্থিক দায়িত্ব প্রদেশগুলি যে স্বীকার করে নিয়েছিল সেটা ছিল তাদের নিজস্ব ইচ্ছাধীন ব্যাপার। ঐ দায়িত্ব নিতে যে তারা বাধ্য ছিল না তা একটি অনন্য ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যখন ১৮৭৭ সালে ঐ ধরনের দায়িত্ব নিতে মাদ্রাজ অস্বীকার করেছিল। আইনগত ভাবে এই ভাবেই ভারত সরকার দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং উপযুক্ত সরকারের জন্য দায়ী ছিল। অতএব সকল কৃত্যকই অপরিহার্যভাবে ছিল রাজকীয় পদমর্যাদার যা সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভারত সরকারকে নিতে হত।

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, যে-অভিমত তর্কের খাতিরে সত্য বলে মনে করত যে ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে সম্পর্কটি ছিল উৎসের পৃথকীকরণ এবং উদ্বর্ত দান করা সেই অভিমতটি সমর্থনযোগ্য নয়। বর্তমান কালে প্রায় প্রতিটি দেশের সরকার পরিচালিত হয় পারস্পরিক সম্বন্ধাবদ্ধ একগুচ্ছ রাজনীতিক সংগঠনের (Polity) দ্বারা যা কাজ করে নির্দিষ্ট এলাকার এবং নির্দিষ্ট সরকারি কাজকর্ম সম্পাদন করে; এবং এটাও হওয়া খুব স্বাভাবিক যে, যে কোনও দুটি নির্দিষ্ট দেশে প্রশাসনের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নিয়োজিত রাজনীতিক সংগঠনগুলির সংখ্যা এক ও অভিন্ন। কিন্তু তা থেকে এ যুক্তি দেখালে ভুল হবে যে, তাদের মধ্যে বর্তমান পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই এক ও অভিন্ন ছিল। অতএব এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সঙ্গত হবে যে ঐ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কে বিশিষ্ট রাজনীতিক সংগঠন গুলির মধ্যে নির্দেশিত সম্পর্কটি নির্ভর করে তারই উপর যেটি হত আইন-সৃষ্টিকারী রাজনীতিক সংগঠন। এটা মেনে নেওয়া হবে যে, ঐ ধরনের রাজনীতিক সংগঠন গুচ্ছের মধ্যে যেটি সেই অর্থে সর্বোচ্চ সেটি নানাবিধ কারণে; যেগুলি বেশির ভাগই ঐতিহাসিক, অন্যান্য রাজনীতিক সংগঠনগুলিকে আইগত নির্দেশ দিতে পারার অধিকার রাখে। সেগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে। সেগুলি মূল ও সেই সঙ্গে অবশিষ্ট সার্বভৌম ক্ষমতাগুলির ন্যাসরক্ষক। তারা তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব দাবি করতে পারে। নিজস্ব সম্পদ থাকে এবং নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই সম্পাদন করতে পারে। অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রাজ্যসরকারের আজ্ঞাবাহী

হয়ে থাকে। স্বেচ্ছায় অধিকার ত্যাগ করে রাজ্যগুলি যে-সব ক্ষমতা ও কাজকর্ম যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে হস্তান্তর করত সেগুলি ছাড়া তার আর অন্য কোনও অধিকার থাকত না। অতএব এটা সত্যনিষ্ঠ ও সেইসঙ্গে শোভনও হবে রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্ককে উৎসের পৃথকীকরণ ও উদ্বর্ত থেকে দান করার সম্পর্ক হিসাবে।[১] কারণ সে ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির পৃথক সম্পদ আছে, যেগুলির তারা বৈধ মালিক এবং তাই একথা বলা যায় যে তা নিজেদের কৃত্যকগুলির জন্য খরচ করার পর কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবার জন্য নিজেদের রাজস্বগুলিকে সমর্পণ করারবই সামিল। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারগুলির অবস্থা সম্পর্কে সে কথা অসঙ্গতিপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ হওয়া দূরের কথা, প্রাদেশিক সরকারগুলি ভারতে কর্মরত প্রশাসনিক রাজনীতিক সংগঠন গুচ্ছে সবচেয়ে দুর্বলতম সত্তা হয়ে থাকে। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত প্রদেশগুলি পৃথক অধিকার ছিল একটি একক তহবিল সমর্পণ করা এবং তখন যদি ভারতের শাসন ব্যবস্থা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হত তবে প্রদেশ গুলির অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশগুলির রাজ্যের মতই হত। কিন্তু ১৮৩৩ সালের আইনের বলে রাজকীয় পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার শেষ সুযোগ অন্তর্হিত হয়েছিল। ঐ আইনের বলে প্রদেশগুলির সার্বভৌমত্ব এমনই সামগ্রিক ভাবে দমন করা হয়েছিল যে, তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল না যাতে প্রদেশগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কের মধ্যে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদান অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে। ঐ আইন বলবৎ হবার পর থেকে এই দেশের প্রশাসনভার ন্যস্ত হয়েছিল এমন একটি একক কর্তৃপক্ষের হাতে যার উপর দেশে উপযুক্ত সরকার গঠনের পূর্ণ দায়িত্বের দায়বদ্ধতা ছিল। কেন্দ্রীয় দফতরের সাহায্যে ঐ ধরনের বিশাল দেশ পরিচালনা করার অতলান্তিক বোঝাকে কোনও একটি প্রশাসন একক ভাবে সমর্থন করতে পারে নি। তাই প্রাদেশিক সরকার গুলিকে বিশাল ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়টি প্রকৃত সত্যকে প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না যে, আক্ষরিক অর্থে প্রদেশগুলি ছিল 'ভারত সরকারের প্রতিনিধি'। প্রচলিত প্রয়োগ বিধির ফলে 'প্রাদেশিক' শব্দটি এক গৌরবময় অর্থে উন্নীত হয়েছিল। প্রাদেশিক রাজস্বের পাশাপাশি সাধারণ ভাবেই বলা হত প্রাদেশিক কৃত্যক, প্রাদেশিক জনপালন কৃত্যক পদাধিকারী, প্রাদেশিক আদালত ইত্যাদি। যেন এগুলি এবং অন্যান্য বিষয়গুলিও সংবিধানগত ভাবে প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব। কিন্তু প্রয়োগবিধিটি ছিল ব্যজস্তুতিপূর্ণ। কারণ, দেশের সাংবিধানিক বিধি-নিয়মগুলির শর্তাবলির কথা স্মরণ করলে, তাহলে দেখা যাবে যে সেগুলিকে সার্বভৌম শাসক-

১) অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি থাকতেই হবে তেমন কোনও প্রয়োজন নেই। বিকেন্দ্রীকরণের বৈধ পদ্ধতি উৎসের পৃথকীকরণ ও উদ্বর্ত থেকে দানের সঙ্গে সমভাবে সুসঙ্গত হবে।

মণ্ডলী মনে করা দূরের কথা। এই কথাই বলতে ইচ্ছে হবে যে, বড়লাট ও পরিষদের মত বাগাড়ম্বর পূর্ণ প্রশাসন যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে সরকার বলা উপযুক্ত হবে না। প্রাদেশিক সরকার গুলির আদৌ কোনও আইনগত ক্ষমতা অথবা ক্রিয়াকলাপ ছিল না। যা সরকার নামে অভিহিত রাজনীতিক সংগঠনগুলির থাকার কথা। বাস্তবে রাজনীতিক সংগঠনের ভারতীয় পদ্ধতিটি ছিল রাজনীতিক সংগঠনের যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এটা ছিল একটা কেন্দ্রীভূত পদ্ধতি যার মধ্যে প্রাদেশিক বলতে কিছুই ছিল না; যেগুলিকে প্রাদেশিক বলে মনে হত সেগুলি ছিল রাজকীয়তার আঞ্চলিক দিক। তাই ভারতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলির মধ্যে বিত্তীয় সম্পর্কটিকে উৎসের পৃথকীকরণ ও উদ্বর্ত থেকে দান করা বললে তা হবে অসত্য এবং অশোভন। কারণ এখানে প্রদেশগুলির পৃথক সম্পদ ছিল না। যেগুলি সম্বন্ধে তাদের বৈধ মালিকানা ছিল। এবং তাই যেগুলি তাদের নিজেদের কৃত্যক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে সেগুলির ব্যয় নির্বাহ করার পর কেন্দ্রীয় সরকারকে দান দেবার জন্য নিজেদের রাজস্ব সমর্পণ করা অবশ্যই বলা যেতে পারে না— যে ধারণাটি সংবিধানের আইনানুসারে অত্যন্ত কঠোর ভাবে নির্মূল করা হয়েছিল।

যদি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত সীমাবদ্ধতার জটিল সংহিতাটির ফলে প্রাদেশিক বিত্তের প্রকৃত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে থাকে। যা আশা করা অযৌক্তিক নয়। তবে ঐ ধরনের অভিমত যা এখানে সমালোচিত হয়েছে তা কখনও আধিপত্য বিস্তার করতে পারত না। এই সব সীমাবদ্ধতার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও এমন কিছু মানুষ থাকা উচিত যারা ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় প্রাদেশিক বিত্তের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে কিনা তা নিয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করার পরিবর্তে অনভিজ্ঞতার আত্মবিশ্বাস নিয়ে তর্ক করে যে, পদ্ধতিটি তার সংগঠনে স্বাধীনতা ভোগ করত— আর এটাই প্রমাণ করে যে, প্রাদেশিক বিত্ত সম্পর্কে তাদের গবেষণায় এর সীমাবদ্ধতার গবেষণার কোনও অংশ ছিল না। তা নাহলে ঐ সংহিতার উল্লেখ থেকে দেখা যেত যে, যদি প্রদেশগুলির পৃথক রাজস্ব ও পৃথক কৃত্যক থাকত তবে তাদের ইচ্ছামত রাজস্বের যে-কোনও অংশ হস্তান্তর করার, তাদের খুশি মত যে-কোনো কৃত্যক সম্বন্ধে খরচ করার, যে-কোনও বিশেষ নীতি তারা গ্রহণ করতে চায় তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বাজেটের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাবের খসড়া রচনা করার, এবং তাদের পছন্দ মত অতিরিক্ত অনুদানের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা থাকত। কিন্তু ঐ ধরনের ক্ষমতা তাদের আদৌ ছিল না। ১৮৭০ সালের পর সবকিছুই ছিল রাজকীয় মর্যাদার, যেমনটি ছিল ১৮৭০ সালের আগে, এই অভিমতটির সমর্থনে প্রাদেশিক বিত্তের কাজকর্ম সম্পর্কে এই সব সীমাবদ্ধতা যে প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করে তার চেয়ে বড়

প্রমাণ আর দেওয়া যেতে পারে না।

যদি ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিত্তীয় সম্পর্কের তত্ত্ব হিসাবে উৎসের পৃথকীকরণ ও উদ্বর্ত থেকে দানকে এই ঘটনার প্রকৃত তথ্যগুলির বিরুদ্ধ চরিত্রের হয় তবে এমন কি তত্ত্ব ছিল যাকে আইন কর্তৃক ব্যাখ্যাত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলা যেতে পারে? হয়ত সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলতে শুরু করতে পারি যে, প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আইনের সঙ্গে সহমত দুটি সরকারের মধ্যে বিত্তীয় সম্পর্কের একমাত্র তত্ত্ব হল **উৎসগুলির সমষ্টিকরণ ও উদ্বর্তের বণ্টনের তত্ত্ব।**

ভারত সরকার যখন প্রদেশগুলিকে রাজস্বের নিয়োগ এবং রাজস্বের অংশ প্রদান করেছিল তখন উৎসের সমষ্টিকরণের কথা বলা প্রবঞ্চণামূলক মনে হতে পারে। এর উত্তরটা কিন্তু কঠিন নয়। একথা আগেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে, প্রাদেশিক বিত্ত কিন্তু উৎসগুলির **আইনত** পৃথকীকরণের সঙ্গে জড়িত ছিল না। বা তার **বাস্তবিক** পৃথকীকরণও হয় নি। আগে যেমনটি মন্তব্য করা হয়েছে নিয়োগ করা বা সংরক্ষিত সকল প্রকারের রাজস্ব আদায় করা হত রাজকীয় কোষাগারে এবং তারপর সকল অনুমোদিত সরকারি লেনদেনের জন্য প্রদত্ত হত। সুস্পষ্টভাবেই যখন সকল রাজস্বই একটি সাধারণ তহবিলে জমা করা হত তখন এ কথা ভেবে নিতে আদৌ কষ্ট হত না যে, প্রদেশগুলিকে যা দেওয়া হত তা রাজস্ব ছাড়া আর কিছু না।[১] রাজস্বের সবকটি উৎস থেকে আদায়ীকৃত অর্থ অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়ে ফেলা হয় আর তাই একমাত্র সঠিক দৃষ্টিকোণের বিচারে বলতে হলে বলা উচিত যে প্রদেশগুলিকে যা দেওয়া হত তা হত অর্থ-তহবিল। নিয়োগের দ্বারা বাজেট, নিয়োগ করা বা অংশ ভাগ করে নেওয়া রাজস্বের দ্বারা বাজেট— এই ধরনের কথা এক অর্থে অলীক শব্দগুচ্ছ। প্রাদেশিক বিত্তের সকল স্তরে প্রদেশগুলিকে যা দেওয়া হত তা হল অর্থ-তহবিল। নিয়োগের স্তরে যে অর্থ দেওয়া হত তা ছিল এক নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ

---

১) ইংল্যান্ডে স্থানীয় করপ্রথা প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকারগুলিকে নিয়োগ করা রাজস্ব সম্বন্ধে রয়াল কমিশনের সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সংসদ-সদস্য ক্যাপ্টেন প্রেটিম্যান যে মন্তব্য করেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি সম্পূর্ণ ভাবে এই অভিমত পোষণ করি যে, আপনারা একটা নির্দিষ্ট উৎস থেকে রাজকীয় কর অর্থ প্রদান করেন এ কথা বলা অসম্ভব। একজন মানুষ এ কথা বলতে পারে যে, সে একটি পুকুরে এক বালতি জল ঢেলেছে এবং তারপর আবার গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে বলে যে, সে ঐ এক বালতি জলই তুলে নিয়েছে। করগুলি জমা পড়ে রাজকীয় রাজস্ব দফতরে এবং রাজকীয় রাজস্ব দফতর থেকেই আবার অর্থ প্রদান করা হয়। এবং যদি বলেন যে, আপনারা একটি নির্দিষ্ট অর্থ বেছে নিয়েছেন একটি নির্দিষ্ট কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে এবং সেটাই আবার হাতে করে তুলে দান করেছেন, তবে আমার মতে তা হবে সম্পূর্ণ প্রবঞ্চনামূলক কথা। সাক্ষ্যের লিখিত বিবরণের প্রথম খণ্ড ১৮৯৮ সালের সি ৮৭৬৩, প্রশ্ন ৯৮৭৩।

এবং নিয়োগের পরিবর্তে নিয়োগ করা বা অংশ ভাগ করে নেওয়া রাজস্বকে স্থান দেওয়ার ফলে যা হয়েছিল তা এই যে, জোগান দেওয়াটা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থের পরিবর্তে, হয়ে উঠেছিল এমন এক অর্থের পরিমাণ যা নিয়োগ করা বা অংশ ভাগ করে নেওয়া রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত উদ্বর্তের তারতম্যের সঙ্গে অর্থের পরিমাণ তারতম্য ঘটাত। কিন্তু যাই হোক না কেন এটা ছিল অর্থ তহবিলের জোগান এবং তা ছাড়া আর কিছু না। এমন কি এ কথা বললেও ভুল বলা হবে যে, ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সেই পরিমাণ অর্থ-তহবিল দিত যা দিয়ে সেই সব কৃত্যকের খরচ মেটানো হত যার দায়িত্বভার থাকত তাদেরই উপর। বস্তুত সব রকমের সরকারি অর্থ, প্রাদেশিক অংশ সহ, গৃহীত ও ব্যয়িত হওয়ার বিষয়টি থাকত ভারত সরকারের হাতে। প্রকৃত তথ্যকে সত্য বলে মেনে নিতে হলে এবং ভাষায় সঠিক ভাবে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হবে যে ভারত সরকার তার কোষাগারের হিসাব-পত্রের খাতায় প্রাদেশিক কৃত্যক হিসাবের খাতা খুলেছিল যা নিয়োগ করা বা অংশ ভাগ করে নেওয়া রাজস্বের উদ্বর্তের সঙ্গে ওঠা-নামা করত এবং যা থেকে এবং তার পরিমাণের ভিত্তিতেই শুধু প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্থ তুলে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হত।

এই ভাবেই ভারত সরকারের হাতে রাজস্বের উৎসগুলির সম্পূর্ণ সমষ্টিকরণ করা হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে এটা অনুমান করে নেওয়া যায় যে, প্রদেশগুলি তাদের অর্থ-তহবিল থেকে অর্থ প্রদানের পরিবর্তে ভারত সরকারই কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রদেশগুলির মধ্যে বন্টন করত। এই পরিস্থিতির অন্যথা ছিল না। কারণ একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৮৩৩ সালের আইনের বলে শান্তি, শৃঙ্খলা ও উপযুক্ত সরকারের উদ্দেশ্য পূরণার্থে যে-সব পরিষেবার দায়িত্ব নেওয়া হত তার জন্য বিত্তীয় দায়িত্বটি ন্যস্ত ছিল ভারত সরকারের উপর। রাশিয়া বাদে ইউরোপ মহাদেশের মত এক বিশাল দেশের কাজকর্ম একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে সরাসরি পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে বলে ভারত সরকার সরাসরি কয়েকটি কৃত্যকের প্রশাসন নিজের হাতে রাখলেও, রাজকীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত বহু প্রশাসন ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল প্রাদেশিক সরকারের তত্ত্বাবধানে। এই পরিস্থিতির দুর্বল বিষয়টি, যে কথা বলা হয়েছে, এই প্রকৃত অবস্থার মধ্যে প্রতীয়মান ছিল যে প্রশাসনিক ও বিত্তীয় দায়িত্ব এক ও অভিন্ন কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত ছিল না, যেটা অবশ্যই হওয়া উচিত ছিল। অপর দিকে প্রতিটি বিত্ত-বৎসরের শেষে প্রতিটি প্রাদেশিক সরকার ভারত সরকারের জন্য তারা যে সব কৃত্যক পরিচালনা করত তার খরচের এক হিসাব বিত্ত বিভাগ পাঠাত, এবং যে অর্থ সরবরাহের জন্য আবেদন করা হয়েছে তা

দিতে অস্বীকার করা, কাটছাঁট করা বা অনুমোদন করার দায়িত্বভার ভারত সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া হত যতটা ভালভাবে তা পালন করা যায় তা করার জন্য। অর্থ সংগ্রহ করার দায়িত্বভার না থাকায় প্রদেশগুলি মাত্রাধিক দাবি করতে চাইত। বিশদ ফিরিস্তি না পাওয়ার ফলে ভারত সরকার প্রতিটি কৃত্যকের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন করতে পারত না। প্রেরিত হিসাব সম্পর্কে অতিমাত্রায় কম বা মাত্রাধিক আস্থা রাখার ফলে নিজ দায়িত্ব ব্যর্থতার আশংকায় ভারত সরকারকে প্রায়ই প্রদেশগুলির অমিতব্যয়িতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে হতো, যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ১৮৫৯ সালের সংকটকালে। এই চরম দুর্দশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য প্রাদেশিক বিত্ত প্রথার প্রবর্তন করা হয়, যে প্রথানুসারে ভারত সরকার তার অর্থ প্রদেশগুলির মধ্যে বন্টন করে দিত, এবং তার পরিবর্তে প্রদেশগুলি অঙ্গীকার করত কিছু কিছু কৃত্যকের পরিচালন ভার গ্রহণ করতে, যা তারা পরিচালনা করত ভারত সরকারেরই অধীনে সেই অর্থে পরিমাণের সীমার মধ্যে যা তারা ঐ বন্টন মাধ্যমে আলাদা আলাদা ভাবে পেত।

আর্থিক সম্পর্কের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এই ধরনের হওয়ার ফলে অবিচারের ভিত্তিতে প্রাদেশিক বিত্ত প্রথার সমালোচনা করা সম্পূর্ণ ভাবে অপ্রযোজ্য ছিল। অর্থদান করতে হবে অবশ্যই সামর্থের ভিত্তিতে, কিন্তু বন্টন করতে হবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে এটাকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য। অবিচারের ভিত্তিতে যদি প্রাদেশিক বিত্ত পদ্ধতিকে যদি অভিযুক্ত করতে হয় তবে এটা দেখানো দরকার ছিল যে, বন্টনটি ন্যায় সঙ্গত হয় নি। এমন কি এ ক্ষেত্রে এটাও দেখানো যেতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অসম পরিমাণের অর্থ পেত যদি তাদের জনসংখ্যা বা তাদের ক্ষেত্রফলের দ্বারা বিচার-পরিমাপ করা হত। কিন্তু এ কথা স্মরণে রাখতেই হবে যে, ঐ বন্টন ব্যবস্থা কেবল মাত্র প্রদেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, নানাবিধ বিভাগের মধ্যেও ছিল। তা সেগুলি ভারত সরকার বা প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হোক্ না কেন। এটা বন্টন ব্যবস্থায় ন্যায়পরতার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পার্থক্য এনে দিতে পারত ; কারণ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংগঠনের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত এলাকাগুলির চাহিদাকে অতি অবশ্যই ভিন্নতর হতে হবে এবং অবশ্যই সেগুলিকে তাদের অধীনস্থ বিভাগগুলির চাহিদার সঙ্গে সহব্যাপী (Co-terminous) রূপে মেনে নেওয়া যাবে না। ভারত সরকার কর্তৃক অর্থের বন্টন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল প্রতিটি প্রদেশের চাহিদার নীতির ভিত্তিতে নয়। বরং প্রতিটি বিভাগের চাহিদার নীতির ভিত্তিতে। অতএব তাই অন্য কোনও নীতির ভিত্তিতে এই পদ্ধতির ন্যায্যতার সম্পর্কে সমালোচনা করা নিরর্থক।

এইভাবে ব্যাখ্যাত, প্রাদেশিক বিত্তের পদ্ধতিটি সেই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যটিকে অবশ্যই

ফুটিয়ে তুলবে যাকে বিভাগীয় বিত্ত বলা চলবে। এবং যা বিকেন্দ্রীয় করা বিত্ত বা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিত্ত থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এই ঘটনার প্রকৃত তথ্যের দ্বারা সমর্থিত সত্যকারের অভিমত থেকে এই অভিমতটি খুব বেশি ভুল হতে পারে না। বিভাগীয় বিত্তের ক্ষেত্রের মত রাজ্যের প্রতিটি বিভাগের জন্য বাজেটে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের অনুদান নির্ধারিত থাকত এবং তারপর বিভাগগুলি তাদের অনুদানের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোষাগার থেকে টাকা-পয়সা তুলত। একই প্রণালীতে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে তাদের পরিচালিত বিভাগগুলির জন্য কিছু সংগঠিত তহবিল দেওয়া হত এবং ঐ বিভাগগুলির ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের অনুদানের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজকীয় কোষাগার থেকে টাকা পয়সা তুলত। প্রাদেশিক বিত্ত থাকা সত্ত্বেও, মর্যাদায় কোনও কিছুই প্রাদেশিক ছিল না। ১৮৭০ সালের পর, যখন প্রাদেশিক বিত্ত অস্তিত্ব লাভ করে। তখন ১৮৭০ সালের আগের মতই রাজস্ব কৃত্যক, জন-পালন কৃত্যকগুলি সম্পূর্ণ ভাবেই মর্যাদায় ছিল রাজকীয়, ১৮৭০ সালের আগে প্রাদেশিক বিত্ত বলতে কিছুই ছিল না। অতএব এটা বলা অতিশায়োক্তি হবে না যে, প্রাদেশিক বিত্ত, কর আরোপ করার স্বাধীনতা ও ব্যয় করার স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত এক স্বাধীন বিত্ত পদ্ধতি হয়ে ওঠার পরিবর্তে হয়ে উঠেছিল কেবল মাত্র হিসাব-নিকাশের ব্যাপার। যার জমা ও খরচের দিকের কাজকর্মগুলি ছিল কঠোর ভাবে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

এর অর্থ এই যে, প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্পটির প্রবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির বিত্তীয় সম্পর্কের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসে নি। উৎসগুলির সমষ্টিকরণ ও উৎপাদের বন্টনের সম্পর্কটি আদৌ নতুন ছিল না। বরং তা বহু আগে থেকে অর্থাৎ ১৮৩৩ সালেই বর্তমান ছিল। এটা ছিল তৎকালে প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় পদ্ধতিরই একটি প্রতিরূপ মাত্র। এটা এই রকম এই জন্য হয়েছিল যে, প্রাদেশিক বিত্ত থাকা সত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকারগুলির সম্পর্কে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি, এবং পৃথক পৃথক ষড়যন্ত্র হয়ে ওঠার পরিবর্তে। যাদের নিজস্ব চালক-স্প্রিং ছিল, আগের মতই ভারত সরকারের বিভাগ হিসাবে সুস্থিত ছিল। এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা এক ধরনের চমকপ্রদ চারিত্র বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হিসাবে পরিগণিত হতে বাধ্য। অতএব ব্রিটিশ ভারতে প্রদত্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলির বৈধ সম্পর্কের এটাই যে সত্য হবে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এবং অন্য কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সম্ভব না। কিন্তু প্রাদেশিক বিত্ত যদি শুধু এক হিসাব-নিকাশের ব্যাপ্রার হত তবে কেন রাজকীয় পদ্ধতির বিত্তীয় ব্যবস্থাপনায় প্রাদেশিক বিত্তকে অনুসরণ করে কোনও পরিবর্তন আসে নি? এটা অস্বীকার করা নিরর্থক হবে

যে, প্রাদেশিক বিত্তের প্রকল্পের প্রবর্তনের জন্য রাজকীয় পদ্ধতির বিত্তীয় ব্যবস্থাপনায় কোনও পরিবর্তন এসেছিল, এবং একথা জোর দিয়ে বলাও সমভাবে নিরর্থক হবে যে, এর পরিণামে কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। সঠিক ভাবে বলতে গেলে বলতে হবে যে, প্রাদেশিক বিত্ত প্রবর্তনের ফলে উল্লেখযোগ্য মাত্র দুটি পরিবর্তন ঘটেছিল:—

(১) ১৮৭০ সালের আগে সকল কৃত্যকের উদ্বর্তগুলি বিত্ত বৎসরের শেষে ভারত সরকারে অতিপন্ন (Lapse) হত। ১৮৭০ সালের পর প্রাদেশিক সরকারগুলির পরিচালনাধীনে অর্পিত কৃত্যক গুলির খরচ না হওয়া সকল উদ্বর্ত তাদেরই আয়ত্তাধীনে থাকত এবং আগামী বৎসরের জন্য তাদের উৎসগুলির একটি অংশ স্বরূপ হয়ে থাকত।

(২) ১৮৭০ সালের আগে সকল কৃত্যকের বাজেট প্রাক্কলন ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল এবং ভারত সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, প্রয়োজন বোধ হলেও বৎসরের বিভিন্ন অনুদানগুলির মধ্যে কোনও রকমের পুন-উপযোজন (Re-appropriation) করতে পারত না। ১৮৭০ সালের পর প্রদেশগুলিকে রাজকীয় কোষাগারে তাদের নিজ নিজ নামে জমা রাখা অর্থের চেয়ে মোট ব্যয় যদি বেড়ে না যায় এই শর্তে যে সব বিভিন্ন কৃত্যকগুলির পরিচালনভার তাদের উপর ন্যস্ত ছিল সেগুলি সম্বন্ধে নিজেদের খরচ ভাগ করে দেওয়ার ব্যাপারে বহুলাংশে তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।[১] কিন্তু বিধিনিয়মানুসারে তারা বাধ্য ছিল তাদের পরিচালনাধীন সকল কৃত্যকগুলিকে প্রশাসনিক দক্ষতার অবস্থায় রাখা। অনুরূপ

---

১) তারা তাদের উপর অর্পিত বিভিন্ন কৃত্যক গুলির জন্য প্রদত্ত অনুদানের বন্টনের ব্যাপারে প্রকৃত অর্থে পরিবর্তন আনতে পারতো কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। সড়ক বিভাগের জন্য বরাদ্দ প্রাদেশিক অর্থ-তহবিল থেকে প্রদত্ত অনুদান দেওয়া বন্ধ করে এবং ঐ অর্থ শিক্ষাখাতে নিয়োগ করার জন্য মাদ্রাজের বড়লাট প্রয়াত লর্ড হোবার্টের এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাজস্ব বিভাগে পাঠান ১৮৭৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের ৩০ নং সরকারি সংবাদে যা লিখেছিলেন তার উত্তর মন্ত্রী লিখেছিলেন, 'আমি এই তথাকথিত রাজস্বের প্রাদেশিক প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণকারী নীতিগুলির সঙ্গে একে মেলাতে পারছি না। আমি অবশ্য এই অভিমত পোষণ করি না যে, এই প্রথাটি প্রবর্তিত হওয়ায় যে অভিন্ন আনুষঙ্গিক অনুপাত বিদ্যমান ছিল হস্তান্তরিত কৃত্যকগুলিও তাদের জন্য করা ব্যয়ের মধ্যে সেগুলিকে সব সময়ে বজায় রাখতে হবে। কিন্তু আমি মি: সিমের সঙ্গে একমত যে, এই সব বিভাগগুলিকে তাদের পূর্ণ দক্ষতায় ও পরিপূর্ণতায় রক্ষা করার অভিপ্রেত চুক্তি এবং তাদের একটিকেও অপরদের জন্য অথবা অন্য কারর জন্য সম্পূর্ণভাবে বর্জন না করার অভিপ্রেত ধারনা বর্তমান ছিল। বিবেচ্য নতুন বিত্তীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত বিশদে আলোচিত হয়েছিল তৎকালে গঠিত নানাবিধ ভারতীয় সরকারগুলি এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর উভয় কর্তৃক। এই আলোচনার সময় একথা আদৌ প্রস্তাবিত হয় নি যে, এই পরিবর্তনের প্রভাব ভারতের কোনও কোনও অংশে নতুন সড়ক নির্মাণের কাজ স্থগিত রাখতে হবে; এই ধরনের সম্ভাব্য ঘটনাকে যদি সম্ভব বলে বিবেচিত হত। তবে আমার সন্দেহ যে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটানো হত।'

ভাবে ১৮৭০ সালের পর প্রাদেশিক সরকার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিল, যা তারা আগে কখনও পায় নি ভারত সরকারের অনুমোদন ছাড়াই তাদের পরিচালনাধীন অনুদানগুলির মধ্যে পূর্ণ-অভিযোজন করার, অবশ্য এই শর্তে যে, তাদের মোট ব্যয় নির্দিষ্ট বৎসরের জন্য বাজেটে বরাদ্দ করার অর্থের পরিমাণ ছড়িয়ে না যায়।

প্রদেশগুলি এবং ভারত সরকারের মধ্যবিত্তীয় সম্পর্কটিকে দৃষ্টিগোচর করানোর জন্য হিন্দু যৌথ পরিবার পদ্ধতির সঙ্গে প্যাট্রিয়া পোটেস্টাস (গোষ্ঠীপতির আধিপত্য) উপর অর্পিত ক্ষমতার তুলনা করা হয়েছে। ১৮৭০ সালের আগে এই দুটির মধ্যে সাদৃশ্য কম-বেশি একই ধরনের ছিল। হিন্দুদের পারিবারিক সম্পত্তির মত ভারতের রাজস্ব সবকটি বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে উপভুক্ত হত, বিভাগগুলি কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক পরিচালনাধীনেই থাকুক না কেন সীমা-সরহদ্দ (metes and bounds) ব্যতিরেকেই তাদের যে-কোনওটির জন্য অংশ সুনির্ধারিত করে। ১৮৭০ সালের পর যে একমাত্র পরিবর্তন হয়েছিল তার মধ্যে ছিল পরস্পরের সাহচর্যে বাসকারীর দুই বৎসরের জন্য কর মকুব এবং তাদের নিজ নিজ চাহিদা অনুসারে সাধারণ সম্পত্তিতে প্রত্যেকের অংশের সীমা সরহদ্দ নির্দিষ্ট করে দেওয়া। পদ্ধতিটি যৌথ পারিবারিক পদ্ধতি হিসাবে থেকে যায়। যদিও পরিবারের কর্তা অর্থাৎ ভারত সরকার কর্তৃক পৃথক হিসাবের খাতা খোলা হয়েছিল যাতে কোনও সদস্য তার হিসাবে জমা রাখা টাকার পরিমাণের চেয়ে বেশি টাকা তুলে নিতে না পারে।

এই কঠোর ভাবে চেষ্টা করার এটাই কি প্রত্যাশিত ফলশ্রুতি? প্রাদেশিক বিত্তের ফলে যে-সব ফল পাওয়া গিয়েছিল সে সম্বন্ধে নানা অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি এর ফলশ্রুতির বিচার করতে যাই, যা আমাদের অবশ্যই করা উচিত ১৮৭০ সালে যে-সব পূর্ববর্তী ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল তার আলোকে তবে একথা বলা যাবে না যে, যে-সব আশার কথা কল্পনা করা হয়েছিল সেগুলি কোনও ভাবেই মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি। একমাত্র প্রাদেশিক বিত্তের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির কারণেই সমালোচকরা যখন সেই সব ফলশ্রুতির অনুসন্ধান করেছিল, যা এর উদ্যোক্তাদের আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। তখনই এই ধরনের বিরূপ মন্তব্য করা হয়। কিন্তু আমরা যদি এই ভুল বোঝাবুঝি অপসারণ করতে পারি এবং এই ঘটনা থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকি যে ১৮৭০ সালে প্রদেশগুলি চেয়েছিল স্বাধীনতা এবং ভারত সরকার চেয়েছিল স্থায়িত্ব। তবে একথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারবে না যে, সাম্রাজ্যবাদ ও যুক্তরাষ্ট্রবাদের মধ্যে এই আপস-মীমাংসা করার চেষ্টা নিষ্ফল হয় নি। প্রদেশগুলি কি পরিমাণ স্বাধীনতা পেয়েছিল তার সঠিক মূল্যায়ন হবে একমাত্র তখনই যখন এ কথা উপলব্ধি করা যাবে যে, ১৮৭০ সালের আগে বঙ্গদেশের বড়লাট।

'সরকারি কর্মচারীদের ভাতা সম্পর্কে কোনও রদ-বদল করতে পারতেন না... নতুন

বিদ্যালয় স্থাপন করতে বা দারোগার (প্রহরী) বেতন এক টাকাও বাড়াতে পারতেন না।'[১]

বা বোম্বাইয়ের বড়লাট ভারত পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে একটা তালা মেরামতিও[২] করতে পারতেন না। এবং এ থেকে প্রাপ্ত এক বড় মাপের স্থায়িত্বের গুরুত্ব পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত একথা মনে রাখা যাবে যে, ১৮৭০ সালের আগে ভারত সরকার ছিল ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমিরের মত অবস্থায়। সেই সব প্রদেশ, যাদের সম্পদ খুব একটা বেশি ছিল না, তাদের জনগণের জন্য একটা বিভাগের ময়লা ফেলার পাত্র থেকে শিক্ষার মত বিভিন্ন ব্যাপারে হতভম্ব করে দেওয়ার মত দাবি মেনে নেওয়া বা নাকচ করার মধ্যে। নিজেদের ন্যূনতম চাহিদাগুলির অনুমোদনের জন্য ভারত সরকারের উপর নির্ভর করার ফলে দেরি এবং অমর্যাদার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল প্রাদেশিক সরকারগুলি। অপর দিকে রাজকীয় সরকারও অব্যাহতি পেয়েছিল অত্যন্ত নগণ্য চাহিদাগুলিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার মত তালগোল পাকানো কাজ করার দায়িত্ব এবং তা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করা থেকে। আর সব সময়ে আশংকিত থাকা যে, বিপরীত কিছু করার ফলে অন্যায় করে ফেলার। প্রথাটি শুধু যে প্রদেশগুলিকে স্বাধীনতা এবং ভারত সরকারকে স্থায়িত্ব দিয়েছিল তা নয়। সেই সঙ্গে যা রাজকীয় পদ্ধতির সর্বনাশের কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল সেই দায়িত্বহীনতা ও অমিতাচারের পরিবর্তে উপস্থাপিত করেছিল মিতব্যয়িতা ও দায়িত্ব বোধকে কারণ প্রাদেশিক সরকারগুলির তহবিলের সীমা নির্ধারিত করার ফলে ভারত সরকার তার নিজের সীমারেখাও নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। একথা সত্য যে, এই ফলাফল গুলি প্রাদেশিক বিত্তের সমালোচকদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। এর অন্যান্য দিকেও অনেক কিছু আশা করা হয়েছিল, কিন্তু তা তবেই সম্ভব হত যদি প্রাদেশিক বিত্ত তার সংগঠনে স্বাধীন পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারত। যত দিন পর্যন্ত প্রাদেশিক বিত্ত রাজকীয় বিত্তের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বন্ধাবদ্ধ অংশ হয়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এ থেকে যে ফল পাওয়া গিয়েছিল তার থেকে বেশি কিছু দিতে পারত না। এবং এ থেকে যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল তা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

অতএব প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে; প্রাদেশিক বিত্তের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আসা সম্ভব না হলেও, নিজের দায়িত্বে সম্ভাব্য কর্মসম্পাদনে কোনওভাবে হস্তক্ষেপ না করে ভারত সরকার কর্তৃক এর উপর চাপিয়ে দেওয়া সীমাবদ্ধতা শিথিল করে এর কর্ম পরিধিকে বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হত না। সমস্যাটির ঐ দিকটি সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

---

১) ক্যালকাটা রিভিউ খণ্ড তিন, পৃ:১৬৯

২) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্ম সম্পর্কিত কমিটির প্রতিবেদন, ১৮৫২, খণ্ড ১০।

অধ্যায়-৯

প্রাদেশিক বিত্তের কর্মপরিধির সম্প্রসারণ

এটাকে অভিযোগের এক বিষয়বস্তু করে তুলে নেওয়া হত যে, প্রাদেশিক বিত্তের পদ্ধতিটি এই কারণে অন্যায্য যে, এর অধীনে ভারত সরকার বিত্তীয় বন্দোবস্তের প্রতিটি সংশোধনে প্রদেশগুলির পরিচালনার জন্য প্রদত্ত রাজস্বগুলির বৃদ্ধির ব্যাপারে যুদ্ধের জন্য খাজনা বসিয়েছিল হয় কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরের প্রয়োজন মেটাবার অছিলায় নিজস্ব লাভের জন্য বা দু:স্থের জীবনে শান্তির প্রলেপ দেবার অজুহাতে নিজেদের সম্পদগুলির উন্নতি বিধানে যত্নশীল না হওয়া, যা হয়েছিল নিশ্চেষ্টতার ফলে, সেই সব প্রদেশগুলির উপকারার্থে। প্রাদেশিক বিত্তের গোড়ার দিকের অধ্যায়ে এই ধরনের অভিযোগ যথেষ্ট সত্যতা ছিল। অর্থতহবিলের তত্ত্বাবিধায়ক হিসাবে ভারত সরকার প্রায়ই প্রদেশিকীকৃত কৃত্যকগুলির তুলনায় রাজকীয় কৃত্যকগুলি সম্পর্কিত বিচার-বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দিত। প্রাদেশিক বিত্তের গোড়ার দিকের অধ্যায়ে অর্থ তহবিল বন্টনে প্রচলিত ধারণাটি [১] প্রাদেশিক সরকারগুলি নিয়ন্ত্রিত ব্যয়ের খাতগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ভাবে খরচ করা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে চলেছে এমন বন্দোবস্তের অধীনে বরাদ্দ করা রাজস্বের পরিমাণের উপর ভিত্তি করা ছিল না। বরং ছিল নিজেদের প্রশাসন পরিচালনার্থে যে-সব ব্যয় প্রয়োজনীয় ছিল তা পূরণ করার জন্য সমর্থ যাতে হতে পারে তার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আরও কিছু বেশি সময়ের জন্য অধিকার অর্পণ করতে পারবে বন্দোবস্ত চলাকালীন তার সম্পদের উপর চাহিদার বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে এবং এর দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সমতা রাখা সাধারণ রাজস্বের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে। সে যুগের আর্থিক গুরুভার চাপের কারণে সমর্থন যোগ্য ভারত সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছিল আর্থিক অবস্থায় সহজ হয়ে ওঠার সঙ্গে, যার জন্য পরবর্তী কালে।

'গুরুতর প্রয়োজন ছাড়া প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলির মধ্যে রাজস্বের বন্টন করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের চাহিদা গুলির প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে নয়। বরং তা করা

---

১) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ৪৫৮, ২৮ জানুয়ারি ১৮৮১ সালের।

হত সেই খরচের প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে যা প্রতিটি প্রদেশ সঙ্গত কারণে করতে পারত তাদের পরিচালনাধীন কৃত্যকগুলির জন্য কৃত ব্যয়ের জন্য। একটি বন্দোবস্ত চুক্তিবদ্ধ করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল প্রদেশগুলির চাহিদার পরিমাণ জানার জন্য এবং সেগুলির ব্যয়ভার মেটাবার জন্য রাজস্ব বরাদ্দ করার জন্য; প্রদেশগুলির আয়ের অবশিষ্টাংশটিকেই শুধু পাঠানো হত রাজকীয় রাজস্ব দপ্তরে'।[২]

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার গুলির প্রতিযোগিতামূলক চাহিদাগুলির উপর পরিবর্তনশীল গুরুত্ব আরোপ করা সহ অর্থ-তহবিলের অন্যান্য বন্টনের ব্যাপারে অভিযোগ করা বন্ধ হয়েছিল। এবং যখন বন্দোবস্তগুলি স্থায়ী করার ঘোষণা করা হল তখন কোনও দুর্ভাগ্যজনক সংশোধনের আশংকা রইল না। অবশ্য অপর প্রধান আপত্তিটি থেকেই গিয়েছিল প্রাদেশিক বিত্ত পদ্ধতি সম্বন্ধে, যেমন, এর উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতা প্রাদেশিক সরকারকে নামিয়ে আনতে চেয়েছিল এক অস্তিত্বহীন সত্তা রূপে সেই সরকারকে বরাদ্দ করা ক্ষেত্রের মধ্যে তাদের কর্মতৎপরতার পরিধিকে সীমিত রেখে।

বলা হয়েছিল যে, এই শর্তের ভিত্তিতে যদি প্রাদেশিক বিত্তের পদ্ধতির সূত্রপাত করা হয়ে থাকে যার দ্বারা ভারত সরকার প্রদেশগুলিকে বলেছিল :

'আমরা তোমাদের যা দিতে সমর্থ হব, তোমরা তাই গ্রহণ কর, এবং অবশিষ্টাংশের জন্য কর আরোপ করার কিছু ক্ষমতা নাও এবং নিজেরাই তা আদায় কর কারণ কিছু বিষয় আছে যেগুলি রাজকীয় করারোপের তুলনায় আরও ভাল ভাবে সম্পাদিত হতে পারে স্থানীয় সরকার দ্বারা'।

এমন কোনও কারণ ছিল না যার ফলে প্রদেশগুলিকে কর আরোপ করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। আবার, যদি কিছু সম্পদ প্রদেশগুলির হাতে তুলে দেওয়া হত। তবে স্থানীয় উপযোগিতার উদ্দেশ্যগুলির উন্নতিসাধনে ঋণ গ্রহণ করার অনুমতি না দেওয়ার কোনও সঙ্গত কারণ থাকতে পারে কি? এই বিধিনিষেধের ব্যাপারটি বিশেষ ভাবে ক্ষতিকারক বলে গণ্য করা হয়েছিল; কারণ দেখানো হয়েছিল যে, ভারতের অত্যন্ত হীন অবস্থাপন্ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষও নিজনিজ অধিক্ষেত্রের উন্নতিসাধন করার জন্য ঋণ গ্রহণ করার অধিকার ভোগ করত। যখন কি প্রাদেশিক সরকারের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঐ ধরনের দায়িত্বভার বহন করার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয় নি। অবশ্যই এটাকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বাধা হিসাবে অনুভূত হয়েছিল।

২) বিত্ত বিভাগের প্রস্তাব নং ২৭, তারিখ ১৮ মে ১৯১২।

কারণ এই অবস্থায় এমন ঘটনা ঘটেছিল যে, একটি প্রাদেশিক সরকার ভারত সরকারের অধীনস্থ অন্য স্থানীয় সংস্থানগুলিকে প্রদত্ত ঋণের বদলে ভারত সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য পর্যাপ্ত বিশ্বাস যোগ্যতা বিশিষ্ট বলে গণ্য হত, সেই প্রাদেশিক সরকারের নিজের জন্য বিশ্বাসযোগ্যতাকে বন্ধক রাখার অধিকার ছিল না।

আবার নিজস্ব কর্মচারিবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলির ব্যয় ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করারই বা কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? যদি নির্দিষ্ট কৃত্যকগুলির প্রশাসন ভার প্রাদেশিক সরকার গুলির হাতে ন্যস্ত করা হয়ে থাকে। তবে কেন তাদের বিভাগ গুলির জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির সংশোধন অথবা পুরনো নিয়োগগুলিকে বাতিল করা বা নতুন নিয়োগ করার ব্যাপারে ক্ষমতা সীমিত করে রাখা হবে? যদি প্রাদেশিক বিত্ত পদ্ধতির অধীনে প্রদেশগুলি তাদের পরিচালনাধীন কৃত্যকগুলির জন্য দায়ী থাকে, তবে কেন ঐ সব কৃত্যকের কাজকর্ম পরিচালনা করার প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থাগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা তারা পাবে না?

এ ছাড়া, প্রশ্ন উঠেছিল, প্রাদেশিক বাজেটের প্রস্তুতি ও তা কার্যকর করার ব্যাপারে বাধা-নিষেধ আরোপ করারই বা কি যৌক্তিকতা ছিল? এককালে সমগ্র ভারতের জন্য রাজকীয় বাজেট গড়ে তুলত, যা তা থেকে প্রতিটি প্রদেশের জন্য পৃথক পৃথক বাজেট রচনা করা হয়েছিল। তবে কেন প্রদেশগুলিকে তাদের বাজেট ভারত সরকারের কাছে পেশ করার প্রয়োজন কেন থাকবে? নিছক তথ্য জানানোর ব্যাপার হিসাবে প্রয়োজনটা ছিল তুলনামূলক ভাবে অতি তুচ্ছ ধরনের। কিন্তু কেন ভারত সরকার তাদের প্রাক্কলনে রদ-বদল করার দাবি জানাল এবং তাদের নির্ধারিত অনুদানকে মেনে চলতে বাধ্য করল প্রাদেশিক সরকারগুলিকে? প্রাদেশিক বাজেটের এই ধরনের সমীক্ষা কি তবে প্রাদেশিক সরকার গুলির উপর একটি নীতি চাপিয়ে দেবার ছদ্ম আবরণ মাত্র? যদি তাই হয়, তবে প্রদেশগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া স্বাধীনতা ও উদ্যোগের সুযোগ সুবিধা ছিল কতটা যা ছিল প্রাদেশিক বিত্তের মূখ্য উদ্দেশ্য উন্নতিবিধান করার এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে তা সুনিশ্চিত করার? আবার, তবে কেন অনুপূরক অনুদানের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে ভারত সরকারের দ্বারস্থ হতে হত। যা তারা করতে বাধ্য হত যখন প্রাক্কলনের অতিরিক্ত প্রয়োজন পুনরুপযোজনের দ্বারাও মেটানো যেত না। এমন কি তখনও যখন তার জমার খাতে এমন পর্যন্ত উদ্বর্ত থাকত যা ঐ অতিরিক্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য হুন্ডি (Draft) কেটেও ন্যূনতম প্রয়োজনের চেয়ে তা হ্রাস পেত না?

প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপকারী এবং প্রাদেশিক বিত্তের সুযোগ-সুবিধাকে সংকুচিতকারী এইসব সীমাবদ্ধ তার প্রতিটির জন্য ভারত সরকার

অবশ্য পর্যাপ্ত অজুহাত প্রস্তুত রেখেছিল।[১] রাজস্ব সম্পর্কিত বিধি-নিষেধের ব্যাপারে ভারত সরকার দাবি জানিয়েছিল যে, ভারতের রাজস্বে তার সাংবিধানিক অধিকার আছে, যা ব্যয় করার ব্যাপারে তাকে মন্ত্রী ও পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকতে হয়। ঘটনাটা এই হওয়ার জন্যই এটাই সঙ্গত যে, ভারত সরকার চাইবে যে, প্রদেশগুলির জন্য নির্দিষ্ট করা উৎসগুলি হস্তান্তরিত করা উচিত নয় বা অনুমোদিত কৃত্যক বা অননুমত অনুদানের জন্য ব্যয় করা উচিত নয়। আবার, সব কৃত্যকগুলির জন্য দায়ী থাকার জন্য এটাই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি যে, ভারত সরকার নিজের অবস্থা দুর্বলতর হতে দিতে পারে না দেশের সম্পদগুলি পরিচালনা করার ব্যাপারে কর আরোপ করা বা ক্ষমতা যাঞ্ছা করার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। ভারতে কর আরোপ করার ক্ষেত্রটি মোটামুটি সীমাবদ্ধ হওয়ায় আশংকা করা হচ্ছিল যে প্রতিযোগী কর্তৃপক্ষের দ্বারা যথেচ্ছভাবে কর ধার্য করার ফলে রাজকীয় শুল্কের সঙ্গে সংযোজনের[২] ফলে হয় অসন্তোষ বা রাজকীয় করারোপণের ক্ষেত্রে ছাঁটাই এনে দিতে পারে। ভারত সরকারের জোরের সঙ্গে সমর্থন করে ছিল যে, ঋণ গ্রহণ করার ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করার বিষয়টি ছিল সারা ভারতের রাজস্বকে সর্বভারতীয় চাহিদার জন্য এবং বিধিবদ্ধ দায়বদ্ধতার স্বাভাবিক এক অনুসিদ্ধান্ত। নিজেদের চাহিদার জন্য প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক দেশের সব রাজস্ব বন্ধক রাখতে দিতে রাজি ছিল না ভারত সরকার। এছাড়া ভারত সরকারের আশংকা[৩] ছিল যে, ঋণ গ্রহণ করার এই স্বাধীনতা অনুমোদন করা হয় তবে।

আগে ভাগে রাজস্ব বন্ধক দেবার প্রলোভন অনুপযোগী ভাবে তীব্র হয়ে উঠতে পারে, এবং একটি প্রদেশের ভবিষ্যৎ প্রশাসন বঞ্চিত হতে পারে এই কারণে যে, পূর্বতন সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কিছু অতিব্যয় বহুল উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অনুৎপাদী প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে এগিয়ে গিয়েছিল।'

উপরন্তু কথিত আছে যে, ভারতে ঋণের বাজার দেশের করারোপের ক্ষমতার মতই সীমাবদ্ধ ছিল। অতএব—

'যদি একটি কূপের মধ্যে বহু বালতি ডোবানো হয় এবং অনাবৃষ্টির ফলে জলের

---

১) এই প্রসঙ্গে তুলনীয় বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত রয়্যাল কমিশনের সামনে প্রদত্ত মি: জে. এস. মেস্টনের সাক্ষ্য। সাক্ষ্যের নথিভুক্ত বিবরণ, খণ্ড ১০, প্রশ্ন - ৪৪৮০৭-৪৫৩১৬।

২) ১৮৭০ এবং ১৮৭৯ সালের মধ্যে স্থানীয় করারোপের ব্যাপারে প্রদেশগুলি অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত। তখন তারা সকলে করারোপের আগের থেকে অতিরিক্ত ভার চাপানোর পদ্ধতিটিকেই বেছে নিয়েছিল। যথা তাদের করের জন্য জমি।

৩) আর. লি. ডি. সাক্ষ্যের নথিভুক্ত বিবরণ, খণ্ড ১০। প্রশ্ন নং ৪৫৩১০।

সরবরাহ কমে যায়, তবে সুস্পষ্টতই কূপের প্রধান মালিক জল তুলে নেওয়ার ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিজের হাতেই তুলে নেবে।'[১] কর্মচারিবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপারে ব্যয় করার ক্ষমতার উপর আরোপিত নির্দিষ্ট বিধি নিষেধের সম্পর্কে ভারত সরকারের কৈফিয়ৎ ছিল এই যে, সমরূপতা এবং ব্যয়-সংকোচের স্বার্থে ঐ ধরনের বিধি-নিষেধের প্রয়োজন ছিল। এ কথা জোর দিয়ে বলা হয় যে, যদি প্রতিটি প্রদেশকে প্রশাসনের প্রকৃত কাজ কর্মের দেখাশোনা করা জনপালন কৃত্যকের বেতন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া হত তবে সম্ভবত এই পরিণামই হত যে সমান কাজের জন্য অসমান বেতন। এই ধরনের পরিণাম সরকারের কর্মচারিদের অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলতে পারত, যা হতে না দেওয়াটাই ছিল সৎ প্রশাসনের স্বার্থে বাঞ্ছনীয়। আবার প্রদেশগুলিকে যদি প্রতিষ্ঠানগুলির সংশোধনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হত তবে প্রদেশগুলির পৌনঃপুনিক ব্যয় যথেষ্ট বেড়ে যেতে পারত, যার দ্বারা প্রাদেশিক ও সেইসঙ্গে রাজকীয় বিত্তের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হতে পারত।[২] কারণ শেষ আশ্রয় হিসাবে প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রতিপালন করার দায়িত্ব ভারত সরকারের।

প্রাদেশিক বাজেটের প্রস্তুতি এবং তা কার্যে সম্পাদন করার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভারত সরকার অনুরোধ জানিয়েছিল যে এক অবাঞ্ছিত নীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ইচ্ছার ফলে কিন্তু সমীক্ষার দাবি জানান হয় নি বরং এটা অপরিহার্য ছিল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যতামূলক শর্তের জন্য যার দ্বারা প্রাদেশিক বাজেট ভারত সরকারের বাজেটের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে থাকত। সেই শর্তগুলি হল (১) প্রাদেশিক সরকারের আয় ও ব্যয়কে ভারত সরকারের বাজেটও বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের সঙ্গে নিগমবদ্ধ করা তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে; (২)রাজস্ব ও ব্যয়ের বিভাজিত খাতের পদ্ধতি, এবং (৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার গুলির লেন-দেনের জন্য এক যৌথ "উপায়-উপকরণের" সঙ্গে জড়িত সাধারণ কোষাগার। পারস্পরিক সম্পর্কের প্রথম বিষয় দুটির জন্য প্রয়োজন ছিল এই যে, প্রাদেশিক সরকারের বাজেটের হিসাব ভারত সরকার অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবে। এ কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে,[৩] ঐ ধরনের রদ-বদল ঘটানোর ক্ষমতাকে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় করে তোলা হয়েছিল নিজেদের ব্যয় সম্বন্ধে অতিরিক্ত হিসাব ধরা এবং নিজেদের রাজস্ব সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত কম হিসাব ধরার যে, বদ্ধমূল প্রবণতা ছিল স্থানীয় সরকারগুলির তার

---

১) ভারতের সংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কিত প্রতিবেদন। সি ডি ৯১০৯, ১৯১৮ সালের, অতঃপর যৌথ প্রতিবেদন বলে উল্লেখিত।

২) বিকেন্দ্রীকরণের রয়্যাল কমিশন, সাক্ষ্যের নথিভুক্ত বিবরণ, খণ্ড ১০। প্রশ্ন ৪৪৯৮১।

৩) বিকেন্দ্রীকরণের রয়্যাল কমিশন সাক্ষ্যের নথিভুক্ত বিবরণ। খণ্ড ১০, প্রশ্ন ৪৪৮৬৩।

দ্বারা। যে প্রাক্কলনের সঙ্গে প্রকৃত অবস্থার প্রচুর ব্যবধান থাকে তাকে বলা হয় ক্ষতিকর বিত্ত এবং তা কোষাগারের কাজ চালানোর ব্যাপারে অনেক বেশি উপায়-উপকরণের উপকরণও বটে। কিন্তু এই প্রবণতা না থাকলেও যৌথ হিসাব-নিকাশকে নির্ভুল রাখার জন্য প্রাদেশিক প্রাক্কলনের সমীক্ষা করা ভারত সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। নির্ভুল রাখার স্বার্থ ছাড়াও তাদের প্রাক্কলনগুলির সমীক্ষার দ্বারা ভারত সরকারকে এটা দেখতে হত যে, একটি প্রদেশ তার আর্থিক অবস্থার স্থায়িত্বকে দুর্বল করে তুলছে (১) তার বাজেটের ব্যয়ে সেই সব প্রকল্পগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেগুলি যথোচিত প্রশাসনিক অনুমোদন পায় নি বা বৎসরটি চলাকালীন খরচ করার জন্য যথা সময়ে ঐ ধরণের অনুমোদন নাও পেতে পারে; অথবা (২) ব্যয়ের বর্ধিত মাত্রাকে অঙ্গীভূত করে একটি প্রদেশ তার উদ্বর্তগুলিকে অযথা নিঃশেষিত করছে না। কেন ভারত সরকারের প্রয়োজন ছিল প্রাদেশিক প্রাক্কলনগুলির সমীক্ষা করা তার সবচেয়ে জোরদার কারণ ছিল এই বিষয়টির মধ্যে যে, হিসাবের কয়েকটি খাতে অংশীদারিত্ব থাকলেও, কেন্দ্রীয় বাজেটের চূড়ান্ত পরিণাম। তা সেটা উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি যাই হোক না কেন, তা নির্ভর করত প্রাক্কলনগুলির নির্ভুলতার উপর। একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, ভারত সরকার এই ভাবে প্রত্যক্ষরূপে আগ্রহী ছিল প্রাদেশিক বাজেট সম্বন্ধে, এবং তার বাজেট পদ্ধতিকে গুরুতর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে না দিয়ে সেগুলির সমীক্ষা করার অধিকার তাই ছাড়তে পারে নি। পারস্পরিক সম্পর্কের তৃতীয় কারণটির জন্য প্রয়োজন ছিল এই যে, প্রাদেশিক সরকারগুলির উচিত সেই অনুদানের মধ্যেই কাজকর্ম করা যা চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হবে ভারত সরকার কর্তৃক। যেহেতু নিজেদের জমার খাতে পর্যাপ্ত উদ্বর্ত আছে তাই প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অনুদানের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দিলে দেশের সমগ্র প্রশাসনের জন্য উপায় উপকরণ যোগানোর যে দায়িত্ব রাজকীয় সরকারের ছিল এর সঙ্গে তা অসঙ্গতিপূর্ণ[১] হয়ে উঠতে পারে। উল্লেখ করা হয়েছিল যে, প্রাদেশিক উদ্বর্ত পৃথক প্রাদেশিক সিন্দুকে রাখা পৃথক কোনও উদ্বর্ত নয়। এটা ছিল সাধারণ উদ্বর্তগুলিরই একটা অংশ যা ভারত সরকারের দৈনন্দিন পরিচালনার অধীনে ছিল। বাজেটে বিবেচিত হয় নি এমন চাহিদা যদি হঠাৎ করা হয় এই সব উদ্বর্ত থেকে, যেটা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে যদি প্রাদেশিক সরকার তাদের বাজেট অনুমোদিত অর্থের পরিমাণের চেয়ে বেশি চায়, সেক্ষেত্রে তা লেনদেনের উপায়-উপকরণকে বিঘ্নিত করবে এবং নগদ অর্থের পর্যাপ্ততার অভাব সৃষ্টি করে সরকারকে দেউলিয়া অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিতে পারে।

---

১) বিকেন্দ্রীকরণের রয়্যাল কমিশন। সাক্ষ্যের নথিভুক্ত বিবরণ, খণ্ড ১০। প্রশ্ন ৪৪৮৬৫।

প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর চাপানো এই সব প্রতিবন্ধকতার কৈফিয়ৎগুলি ছিল আপাত দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত কৈফিয়ৎ এবং সেগুলি নিষ্পত্তিমূলক হতে পারত যদি প্রশাসনের কেন্দ্রীভূত পদ্ধতিটি যার অনুকূলে সেগুলি সমর্থিত হয়েছিল তা উপযুক্ত সরকারের লক্ষ্যগুলিকে পূরণ করতে সক্ষম হত। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারগুলির[১] মত এ যুক্তি দেখানো অযৌক্তিক হবে না যে, বর্তমান প্রবণতাগুলি এগিয়ে চলেছে সেই ধরনের সরকারের তন্ত্রগুলির দিকে যা প্রশাসনিক ক্রমের (অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত জনগণের সেই অংশের যতটা কাছে সম্ভব) নীচের দিকে সর্বোচ্চ মাত্রায় ক্ষমতা অর্পণ করেছিল যা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে সুব্যবস্থিত করা যেতে পারে। ঐ ধরনের ক্ষমতাগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার যা অন্যভাবে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করা যায় না। আবার এটাও সমভাবে কেন্দ্রীভূত করা অযৌক্তিক হবে যে-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা সমরূপতা সুস্পষ্ট ভাবে অপরিহার্য বা কার্যত অসম্ভব নয়। কেন্দ্রীভূত করণের দ্বারা সমস্ত অগ্রগতি প্রতিহত হবার প্রবণতা দেখা দেয়, সমস্ত উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে; এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির দায়িত্ব বোধ প্রবল মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া কেন্দ্র শাসনাধীন করার সঙ্গে জড়িত থাকে এবং অবশ্যই জড়িত থাকা উচিত স্থিতিস্থাপকতার ব্যাপারে ঐকান্তিক ত্যাগ স্বীকার, কারণ প্রশাসনের একই শাখার আধডজন বিভিন্ন পন্থায় প্রয়োগ করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয়বিভাগের কাছে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ যোগ্য না হতে পারে। এবং ফলে যা বিভিন্ন সকল আদর্শ-রূপ গুলিকে একটিতে পরিণত করতে চাইবে। অধিকতর কেন্দ্র-শাসনাধীনকরণের বিষয়টির সঙ্গে বিরোধিতা হয় তার সঙ্গে যাকে দক্ষ সরকারের মৌলিক নীতি হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন, কার্যকর করার জন্য সম্পূর্ণভাবে যোগ্য কোনও কর্তৃপক্ষের সামনে যখন কোনও প্রশাসনিক বিষয় উপস্থিত হয়। তখন ঐ কর্তৃপক্ষের উচিত সেটাকে চূড়ান্তভাবে কার্যকর করা। এমন কি যখন সমপরিমাণে যোগ্য কোনও উচ্চতর কর্তৃপক্ষ থাকে যার কাছে ঐ বিষয়টি পাঠান যেতে পারে সেক্ষেত্রে সেটা বড়জোর হয়ে দাঁড়াবে সরকারি শাসনতন্ত্রের পরম্পরায় নিম্নতর পদমর্যাদার শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ব্যাপারে সাহায্য মাত্র, যার ফলে কেন্দ্রীয় বিভাগ কাজের ক্ষেত্রে ভিড় বাড়বে। ব্যাপক মাত্রায় সীমিত করে না রাখলে এই ভাবে কেন্দ্র শাসনাধীন-করণের বিষয়টি অবশ্যই ঠেলে দেবে অক্ষমতার দিকে। এটা সমশ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও অবশ্য ঘটতে পারে এবং সর্বোপরি ভারতের মত দেশে, যেখানে জাতি, ভাষা, ধর্ম, রীতি-নীতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশের চেয়েও বেশি বৈচিত্র দেখা

---

১) এই প্রসঙ্গে বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে বোম্বাই সরকারের অত্যন্ত মর্মভেদী স্মারকলিপিটি দ্রষ্টব্য, আর. সি. ডি. সাক্ষ্যের নথিভুক্ত বিবরণ, খণ্ড ৮, পরিশিষ্ট-২।

যায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে এমন একটা জায়গায় আসতেই হবে যেখানে উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নিম্নতর কর্তৃপক্ষের চেয়ে কম যোগ্য হতে হবে। কারণ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোনও ভাবেই স্থানীয় সবরকম অবস্থার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, সমগ্র ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে তার অধীনস্থ বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমান নানা বিচিত্র অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। অতএব প্রাদেশিক প্রশাসনের ব্যাপারে কাজকর্ম করার জন্য প্রাদেশিক সরকারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য[১] কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ছিল। যার সদস্যদের কিছুতেই উল্লেখযোগ্য ভাবে নিকৃষ্ট বলা যাবে না। এবং তাদের অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্যদের মত দক্ষতায় সমপরিমাণ হতে হবে। যখন কি জ্ঞানের বিচারে একটি সংস্থা হিসাবে অবশ্যই শ্রেষ্ঠতর হতে হবে।

এই সব যুক্তিজালের একটি মাত্র উত্তরই ভারত সরকার দিতে পারত এবং তা হল এই যে, নীতির জন্য নয়। প্রয়োজনের খাতিরে ভারত সরকার সব ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিল। এই প্রয়োজনের উদ্ভব হয়েছিল তার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য। আইন ভারত সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছিল সামরিক ও অসামরিক সরকারের তত্ত্বাবধান। নির্দেশদানও নিয়ন্ত্রণের এবং দেশের রাজস্ব ব্যাপারে পরিচালনা ও নির্দেশদানেরও। তাই প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পিত ক্ষমতাগুলির উপর ভারত সরকার তার নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে পারত না। অবশ্যই এই যুক্তির প্রবল তাৎপর্যটিকে অস্বীকার করা অসম্ভব। যতদিন পর্যন্ত ভারত সরকারের পার্লামেন্টের কাছে একমাত্র দায়িত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ হয়ে থাকবে। ততদিন পর্যন্ত এই মত পোষণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, দেশের প্রশাসন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে এক্ষ্ উচিত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হয়ে থাকা। তবে এ প্রশ্ন করাও সমভাবে যুক্তিপূর্ণ হবে যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে সৌহার্দের স্বার্থে এটা সম্ভব হত না কি প্রদেশগুলির আর্থিক ক্ষমতার উপর সেই ধরনের বিধি-নিষেধ শিথিল করা যা কেন্দ্রীয় সরকার

---

২) এই প্রসঙ্গে মিঃ এ. সি. লোগান (A.C. Logan)- এর অংশত-গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা কৌতূহল উদ্দীপক হতে পারে, যে প্রস্তাবে তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন যে, যদি কেন্দ্র শাসনাধীনকরণ কার্যকর করা না যায় তবে তার একটি বিকল্প পদ্ধতি হবে ভারত সরকারের সংবিধানকে এমন ভাবে নতুন করে গড়া যাতে বর্তমান বিভাগগুলির পরিবর্তে বিভিন্ন স্থানীয় অঞ্চলের বিভাগগুলিকে স্থাপন করা যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সচিব ও সদস্য থাকবে; অতএব এই ভাবে বোম্বাই সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঐ প্রদেশ থেকে নিযুক্ত সচিব ও সদস্য সহ একটি বোম্বাই বিভাগ থাকা উচিত, এবং অন্য (ছয়টি) প্রদেশ সম্বন্ধেও তাই হওয়া দরকার। এইভাবে প্রতিটি প্রদেশ নিজেদের শাসনকার্য চালাতে পারবে কলকাতা থেকে বড়লাটের তত্ত্বাবধানে।— দ্রষ্টব্য বিকেন্দ্রীকরণের রয়্যাল কমিশন, সদস্যের নথিভুক্ত বিবরণ। খণ্ড আট। প্রশ্ন ৩৫৫৩১।

কর্তৃক তার নিজস্ব দায়িত্বগুলির যথাযথ সম্পাদনের সঙ্গে বেমানান হত না। ভারত সরকারের বিন্যাস-ব্যবস্থায় কোনও ক্ষতি সাধন না করে বিধিনিষেধগুলিতে শিথিলতা এনে প্রাদেশিক বিত্তের কর্মপরিধিকে বাড়িয়ে তোলা যে সম্ভব ছিল সে সম্বন্ধে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে। তা প্রাদেশিক সরকারগুলির উত্থাপিত প্রস্তাবগুলির নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্ট প্রস্তাবগুলি ছিল

(১) প্রাদেশিক রাজস্বের প্রতিভূতির (Security) ভিত্তিতে কর আরোপ ও ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।

(২) কর্মচারিবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপারে ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদনের চেয়ে অধিকতর ব্যয় করার এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় মঞ্জুর করার ক্ষমতা।

(৩) প্রাদেশিক প্রাক্‌কলনকে রাজকীয় বাজেট ও হিসাব থেকে পৃথক করা।

(৪) রাজস্ব ও ব্যয়ের খাতগুলিকে বিভাজিত করার পদ্ধতি রদ করা এবং তার পরিবর্তে উৎসগুলি ও উৎপাদ থেকে অর্থদানের পৃথকীকরণের পদ্ধতিকে স্থাপন করা।

(৫) বাজেট প্রাক্‌কলনের পরিমাণের উপরে অতিরিক্ত ব্যয়ভার মেটানোর জন্য ভারত সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে এক সুনির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত নিজেদের উদ্বর্তগুলির একটা অংশ খরচ করার ক্ষমতা।

এই সব দাবি মঞ্জুর করার ব্যাপারে ভারত সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে কি কি আপত্তি ছিল? সুস্পষ্টত ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল প্রাদেশিক উপগ্রহণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এবং রাজকীয় আমদানীকৃত মালের উপর শুল্কের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন করের কয়েকটি উৎসকে চিহ্নিত করে দেওয়া। অনুরূপ ভাবে প্রাদেশিক সরকার গুলিকে এই অনুমতি দেওয়া সম্ভব ছিল তাদের জন্য বরাদ্দ রাজস্বের প্রতিভূতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ নেওয়া। প্রাদেশিক সরকারগুলি অসন্তোষের কারণ হওয়া বা নিজেদের বিত্তীয় পদ্ধতির স্থায়িত্ব বিপন্ন করা পর্যন্ত ঘটতে পারে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে ভারত সরকারের মত এই ইঙ্গিত করার অর্থ হল, এ কথা বিশ্বাস করা যে, প্রাদেশিক সরকারগুলির মত বৈধভাবে স্বীকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলি পরিচালিত হত অযোগ্য প্রশাসকদের দ্বারা যারা নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকত না। দ্বিতীয় দাবিটি আরও সহজভাবে অনুমোদিত হতে পারত। এটা লক্ষ করতে হবে যে রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত দেশের জনপালন কৃতক বিভক্ত ছিল।

(১) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে ইংল্যান্ডে নিযুক্ত হওয়া 'ভারতীয় জনপালন

কৃত্যক', যে পরীক্ষায় ভারতের দেশজ লোকেরা সম্রাটের অন্যান্য প্রজাদের মতই, প্রতিযোগিতায় নামতে পারত; এবং

(২) 'প্রাদেশিক' এবং 'অধস্তন' জনপালন কৃত্যক, ভারতে নিযুক্ত, এবং সাধারত এর দ্বার খোলা থাকত দেশের মানুষেরা বা দেশে নিবেশিত (Domiciled) ব্যক্তিরা।

প্রত্যেকটি প্রদেশের নিজস্ব পৃথক 'প্রাদেশিক' ও 'অধস্তন' কৃত্যক ছিল। কিন্তু শেযোক্তদের নিযুক্তির ব্যাপারে প্রদেশগুলির অবাধ স্বাধীনতা থাকলেও প্রথমোক্তর ক্ষেত্রে নিযুক্তির বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হত ভারত সরকার কর্তৃক রচিত নিয়মাবলির দ্বারা। ' ব্যাপারটি এই রকম হওয়ার এটাই শুধু যুক্তিসম্মত হত যে, কোনও পদে নিযুক্তির ব্যাপারে যে-সরকারের ক্ষমতা থাকত, বেতন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও তাদের থাকা উচিত ছিল। সকল প্রদেশে একই ধরনের পদমর্যাদার পদের বেতন এক না হওয়ার কোনও কারণ থাকা উচিত নয়; অথবা প্রদেশগুলির আর্থিক অবস্থার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তারা সবাই সমান হতে পারে না। একজন স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক মূল্য কি হতে পারত স্থানীয় সরকারই সবচেয়ে ভাল ভাবে জানতে পারে। এবং তাই তাদের সেই ক্ষমতা ন্যস্ত করা উচিত যা প্রাদেশিক ও অধস্তন কৃত্যকগুলির আওতার সীমার মধ্যে পড়বে। এই ধরণের ক্ষমতা, প্রদান করলে প্রদেশের পৌনঃপুনিক ব্যয়ের উপর বাড়তি প্রচুর চাপ পড়বে ভারত সরকারের এই ধরণের ইঙ্গিতকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করার ব্যাপারে অবশ্যই প্রশংসা করা চলে না।

তৃতীয় সুপারিশটিতে স্বীকৃতিটি ভারত সরকারের দায়িত্বকে কোনও ভাবেই প্রভাবিত করবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে না। একমাত্র যে আপত্তিটি ভারত সরকার জোর দিয়ে জানিয়ে ছিল তা এই যে, ঐ ধরনের পৃথকীরণ বুদ্ধিমানের কাজ হত না। প্রাদেশিক সরকারের হিসাব বাদ দেওয়া রাজকীয় সরকারের হিসাব বা সম্ভাব্য ব্যয়ের খসড়া প্রকাশ করার বিষয়টি, যখন বাদ দেওয়া দফাগুলি ঐ ধরনের বিরাট পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে, জনসাধারণকে ভুল পথে চালিত করতে পারত এবং ভারত সরকারের[১] আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ অপূর্ণাঙ্গ ধারণা জন্ম দিত। এখন একথা অনস্বীকার্য যে, যদি ঐ ধরনের হিসাবের পৃথকীকরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষাকে পরিহার করতে পারত এবং প্রদেশগুলি কর্তৃক বাজেট-প্রস্তুতের উপর আরোপিত পরিণামী নিয়ন্ত্রণকেও, তবে তা না করাটার অর্থ হত হিসাব করার শিক্ষার্থীদের অনুমিত সুবিধাটিকে প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক সুবিধার উপর স্থান দেওয়া যায়। এছাড়া এটাও উল্লেখ করতে হবে যে, প্রস্তাবটির মধ্যে কোনও নতুনত্ব ছিল না। এটা

১) বিকেন্দ্রীকরণের রয়্যাল কমিশন, সাক্ষ্যের নথিভুক্ত বিবরণ, খণ্ড দশম। প্রশ্ন ৪৪৮৬৬, ৪৫১৭৯-১৮০।

একটা প্রাচীন রীতির পুনরুজ্জীবন মাত্র যা পাওয়া গিয়েছিল ১৮৭১ থেকে ১৮৭৭ সালের মধ্যে। বিত্তীয় বিকেন্দ্রীকরণের ঐ অধ্যায়কালে প্রাদেশিক সংখ্যাতত্ত্বগুলি রাজকীয় বাজেটে আত্মপ্রকাশ করত না। মহাগাণনিক (Accountant General) কর্তৃক রচিত প্রাদেশিক বাজেট অনুমোদিত হত প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক এবং প্রাক্কলনটি একটি সম্ভাব্য খসড়া এবং তা প্রদেশকে বরাদ্দ করা রাজস্বের সীমার মধ্যেই আছে তা ভারত সরকারকে জানিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও কিছুর উল্লেখ করার দরকার নেই। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, হিসাবের পৃথকীকরণের দাবি মঞ্জুরির ব্যাপারে কোনও রকমের সাংবিধানিক আপত্তি থাকার কথা নয়।

চতুর্থ সুপারিশটি তৃতীয়টির সমগোত্রীয় এই কারণে যে, এক্ষেত্রেও ভারত সরকারের সাংবিধানিক দায় দায়িত্বের ব্যাপারে কোনও রকমের অযথা হস্তক্ষেপের উল্লেখ নেই। রাজস্বের বিভাজিত দফার রদকরণ সুস্পষ্টভাবে প্রদেশগুলি কর্তৃক বাজেটের প্রাক্কলনের প্রস্তুতিতে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপের প্রশ্নটি বাতিল করে দেয়। অনুরূপ ভাবে ব্যয়ের বিভাজিত দফার রদকরণ প্রদেশগুলিকে আরও বেশি[১] স্বাধীনতা দিত তাদের জন্য বরাদ্দ করা রাজস্ব ব্যয় করার ব্যাপারে। ঐ পদ্ধতির অধীনে কোনও এক বিশেষ কৃত্যকের জন্য প্রাদেশিক সরকার অধিকতর ব্যয় করতে পারত না যদি তা বিভাজিত দফা হত এবং যদি না ঐ কৃত্যকের অধীনে ব্যয়ের জন্য তার অংকের পরিমাণ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে ভারত সরকার অনুমতি দিত। ভারত সরকার যদি অর্থের অংকের পরিমাণ কমিয়ে দিত তবে প্রাদেশিক সরকারও বাধ্য হত তার নিজের ব্যয়ের পরিমাণ কমাতে। উৎসগুলির পৃথকীকরণের পদ্ধতির পরিবর্ত স্থাপন এবং বিভাজিত দফার পদ্ধতির জন্য উদ্বর্ত থেকে অর্থ প্রদান করলে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে খোলাখুলি ভাবেই আরও বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হত, এবং তার ফলে ভারত সরকারের কোনও বিশেষ ক্ষতি হত না। এই দাবির ব্যাপারে বিরোধীতা করে ভারত সরকার যে আপত্তিগুলি তুলতে পারত তা আদৌ বিশ্বাসজনক হত না। এই দাবি[২] করা হয়েছিল যে, সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের আওতাভুক্ত প্রাদেশিক সরকারগুলি সেই ধরনের আগ্রহ দেখাতে বিরত হত যা তারা দেখাত বিভাজিত রাজস্বের ক্ষেত্রে। কিন্তু এটা সুষ্টভাবেই ছিল এক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি যে, পরিণামে বিত্তীয় স্বার্থ জড়িত না থাকলে দক্ষতার সঙ্গে কর সংক্রান্ত প্রশাসনের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের উপর আস্থা রাখা যায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি মনে করত যে, রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত মানুষ প্রকৃত অর্থেই জানত যে আদায়ীকৃত অর্থ রাজকীয় বা প্রদেশের জমার ঘরে জমা পড়ছে।

১) বিকেন্দ্রীকরণের রয়্যাল কমিশন, সাক্ষ্যের নথিভুক্ত বিবরণ। খণ্ড অষ্টম, প্রশ্ন ৩৫২২৫-২৮।
২) বিকেন্দ্রীকরণের রয়্যাল কমিশন, সাক্ষ্যের নথিভুক্ত বিবরণ। খণ্ড পঞ্চম, প্রশ্ন ১৫১০০, ১৬৭৯১।

বস্তুত চূড়ান্ত জমার বিষয়টি কোনও ভাবেই রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিকে প্রভাবিত করতে পারে না। এবং ঐ দৃষ্টিভঙ্গি যদি সত্য হত তবে ঐ অসুবিধার সমাধান সহজেই হয়ে যেত প্রতিটি সরকারের দ্বারা যাদের নিজস্ব রাজস্ব আদায় করার নিজস্ব কর্মচারী ছিল। কোনও এক সরকার কর্তৃক অপর সরকারের প্রতিনিধি-সংস্থা গুলিকে নিজের স্বাভাবিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করা, যা ভারতে হত। সুস্পষ্টতাই এক জটিল ও অসুবিধাজনক পদ্ধতি। যদি উৎসগুলির পৃথকীকরণের ফলেই প্রতিনিধি সংস্থাগুলির পৃথকীকরণ উদ্ভূত হয়ে থাকে, তবে এই সংস্কার সাধন সব রকমে ভালর জন্যই হতে পারত। এছাড়া বিভাজিত দফাগুলি প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নিজস্ব আগ্রহ সৃষ্টি করিয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই যে পদ্ধতিটির অনুকূলে না গিয়ে বিপক্ষে যাবার বিষয় হয়ে উঠবে, এ ব্যাপারটি উপেক্ষিত হয়েছিল। যে পদ্ধতিটি রাজস্বের ব্যাপারে কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করে থাকে জনগণের স্বার্থ ছাড়াই তবে তা নিশ্চয়ই একটি খারাপ পদ্ধতি; কারণ ঐ ধরনের স্বার্থ সুনিশ্চিত ভাবে আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা এবং নিয়মানুবর্তিতা পূর্ণ এনে দেবে।[১] এর দৃষ্টান্তস্বরূপ কর লাঘব করার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষতিকারক অনীহার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[২] প্রাদেশিক সরকারগুলিকে মানবধর্মী করাই যদি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা হয়ে থাকে, তবে বিভাজিত খাতগুলির রদকরণ অবশ্যই উৎকৃষ্ট মাধ্যম। অপর যে আপত্তির বিরোধিতা করতে পারত ভারত সরকার তা ছিল এই যে, ঐ ধরনের পরিবর্তন প্রদেশ থেকে আদায় করা রাজস্বের মধ্যে ভারত সরকারের অংশকে বশ্যতামূলক কর প্রদানের রূপে চিহ্নিত করে দিত এবং ভারত সরকারকে তখন মনে হতে পারত প্রাদেশিক সরকারগুলির বৃত্তিভোগী। এবং নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠত। আবেগপ্রবণতা বিধায় এই আপত্তিটিকে অবশ্যই খারিজ করতে হবে।

প্রাদেশিক বিত্তের কর্মপরিধির সম্প্রসারণের জন্য পঞ্চম ও শেষ প্রস্তাবটি ছিল ভারত সরকারের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে ন্যূনতম আপত্তিকর। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারের জন্য একটি মাত্র-কোষাগার পদ্ধতি থাকার কোনও যৌক্তিকতা নেই। এ কথা সত্য যে, দেশের নগদ উদ্বর্তে ব্যয় সংকোচের উচ্চমান বজায় রাখতে সাহায্য করে সাধারণ কোষাগার। যা কার্যকর করা প্রত্যেক সরকারের কর্তব্য, ঠিক যেমনটি যে-কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ক্যাশবাক্সের টাকা-পয়সা বা লেনদেনের জন্য নগদ অর্থকে যে চোখে দেখা কর্তব্য মনে করে। কিন্তু যদি সাধারণ কোষাগার উদ্বর্তগুলির ব্যবহারে বাধা জন্মায় তবে স্বাধীনতা থেকে প্রাপ্ত লাভগুলি তবে নগদ উদ্বর্তে বৃদ্ধির

১) এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক উরধালের প্রজাস্বত্ত্ব পদ্ধতি তুলনীয়।

২) বিকেন্দ্রীকরণের রয়্যাল কমিশন, সাক্ষ্যের নথিভুক্ত বিবরণ। খণ্ড দশম। প্রশ্ন ৪৪৮৬৬।

সঙ্গে জড়িত ক্ষতিরপূরণের চেয়েও বেশি কিছু হত। যার ফলে পাওয়া যেত পৃথক পৃথক কোষাগারের প্রতিষ্ঠা এবং পৃথক পৃথক উপায়-উপকরণ। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারগুলির দাবির মধ্যে পৃথক কোষাগার পদ্ধতি এবং পৃথক উপায়-উপকরণের সঙ্গে জড়িত কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বর্তগুলি থেকে প্রাদেশিক সরকারের স্থিতিকে সম্পূর্ণ পৃথক করার কথা চাওয়া হয় নি, সম্ভবত এই কারণে যে, তারা অনুমান করে নিয়েছিল যে, ঐ ভাবে চাওয়া প্রাদেশিক রাজস্বের পৃথক অধিকারের প্রস্তাবে ঐ দাবির বিরুদ্ধে ভারত সরকার সাংবিধানিক আপত্তি তুলতে পারে। তারা শুধু এইটুকুই চেয়েছিল যে, ভারত সরকারের কাছে উল্লেখ না করে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পর্যন্ত তাদের স্থিতির একটা অংশ খরচ করার ক্ষমতা তাদের দেওয়া হোক। 'যুক্তিযুক্ত' হিসাবে ঐ প্রস্তাব মেনে নেওয়া[১] হয়েছিল। কারণ এর পরিণামে, অবশ্য যদি না ঐ অর্থের খুব বেশি হয়, উপায়-উপকরণের ব্যাপারে বাধা বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থেকে ভারত সরকার বঞ্চিত না করে। বরং দেশের নগদ উদ্বর্তে সামান্য বৃদ্ধি মাত্র হয়।

এই ভাবে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, প্রাদেশিক বিত্তের কর্ম-পরিধি অযথা সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল ভারত সরাকরের সাংবিধানিক দায়-দায়িত্বের এক অতি সংকীর্ণ এবং অতিমাত্রায় বিধানিক ব্যাখ্যার দ্বারা। প্রাদেশিক সরকারগুলির করা প্রস্তাবগুলির উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, ভারত সরকারের সাংবিধানিক বিন্যাস-ব্যবস্থায় কোনও ব্যত্যয় না ঘটিয়ে তাদের দায়িত্ব বোধ সম্বন্ধে আরও উদার দৃষ্টিভঙ্গি সহ তাদের বঞ্চিত পরিবর্তনগুলি ঘটানো সম্ভব হতে পারত। এই ধরনের বিশেষ সুবিধাদান প্রাদেশিক বিত্তকে ঠিক ততটাই স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং স্বশাসিত করে দিত পারত যতটা করার যোগ্য ছিল তারা। নিঃসন্দেহে পদ্ধতিটি নির্ভর করত নিছক প্রচলিত রীতির ভিত্তির উপর। তৎসত্ত্বেও এ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি ততটাই বাস্তব হত যেন তা আইনের ভিত্তিতেই রচিত।

কিন্তু এখন এমন সময় এসেছে, যখন বিত্ত সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি এমন একটা বিষয় হিসাবে পরিলক্ষিত হবে না যা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটি তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব হয়েছিল যাদের প্রদত্ত উপদেশগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ১৮৭০ সালে। কিন্তু যা এখন দেশের বিত্তীয় সম্পদের বিলি-বন্দোবস্তের ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করার দাবির জানাচ্ছে।এরা হল ভারতীয় কর দাতা। এবং তাদের ক্রমাগত উচ্চ কলরব এতই তীব্র হয়ে উঠেছে যে, তা ক্ষমতাসীনদের বাধ্য করবে পদ্ধতিটি পাল্টাতে যাতে তারা যে ভূমিকা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে তাতে অংশ নিতে পারে।

এই ঘটনার ফলে যে-সব পরিবর্তন ঘটেছিল সেটাই হবে ভাগ-IV-এর বিষয়বস্তু।

---

১) বিকেন্দ্রীকরণের রয়্যাল কমিশন, সাক্ষ্যের নথি বিবরণ, খণ্ড দশম, প্রশ্ন ৪৪৯০০।

ভাগ IV

১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইনের অধীনে প্রাদেশিক বিত্ত

অধ্যায়-১০

পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রপতি এবং সংসদীয় এই দুই পদ্ধতির সরকারের মধ্যে প্রায়ই বৈষম্য[1] দেখতে গিয়ে শেষোক্তের প্রাধান্য দেখানো হয়ে থাকে। সংসদীয় ধাঁচের সরকারের ব্যাপারে এটা দাবি[2] করা হয়েছে যে, অন্য কোনও পরিকল্পনা কর্তৃত্বের কেন্দ্রটিতে ততটা ফলপ্রদভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে সমর্থ হতে পারে যারা জন-মানসের প্রতিনিধিত্ব করে বলে ধরে নেওয়া হয় অর্থাৎ এর অর্থ হল ঐকমত্যের দ্বারা গঠিত সরকার। যে এটা সুনিশ্চিত করে জনগণের একটি সংস্থার দ্বারা সরকারের ক্রিয়াকর্মগুলি প্রয়োগ করার বিষয়টিকে এবং যাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিধান মণ্ডলের সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাদের বশবর্তী যে এটাই একমাত্র সরকার, যা এক শক্তিশালী শাসনকার্য-পরিচালক দিতে পারে যেটা এক স্থায়ী সরকারের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি, যে পরিচালকদের তা ততটা দায়িত্বহীন হতে দেয় না যার ফলে দক্ষ সরকারের জন্য মূল উপাদানগুলির বিঘ্নিত হয়। এবং তা উচ্চ পদাধিকারীদের উপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় তাদের কাজের সাফল্য অর্জন করার ব্যাপারে যে, ব্যর্থ হলে পদ থেকে অপসারিত হবার আশংকা থাকে: এবং তা আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন উভয় ক্ষেত্রে বিধানমণ্ডলকে সর্বোচ্চ স্থান দেয় যাতে তা এমন এক সরকার গঠন করতে পারে যা জীবনযাত্রাকে শুধু কার্যকর করবে তা নয়, তা জীবনযাত্রাকে সুন্দরও করবে। একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, অন্য কোনও ধরনের সরকার এত সাফল্যের সঙ্গে শাসনতন্ত্রকে যদৃচ্ছ শাসনক্ষমতায় নামিয়ে আনার বিষয়টিকে প্রতিহত করতে পারে অথবা শান্তির নামে প্রগতির পথ রুদ্ধ করতে পারে। সংসদীয় সরকার এত উন্নতমাত্রায় তার সর্বোচ্চ উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেছে নিয়মমাফিক শাসনতন্ত্রের প্রগতিকে সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে যে ব্রিটিশ সংবিধানের বিবর্তনে মূলত ঘটনাচক্রে এর উদ্ভব হলেও এটিকে বহু দেশের অত্যন্ত মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছে যে-দেশগুলির প্রবল রাজনৈতিক আলোড়ন তাদের বাধ্য করেছিল নিজেদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোকে পরিবর্তন করতে বা নতুন করে রচনা করতে।

শাসনকার্য পরিচালকরা বিধান মণ্ডলের একটা অংশ বলে গণ্য হয় এবং তা যদি

---

১) তুলনীয় জেমস ব্রাইস, মার্কিন লোকায়ত শাসনতন্ত্র ১৯১০, খণ্ড ১, অধ্যায় ২০।

২) তুলনীয়, স্যার সিডনি লো, ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা ১৯১৪, অধ্যায় ৩।

সংসদীয় ধাঁচের সরকারের পর্যন্ত নির্দেশক হয়। তবে ১৮৫৩ সাল থেকে প্রচলিত ভারতস্থ প্রশাসনিক পদ্ধতিকে সংসদীয় পদ্ধতির সমরূপ বলা যেতে পারে। ভারতীয় সংবিধানের এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা আদৌ সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ সেই সময় থেকে সাংবিধানিক আইনের ব্যবস্থাগুলি ছিল এই যে অতিরিক্ত (অর্থাৎ বিধান মণ্ডলীর) সদস্যরা এবং সাধারণ (অর্থাৎ শাসনকার্য পরিচালকরা) সদস্যরা উভয়ে যৌথ ভাবে বিধান মণ্ডল গঠন করবে ব্রিটিশ ভারতের শান্তি, শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং দক্ষ সরকারের জন্য আইন ও বিধি-নিয়ম রচনা করার জন্য।[১] কিন্তু এর বাস্তবিক পরিণামের আলোকে বিচার করলে ভারতীয় পদ্ধতি সেই প্রশাসনিক পদ্ধতির শ্রেণীর আইনত স্বাভাবগত বৈশিষ্ট্যের শোচনীয় ভাবে অত্যন্ত নিম্নস্থানে পর্যবসিত হয় যে পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ছিল ঐ পদ্ধতি। যদি অন্য কোনও দেশে সংসদীয় সরকারের প্রমাণ-চিত্র হয় বিধান মণ্ডলীর কাছে কার্য নির্বাহিকদের বশ্যতা স্বীকার করার ব্যাপার তবে ভারতে তা ছিল বিধান মণ্ডলকে কার্য-নির্বাহিক কর্তৃক বাধা দেওয়ার, এবং প্রায়শই অবজ্ঞা করার ব্যাপার। জনগণের ইচ্ছাকে কখনও কার্যনির্বাহিকরা শ্রদ্ধা দেখিয়েছে কিনা তা যদি কেউ বিধান মণ্ডলের কার্য-বিবরণীতে খোঁজার চেষ্টা করে তবে সে ব্যর্থ হবে।[২] অবিরাম ভাবে সংস্কার সাধনের আবেদন করা হয়েছে বিধান মণ্ডলীর পক্ষ থেকে এবং কার্য-নির্বাহিকরা সমান দৃঢ়তা দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

ভারতীয় সংসদীয় পদ্ধতি কেন যে এক অন্তঃসারশূন্য রূপ হিসাবে থেকে গেছে তার কারণটি খুঁজে পাওয়া যাবে এই ঘটনার মধ্যে যে তা ছিল সংসদীয় কার্য-নির্বাহিক ছাড়াই এক সংসদীয় পদ্ধতি।

---

১) ১৯০৮ সালে লর্ড মিন্টোর সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব সম্পর্কে বিখ্যাত আইনজীবী স্যার ভাষ্যম আয়েঙ্গারের কৃত গুরুত্বপূর্ণ নোটটি তুলনীয়।

২) এন. সি. কেলকর রচিত ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের জন্য সমর্থনমূলক কৈফিয়ৎ, পৃষ্ঠা ৮১ থেকে গৃহীত নিম্নলিখিত সারণিটি এই ঘটনার উদাহরণঃ—

বিধান পরিষদ	পেশকরা প্রস্তাবের সংখ্যা	প্রত্যাহার করা প্রস্তাবের সংখ্যা	বাতিল করা প্রস্তাবের সংখ্যা	গৃহীত হওয়া প্রস্তাবের সংখ্যা
সর্বোচ্চ	৩	২	১	০
মাদ্রাজ	৩২	২৬	৬	০
বঙ্গদেশ	৩৮	২৬	১২	০
উ: প্রদেশ	২২	১০	১২	০
বিহার ও ওড়িশা	৫	৫	০	০
মধ্যপ্রদেশ	৪	২	২	০

অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, এই পদ্ধতির অধীনে কার্য-নির্বাহী করা বিধান মণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধ ছিল না এবং বিধান মণ্ডলীর দ্বারা তারা অপসারিতও হত না। ভারতীয় বিধান মণ্ডল ভারতীয় কার্য নির্বাহিক গঠিত বা বিগঠিত করতে পারত না। বিধান মণ্ডল কর্তৃক অপসারিত হবার আশংকা না থাকায় ভারতীয় কার্য-নির্বাহিকরা শান্তি চুক্তি বা যুদ্ধ করতে পারত নিজেদের ইচ্ছানুসারে। খুশিমত কর আরোপ করতে এবং খুশি মত খরচও করত পারত বিধান মণ্ডলীর ইচ্ছা সম্বন্ধে সামান্যতম অনুশোচনা না করেই। নিজেদের খেয়ালখুশি অনুসারে কাজের দায়িত্ব নিত বা দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করত, এবং বিধান মণ্ডলী কর্তৃক বিরুদ্ধ মত প্রদানকেও ভয় করত না। সংসদীয় সরকারের ভারতীয় পদ্ধতির কাছাকাছি তুলনীয় রূপটিকে দেখতে পাওয়া যাবে আয়ারল্যাণ্ডের সংসদের বিন্যাস-ব্যবস্থার মধ্যে যার অস্তিত্ব ছিল ১৭৮২ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত। বিষয়টির বিশেষত্ব অন্তর্নিহিত ছিল প্রধানত এই ঘটনার মধ্যে যে, যখন এই আয়ারল্যাণ্ডের সংসদ সাধারণত গ্রাটানের সংসদ নামে পরিচিত। যে অধ্যায়-কাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল; তখন তা এক সার্বভৌম বিধান মণ্ডলী হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। সেই সময়কার আয়ারল্যাণ্ডের কার্যনির্বাহিকরা আয়ারল্যাণ্ডের সংসদের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও অর্থের সংসদীয় কার্য-নির্বাহিক ছিল না। আয়ারল্যাণ্ডের কার্য-নির্বাহিকরা আইরিশ বিধান মণ্ডলী কর্তৃক নিযুক্ত বা অপসারিত হবার পরিবর্তে বাস্তবে নিযুক্ত বা অপসারিত হত সম্রাট কর্তৃক ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে। অনুরূপ পদ্ধতিতে ভারতীয় কার্য-নির্বাহিকরা ভারত-বিষয়ক মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত এবং অপসারিত হত, যিনি ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য হতেন এবং তিনি কোনও ভাবেই ভারতীয় বিধান মণ্ডলীর কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন না।

এ কথা সত্য যে, ভারতস্থ কার্যনির্বাহিকরা চূড়ান্তভাবে দায়বদ্ধ থাকত ভারত বিষয়ক মন্ত্রীর কাছে এবং তাঁর মাধ্যমে ব্রিটিশ সংসদের কাছে। কিন্তু একথা অবশ্যই ভোলা উচিত নয়, মি: ফিশার[১] বলেছিলেন :

'ভারত বিষয়ক কাজ-কর্ম আছে ভারত সরকারের হাতে ভারতীয় সরকারের কাছ থেকে লণ্ডনে প্রস্তাব আসতে পারে এবং রাজকীয় সরকার কর্তৃক তা সমর্থিত ও হতে পারে। ভারত সম্পর্কিত নীতির বড় বড় পরিলেখগুলি ভারত দপ্তরে মন্ত্রী কর্তৃক রূপায়িত হতে পারে। এবং ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড রকমের বিরোধিতার

১) এইচ. এ. এল. ফিশার তাঁর রচিত সাম্রাজ্য ও ভবিষ্যৎ ১৯১৬ গ্রন্থে পৃ: ৫৮-তে রাজকীয় প্রশাসন সম্বন্ধে বলেছিলেন।

সম্মুখীন হতে না হলে ভারত-বিষয়ক কাজকর্মের গতিপথে একজন ক্ষমতাশালী মন্ত্রী তাঁর প্রভাব প্রবলভাবে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শেষ কথাটি বলার অধিকার থাকত ভারতীয় সরকারি অভিমতের (অর্থাৎ ভারতস্থ কার্যনিবাহিকদের)। যে ভারতীয় আমলাতন্ত্রের ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার বিরুদ্ধে গিয়ে কোনও ব্যবস্থাই জোর করে চাপানো হবে না।'

ভারত বিষয়ক কাজকর্মে সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও কার্যত মন্ত্রী না ছিলেন ভারতে জনগণ যাকে অশুভ কাজ বলে মনে করত তা করার ব্যাপারে কার্যনির্বাহিকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার পক্ষপাতী বা যা জনগণের পক্ষে হিতকর মনে করতেন তা করার জন্য তাদের বাধ্য করতে চাইতেন।[১] আবার একথা আদৌ বলা যেতে পারে না যে, ব্রিটিশ সংসদ, যেখানকার সকল সদস্যকেই ভারতের সদস্য বলে ধরে নিতে হয়। তারা ভারতীয় কার্যনির্বাহিক সংক্রান্ত আইনগুলিকে খুটিয়ে পরীক্ষা করার বিষয়টি জরুরি করে তুলেছে।[২] অপর দিকে ভারতবিষয়ক কাজকর্মে এর অযথা হস্তক্ষেপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতের জনগণের স্বার্থের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকারক হয়েছিল।[৩] এ বিষয়ে অবশ্যই কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, সম্রাট কর্তৃক

১) মাত্র যে দুটি ক্ষেত্রে মন্ত্রী ভারতে কার্যনির্বাহিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েছেন বলে জানা যায় সে দুটি হল পঞ্জাব নিকাশী ও খাল আইন এবং ১৮৭৫ সালের ভারতীয় শুল্ক আইন। শেষোক্তটি স্পষ্টতই ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল।

২) ভারতের জন্য নিযুক্ত মন্ত্রীর বেতন যেহেতু ভারতের রাজস্ব থেকে দেওয়া হত। তাই সংসদের কোনও সুযোগই ছিল না, যা ছিল উপনিবেশ সংক্রান্ত মন্ত্রিদের, সংসদ পূর্ণ মাত্রায় চালু থাকাকালীন তাঁর নিজের কাজকর্মের বাৎসরিক সমীক্ষা চালানোর। সবশেষে, সাধারণত উপযোজন বিল দ্বিতীয়বার পাঠের পর ভারতের বাজেট পেশ করা হত সংসদে, যা কিছুটা অসংলগ্ন আলোচনার পর একটি প্রস্তাব পাশ করত বিধিসম্মত ভাষায় এই ঘোষণা করত যে, ভারত সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশে আয় ও ব্যয়ের একটা নির্দিষ্ট মোট পরিমাণ দেখানো আছে। ভারত বিষয়ক কাজর্মের ব্যাপারে সংসদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করার বহু চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু নিজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য কখনো যত্নশীল হয় নি সংসদ (১৮৭৩ সালে মি: আর. এন. ফাউলার প্রস্তাব আনেন যে 'সভার অভিমতে ভারতের বিত্ত বিষয়ক কাজকর্মের বিবরণ অধিবেশন চলাকালীন পেশ করা বাঞ্ছনীয়। যখন তা পূর্ণমাত্রায় আলোচিত হতে পারে।' আবার ১৮৮৩ সালে ঐ একই প্রস্তাব পেশ করেন মি: ফাউলার। ভারত বিষয়ক কাজকর্মের সমীক্ষা চালানোর জন্য সভাকে আরও ভাল সুযোগ দেওয়ার জন্য যে দুটি চেষ্টা চালানো হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে ঐ একই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন সংসদ সদস্য মিঃ ক্ল্যাডওয়েল এবং তার সঙ্গে এটাও চেয়েছিলেন যে ভারতের জন্য নিযুক্ত মন্ত্রীর বেতনকে রাখা হোক ব্রিটিশ প্রাক্কলনের মধ্যে। ভারতের জন্য নিযুক্ত তৎকালীন মন্ত্রির মি: ফাউলার এর বিরোধিতা করেন এবং পরিণামে এটিও ব্যার্থ হয়। ১৯১৯ সালের ভারত আইনের শর্তাবলি অনুসারে মন্ত্রির বেতনকে ব্রিটিশ প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ভারত বিষয়ক কাজকর্মের সমালোচনা করার আরও ভাল সুযোগ পেয়েছিল ব্যবস্থাপক সভা।

৩) ভারতীয় কার্যনির্বহিকদের বিচারাধিকারের অধীনস্থ করে রাখতে চেয়ে ছিল যে সংসদ তার সঙ্গে তুলনা কর সেই সংসদের যা কার্যনির্বাহিকদের মুক্ত করে দিয়েছিল বিচার বিভাগ ও বিধানিক নিয়ন্ত্রণপাশ থেকে। সেই সংসদের সঙ্গে তুলনা কর যা ভারতস্থ ইউরোপীয়দের উপর কঠোর বিধিনিয়ম আরোপ করেছিল ঐ সংসদের যা শুধু তাদের প্রবেশধিকার দিয়েছিল তা না সেই সঙ্গে তাদের শাসকবর্গের নিয়ন্ত্রণের উপরে স্থান দিয়েছিল। হেস্টিংসকে অভিযুক্তকারী সংসদের সঙ্গে জেনারেল ডায়ারকে সমর্থনকারী সংসদের তুলনা কর।

দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে ভারত বিষয়ক কাজকর্মের ব্যাপারে সংসদের আগ্রহ বেড়ে ওঠার পরিবর্তে যথেষ্ট পরিমাণে কমে গিয়েছিল যখন দেশের কাজকর্মের ব্যাপারে কোম্পানি দায়ী ছিল তখন যে আগ্রহ দেখাত তার তুলনায়।[১] আবার ভারত বিষয়ক কাজকর্মের ব্যাপারে ব্রিটিশ সংসদের প্রভাব আরও খারাপের দিকে উল্লেখযোগ্য ভাবে বদলে গিয়েছিল এ কথাও বলা যায় না।[২] যেহেতু এর সমগ্র প্রভাব খাটানো হত ভারতে জনমতের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করা থেকে সংযত করার পরিবর্তে জনগনের সোচ্চার আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে কার্যনির্বাহিকদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য।

অতএব এটা প্রত্যক্ষ করা যায় যে ভারতে কার্যনির্বাহিকদের উপর মন্ত্রী এবং সংসদের নিয়ন্ত্রণ ছিল শুধু নামমাত্র নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবে ভারতস্থ কার্যনির্বাহিকরা ছিল আমলাদের এক লাগামছাড়া সংস্থা যাদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা ছিল ভারত বিষয়ক কাজকর্ম দেখার। এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্যনির্বাহিকদের দ্বারা যে আস্থা তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল তা সম্পাদন করত?

এই প্রশ্নের উত্তরটি এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সংক্ষেপে বলা যাবে যে, ভারতস্থ কার্যনির্বাহিকরা নিয়মশৃঙ্খলার বদলে প্রগতিকে বলিদান দিয়েছিল। আইন প্রণয়ন বা বিত্তবিষয়ক ব্যাপারে এদের গৃহীত ব্যবস্থাগুলিকে যদি পরীক্ষা করা হয় তবে এই বক্তব্যের সত্যতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ভাবে পরিস্ফূট হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে এমন অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যক দেশ আছে যেখানে ভারতের মত এত অধিক সংখ্যক সামাজিক অশুভ অনিষ্টকর ব্যাপারে বর্তমান আছে। আইন এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা সমাজ মাঝে মাঝে তার ক্ষতিকর দিকগুলির সংশোধন করে নেয় তার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। কিন্তু নামমাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রম[৩] বাদে ব্যক্তিগত আইনের নিয়মাবলির অত্যন্ত অতীব ক্ষতিকারক বৈশিষ্ট্যগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হত

---

১) তুলনীয় ১৮৭৭ ও ১৮৭৯ সালে ইংল্যান্ডের লোকসভার প্রস্তাবগুলিতে ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থে ভারতের শুল্ক নীতির নিন্দা করা হয়েছিল।

২) এই বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করে বলা যেতে পারে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্মের ব্যাপারে নাকাল করা অনুসন্ধান না করে সংসদ কখনো ক্ষমতার মেয়াদ বাড়াত না।

৩) সতীপ্রথা নিষিদ্ধকারী ১৮২৯ সালের বেঙ্গল রেগুলেশন, ১৮৪৩ সালের অধিনিয়ম ৫ (ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধকারী); ১৮৫০ এর ২১ (বিষয় ১৮৩২ সালের বিধিনিয়মের ধারা নং পুন: প্রবর্তিত) জাতি বা ধর্মের হানির ফলে সম্পত্তি অধিকার খোয়ানো নিষিদ্ধকারী; হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার মঞ্জুরিকারী ১৮৫৬ সালে অধিনিয়ম ১৫; খ্রিস্টানধর্মে ধর্মান্তরিত দেশজ ব্যক্তিদের বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষমতা দানকারী ১৮৬৬ সালের বিধিনিয়ম নং ২১; অস্বাভাবিক প্রথার উপর বিধিনিষেধ আরোপকারী ১৮৭১ সালের বিধি নিয়ম নং ২৭; খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান বা শিখ নয় এমন সকল ব্যক্তির জন্য বিবাহ প্রথার ব্যবস্থাকারী ১৮৭২ সালের বিধিনিয়ম নং ৩।

নাগরিকদের সামাজিক সম্পর্কগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য,যদিও সুশিক্ষিত জনমত দীর্ঘকাল ধরে এটা অনন্তকাল ধরে চালিয়ে যাবার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।[1] ব্যক্তিগত আইনের সংরক্ষণের জন্য এত বেশি শ্রদ্ধাশীলতা ছিল কার্যনির্বাহিকরা যে তাদের লক্ষ লক্ষ প্রজারা নাগরিকত্বের অত্যন্ত প্রাথমিক অধিকারগুলি ভোগ করা থেকেও বঞ্চিত ছিল, এটা সদা সতর্ক থাকত বিরোধের ব্যাপারে দেওয়ানি আইনের শর্তগুলি যাতে প্রাচীন সংহিতার অযৌক্তিক বিনির্দেশগুলিকে অগ্রাহ্য করতে বা সংশোধন করতে না পারে তা দেখা।[2] আইন প্রণয়নের আধুনিক মানের দ্বারা বিচার করলে কার্য নির্বাহিকদের অবশ্যই চরম রক্ষণশীল বলে ঘোষণা করতেই হবে। অর্থনৈতিক অধিকারগুলি অর্জনের ব্যাপারে এদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত শিথিল ধরনের এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কৃষিকেন্দ্রিক[3] জনগণকে নিরাপত্তা অথবা রাযতিস্বত্বের স্থায়িত্ব অথবা শিল্পভিত্তিক[4] জনগণকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দেবার জন্য দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল যে বিধান মণ্ডলীকে, তা এর উচ্ছেদের জন্য অবিরাম দাবি থাকা সত্ত্বেও শিল্পের সঙ্গে জড়িত দাসত্বকারী এক প্রজাতি থেকে বাকিদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করায় অনেকটা নিচে নেমে গিয়েছিল।[5]

এর বিত্তীয় পদ্ধতিও অনুরূপভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে সাধারণ জনগণকে করভারে পীড়িত করে এবং উচ্চ পদমর্যাদা বিশিষ্ট শ্রেণীদের কর রেহাই দিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ইচ্ছার দ্বারা। এমন দাবি করা হয়েছিল যে, রাজস্ব পদ্ধতি এমন ভাবে পাল্টাতে হবে যাতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীদের সাহায্য করা যায়। পরোক্ষকরকে সমর্থন করা হয়েছিল এমন একটি পদ্ধতি হিসাবে যাতে রাজ্যের উপর যে বোঝা থাকে তাতে দরিদ্র শ্রেণীরা তাদের অংশ প্রদান করতে পারে প্রকৃত

---

১) এটি প্রথম স্বীকৃতি পায় ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক এবং তা সন্নিবেশিত হয় ১৭৮০ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিনিয়মে (২১ নং তৃতীয় জর্জ সি-৭০, ধারা ১৭ এবং ১৮); পরবর্তীকালীন সংবিধির মধ্যে এর শর্তাবলি সন্নিবেশিত হয়েছে।

২) তুলনীয়, ১৮৬৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন নং ১০-এ ব্যক্তিগত অধিনের অনুকূলে কৃত শর্তাবলি; ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন নং ৪, এবং ১৮৮২ সালের ভারতীয় ন্যাস আইন নং ২।

৩) তুলনীয়, বঙ্গদেশে ১৮৫৯, ১৮৬৮, ১৮৮১ এবং ১৮৮৫ সালের ভাড়াটিয়া আইনগুলি; উত্তর প্রদেশে অযোধ্যা ভাড়া আইন, ১৮৬৮; বোম্বাইয়ের ১৮৭৯ সালের দাক্ষিণাত্য কৃষক ত্রাণ আইন। এবং মধ্য প্রদেশের ১৮৮৩ সালের ভাড়াটিয়া আইন।

৪) ১৮৮১ সাল পর্যন্ত ভারতে কারখানা আইন প্রবর্তিত হয় নি। ১৮৮১ সালের আইনটি সংশোধিত হয় ১৮৯১ সালে ও তার পরিবর্তে অন্য একটি আইন প্রবর্তিত হয় ১৯১১ সালে যাতে ভারতের কারখানা শ্রমিকদের উপর প্রযোজ্য শর্তাবলি সন্নিবেশিত আছে।

৫) ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যাবলির গবেষকরা এটা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এখানে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংক্রান্ত কলঙ্ককর পদ্ধতিটি।

ঘটনাটা উপলব্ধি না করেই। কিন্তু সীমিত রাখার একটি নীতি ছিল যা কয়েক ধরনের পরোক্ষ কর আরোপ করা নিষিদ্ধ করত। এ কথা বলা যেতে পারে যে, সরকারি বিত্তের গবেষকরা এ ব্যাপারেসম্মত হয়েছিলেন, যাতে পরোক্ষ করগুলি এমন হওয়া উচিত যে, তুলনামূলক ভাবে, যা বেশ গুরুভার হয়েই দরিদ্রদের উপর চাপে তা যেন ঐ ধরনের করগুলির বোঝা তাদের সক্ষমতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যখন ঐ ধরনের পরোক্ষ করগুলি বিলাস দ্রব্যের উপর চাপানো হয় তখন তাদের পক্ষে সেই বোঝাটি ন্যায্য ভাবে ভাগ করে নেওয়া সম্ভব হবে তাদের বহন করতেই হবে, এমন ক্রয় করার বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে ঐ করগুলি জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগুলির উপর চাপানো হয় সেখানে এই নমনীয়তা সম্ভব হবে না। ভারতে প্রযোজ্য অনিষ্টকর শ্রেণীর লবণ কর সম্বন্ধে এ কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, এটাই পর্যাপত কারণ যার জন্য ভারতের রাজস্ব পদ্ধতি থেকে এই কর বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু কার্য নির্বাহিকরা শুধু যে এই দাবি মেনে নিতে অরাজি হয়েছিল তাই না, তার বদলে প্রকৃত পক্ষে রাজস্বের অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ না করে যখনই ঘাটতি দেখা দিয়েছে তখনই লবণ কর বাড়িয়ে দিয়েছে, যা তারা করতে পারত সমান সহজসাধ্যতায় এবং অনেক বেশি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ প্রসঙ্গে ১৮৮৬ সালে এটা মেনে নেওয়া[১] হয়েছিল যে,

'সবকিছু বলা এবং করার পর, কোনও রকমের সন্দেহই থাকতে পারে না, কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, একটা বড় কলঙ্ক শুধু যে মুছে ফেলা হয় নি তা নয়, বরং তা সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলির দ্বারা আরও বেড়ে গেছে।..... সেটা হল এই যে (ভারতে) শ্রেণীগুলি যারা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা এবং সুযোগ-সুবিধা পায়। তারা হল সেই শ্রেণী এ ব্যাপারে যাদের অবদান সবচেয়ে কম।'

কিন্তু ১৮৮৭-৮৮ সালের বাজেটে কার্য-নির্বাহিকরা তাদের নিজস্ব দৃঢ় বিশ্বাসকে বর্জন করে এবং লবণকর বাড়িয়ে দেয় ঘাটতি মেটাবার জন্য যে ঘাটতি কোনও অভ্যন্তরীণ উন্নতিবিধানের জন্য কোনও বিশিষ্ট ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য করা হয় নি বরং করা হয়েছিল বহিরাক্রমণের মত এক গুরুতর কর্মকাণ্ডের জন্য, যথা ব্রহ্মদেশ জয় করা, যেন ১৮৮৬ সালের আয়কর, যা বঙ্গদেশের জমিদার, আসাম চা আবাদকারী এবং অযোধ্যায় তালুকদারদের আয়কে স্পর্শ পর্যন্ত করে নি। এবং অপেক্ষাকৃত ধনী

১) তুলনীয়, ১৮৮৬ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বোচ্চ বিধান পরিষদে অনুজ্ঞা কর সংশোধনী বিল সম্পর্কে স্যার এ. কলভিনের প্রদত্ত ভাষণ।

শ্রেণীদের দিতে, এবং তাদের দিয়ে দেওয়াতে, যে পরিমিত হারে ঐ কর আরোপিত হয়েছিল, ঠিক ততটাই যা তাদের দিয়ে দেওয়ানো যেতে পারত।

কিন্তু লবণ করই অবিচারের একমাত্র নিদর্শন নয় যার ফলে উচ্চশ্রেণীর জন্য সাধারণ মানুষদের দিতে হত। ভারতে যে ভাবে ভূমিরাজস্ব ধার্য করা হত তা ভারতীয় কর পদ্ধতিতে অবিচারের অপর এক উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। অবিচারের উৎস ছিল নানাবিধ। প্রথমত জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তটি হল এই যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে করের পরিমাণ স্থায়ী ভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত; অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্ব হিসাবে প্রদেয় কর ও পর্যায় ক্রমে সংশোধিত হত। তবে রাজ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ব্যাপারে কিছু নাগরিককে কেন তাদের আনুপাতিক অংশ দেওয়ার ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হবে, যখন কি তাদের সঙ্গীদের কাছ থেকে কঠোরভাবে তা আদায় করা হত তার কোনও যুক্তিসঙ্গত পরিস্থিতি নেই। এটা অবশ্য অবিচারের একটি মাত্র দিক তাদের প্রতি যাদের ভূমিরাজস্ব ব্যাপারে কর দেবার ক্ষমতা পর্যায়ক্রমে সংশোধিত হত। আর একটা দিক আছে যার মধ্যে কর দেওয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে ভুল ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি সন্নিবেশিত আছে। ভারতে ভূমি করের এই সংশোধনের জন্য পুনরীক্ষণের ভূমিকাটির মূল বৈশিষ্ট্যটি এই যে, কর আরোপ করার ভিত্তিটি হল জমির একটা নির্দিষ্ট একক, যা ভারতীয় বিত্তের প্রতিটি গবেষকদের কাছে সুপরিচিত। তখন পর্যন্ত এই পদ্ধতির অনিষ্টকর প্রভাবটি সম্বন্ধে সন্দেহ করে নি যা অধিকৃত জমির এককের ভিত্তিতে কর নির্দিষ্ট করত; কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এমন আর কোনও পদ্ধতি থাকতে পারে না যেটা চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এতটা ভ্রান্ত অথবা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এতটা ক্ষতিকারক হতে পারে। এটা অর্থনীতিবিদদের গতানুগতিক উক্তিকে উপেক্ষা করে যাতে জোর দিয়ে বলা হয় যে, কর বস্তুর দ্বারা নয়, ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত হয়।[১] এবং শেষ পর্যন্ত যদি ব্যক্তিকেই কর দিতে হয় তাহলে এটা সুপ্রকট যে, তাদের অবশ্যই যে জমি তাদের অধিকারে আছে, তার অনুপাতে না দিয়ে প্রাপ্ত মোট আয়ের অনুপাতে দেওয়া উচিত। জমির একক অনুসারে কর দেওয়ার দায়িত্ব নিতে গিয়ে পক্ষান্তরে ঐ পদ্ধতিতে চাষের জন্য মাত্র এক একর জমি বিশিষ্ট দরিদ্র কৃষককে এবং শত শত একর জমির মালিক ভূস্বামীকে অভিন্ন হারে কর দিতে বাধ্য করে একথা না বুঝেই যে, ঐ দুই শ্রেণীর মোট আয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অভিন্ন হারে এই কর আরোপ করাটা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এক জাজ্বল্যমান অবিচার সৃষ্টি করতে বাধ্য।

১) তুলনীয় রাজকীয় এবং স্থানীয় কর প্রথার শ্রেণীভুক্তীকরণ ও আপতন মুখ্যত সম্পর্কিত স্মারক- লিপিতে স্থানীয় কর প্রথা বিষয়ক রয়্যাল কমিশনে প্রদত্ত বিচার-বিবেচনার জন্য উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে অধ্যাপক ক্যান্নান-এর সমালোচনা।

পদ্ধতির নির্দেশে ন্যায়বিচারকে বিসর্জন দিয়ে এই ভাবে আদায় করা রাজস্ব যদি উন্নতিবিধানের জন্য কৃত্যকগুলির ব্যাপারে খরচ করা হত, তবে হয়ত কিছুটা ক্ষতিপূরণ হত। কিন্তু কার্যত তা হয় নি।

যত রাজস্ব আদায় হত তার সবটাই খরচ করা হত পুলিশ, সামরিক ও প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য, যার হিসাব করা হত নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। শিক্ষা, শিল্পে সরকারী সাহায্যের মত কৃত্যকগুলি এই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কার্যনির্বাহিক কর্তৃক পরিচালিত জনস্বার্থে ব্যয়িত অর্থের প্রকল্পে কোনও স্থান পায় নি। এখন এ প্রশ্নটা করা যায় যে, কেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এই কার্য নির্বাহিকরা প্রগতির পরিবর্তে, নিয়মশৃঙ্খলার পক্ষ সমর্থন করছে? উত্তরটা এই যে, যতই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারই হোক না কেন এক দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকার উন্নতিবিধানে অসমর্থ, কারণ তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের কাজে বাধা পেত দুটি গুরত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার দ্বারা।[১] প্রথমত দেখা যায় একটি অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা, যার উদ্ভব হয় ক্ষমতাসীনদের চরিত্র, উদ্দেশ্য এবং স্বার্থ থেকে। সুলতান যদি ইসলাম ধর্মকে উচ্ছেদ না করেন, পোপ ক্যাথলিক ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা না করেন, ব্রাহ্মণ জাতিবাদকে নিন্দা না করেন এবং ব্রিটিশ সংসদ যদি তার প্রিয়পাত্রদের সংরক্ষণকে অবৈধ ঘোষণা না করে, তবে তার কারণ এ নয় যে, তারা কাজ **করতে পারে না**। বরং এই কারণে যে তারা এই কাজগুলো **করবে না**। একই ভাবে উন্নতিবিধানের জন্য সবচেয়ে উপকারী নির্দিষ্ট কাজগুলি যদি কার্য-নির্বাহিকরা না করে থাকে তবে তার কারণ এই যে এদের নৈর্ব্যক্তিক[২] হওয়ার জন্য এবং

---

১) এ বিষয়ে একটি প্রাঞ্জল আলোচনার জন্য তুলনীয় এ. ভি. ডাইসি-র **সংবিধানের বিধিনিয়ম**, ১৯১৫, পৃষ্ঠা ৭৪-৮২।

২) নৈর্ব্যক্তিক ছিল এই কারণে যে, জনপালন কৃত্যকগুলির উচ্চতর ও নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীগুলির মধ্যে ভারতীয় উপাদান ছিল না। জনপালন কৃত্যকে ভারতের দেশজ ব্যক্তিদের নিযুক্তির যোগ্যতা বহু আগে ১৮৩৩ সালে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতে জনপালন কৃত্যকে প্রবেশাধিকারের জন্য মন্ত্রি কর্তৃক রচিত বিধি-নিয়মের প্রবণতা ছিল সংবিধি কর্তৃক তাদের জন্য অনুমোদিত নিযুক্তির অধিকারকে বাদ দেওয়া। যুদ্ধ মন্ত্রী কর্তৃক রচিত বিধি-নিয়ম অনুসারে সেনাবাহিনীতে কমিশনের জন্য প্রার্থীদের হতে হবে খাঁটি ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত এবং অনুরূপ বিধি-নিয়ম নৌবাহিনীতে সামরিক শিক্ষানবিসের জন্য নৌ-বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। তার ফলে ভারতীয়রা বাদ পড়েছিল। জনপালন কৃত্যকের ক্ষেত্রে সংবিধিতে (১৮৫৮ সালের ভারত সরকার আইন, ধারা ৩২) বলা হয়েছিল যে সম্রাটের সকল 'স্বদেশ-জাত প্রজাদের' পরীক্ষা দিতে অনুমোদন করা হত। তার ফলে ভারতের দেশজ ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষা হবে শুধু লন্ডনে এই মর্মে মন্ত্রীর বিনির্দেশ পরোক্ষ ভাবে দেশের বহু দেশজ ব্যক্তিকে সংবিধি থেকে সুযোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে বঞ্চিত করেছিল। অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কৃত্যকে প্রবেশধিকার সম্পর্কিত বিধিনিয়মগুলির মধ্যে তারতম্য ছিল। ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগ কৃত্যকে প্রার্থীদের 'স্বদেশজাত প্রজা অথবা পূর্বভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল; ভারতীয় পুলিশ কৃত্যকের জন্য ইউরোপীয় বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ প্রজা হতে হত; বনবিভাগ কৃত্যকের জন্য প্রার্থীদের হতে হত স্বদেশজাত ব্রিটিশ প্রজা; বাস্তুকর্ম বিভাগে ভারতের দেশজদের মধ্যে থেকে এক-দশমাংশকে নেওয়া হত'। যারা ব্রিটিশ প্রজা ছিল। তুলনীয়। এই প্রসঙ্গে হলসবেরি **ইংল্যান্ডের নিয়মাব**[illegible], খণ্ড [illegible], পৃষ্ঠা ৫৮৮-৯।

ব্যয়ের শতকরা হার

(বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলি অর্থাৎ পোস্ট অফিস এবং টেলিগ্রাফ বিভাগ, রেলওয়ে এবং সেচ-ব্যবস্থা, সমস্ত খরচ বাদে)
হাজার টাকার হিসাবে।

পর্য্যায়কাল	জিলা প্রশাসন	বন	আফিং সহ অন্যান্য খাত	ঋনের উৎস	অসামরিক বিভাগ	অসামরিক পরিবর্তন	অসামরিক কাজকর্ম (কারখানাসহ)	সৈন্যবাহিনী (সাময়িক কারখানা ও বিশেষ প্রতিরক্ষা কারখানাসহ)	দুর্ভিক্ষ ত্রান এবং বীমা	মোট
১৮৭৭-৭৮ থেকে ১৮৮১-৮২	৫.২	.৮	৫.৬	৮.৯	১৮.৭	৬.৮	৫.৮	৩৯.২	২.৬	৯৩.৬
১৮৮২-৮৩ থেকে ১৮৮৬-৮৭	৬.০	১.২	৬.৬	৮.২	২১.৪	৭.৫	৭.৬	৩৫.৬	২.৩	৯৬.৪
১৮৮৭-৮৮ থেকে ১৮৯১-৯২	৬.০	১.৩	৫.৪	৭.৬	২২.১	৭.৫	৭.৩	৩৭.৭	২.৮	৯৫.৭
১৮৯২-৯৩ থেকে ১৮৯৬-৯৭	৬.১	১.৩	৪.৯	৬.৪	২২.৫	৮.৪	৬.৯	৩৮.৫	১.৬	৯৬.৬
১৮৯৭-৯৮ থেকে ১৯০১-০২	৫.৮	১.৪	৫.৫	৪.৩	২২.৬	৭.৮	৬.৮	৩৫.২	৪.৮	৯৪.২
১৯০২-০৩ থেকে ১৯০৬-০৭	৫.৯	১.৬	৮.২	৩.১	২৩.২	৭.৬	৯	৩৭.১	১.৮	৯৭.২
১৯০৭-০৮ থেকে ১৯১১-১২	৬.৩	১.৮	৭.১	৩.৫	২৫.৭	৭.৭	৮.৫	৩৫.৬	২.১	৯৮.৩
১৯১১-১৩ থেকে ১৯১৬-১৭	৬.০	১.৯	৬.২	২.১	২৮.২	৭.৩	৯.৩	৩৫.১	১.৫	৯৭.৬

ব্রিটিশ ভারতের পরিসংখ্যান থেকে, খণ্ড ২, বিত্ত বিষয়ক পরিসংখ্যায়, ১৯২০, পৃষ্ঠা ৭

তাদের চরিত্র। উদ্দেশ্য এবং স্বার্থের জন্য ভারতীয় সমাজে সক্রিয় থাকা জনশক্তির সঙ্গে সহানুভূতি দেখাতে পারে নি, এবং তাদের চাহিদা, তাদের দুঃখকষ্ট। তাদের আকুল কামনা, এবং তাদের অভিলাষের দ্বারা উদ্দীপিত ছিল না, বরং তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে শত্রুভাবাপন্ন ছিল, শিক্ষার অগ্রগতি ঘটায় নি, স্বদেশিয়ানাকে সমর্থন করে নি অথবা যার মধ্যে জাতীয়তাবাদের আভাস ছিল তার বিরোধিতা করত সঙ্গে সঙ্গে এবং এর মূল কারণ ছিল এসব কিছুই ছিল সাধারণ প্রবণতার বিরুদ্ধে। কিন্তু এক দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকার যা করতে চায় সেটুকু করারও ক্ষমতা তার থাকে না। কারণ বাইরের বাধার ফলে তার কর্তৃত্ব সীমিত। এমন কিছু কাজ থাকে যা তার করা উচিত কিন্তু করতে সাহস পায় না এই আশংকায় যে, তার ফলে নিজের কর্তৃত্বে বাধা আসতে পারে। সিজার রোমবাসীর ভক্ত-পূজাকে পরাভূত করে না, আধুনিক যুগের সংসদ উপনিবেশগুলির উপর কর চাপাতে সাহস করে না। যতটা বেশি তাদের করতে চায়। ঐ একই কারণে ভারত সরকার জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ করতে, এক বিবাহের নিয়ম নির্দিষ্ট করতে। উত্তরাধিকার আইন বদল করতে, অসবর্ণ বিবাহ বৈধ করতে অথবা চা আবাদকারীদের উপর কর বসাতে সাহস করে নি। উন্নতি বিধানের সঙ্গে সমাজ জীবনের বর্তমান আইন সম্পর্কিত নিয়মাবলি ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ব্যাপারটি জড়িত এবং হস্তক্ষেপ করলে বাধা আসা সম্ভব। তৎসত্ত্বেও যে সরকার জনগণের এবং যা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সেই সরকার প্রগতির পথে এগোতে পারে। কারণ তার পক্ষেই জানা সম্ভব কখন আজ্ঞানুবর্তিতার অবসান ঘটবে এবং প্রতিরোধ শুরু হবে। কিন্তু ভারতস্থ কার্য-নির্বাহিকরা জনগণের নিজের লোক না হওয়ার ফলে দেশবাসীর নাড়ীর স্পন্দনকে বুঝতে পারেনি। বিষয়ের সারমর্মটি এই যে, ভারতে ক্ষমতাসীন থাকা দায়িত্বজ্ঞানহীন কার্য-নির্বাহিকরা তাদের কর্তৃত্বের এই দুই সীমাবদ্ধতার মধ্যে পঙ্গু হয়েছিল এবং যা জীবনযাত্রাকে সুন্দর করে তুলতে পারত তার অধিকাংশই স্থগিত রাখা হয়েছিল। কর্মসূচির একাংশের তারা দায়িত্ব নিতে চাইত না এবং বাকি অংশটুকুর দায়িত্ব তারা নিতে পারত না। এর ফলে জনগণের নৈতিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে মোঘল সরকারের পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারের স্থাপনা শুধু শাসকদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। পদ্ধতিতে কোনও পরিবর্তন আনেনি। ব্রিটিশ কর্তৃক আংশিক প্রয়োজনের খাতিরে এবং আংশিক অগ্রাধিকারের ফলে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করার জন্য।

'ভারতের দেশজ মানুষ এমন এক সরকারের অধীনস্থ হয়েছিল, যার সঙ্গে সেই সরকারের কোনও বিশেষ পার্থক্য ছিল না, যে-সরকারের অধীনে তারা কঠোর পরিশ্রম করেছিল এবং পূজা করেছিল, তাদের ক্লান্তিকর ও বিশ্রুত ইতিহাসের ধারায় জীবন-

মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত-ও হয়েছিল। রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে এই পরিবর্তন ছিল এক স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে অপর একটির প্রতিস্থাপনা। যে ব্যবস্থা তারা প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখেছিল সেটাকেই গ্রহণ করেছিল[১] এবং চীনা দরজির মত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেটাকেই সংরক্ষিত করেছিল, যে নমুনা হিসাবে একটা পুরনো কোট পেলে ছেঁড়া-ফাটা অংশ তালিমারা ইত্যাদিসহ ঠিক ঐ রকম একটা কোট সেলাই করে গর্ব অনুভব করে'।[২]

পার্থিব প্রগতি যে কিছুটা হয়েছিল এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু পৃথিবীর কোনও মানুষই দীর্ঘকাল শান্তি-শৃঙ্খলার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কারণ তারা বাক্‌শক্তিহীন নির্বোধ নয়। একথা মনে করা নির্বুদ্ধিতা যে, মানুষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য একটি আমলাতন্ত্রকে সমর্থন করবে এই জন্য যে, ঐ আমলাতন্ত্র তাদের পথ-ঘাটের উন্নতি বিধান করেছে বা আরও উন্নততর বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে খাল নির্মাণ করেছে, রেলপথে পরিবহনের কাজ সুগম করেছে, এক পেনি ডাক মাসুলের তাদের চিঠি পৌঁছে দিয়েছে, বিদ্যুৎ তরঙ্গের মাধ্যমে তাদের খবর পৌঁছে দিয়েছে। উন্নতমানের মুদ্রা দিয়েছে, তাদের ওজন-বাটখারা নিয়ন্ত্রিক করেছে, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের ধারণা সংশোধন করে দিয়েছে এবং বন্ধ করে দিয়েছে তাদের অভ্যন্তরীণ কলহ। যে কোনও মানুষ। যত ধৈর্য-শালীই হোক না কেন। কোনও না কোনও সময়ে এমন একটি সরকারের দাবি করবে যাকে নিছক দক্ষতার যন্ত্রের চেয়ে বেশি কিছু হতে হবে। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার সম্পর্কিত পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে ভারতীয় জনগণ কিছু কাল থেকে সরকারের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন দাবি করে আসছিল। সংসদীয় কার্যনির্বাহিক বিশিষ্ট একটি সংসদীয় গঠনতন্ত্রের সরকারের কল্পনাই ছিল তাদের সামনে।

এই লক্ষ্যে সাফল্য অর্জনের জন্য জনগণের বিক্ষোভ এমন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, এক সময়ে ভারতে কার্যনির্বাহিকদের সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করার জন্য তা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিল। কি ভাবে দেশের সরকার পরিচালিত হবে? শক্তি প্রয়োগের দ্বারা, না ঐকমত্যের দ্বারা, ক্ষমতা ,কদাচিৎ স্বেচ্ছায় নিজের মৃত্যু বরণ করে। বরং যখন জনগণের কাছ থেকে স্বেচ্ছাকৃত বশ্যতা অর্জনে ব্যর্থ। তখন শক্তি প্রয়োগ করে ভারতস্থ কার্যনির্বাহিকরা এই উপায়টিই গ্রহণ করেছিল। প্রতিরোধক বিধি-বদ্ধ আইনের দ্বারা অপরাধের মোকাবিলা করতে অপরাধ ও দণ্ডবিধির শর্তাবলির

১) ব্রহ্মদেশে মাথাপিছু ধার্য কর অব্যাহত রাখা হয়েছিল নিছক এই কারণে যে, ঐ দেশটি জয় করার দিন ঐ কর বর্তমান ছিল।

২) বেনার্ড হাউটন, আমলাতান্ত্রিক সরকার।

দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত কার্য নির্বাহিকরা যে ক্ষমতার সাহায্য পেত তা নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে তারা ভারতীয় সংবিধি শাস্ত্রকে মসীলিপ্ত করেছিল একগুচ্ছ দমনমূলক বিধিনিয়মের দ্বারা যার অনুরূপ নিয়ম পৃথিবীর অন্য কোনও অংশে আছে বলে মনে হয় না। ১৯০৮ সালের ফৌজদারি আইন সংশোধনী অধিনিয়ম নং চতুর্দশ সরকারের বিশেষ অনুমোদনক্রমে ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দিয়েছিল অভিযুক্তের বা তার বৈধ প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে একতরফা তদন্ত চালাবার এবং জুরি ছাড়াই তাকে বিচারার্থে প্রেরণ করার। ঐ অধিনিয়মের অন্য এক শর্তানুসারে কার্যনির্বাহিক যে-কোনও সমিতিকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারত, যে সমিতি তার মতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। এমন একজন ব্যক্তি যার ব্যাপারে সন্দেহ আছে অথচ তার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রাজ্য বন্দী প্রবিধান[১] এবং অধিনিয়মগুলি[২] কার্যনির্বাহিকদের যে ক্ষমতা দিয়েছিল সেগুলিকে এমন গঠিত করেছিল যার ফলে বন্দীপ্রদর্শন অধিনিয়ম[৩] (Habeas Corpus Act) চিরকালের জন্য স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। যখন অন্য এক অধিনিয়মের[৪] বলে কার্যনির্বাহিকদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে-কোনও এলাকাতে 'অবরুদ্ধ রাজ্য' বা সমরিক আইনজারির ঘোষণা করার। ১৯১০ সালের ভারতীয় সংবাদপত্র আইন সংবাদপত্রের মুখে মুখবন্ধনী পরিয়ে দিয়েছিল পুরো মাত্রায়। এর শর্তগুলি এত সুদূর প্রসারিত ছিল যে ভারতের উচ্চন্যায়ালয়ের এক বিজ্ঞ বিচারপতির[৫] অভিমতে 'এটা দেখা কঠিন ছিল, কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক এর কার্যকারিতা ন্যায়সঙ্গত ভাবে কতদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা যেতে পারে এবং তারা অবশ্যই সেগুলিকে লেখালিখির ব্যাপারে প্রয়োগ করবে যেগুলির জন্য অনুমোদন অত্যাবশ্যকীয় হবে এবং যেগুলি বিশেষ ভাবে প্রামাণ্য সাহিত্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে সেগুলি অবশ্যই উপলব্ধি করা যেতে পারে।' এই ভাবে জনসভা করার অধিকারকে দমন করে রাখা হয়েছিল এবং একই কঠোরতার সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ও আলোচনা করার অধিকার ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল; কারণ দেশের সাধারণ আইন প্রদত্ত সীমাবদ্ধকর শর্তাবলি ছাড়াও[৬] এবং জনস্বার্থের সঙ্গে

---

১) ১৮১৮ সালে বঙ্গদেশ প্রবিধান নং ৩; ১৮২৭ সালের বোম্বাই প্রবিধান নং ২৫; ১৮১৯ সালের মাদ্রাজ প্রবিধান নং ২

২) ১৮৫০ সালের প্রবিধান নং ২৪ এবং ১৮৫৮ সালের প্রবিধান নং ৩

৩) এন. ঘোষ, তুলনামূলক প্রশাসনিক বিধি-নিয়ম, ১৯১৮। পৃষ্ঠা ৪৮০

৪) ১৮৫৭ সালের প্রবিধান নং ৯

৫) স্যার লরেন্স জেনকিন্স, প্রধান বিচারপতি, বিষয়, মহমেদালি, ইন্ডিয়ান ল, রিপোর্ট, ৪০, কলকাতা ৪৬৬ (১৯১৩)। এন. ঘোষের উদ্ধৃতি। পৃ : ৫৬৭।

৬) ফৌজদারি প্রক্রিয়া বিধির ধারা ১০৮ এবং ১৪৪ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ এ. ও. বি এবং ১২৪-এ নং ধারা।

জড়িত বলে পরিগণিত হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে যে কোনও জনসভা নিষিদ্ধ করতে বিশেষ আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার বলেও বলীয়ান ছিল কার্য-নির্বাহিকরা।

গ্রেপ্তার ও কয়েদ করার রাজকীয় পরোয়ানা (Leltre de Cachet) এবং **সুদৃঢ় কারাগারের** (Bastille) এই শাসনতন্ত্রের কঠোর ব্যবস্থা এই সব দমনমূলক আইনগুলিকে কার্যকর করার ব্যাপারে কার্য নির্বাহিকদের তরফ থেকে বাড়াবাড়ি করার দায়িত্ব সম্বন্ধে কোনও রকম ভীতির দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে অপরিমিত ছিল। কারণ এটা লক্ষ করতে হবে যে, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জনগণের স্বাধীনতা অবদমিত করে রাখার এই সব খেয়ালখুশি মত কাজ করার ক্ষমতা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাপক অনুমোদনগুলির সঙ্গে কার্যনির্বাহিকরা ঐ সব ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করার জন্য তাদের প্রতিনিধিদের অব্যাহতি দেবার ব্যাপারে সমপরিমাণ উদার ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুদানও দেওয়া হয়েছিল।[১] পুলিশ অধিনিয়ম এবং সংবাদপত্র অধিনিয়মের **সবগুলিতেই** এমন সব শর্তাদি ছিল তার ফলে এই অধিনিয়মগুলি অনুসারে কোনও কিছু করার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে এইসব প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি আদালতে সব রকমের মামলা করা নিষিদ্ধ ছিল। দাঙ্গা দমনে অংশগ্রহণকারী সকল আধিকারিক ও সৈন্যরা সরল বিশ্বাসে কৃত কর্মের জন্য অপরাধের দায়িত্ব মুক্ত ছিল এবং সরকারের অনুমোদন ছাড়া কৃত যে-কোনও অন্য কাজের জন্য অভিযুক্ত হত না।[২] সরকারের অনুমতি ছাড়া অন্যসব রকমের সরকারি কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে যদি কোনও অপরাধ করে ফেলে তবে ঐ ভাবে উচ্চশ্রেণীর কার্যনির্বাহিক আধিকারিকরা অভিযুক্ত হত না এবং হলেও সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতেই তা করা হত।[৩] অতএব এতে আশ্চর্যের কিছুই ছিল না যে আইন-বহির্ভূত ভাবে প্রয়োগ করা ঐ ধরনের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলি শান্তির শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে আতঙ্কের শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল যে একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা চালানোর জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ সুনিশ্চিত উপায় নয়। ইতিহাসের রায়টি সুন্দরভাবে সংক্ষেপে বলেছিলেন বার্ক,[৪] যখন তিনি বলেছিলেন:

'কেবল মাত্র ক্ষমতার ব্যবহার চিরস্থায়ী হতে পারে না। তা স্বল্পকালের জন্য বশে আনতে পারে, কিন্তু তা আবার বশে আনার প্রয়োজনকে বিদুরিত করে না, চিরকাল বলপ্রয়োগে জয় করতে হবে এমন জাতিকে শাসন করা যায় না। ক্ষমতা সম্পর্কে

---

১) এন. ঘোষ। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৬০১।

২) ফৌজদারি প্রক্রিয়া বিধির অধিনিয়ম নং ৫, ১৮৯৮, অধ্যায় নবম, ১২৮, ১৩০ এবং ১৩২ ধারা।

৩) পূর্বোক্ত গ্রন্থ ১৯৭ নং ধারা।

৪) আমেরিকার সঙ্গে আপস-মীমাংসা সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পরবর্তী আপত্তি (টি) হল তার অনিশ্চয়তা। সন্ত্রাস সব সময়ে ক্ষমতার ফলশ্রুতি হয় না; এবং যুদ্ধার্থে প্রস্তুত সৈন্যদলও জয়ের সূচনা করে না। সফল না হলে সঙ্গতি থেকে বঞ্চিত হতে হবে; আপস-মীমাংসা ব্যর্থ হলে, ক্ষমতা টিকে থাকে বটে কিন্তু ক্ষমতা ব্যর্থ হলে, আপস মীমাংসার আর কোনও আশা অবশিষ্ট থাকে না। কখনো কখনো সদাশয়তা দিয়ে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করা যায়। কিন্তু সেগুলি কখনো ভিক্ষা হিসাবে প্রার্থনা করা যায় না দুর্বলও পরাজিত হিংস্রতার দ্বারা। ক্ষমতার প্রয়োগ সম্বন্ধে অপর আপত্তিটি এই যে, সংরক্ষিত করার চেষ্টা করতে গিয়ে মূল উদ্দেশ্যটিরই ক্ষতিসাধন করা হয়ে যায়। যার জন্য সংগ্রাম করা হচ্ছে (অর্থাৎ জনগণের আনুগত্য) সেটা সেই বস্তু নয় যা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা হচ্ছে। পরিবর্তে প্রতিযোগিতার ব্যাপারে তার অবমূল্যায়ন, বিসর্জন, অপচয়ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। ঐকমত্যের দ্বারা রচিত সরকার বহু আগেই রাজনৈতিক প্রজ্ঞার নীতি হিসাবে ভারতীয় কার্যনির্বাহিকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল এবং মাঝে মাঝে ভারতের বিধানমণ্ডলের সংবিধানে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছিল সেগুলি অবশ্যই সর্বসম্মতিক্রমে করা হয় জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যে। কিছু কালের জন্য এর ফলশ্রুতিটি হয়েছিল ভারতস্থ কার্যনির্বাহিক ও ভারতীয় বিধান মণ্ডলীর মধ্যে এক বিস্ময়কর মাত্রায় ঐকমত্য হওয়ার; এবং তা এতদূর এগিয়েছিল যে **গ্রেপ্তার ও কয়েদ করার রাজকীয় পরোয়ানা ও সুদৃঢ় কারাগারের** শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে **ভারতীয় বিধান মণ্ডলীর** অধিকাংশদের অনুমোদন পর্যন্ত পেয়েছিল। কিন্তু ঐকমত্যের বা আপস মীমাংসার এই সব প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল প্রতারিত করার কৌশলমাত্র। অপর দিকে ভারতীয় বিধান মণ্ডলের সংবিধানে মাঝে মাঝে যে পরিবর্তন করা হয়েছিল তা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এই সব পরিবর্তনের পিছনে যে উদ্দেশ্য ছিল তা হল বিধানমণ্ডলীকে একটি অক্ষম সংস্থা বা কার্যনির্বাহিকদের হাতে এক অনুগত যন্ত্রে পরিণত করা। কার্যনির্বাহিকদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক বিধান মণ্ডলীর প্রথম[১] অভিষেক হয় ১৮৫৩ সালে[২]। কিন্তু ১৮৬১ সালে[৩] সেই সময়ে বর্তমান বিধান মণ্ডলীর সংবিধান বদলে দেওয়া হয়। কারণ দেখানো হয়েছিল এই যে, বিধান মণ্ডলী ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব মূলক সংস্থা নয়। এর সদস্যদের নেওয়া হত কয়েকটি প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী সরকারি

১) ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত কার্যনির্বাহিকরা ছিল বিধানমণ্ডলী। ১৮৩৩ সালে কার্যনির্বাহক পরিষদে একজন আইন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার কাজ ছিল আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কার্যনির্বাহিক পরিষদকে কেবলমাত্র সাহায্য করা। ১৮৫৩ সালের অধিনিয়মের বলে ঐ সদস্যকে কার্যনির্বাহিক পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

২) ১৬ এবং ১৭ ভিক্টোরিয়া, সি-৯৫

৩) ২৪ এবং ২৫ ভিক্টোরিয়া, সি-৬৭

৪) ১৮৫৩ সালের অধিনিয়মের দ্বারা সর্বোচ্চ বিধান মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল মনোনীত সদস্যদের দ্বারা যার মধ্যে ছিল বঙ্গদেশের উচ্চ ন্যায়ালয়ের দুইজন বিচারপতি এবং ভারত সরকারের কার্যনির্বাহিক পরিষদের সদস্যরা ছাড়াও ছিল বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাইও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সরকারগুলির চারজন মনোনীত সরকারি প্রতিনিধি।

শ্রেণী থেকে। বিধান মণ্ডলীকে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্য ১৮৬১ সালের অধিনিয়মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, এটা গঠিত হবে জনগণের মধ্যে বড়লাটের বেছে নেওয়া মনোনীত সদস্যদের দ্বারা, এবং অবশ্যই কার্যনির্বাহিকদের পরামর্শ অনুযায়ী। আবার ১৮৯২ সালের অধিনিয়মের দ্বারা বড়লাটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিধান মণ্ডলীতে সেই সব ব্যক্তিদের মনোনীত করা, যারা দেশের জনসংস্থাগুলির দ্বারা নির্বাচিত হবে। বিধান মণ্ডলের সংবিধানে এই সব পরিবর্তনগুলি থেকে এটা মনে হত যে, সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল উদারীকরণ করা। কিন্তু কার্যনির্বাহিকদের ব্যাপারে তাদের আরও শক্তিশালী করার প্রবণতার সঙ্গে বিধানমণ্ডলকে প্রতিনিধিত্বমূলক করার প্রবণতাটা কি সংযুক্ত? বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীতই হত। বিধান মণ্ডলী যত বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র অর্জন করেছে ততটাই হারিয়েছে তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। ১৮৫৩ সালের অধিনিয়মের অধীনে বিধান মণ্ডল যে ক্ষমতার ব্যবহার করত তা অনেক বেশি ছিল ১৮৬১ সালের অধিনিয়মের অধীনে বিধান মণ্ডল যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল তার চেয়ে। প্রথমোক্ত অধিনিয়মের অধীনে ভারতীয় বিধান মণ্ডল ইংল্যান্ডের লোকসভার কর্ম পদ্ধতির আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলেছিল, এবং কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের ব্যাপারগুলি নিয়েই যে কাজ করত তা নয়, সেই সঙ্গে প্রশাসনের ব্যাপারগুলিও দেখত। স্যার সি. ইলবার্টের মন্তব্য অনুসারে কার্যনির্বাহিক সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাগুলির যথার্থতা সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রশ্ন উত্থাপন করে স্বাতন্ত্রের এক অসুবিধাজনক মাত্রাটিকে তা দেখিয়েছিল— এটা ধরে নিয়ে যে, তা অপব্যবহার ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে স্থানীয় প্রশাসনগুলির কাছ থেকে প্রতিবেদন ও সরকারী বিবরণ পেশের দাবি জানান। কার্যনির্বাহিক সরকারের সাহায্য ছাড়াই উত্থাপিত প্রস্তাব ও গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রবর্তন করা ও জনস্বার্থ বিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে দীর্ঘ বিতর্ক চালান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার যোগ্যতা বিশিষ্ট। ঐ সময়ে লর্ড ক্যানিং-এর প্রেরিত এক সরকারী বার্তায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, বিধান মণ্ডলী সেইসব নিদর্শ পত্র ও কার্য-পরিচালনার প্রণালীগুলির অধিকারী হয়েছিল। যেগুলির সঙ্গে ইংল্যান্ডের লোকসভার অনুরূপ বিষয়গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য রেখে অনুকরণ করা হয়েছিল; পরিষদে সম্মিলিত হওয়া এক ডজন ভদ্রলোকের কার্যপরিচালনা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ১৬৬টি স্থায়ী নির্দেশ ছিল। অর্থাৎ সংক্ষেপে স্যার লরেন্স পিলের মন্তব্য অনুসারে সেগুলি বিচারের মাধ্যমে জাতি সম্পর্কিত ব্যাপক অনুসন্ধানের মত বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট অধিক্ষেত্রের ভূমিকা নেয়। ১৮৫৩ সালের অধিনিয়ম কর্তৃক যে ভাবে গঠিত হয়েছিল সেই ভাবে বিধান মণ্ডলে এটাকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি (!!) হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। অতএব এর সংস্কার সাধনকে কার্যনির্বাহিকদের আধিপত্য

বজায় রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখা হত, এবং এর যে অংশ জনপ্রিয় নয় সেই বৈশিষ্ট্যটিকে এর পুনর্গঠনের জন্য লোক-দেখানো অজুহাত হিসাবে দেখানো হত। ১৮৬১ সালে প্রবর্তিত ছদ্ম-প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি অনুসারে বিধানমণ্ডল ছিল এক নিরীহ সংস্থা যা পুরোপুরি ছিল কার্যনির্বাহিকদের মুঠোয়। মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হওয়ার ফলে তার জন্য বিধান মণ্ডলে বিভাজন প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হত। প্রতিটি বিধানিক সংস্থায় একজন মানুষ সেই ক্ষমতার বলে আসীন হবে যাকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় আইনগত আদেশ, অবশ্য যদি না তার বংশগত অধিকার থাকে। ঐ আইনগত আদেশ সাধারণত সেই কর্তৃত্ব ক্ষমতা থেকে উৎসাহিত হয়। যার কাছে সে তার আসনটির জন্য ঋণী। মনোনীত সদস্যরা, সরকারি অথবা বে-সরকারি কার্যনির্বাহিকদের সন্তুষ্টি সাধনে বিধান মণ্ডলের সদস্যপদে উন্নীত হবার জন্য বাধিত থাকত এবং সে-কারণে যে ব্যাপারে মতভেদ হত সেক্ষেত্রে তারা কার্যনির্বাহিকদের সমর্থন করতে বাধ্য থাকত। কার্যনির্বাহিকরা সব সময়ে মনোনীত সদস্যদের সরকারি গোষ্ঠীকে নিজেদের আজ্ঞাধীন অবস্থায় পেত, যারা কার্যনির্বাহিকদের আইনগত আদেশের ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় আনুগত্য দেখাত, হয় তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে, নয় তাদের একটি অঙ্গ হবার কারণে। মনোনীত বেসরকারি সদস্যরা, যাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের ব্যাপারে কার্যনির্বাহিকদের বিরোধিতা করা সম্ভব বলে বলা যেতে পারে, তারা কিন্তু স্বাধীন চরিত্রের মানুষ ছিল না এবং বেশির ভাগ মাথা ঘামাত কার্যনির্বাহিকদের মনোমত হয়ে ওঠার ব্যাপারে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার পরিবর্তে। কিন্তু যদি তারা স্বাধীন চরিত্রের মানুষ হত তবে নিজেদের কার্যনির্বাহিকদের নিয়ন্ত্রক হতে দিত না, কারণ বিধান মণ্ডলের সৃষ্ট সাংবিধানিক আইনের শর্তাবলি এবং কার্যপরিচালন পদ্ধতির নিয়মাবলির ফলে তা সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন হয়ে উঠেছিল যার জন্য তাদের ইচ্ছাগুলির বিরুদ্ধে কিছু করতে কার্যনির্বাহিকদের বাধ্য করতে পারত। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত বিধান মণ্ডল বিধানিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারগুলির দেখাশোনা করত। ১৮৬১ সাল থেকে বিধান মণ্ডলের অধিবেশন বসত কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের জন্য। এই সীমাবদ্ধতার ফলে বিধান মণ্ডলকে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে, প্রস্তাব পেশ করতে বা বাজেট সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করতে দেওয়া হত না। এর অস্তিত্বের প্রথম ত্রিশ বছর বিধান মণ্ডল ষোলো বারের বেশি এমন কি বাৎসরিক বাজেট নিয়েও আলোচনা করে নি এবং তাও করেছিল, কারণ কিছু নতুন কর সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের দাবি করা হয়েছিল এবং যা কার্যনির্বাহিকরা কার্যকর সব সময়ে করে নিতে পারত মনোনীত সরকারি গোষ্ঠীর দ্বারা, যা তারা অন্য সব ধরনের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে করে আসছিল প্রয়োজন মনে করায় বার্ষিক বিত্তীয়

বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনার অধিকার এবং বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার বিধান মণ্ডলকে প্রথম অর্পণ করা হয় ১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ অধিনিয়মের অধীনস্থ কার্য পরিচালনা পদ্ধতির নিয়মাবলির দ্বারা। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হতেই পারে যে, বিধান মণ্ডলকে এই সব ক্ষমতা প্রদান করাটা তাদের পদমর্যাদা পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া বোঝায় কিনা, যা তাদের অধিকারে ছিল এবং ১৮৫৩ সালের অধিনিয়মের বলে যে আধিপত্য তারা খাটাতো।

এমন কি লর্ড মর্লে সাধিত সংস্কারগুলিও কার্যনির্বাহিকদের উপরে বিধান মণ্ডলকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা প্রদানের ব্যাপারে পর্যাপ্ত ছিল না। ১৯০৯ সালে তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলিকে সরাসরি বা বাছাইয়ের পর মনোয়ন দেওয়াটা নীতিগতভাবে প্রতি স্থাপিত হয়েছিল নির্বাচনের দ্বারা বিধান মণ্ডলের সংবিধানের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে বিধান মণ্ডলের কার্য পরিচালন পদ্ধতির উদারীকরণ করা হয়েছিল যা সদস্যদের ক্ষমতা দেওয়া হয় বিতর্ক কালে উত্থাপিত প্রশ্নের সঙ্গে অতিরিক্ত প্রশ্ন করার, বিত্তীয় বিবরণ সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করার এবং সাধারণ জনস্বার্থমূলক ব্যাপার সম্পর্কেও। কিন্তু যৎসামান্য বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে কার্য নির্বাহিকদের আধিপত্য বিনষ্ট না করে বিধান মণ্ডলের উদারীকরণের ব্যাপারে এই প্রচেষ্টাও ছিল একটি চাল মাত্র।[১] কার্যনির্বাহিকদের এই আধিপত্য বজায় রাখা হয়েছিল (১) বিধানমণ্ডলে সরকার মনোনীত আধিকারিকদের এক স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে এবং (২) কার্যপরিচালন পদ্ধতির নিয়মাবলি নিয়ন্ত্রণে রেখে, যদিও বিধান মণ্ডলের গঠন-বিন্যাসের ভিত্তি হিসাবে ১৮৯২ সালের অধিনিয়মের দ্বারা নির্বাচনের[২] কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচিত সদস্যরা থাকতেন সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে। ফলে তাঁরা যে জনগণের

---

১) আয়ারল্যান্ডের স্ব-শাসনের বিষয়টিকে সমর্থনের দ্বার উদার পন্থারসমর্থক হিসাবে জগৎ-জোড়া খ্যাতি অর্জনকারী লর্ড মর্লে, ভারতে রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের প্রবর্তন করার সময় বলেছিলেন: "যদি আমি জানতে পারতাম যে যদি আমার আয়ুষ্কাল, সরকারি বা দেহগত যা হওয়া উচিত তার চেয়ে কুড়ি গুণ বেশি হত, তবে ভারতে সংসদীয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হলে দু:খ বোধই করতাম। ভারতে সংসদীয় পদ্ধতি সেই লক্ষ্যমাত্রা নয় যার জন্য আমি মুহূর্তের জন্যও সাগ্রহে আকাঙক্ষা করব।"

২) এটি আসলে ছিল এক ধরনের বাছাই করার পদ্ধতি। ১৮৬১ সালের অধিনিয়ম এবং ১৮৯২ সালের অধিনিয়মের মধ্যে একমাত্র যে পার্থক্য ছিল তা হল এই যে, প্রথমোক্ত অধিনিয়ম অনুসারে কার্যনির্বাহিকদের সরকার নিজেদের ইচ্ছামত বিধান মণ্ডলে যে-কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারত। শেষোক্ত অধিনিয়মের অধীনে কার্যনির্বাহিক-সরকার মনোনীত করতে পারত জনসাধারণের সেই অংশের উপদেশ অনুসারে যারা এই ব্যাপারে সহায়তা করার যোগ্য বলে বিবেচিত হত।" কিন্তু বাছাই করা ব্যক্তিকে যেহেতু সরকার নিযুক্ত করতে বাধ্য থাকত না, তাই দ্বিতীয়টি তা সেটা যতই গোপন রাখা হোত না কেন, সেটাকে অবশ্যই ঠিক প্রথমটির মতই কার্যনির্বাহিক কর্তৃক মনোনয়ন বলে গণ্য করতে হত।

প্রতিনিধিত্ব করতেন তাদের মনোবাঞ্ছাকে রূপদান করতে পারতেন না। কার্যনির্বাহিকরা[1] অনুমতি দিলেই তারা প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকারী হতেন। কিন্তু কার্যনির্বাহিকরা তা মেনে চলতে বাধ্য থাকত না। সেগুলি শুধু সুপারিশ হিসাবে কার্যকর হত। এবং তা কার্যনির্বাহিকদের উপর বাধ্যতামূলক ছিল না। প্রত্যক্ষভাবে এই ধরনের বাধাদানের ফলে কার্যনির্বাহিক এবং বিধান মণ্ডলের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হত। এক বিশেষ অর্থে ১৯৫৯ সালের সংস্কার সাধনগুলি কার্যপরিচালনার কৌশলের ক্ষেত্রে একটা ক্ষতিকর পদক্ষেপ ছিল। ১৯৫৯ সালের আগে যা-কিছু বিরোধ ছিল তা প্রকাশ পেত বিধান মণ্ডলের বাইরে। কারণ নির্বাচন ও কার্যপরিচালন পদ্ধতির নিয়মাবলির ফলে বিধানমণ্ডলের মুখবন্ধ করে রাখত সম্পূর্ণভাবে। ফলে কোনও ক্ষতিসাধন করতে পারত না। ১৯০৯ সালের সংস্কার সাধনের দ্বারা অবশ্য বিধান মণ্ডলকে স্বাধীন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এবং সেই সঙ্গে মুখবন্ধ রাখাও হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত উদ্ভাবনক্ষম হওয়ার ফলে, কার্যনির্বাহিক ও জনগণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী শক্তিগুলির মধ্যে গভীর অন্তস্থলে থাকা বিরোধকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে তুলত। বিধান মণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণকারী কাজকর্মের পদ্ধতি বা নির্বাচন পদ্ধতিটি অধ্যাপক রেডলিচের ভাষায়, এটা যেন ছিল একটি রাজনৈতিক চাপ মাপার যন্ত্র। যাতে সংসদীয় প্রশাসন যন্ত্রের উপর যে চাপ পড়ত তা মাপা যেত এবং তার ফলে সরকারের সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থারও।[2] এই চাপ-মাপার যন্ত্র প্রথম ক্ষেত্রে খারাপ ভাবে নির্মিত হওয়া সম্ভব বা বহুব্যবহারে ক্ষয়ে যাওয়া সম্ভব যার ফলে প্রকৃত চাপের ব্যাপারে ভুল হিসাব দিতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ভারতের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং বিশেষ করে ১৯০৯ সালে বিধান মণ্ডলের নির্বাচন ও কার্য-পরিচালক পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন করা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যনির্বাহিকরা সবসময়ে অন্যায় উদ্দেশ্যে সেগুলি রচিত করেছিল এবং তা করে রাজনৈতিক প্রশাসন যন্ত্রে যে বিপজ্জনক চাপ সৃষ্টি করত তা গোপন রাখার চেষ্টা করত। যাতে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা জন্মাতে পারে। যতদিন পর্যন্ত বিধান মণ্ডলের সদস্যরা তাদের আইনগত আদেশ পেত কার্যনির্বাহিকদের কাছ থেকে। এই কারণে যে, তারা সকলেই ছিল মনোনীত সদস্য, তাই এই ধরনের চাতুরি বেশ ভালই কাজ করত, জনগণের কাছ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত নির্বাচিত সদস্যদের প্রবেশের ফলে। কিন্তু এই চাতুরির দুর্বলতা প্রত্যক্ষ

১) আইনত পরিষদের সভাপতি অর্থাৎ ভাইসরয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাকে কার্যনির্বাহিক পরিষদের উপদেশানুসারেই কাজ করতে হত।

২) তুলনীয়, জে. রেডলিচ। সংসদীয় কার্যপরিচালন পদ্ধতি, খণ্ড ৩। পৃষ্ঠা : ১৯৮।

হয়েও উঠত। নির্বাচিত সদস্যদের এই বিবশতা তাদের প্ররোচিত করত সেই সব মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলিকে বাধা দিতে বা আপত্তি করতে যেগুলি কার্যপ্রণালীর পদ্ধতির তত্ত্বগত ভিত্তি বলে স্বীকৃত। যদি কোনও পক্ষ সদস্যদের মধ্যে বৈষম্যের ব্যাপারে, কার্যবিধি পরিচালনার নিয়মাবলি সম্বন্ধে, বাক্ স্বাধীনতার অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতির ব্যাপারে অভিযোগ করে, তবে তা সরকারের অস্তিত্বের পক্ষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি যে আছে তার বিপদ-সংকেত জ্ঞাপক। যখন ঐ ধরনের বিরোধের উদ্ভব হয়। তখন কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে যে প্রতিনিধিত্বমূলক সভার কার্যপরিচালন পদ্ধতির সংস্কার সাধনের অথবা সরকারের সংবিধানে সংস্কার সাধনের সম্মুখীন হতে হবে।

বিধান পরিষদের অভ্যন্তরে যখন অনমনীয় বিরোধিতার এবং একঘেয়েমিতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, যার উদ্ভব হয় নিষ্ফল প্রচেষ্টার জন্য, তখন বিধান মণ্ডলের বাহিরে অত্যন্ত দ্রুত আবেগের জোয়ার বাড়ছিল এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্তির বাসনা শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে দ্রুত বাড়ছিল নিঃসন্দেহে, কারণ সীমিত ক্ষমতা বিশিষ্ট বিধানমণ্ডলকে নিরাপদভাবে উত্তেজনা নিরসনের উপায় হিসাবে অপর্যাপ্ত মনে হচ্ছিল। এই প্রকৃত সত্যের উপলব্ধির ফল স্বরূপে যারা দেশের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করত তারা এ ব্যাপারে সহমত হল যে, কার্যপরিচালন পদ্ধতির শুধু সংস্কার সাধন করলেই কাজ হবে না। দেশকে অরাজকতার হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র সংবিধানের সংস্কার সাধন।

ভারতের সংবিধানে পরিবর্তন সাধন করার জন্য যে সব সংস্কার সাধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেগুলি অবশ্য ছিল যথেষ্ট পরিমাণে ভিন্ন ধর্মী। প্রসঙ্গক্রমে একটা প্রকল্পের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এবং সেটা হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি, যাকে সংক্ষেপে বলা হত কংগ্রেস-লিগ প্রকল্প।[১] এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ চার-পঞ্চমাংশ নির্বাচিত সদস্যের দাবি করা হয়েছিল। কার্য নির্বাহিকদের ক্ষেত্রে, এতে দাবি করা হয়েছিল যে, কার্য নির্বাহিক সদস্যদের মোট সংখ্যার অর্ধেককে হতে হবে ভারতীয় এবং বিধানমণ্ডলের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা তাদের নির্বাচিত হওয়া দরকার। বিধানমণ্ডলীর বিত্তীয় ও আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা থাকতে হবে। শুধু তাই নয় প্রস্তাবের আকারে অনুমোদিত এর সুপারিশগুলি বাধ্যতামূলক হবে কার্য নির্বাহিকদের উপরে। এই ধরনেরই ছিল ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে "ভারতীয় মুখ্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলির দাবিগুলির

১) এর উল্লেখ আছে পূর্ব ভারত সাংবিধানিক সংস্কার-সাধন গ্রন্থে। পৃষ্ঠা সিডি-১৯১৮ সালের ৯১৭৮, পৃষ্ঠা ৯৮।

সর্বশেষ, পূর্ণাঙ্গ এবং অত্যন্ত প্রামাণ্য উপস্থাপনা"। কিন্তু যখন আমরা প্রকল্পটির বিশ্লেষণ করতে উদ্যত হই তখন দেখতে পাই যে, ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিভা হিসাবে চিহ্নিত তাঁদের সাফল্যের কথা তা উল্লেখ করে না। প্রকল্পটিকে রূপদান করা হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতে দায়িত্বশীল সরকার কার্যকর করার জন্য। কিন্তু কার্যত এটা শুধু দায়িত্বশীল সরকারের মানদণ্ডই ছিল না তা নয়, বরং দক্ষ সরকার গঠনের লক্ষ্যের উন্নতিসাধনের পক্ষে পর্যাপ্তও ছিল না। প্রকল্পে এ কথা বলা হয়নি যে কার্য নির্বাহিকদের গঠিত বা বিগঠিত করার ক্ষমতা বিধান মণ্ডলের থাকা দরকার নিজেদের খেয়ালখুশি মত। যদি তাতে তা বলা থাকত তবে প্রকল্পটি অবশ্যই দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রকল্প হয়ে উঠতে পারত। পরিবর্তে প্রকল্পে যা চাওয়া হয়েছিল তা হল এই যে, অপসারিত করা যায় না এমন কার্য-নির্বাহিককে বাধ্য করতে পারে বিধান মণ্ডলের নির্দেশ অনুযায়ী দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার ব্যাপারে। প্রকল্পটি ছিল লর্ড মর্লের প্রকল্পেরই এক বিবর্ধিত রূপ। তিনি সরকারে ভারতীয় উপাদান প্রবর্তিত করেছিলেন যাতে ভারতীয়দের অভিমত এবং ভারতীয়দের উপদেশ কার্য-নির্বাহিকদের কাছে গুরুত্ব পায় তারও অতিরিক্ত যা তারা প্রয়োগ করত সরকারের বিধানিক সংগঠনের মাধ্যমে। যারা কংগ্রেস-লিগ প্রকল্প রচনা করেছিল তারা শুধু বিধানমণ্ডল ও কার্যনির্বাহিকদের মধ্যে ভারতীয় উপাদান বাড়িয়েছিলেন এবং কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছিল যার লক্ষ্য ছিল উপদেশকে নিয়ন্ত্রণে রূপান্তরিত করা এটা উপলব্ধি না করেই যে কার্য-নির্বাহিকরা যদি বিধানমণ্ডলের ইচ্ছাগুলিকে মেনে নিতে অস্বীকার করে তবে কি হবে। প্রকল্পটির মূল উপাদান ছিল বিশ্লিষ্ট আইনগত আদেশসহ একটি কার্যনির্বাহিক যা সংসদের কাছে বৈধভাবে দায়ী থাকবে এবং কার্যত এক নির্বাচিত বিধানমণ্ডলের কাছে। আইনগত আদেশের এই পৃথকীকরণ সুস্পষ্টতই বিধানমণ্ডলকে সক্ষম করত কার্য-নির্বাহিকদের কর্মশক্তি লোপ করে দেওয়ার অবশ্য তাদের অপসারিত করার ক্ষমতা বাদে। নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আবেদন জানিয়ে মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিধান মণ্ডলের পরিবর্তনসাধন করার কোনওরকম সাংবিধানিক ক্ষমতা না থাকায় তারা বাধ্য হত সরকার চালাতে এমন কি সেই ক্ষেত্রেও যেখানে তা বিধানমণ্ডলের ইচ্ছাগুলিকে মর্যাদা দিত না। ভারতীয় সংবিধানের সংস্কার সাধনের জন্য আগেকার অন্যান্য প্রচেষ্টাগুলির মতই এই প্রকল্পটিও ছিল ত্রুটিপূর্ণ, কারণ এতে কার্য-নির্বাহিক এবং বিধানমণ্ডল তাদের আইনগত আদেশ গ্রহণ করত ও দায়ী থাকত বিভিন্ন ক্ষমতার কাছে। এটা ত্রুটিপূর্ণ ছিল এই কারণে যে, তা উপেক্ষা করে যেত দুটি আইনগত আদেশের মধ্যে অমিল থাকার সম্ভাবনাটিকে, যে ক্ষেত্রে বিরোধ হবার সম্ভাবনা থাকত। অ-সংসদীয় কার্য নির্বাহিকদের মধ্যে এই বিরোধ সহজাত হত। এটা পরিহার করার একমাত্র উপায় ছিল সংসদীয় কার্যনির্বাহিক সহ এক ধরনের সংসদীয় সরকার।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় যে, ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট তারিখের ঘোষণাটি ভারতের সংবিধানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক বিখ্যাত ঘটনা হয়ে আছে। উক্ত তারিখে ভারত বিষয়ক মন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করেন যে—

"সম্রাটের সরকারের নীতি, যার সঙ্গে ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে সহমত, এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতে এক উন্নতিমূলক দায়িত্বশীল সরকারের বাস্তবায়িতকরণের উদ্দেশ্যে স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবিকাশের জন্য ও প্রশাসনের প্রতিটি শাখায় ভারতীয়দের ক্রমশ বেশি মাত্রায় সম্মিলিত করা। তারা স্থির করেছে যে, যথাসম্ভব শীঘ্র এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।....."

"আমি আরও বলতে চাই যে, এই নীতির উন্নতিবিধান একমাত্র ধারাবাহিক পর্যায়ে করা সম্ভব। ব্রিটিশ সরকার এবং ভারত সরকার, যাদের উপর ভারতীয় জনগণের কল্যাণ ও অগ্রগতির দায়িত্ব ন্যস্ত আছে, তাদের অবশ্যই কালের এবং প্রতিটি অগ্রগতির পদক্ষেপ সম্বন্ধে বিচার করে দেখতে হবে এবং তারা অবশ্যই পরিচালিত হবে তাদের কাছ থেকে পাওয়া সহযোগিতার দ্বারা যাদের উপর পরিষেবার নতুন সুযোগ-সুবিধাগুলি এইভাবে অর্পিত হবে এবং সেই পরিমাণে যত দূর পর্যন্ত এটা পরিলক্ষিত হবে যে তাদের দায়িত্ব বোধের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে।"

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি একটি যুগের অবসানেরও নতুন যুগের প্রারম্ভের সূচনা করেছে। এটা সুনিশ্চিতভাবে সেই প্রাচীন ধারণাকে বর্জন করেছিল যে, ধারণা অনুসারে কার্যনির্বাহিকরা, উচিত বিবেচনা করার ফলে বিধানমণ্ডলের ইচ্ছেগুলির ব্যাপারে পরামর্শ নিত, যেগুলিকে শুধু দেশের প্রশাসনে বর্ধিত অংশ নিতে দেওয়া হত এবং প্রভাবিত করার ও সমালোচনা করার আরও বেশি সুযোগ দিত, কিন্তু কখনোই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিত না। এই নতুন ধারণা অনুসারে লক্ষ্য ছিল সরকার গঠিত বা বিগঠিত করার ক্ষমতা বিধান মণ্ডলকে দেওয়া, যাতে তা শুধু জনগণের সরকারেই নয়, সেইসঙ্গে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার হয়ে উঠতে পারে। দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তিতে নীতির এ জাতীয় পরিবর্তনকে মেনে নেওয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল প্রশাসনিক, বিধানিক ও বিত্তীয় ব্যাপারগুলির একের অপরের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের বিষয়টি। ১৯১৯ সালে সংস্কারমূলক অধিনিয়মের ফলে প্রবর্তিত প্রাদেশিক বিত্ত পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন ঘটেছিল সেগুলির মূলে তৎকালে বর্তমান পদ্ধতিটির কোনও মূলগত ত্রুটি দায়ী ছিল না। পক্ষান্তরে পদ্ধতিটি ছিল বিশেষভাবে কার্যোপযোগী। এগুলি কার্যকর করা হয় এই জন্য যে, সামগ্রিকভাবে পদ্ধতিটি সেই বিরাট আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল যা ঐ অধিনিয়ম চেয়েছিল ঐ দেশের প্রশাসনিক পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে।

পরিবর্তনগুলির গতি-প্রকৃতি, তাদের বিস্তার এবং তাদের পর্যাপ্ত তা পরবর্তী দুটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হবে।

অধ্যায়-১১

পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি

১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট তারিখের ঘোষণাটিতে ভারতে ভবিষ্যতের ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্য হিসাবে দায়িত্বশীল সরকারের প্রগতিশীল বাস্তবায়িতকরণের কথা বলা হয়েছিল এবং সাংবিধানিক সংস্কারসাধন সম্পর্কিত মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রতিবেদন সমীক্ষা করেছিল কী ভাবে ঐ ঘোষণাকে কার্যকর করা যায়। ঐ প্রতিবেদনের গুণাবলির মধ্যে অন্যতমটি ছিল এই যে, এটা দেখাতে পেরেছিল যে, রাজনৈতিক সংস্কার-সাধনের কংগ্রেস-লিগ প্রকল্পটিতে সেই নীতিটি সন্নিবেশিত হয়নি যে বিষয়টির স্বীকৃতির জন্য, যা তারা এতদিন ধরে দাবি করে এসেছে। ভারতে দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে প্রকল্পটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের অধীনে অ-সংসদীয় কার্যনির্বাহিকদের দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারত। নিজেদের ভুল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার পর কংগ্রেস লিগ রাজনীতিবিদ্‌রা যৌথ প্রতিবেদনের প্রস্তাবগুলির অনুকূলে তাদের প্রকল্পটিকে বর্জন করেছিল, এতটাকে তাদের কৃতিত্বও বলা যেতে পারে। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে তারা এক সঙ্গে বেশিরভাগ রাজনৈতিক প্রতিষ্টানে মোটামুটি পূর্ণমাত্রায় দায়িত্বশীল সরকার প্রচলন করার দাবি জানায়। কিন্তু নতুন সংবিধানের রচয়িতারা উল্লেখ করে যে ঘোষণায় প্রগতিশীল শব্দটির উপর যে জোর দেওয়া হয়েছিল সেটা দায়িত্বশীল শব্দটির উপর যে জোর দেওয়া হয়েছিল ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে না ধরলেও।[১]

এই অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ঘোষণায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়িতকরণের ব্যাপারে প্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে প্রাদেশিক সরকারগুলিতে সীমিত বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মত ভারতের প্রাদেশিক সরকারগুলি ছিল দায়িত্বহীন সরকার। প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলগুলির সংবিধানে যে সব পরিবর্তন করা হয়েছিল সেগুলি কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলে কৃত পরিবর্তনগুলির মতই বিশেষ করে এই জন্য যে, দুটি ক্ষেত্রেই পরিকল্পনা করা হয়েছিল যাতে কার্যনির্বাহিকরা বিধানমণ্ডলীর পরামর্শ নেয় তার নিয়ন্ত্রণাধীন না হয়েও। মাত্র একবারই প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলির

১। ভারত শাসন বিল সম্পর্কে যৌথ প্রবর সমিতির প্রতিবেদন, ১৯১৯ সালের পৃ: ২০৩, পুনশ্চ ৭ নং অনুচ্ছেদ।

প্রশাসন যন্ত্রের কাঠামোটি রচিত হয়েছিল সামান্য ভিন্নতর ভিত্তিতে এবং তা করা হয় ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার সাধনে। ঐ সংস্কার-সাধনগুলির অধীনে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডল ছিল সরকারি সদস্যদের কর্তৃত্বাধীনে, যারা কার্যনির্বাহিক সদস্যদের সঙ্গে সভাকক্ষে স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখত। প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলগুলিতে সরকারি সদস্যদের স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতার এই নীতিটি বর্জিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলের সংবিধানের সঙ্গে তুলনায় প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলগুলির সংবিধানে দ্বিতীয় ব্যতিক্রমটি ছিল উভয় সরকারে বাজেট সম্পর্কিত কার্য-পরিচালনার পদ্ধতিতে। কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলে বিত্ত-সদস্য পঞ্জিকা অনুযায়ী প্রতিবছর গোড়ার দিকে বিধানমণ্ডলে কৈফিয়ৎমূলক স্মারকলিপিসহ তাঁর প্রাথমিক হিসাব পেশ করতেন। পরবর্তী দিনে সেইসব কৈফিয়ৎ তিনি পেশ করতেন যেগুলি তাঁর মতে প্রয়োজনীয় মনে হত। তার ভিত্তিতে বিধানমণ্ডলের সদস্যরা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারতেন (ক) কর আরোপণের ব্যাপারে প্রস্তাবিত কোনও পরিবর্তন, (খ) কোনও প্রস্তাবিত ঋণ, অথবা (গ) স্থানীয় সরকারকে প্রদেয় কোনও অতিরিক্ত ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে। ভারত সরকারের বাজেট আলোচনায় প্রথম অধ্যায়টির সমাপ্তি ঘটত যখন ঐসব প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে ভোট নেওয়া হত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত হত যখন হিসাবগুলিকে গুচ্ছগুচ্ছ ভাবে বিবেচনা করা হত। এই অধ্যায়েও রাজস্ব ও ব্যয়ের যে-কোনও খাত সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করার স্বাধীনতা থাকত, শুধু সেই খাতগুলি বাদে যেগুলি কার্যপরিচালন পদ্ধতির নিয়মাবলি অনুসারে বিধানমণ্ডলে আলোচনার জন্য অবাধ ঘোষিত হয়েছিল। প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত এবং ভোট দেবার পর বিত্ত-সদস্য সমগ্র আলোচনাকে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করতেন এবং যেগুলি সম্বন্ধে তিনি রাজি থাকতেন সেই সব পরিবর্তনগুলি করা হত এবং তারপর তিনি তাঁর চূড়ান্ত বাজেট পেশ করতেন। এই তৃতীয় অধ্যায়ে বাজেট বিতর্কের সময় অন্য যে-সব প্রস্তাব উত্থাপিত হত তার কতকগুলিকে স্বীকার করা ও কতকগুলিকে কেন অস্বীকার করা হল তার জন্য নিজস্ব কারণ ব্যাখ্যা করতেন। তারপর বাজেট সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা শুরু হত, কিন্তু চূড়ান্ত বাজেটের উপর আর কোনও প্রস্তাব করতে দেওয়া হত না বা ভোটও নেওয়া হত না। প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলে বাজেট পদ্ধতি ছিল সামান্য ভিন্নতর। এ ক্ষেত্রে প্রথম অধ্যায়ের সূত্রপাত হত প্রাদেশিক হিসাবের অবিশদীকৃত খসড়া প্রস্তাব দিয়ে তার সঙ্গে থাকত অণুসূচী যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকত ৫০০০ টাকার অতিরিক্ত ব্যয়-বিশিষ্ট সকল প্রকল্প, যে-গুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত থাকত, প্রথমটির মধ্যে থাকত ব্যয়ের সব বরাদ্দ করা দফাগুলি অর্থাৎ যে-গুলি বাধ্যতামূলক এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে থাকত বরাদ্দ না করা দফাগুলি

অর্থাৎ যেগুলি বাধ্যতামূলক নয়। যার সমক্ষে এই খসড়া বাজেট পেশ করা হত সেই ভারত সরকার রাজস্বের হিসাবগুলির সংশোধন করত এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে নির্ধারিত করত মোট ব্যয়ের পরিমাণ যা ভারত সরকারকে দিতে হত এবং প্রয়োজনে অণুসূচির প্রথম অংশে দফাগুলি পরিবর্তিত করত বা যুক্ত করত। যখন ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিবর্তিত রাজস্বের সংখ্যাতত্ত্ব এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রাদেশিক সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হত, তখনই প্রাদেশিক বাজেটের প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত হত যখন এই খসড়া বাজেট প্রাদেশিক সরকার প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলের কমিটির কাছে পাঠিয়ে দিত। কমিটিতে সম-সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি সদস্য থাকত, প্রথমোক্তরা সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং শেষোক্তরা তাদের সহযোগীদের দ্বারা নির্বাচিত হত। এর সভাপতিত্ব করত প্রাদেশিক বিত্তের ভারপ্রাপ্ত এক কার্যনির্বাহিক সদস্য; কমিটির কার্যপরিচালন পদ্ধতি ছিল অনুপচারিক (informal) এবং বেসরকারি, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে। কমিটি শুধু বাধ্যতামূলক নয় এমন দফা সম্বলিত অণুসূচির দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকত এবং ভারত সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট করা মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছাড়িয়ে না গেলে, কমিটির স্বাধীনতা থাকত পরিবর্তন ঘটানোর এবং এমন কি কখনো কখনো নতুন দফা অণুপ্রবিষ্ট করানোরও। কার্য সমাপণান্তে কমিটি তার সরকারের কাছে প্রদত্ত প্রতিবেদন জানিয়ে দিত কি কি পরিবর্তন করা হয়েছে। এরই সঙ্গে প্রাদেশিক বাজেটের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয় যখন সমগ্র প্রাদেশিক হিসাবটি প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলে পেশ করেন বিত্তের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। তখন পূর্ণাঙ্গ সভার একটি কমিটি বাজেটের পর্যালোচনা করে এবং হিসাবের প্রতিটি শাখার উপর পেশ করা প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। যখন সবকটি প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা এবং বিতর্ক শেষ হয় তখন আলোচনার ফলাফলটি জানিয়ে দেওয়া হয় প্রাদেশিক সরকারকে। কিন্তু প্রস্তাবগুলি বাধ্যতামূলক নয়। চতুর্থ অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় যখন প্রাদেশিক সরকার চূড়ান্ত বাজেট উপস্থাপিত করে সংবিধানমণ্ডলকৃত প্রস্তাবগুলির কয়েকটিকে গ্রহণ করা এবং বাকিগুলিকে গ্রহণ না করার কারণগুলি ব্যাখ্যা করে। তারপরে শুরু হয় বিতর্ক, কিন্তু এই অধ্যায়ে কোনও গৃহীত সিদ্ধান্তই যথাযথ থাকে না; বা বিধানমণ্ডলও বাজেটের ব্যাপারে ভিন্নমত হয় না। বাজেট গৃহীত হয় কার্যনির্বাহিক কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে ধরে নিয়ে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির সংবিধান এবং কার্যপরিচালন পদ্ধতির এই

পার্থক্যগুলি থেকে একথা অবশ্যই ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে, প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের বিধানমণ্ডলগুলি সম্পর্কে কম দায়িত্বহীন ছিল নিজের বিধানমণ্ডল সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার যতটা ছিল তার তুলনায়। প্রকৃত ঘটনাটি এই যে ১৯০৯ সাল থেকে কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলের মত প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলে সরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকাটা কার্যনির্বাহিকদের ব্যাপারে তার ব্যবহারিক পরিণতির ক্ষেত্রে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; কারণ এ কথাটা স্মরণে রাখা দরকার যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে মনোনীত সদস্য ও সরকারি সদস্যদের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না এবং সরকারী সদস্যরা ছিল বাহুল্য মাত্র। উভয়েই তাদের আইনগত নির্দেশ পেত সেই সরকারের কাছ থেকে যা তাদের বিধানমণ্ডলীতে সদস্যপদ দিত। যাতে করে, তত্ত্বগতভাবে না হলেও, কার্যত প্রাদেশিক সরকার বিধানমণ্ডলে ততটাই স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেত যতটা কেন্দ্রীয় সরকার পেত তত্ত্বগতভাবে এবং সেই সঙ্গে কার্যতও। প্রাদেশিক সরকারের বাজেট পদ্ধতিও কার্যনির্বাহিকদের উপর বিধানমণ্ডলের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তার ক্ষেত্রে কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারেনি। উভয় ক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল বাজেটের আবশ্যকতাগুলি সম্পর্কে ঐ ধরনের পরিবর্তনগুলির প্রশ্নে পূর্বেই আলোচনা করার বিশেষ অধিকার দেওয়া বিধানমণ্ডলের সদস্য দেয়, তবে এই বিশেষ অধিকার অপেক্ষাকৃত আগের অধ্যায়েই প্রয়োগ করতে দেওয়া হত প্রাদেশিক বাজেটে রাজকীয় বাজেটের তুলনায়। রাজকীয় বাজেটের উপর কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলের গৃহীত প্রস্তাবগুলির মতই প্রাদেশিক বাজেটের উপর বিধান মণ্ডলের গৃহীত প্রস্তাবগুলি যে শুধু তাদের নিজ নিজ কার্যনির্বাহিকদের জন্য সুপারিশমাত্র এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি সরকারের বাজেট পদ্ধতির মধ্যে এই পার্থক্যটি অপর কার্যনির্বাহিকদের মত অন্য কার্যনির্বাহিকদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আরোপ করেনি। পুনশ্চ, যেহেতু প্রাদেশিক বাজেটের জন্য কমিটির অনুমতিদান করা হয়েছে তাই প্রাদেশিক বাজেটের বাধ্যতামূলক নয় এমন অংশগুলি রচনার বিশেষ অধিকার বিধানমণ্ডলকে কার্যনির্বাহিকদের উপর কোনও রকমের লক্ষ্যণীয় নিয়ন্ত্রণাধিকার দেয়নি। প্রথমত প্রাদেশিক সরকার সবসময়েই এই বাজেট কমিটির কর্ম-পরিধিকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারত বাধ্যতামূলক নয় এমন ব্যয়ের শ্রেণী থেকে যে কোনও খাতকে বাধ্যতামূলক ব্যয়ের শ্রেণীতে বিষয়ান্তরিত করে। এ ছাড়া, সরকারি বিত্তের সাধারণ নীতির ভিত্তিতে গঠিত বাজেট পদ্ধতির কয়েকটি নির্দিষ্ট অপরাপর নিয়মাবলির প্রয়োগ পদ্ধতি বিকল্প বা অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য প্রকল্প পেশ করার ব্যাপারে কমিটির ক্ষমতাকে সরাসরি সীমাবদ্ধ করতে

প্রয়াসী হত। এই ব্যবস্থা সঙ্গত কারণেই করা হয়েছিল যে, পৌন:পুনিক ব্যয় সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি পৌন:পুনিক রাজস্ব ও পৌন:পুনিক ব্যয় বৃদ্ধির হারের প্রতি লক্ষ রেখেই শুধু প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারা যায়।

এই নিয়মটির জন্য পৌন:পুনিক ব্যয় সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলিকে বর্জন করতে হয়েছিল ঐ কমিটিকে অথচ সেগুলি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বাঞ্ছনীয় ছিল। পক্ষান্তরে, কার্যনির্বাহিকদের আনা অনুরূপ প্রস্তাব সহজেই কার্যকর করা যেত সেই কৌশলে যা অবাধে প্রয়োগ করা হত ভারত সরকারের আগাম অনুমোদন পাওয়ার জন্য। এর পরিণামে নতুন নিয়মাবলির অধীনে উপস্থাপিত সকল প্রাদেশিক বাজেটে কমিটির নিজস্ব বিচার-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া এই "অ-বরাদ্দকৃত" তহবিলের পরিমাণ বাজেটে মোট ব্যয়ের এমন এক অত্যন্ত অকিঞ্চিৎ কর অনুপাত হয়ে থাকত যার জন্য প্রাদেশিক কার্য-নির্বাহিককে প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলের কাছে যে-কোনও প্রকৃত মাত্রায় দায়ী থাকতে হতো।

ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারগুলি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে সম্পূর্ণ পরিবর্তন না ঘটিয়ে প্রদেশগুলিতে প্রকৃত অর্থে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত অবশ্যই করা যেত না। ১৯১৯ সালের অধিনিয়ম পাশ হবার আগে ঐ দুই সরকারের মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান ছিল তা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রাদেশিক সরকারগুলির পূর্ণমাত্রায় শাসনাধীনে থাকা।[১] বশ্যতার এই বন্ধনে আমরা তিনটি উপাদান দেখতে পাই—বিধানিক, বিত্তীয় এবং প্রশাসনিক। এই তিনটির মধ্যে বিত্তীয় উপাদানটি যে কতটা ঘন-বিন্যস্ত ছিল তা আমরা দেখেছি। রাজস্ব ও ব্যয়ের উপর ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা উপলব্ধ হয়েছিল সংসদীয় সংবিধি থেকে যা ভারত থেকে প্রাপ্ত রাজস্বকে গণ্য করত অবিভক্ত হিসাবে এবং সামগ্রিকভাবে ভারত সরকারের কাজে প্রয়োগ করত। এ কথা সত্য যে, এই শর্তটি ততটা ব্যাকরণ সম্মতভাবে গঠিত হয়নি যাতে আয়ের বিশেষ উৎসগুলিকে নির্দিষ্ট সর্বভারতীয় বা প্রাদেশিক উদ্দেশ্যে উপযোজিত করার বিষয়টি পুরোপুরি বন্ধ করা যায়। অন্যথায় বিত্তের প্রাদেশিক পদ্ধতিটির উন্নতিসাধন অসম্ভব হতে পারত। তবে এটা ঠিক যে এই ব্যবস্থাটি নিজেদের সংগৃহীত রাজস্বের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কোনও সহজাত বৈধ অধিকার দেয়নি। স্থানীয় সংস্থাগুলি কর্তৃক আদায় করা স্থানীয় করগুলি ছাড়া ব্রিটিশ ভারতে আরোপিত করা প্রথা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হত ভারত সরকার কর্তৃক। কর আরোপ করা যায়

১। ভারতীয় সংবিধানের সংস্কার সাধন সম্পর্কিত প্রতিবেদন, ১৯১৮ সালের সি. ডি. ৯১০৯, অধ্যায় পঞ্চম।

একমাত্র আইনের দ্বারা[১], কিন্তু ভারত সরকারের পূর্বানুমোদন ছাড়া প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলকে আইনগতভাবে নিষেধ করা হয়েছিল বিবেচনা করতে।

"যে কোনও আইন সম্বন্ধে যা ভারতের সরকারী ঋণ বা আমদানি-রপ্তানির উপর ধার্য্য শুল্ক বা অন্য কোনও করা বা শুল্ক যা মাঝে মাঝে বলবৎ হয় বা আরোপিত হয় সপরিষদ বড়লাটের আজ্ঞানুসারে ভারত সরকারের সাধারণ কাজকর্মের জন্য।"

এটাই হচ্ছে সর্বভারতীয় রাজস্বকে সর্বভারতীয় প্রয়োজনের কাছে বিধিসম্মতভাবে দায়বদ্ধ রাখার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। কৌশলে আবিষ্কৃত কর আরোপ করার কোনও নতুন উৎস যা প্রাদেশিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজে লাগানো না হয় তার জন্য প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলকে বাধা দিত না আইন। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রেও প্রকল্পটি বাস্তবে রূপায়িত হবার আগে ভারত সরকারের বিত্ত বিভাগের সম্মতি অর্জন করা দরকার, যা ঐ বিভাগ অনুমোদন করবে না কেন্দ্রীয় সরকারের করের উৎসে অযথা হস্তক্ষেপ করছে কি না তা খুঁটিয়ে বিচার না করে। আবার, আইনের শর্তের জন্য প্রয়োজন ছিল যে—

"কোনও লাট বা সপরিষদ লাট (প্রদেশের) ক্ষমতা থাকবে না নতুন পদে সৃষ্টি করার বা কোনও বেতন, আনুতোষিক বা ভাতা ভারতের সপরিষদ বড়লাটের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে দিতে পারবেন না।"

এবং ঐ শর্তটি প্রদেশগুলির ব্যয়ের ব্যাপারে ভারত সরকারকে নিয়ন্ত্রণাধিকার দিয়েছিল অনুভার অনুক্রমিক সংহিতার মাধ্যমে প্রয়োগ করার যেগুলি হল জনপালন কৃত্যকের বিধি-নিয়ম, সরকারি হিসাব সংহিতা, বাস্তুকর্ম সংহিতা ইত্যাদি। এই সংহিতাগুলি আংশিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করত বিত্তের কার্যসাধন প্রণালী যথা নিরীক্ষা (audit) ও হিসাবের পদ্ধতি অভিন্ন প্রয়োগ বজায় রাখা, সরকারি অর্থের তত্ত্বাবধান করা, প্রেষণ করা (remittances), আর্থিক ব্যাপারের পরিচালনা করা ইত্যাদি; কিন্তু ঐ সংহিতাগুলি প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষমতার উপর কিছু নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছিল, যথা নতুন পদ সৃষ্টি করা অথবা বেতন বৃদ্ধি করা ও অন্যান্য বিষয় যেমন নিযুক্তি, পদোন্নতি, ছুটি, বৈদেশিক চাকরি, এবং উত্তর বেতন (pension), যেগুলি সম্বন্ধে সংহিতাগুলি নজিরের এক প্রকৃত সার সংগ্রহ গঠন করেছিল

১। অবশ্য একটি জ্বলন্ত ব্যতিক্রম আছে। ভারতে ভূমিরাজস্ব বিধানিক অনুমোদন ছাড়াই আদায় করা হত। বিধান মণ্ডলের প্রক্রিয়ার থেকে ভূমি রাজস্বকে বাদ দেওয়ার ফলে নিট সরকারি রাজস্বের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশের মত পরিমাণ কার্যত অপসারিত হয়েছিল যে-কোনও রকমের নিয়ন্ত্রণ থেকে।

যে-গুলি মাঝে মাঝে ভারত সরকার কর্তৃক রচিত হয়েছিল, যা কঠোরভাবে মেনে চলতে বাধ্য ছিল প্রাদেশিক সরকারগুলি। তাদের ব্যয় ও কর আরোপ করার ক্ষমতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হলেও ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা কখনো মেনে নেওয়া হয়নি। স্মরণ করা যেতে পারে যে, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বন্দর-ন্যাস (Port Trust) ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ সংগ্রহ করতে পারত, কিন্তু যেহেতু ভারতের রাজস্ব ছিল আইনত অবিভক্ত ও অবিভাজ্য এবং দায়বদ্ধ ছিল ভারত সরকারের প্রয়োজনে গৃহীত সকল ঋণের জন্য, তাই প্রাদেশিক সরকারগুলির কোনও পৃথক সম্পদ ছিল না। যার জামিনে তারা ঋণ গ্রহণ করতে পারত।

এমনকি প্রাদেশিক বিত্তের ঘোষিত সীমার মধ্যেও প্রাদেশিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ছিল না। যেহেতু প্রাদেশিক বন্দোবস্তগুলি প্রাদেশিক রাজস্বের উপর নির্ভর না করে নির্ভর করত প্রাদেশিক প্রয়োজনগুলির উপর তাই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল অপরিহার্য। কেন্দ্রীয় সরকার কোনও প্রদেশকে দেউলিয়া হতে দিত না। কিন্তু ভারত সরকার যদি প্রদেশের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য দায়ী থাকত তবে প্রাদেশিক ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার দায়িত্বও তার থাকা দরকার। আবার, রাজস্বের ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত ভারত সরকার আয়ের অংশ নিত ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু প্রদেশগুলির বাজেট প্রাক্কলন হস্তক্ষেপ করার জোরালো উদ্দেশ্য থাকত তা নয় সেইসঙ্গে প্রশাসনের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভূমি রাজস্বের ব্যাপারে তাদের স্বার্থ অপরিহার্যভাবে রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্তের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বাবধান করতে প্ররোচিত করত, এবং সেইসব ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর হত যেখানে জলসেচের মত রাজস্বের উৎসের সম্প্রসারণ ও বিকাশ নির্ভর করত পুঁজির ব্যয়ের উপর।

প্রাদেশিক সরকারগুলির বিধানিক ক্ষমতাকেই একই পদ্ধতিতে আইনগত সীমাবদ্ধতার অধীনে রাখা হত। তবে এটা ঠিকই যে, একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র ছিল, বিশেষ করে সংবিধি সংক্রান্ত কিছু স্থায়ী শর্তাবলির ব্যাপারে, যেখানে প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলের বিধানিক যোগ্যতা আইনত ছিল লাগামহীন। বাস্তবে অবশ্য স্থানীয় বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা কাটছাঁট করা হয়েছিল দুইভাবে। প্রথমত এই কারণে যে নিজেদের অস্তিত্বের ব্যাপারে সকল প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত নবীন এবং তাদের মধ্যে বেশির ভাগই আবার নবীনতর প্রতিষ্ঠান বড়লাটের কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলের তুলনায়, সেই ক্ষেত্রের একটা বড় অংশ যা পক্ষান্তরে তাদের কাছে অবাধ থাকতে পারত, তা ঐ সংস্থার অধিনিয়মের আওতাভুক্ত ছিল, যা আবার খোলামেলাভাবে দেশের জন্য সব সময়ে আইন প্রণয়নের সমবর্তী

(concurrent) ক্ষমতা নিজের হাতে রাখত। কিন্তু ক্ষেত্রটিতে প্রবেশাধিকার তখনও অবাধ থাকার জন্য আইন প্রণয়নের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আরও বেশি সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল এই কারণে যে, সর্ব-ভারতীয় আইন প্রণয়নের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত করে রাখার জন্য মন্ত্রী ও সংসদের ক্ষমতা কার্যকর করা হয়েছিল নির্বাহিকদের নির্দেশের মাধ্যমে যা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বাধ্য করত প্রবর্তিত হবার আগে আইনপ্রণয়ন সম্পর্কিত তাদের সকল প্রকল্প পূর্বানুমোদনের জন্য পেশ করতে মন্ত্রী ও ভারত সরকারের কাছে। একথা সত্য যে, এই নির্দেশগুলি প্রযোজ্য হত না বেসরকারি সদস্যদের বিধেয়ক সম্বন্ধে; কিন্তু যেহেতু বিধানমণ্ডলের অনুমতিক্রমেই শুধু বিধেয়ক উত্থাপিত করা যায়, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিরোধিতা করতে চাইলে প্রাদেশিক সরকার সাফল্যের সঙ্গে প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারত, তাই প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়ে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারি বিধেয়কের মতই সমান ফলপ্রদভাবে সকলকে সরকারি প্রাদেশিক আইন প্রণয়নের বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত।

প্রশাসনের যথাযথ কাজগুলি সম্পাদন করতে গিয়ে প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার আইনত বাধ্য থাকত ভারত সরকারের আদেশ পালন করতে এবং তার সকল ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার ও অন্য সকল বিষয়ে নিয়মিতভাবে ও সযত্নে উক্ত সরকারকে অবগত করিয়ে রাখবে, যেগুলি তাদের মতে সরকারকে জানান উচিত বা যে-ব্যাপারে সরকার নিজেই তথ্য জানতে চায়। এটা করা হত এই কারণে যে, আইনগতভাবে প্রতিটি প্রাদেশিক সরকার তার প্রদেশের সরকার সংক্রান্ত সকল বিষয়ের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশ, ও তত্ত্বাবধানের অধীনস্থ থাকত। ভারত সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা হত সমধর্মিতার স্বার্থে ঐ সরকারেরই মাধ্যমে। এটা প্রতীয়মান হত যে, নানা দিক দিয়ে বিচার করলে ভারত ছিল একটি একক ও অবিভক্ত দেশ, যেখানে অভিন্নভাবে বেশির ভাগ করা দরকার। প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশাবলি কার্যকর জনপালন কৃত্যকের আধিকারিকরা। মন্ত্রীর প্রত্যাভূতি দেওয়া শর্তে ইংল্যান্ড থেকেই নিযুক্ত হওয়ার ফলে তাদের সংক্রান্ত বহু বিষয় প্রাদেশিক সরকাররা স্থির করতে পারত না। আবার, সারা ভারত জুড়ে বাণিজ্য, শিল্প ও বিকাশের উন্নতিসাধনের বিষয়টি অনুরূপভাবে ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত অভিন্ন নীতির সূত্রবদ্ধকরণ ও পালন করার স্বপক্ষে ছিল। সমগ্র ভারতের জন্য এমন কি একটি আইনের ফলে ব্যবস্থা ও শিল্প তাদের নিজেদের বিচার-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল পরিসংখ্যান, কৃতিস্বত্ব (patent), গ্রন্থস্বত্ব, বীমা, আয়কর, বিস্ফোরক ও খনি ইত্যাদির মত বিষয় পরিচালনা করার জন্য।

প্রশাসনের ব্যাপারে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করার জন্য শুধু যে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ করে রাখা হত তা নয়, সেই সঙ্গে কোনও নতুন নীতি নিতে উদ্যোগী হওয়ার স্বাধীনতাও তাদের ছিল না। নতুন নির্দেশ জারি করে সমগ্র ভারতের জন্য নীতি রচনা করা এবং উৎসাহবর্দ্ধক সংস্কারসাধন করার দায়িত্বের ব্যাপারে নিজেদের বিশেষভাবে দায়বদ্ধ বলে মনে করত ভারত সরকার। এই নির্দেশগুলিকে ফলপ্রদ করার জন্য তাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত অনুদান। দেওয়া হত প্রাদেশিক সরকারগুলিকে, যেগুলি বিশেষভাবে আলাদা করে রাখা হত নতুন নীতির কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। প্রায়শই ভারত সরকার নতুন উপদেষ্টা বা পরিদর্শক আধিকারিকদের নিয়োগ করত যাদের কাজ ছিল নতুন পদ্ধতির মধ্যে হঠাৎ অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া নতুন কর্মপ্রেরণা যাতে সঠিকভাবে পালিত ও পরিচালিত হয় কাঙ্ক্ষিত ফললাভের ব্যাপারে।

যতদিন পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকারগুলি ভারত সরকারের এই ধরনের উপাদানগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকবে ততদিন পর্যন্ত প্রদেশগুলিতে দায়িত্বপূর্ণ সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এক সঙ্গে এবং একইসময়ে কোনও সরকারই দুইজন প্রভুর মন জুগিয়ে চলতে পারে না। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে ভারত সরকারের অধীনস্থ[১] করে রাখার জন্য এবং লোকায়ত বিধানমণ্ডলের কাছে তাদের দায়ী করে রাখাটাও তত্ত্বগতভাবে সামঞ্জস্যহীন এবং ব্যবহারিকভাবে অনৈতিক হয়ে উঠতে পারত। একথা ভালভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, এই ধরনের দ্বৈত সরকারের অধীনে কয়েকটা বিষয়ে প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি ভারত সরকারের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ নাও হতে পারে। সেই সব ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার কাকে মেনে চলতে হবে এটা বুঝে উঠতে নাও পারে। যদি তা বিধানমণ্ডলের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বিলম্বিত করে তবে তা ভারত সরকারের কাছে নিজ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হবে। এই ধরনের মত-বিরোধের ঘটনা অবশ্য নথিভুক্ত আছে।[২] একবার মর্লে মিন্টো সংস্কার সাধন প্রক্রিয়া চালু থাকাকালীন বোম্বাই সরকার শিক্ষা বিভাগীয় কর্মীদের উপর প্রভাব পড়তে পারে এমন কিছু খরচের ব্যাপারে ভারত সরকারের অনুমোদন পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। প্রস্তাবগুলি স্থানীয়ভাবে বেশ জনপ্রিয় ছিল এবং একজন নির্বাচিত সদস্য কর্তৃক বোম্বাই বিধানমণ্ডলে একটি প্রস্তাব আবার উত্থাপন করা হয় উক্ত বিষয়টির

১। অধীনতার এই মাত্রাটিতে প্রদেশগুলির পদমর্যাদা অনুসারে তারতম্য হত, এটা জানতে হলে দ্রষ্টব্য, যৌথ প্রতিবেদন। পৃষ্ঠা ৩৭-৪৫।

২। যৌথ প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬।

অনুমোদনের জন্য ফলে বোম্বাই সরকার প্রস্তাবটি মেনে নেয় যা সর্বসম্মতি আদায় করেছিল এবং সমগ্র বিধানমণ্ডলের সমর্থন আছে এই কারণ দেখিয়ে আবার তাদের প্রস্তাবটি পাঠায় ভারত সরকারের কাছে। কিন্তু ভারত সরকার ও মন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করে যে, এই কৌশলী পন্থাটি কার্যত অচল হয়ে গেছে এবং এটাই—

"প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার ব্যাপারে স্থানীয় সরকারের কর্তব্য হল তাদের সর্বময় ক্ষমতা নিয়োগ করে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা",

অর্থাৎ নীতিগতভাবে বিধানমণ্ডলীর সঙ্গে একমত হলেও প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে হবে।

অতএব অধীনতার যে নাগপাশ প্রদেশগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বেঁধে রাখত সেটাই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। প্রাদেশিক সরকারকে প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলের অধীনস্থ করে রাখার জন্য প্রথম যেটা করণীয় ছিল তা হল প্রাদেশিক বিত্ত, প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন এবং প্রাদেশিক প্রশাসনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার যে ক্ষমতা ভারত সরকারের ছিল সেই ক্ষমতাগুলি সংকুচিত করা। সাংবিধানিক সংস্কার সাধন সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিবেদনের[১] রচয়িতারা সঙ্গত কারণেও মন্তব্য করেছিলেন :

"বর্তমান কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে আমাদের। অন্তত আংশিকভাবেই নতুন কাঠামো গড়ে তোলার আগে। আমাদের কাজ হবে অধিকারের পুনঃপ্রাপ্তি, সীমা নির্দিষ্ট করার জন্য সীমারেখা টানা, দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী বন্ধনকে ছিন্ন করা। ভারত সরকারকে অবশ্যই দিতে হবে এবং প্রদেশগুলি অবশ্যই গ্রহণ করবে; কারণ একমাত্র সেই কারণেই প্রদেশগুলির স্ব-শাসিত সরকারের ক্রমবর্দ্ধমান যান্ত্রিক গঠন বুক করে নিঃশ্বাস নিতে পারবে এবং বেঁচে থাকতে পারবে।

অতএব প্রাদেশিক স্বাধীনতার পথটি প্রস্তুত করা যেতে পারে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে কাজকর্ম ও বিত্তের সন্তোষজনক বিভাজনের মাধ্যমে। এই দুটির মধ্যে কাজকর্ম বিভাজনের কাজটি তুলনামূলকভাবে সহজতর। কাজকর্মের প্রয়োজনীয় বিভাজনে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকার নিম্নলিখিত নীতিগুলি ধার্য করেছিলেন।[২]

১। যৌথ প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ১০১

২। ভারত সরকার কর্তৃক কাজকর্ম কমিটির জন্য স্মারকলিপি। কমিটির প্রতিবেদনের ক্রোড়পত্র নং ২, সিএমডি ১৩৩, ১৯১৯ সালের।

"৭। কয়েকটি বিষয় আছে যা বর্তমানে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আছে। এই তত্ত্বাবধানের জন্য ভারত সরকার পৃথক কর্মচারিবৃন্দ রেখেছে এবং এতে প্রাদেশিক সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। শ্রেণীটিকে সহজে শনাক্ত করা যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার মধ্যে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ একটা অবসর ছিল না। নীতিসূত্রটির অন্য প্রান্তে থাকত প্রধানত স্থানীয় স্বার্থ জড়িত বিষয়গুলি, যেগুলি প্রদেশগুলির মধ্যে পরিবেশের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন সাধারণ অর্থে প্রাদেশিকীকরণের সঠিক বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হবে।

"৮। দুই প্রান্তের এই শ্রেণীগুলির মধ্যে অবশ্য একটি অনির্বাচিত বৃহৎ ক্ষেত্র আছে, যার জন্য আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন এর শ্রেণীভুক্তিকরণের বিষয়টির নীতিগুলি সুমীমাংসিত হবার আগে। এর আওতার মধ্যে পড়ে সেইসব বিষয়গুলি যে সম্বন্ধে বর্তমানে ভারত সরকার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণটি নিজের হাতে রাখে বিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে; কিন্তু কার্যত প্রকৃত প্রশাসনে নানা মাত্রায় অংশ নেয় প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে। বহু ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বকরণের যে প্রয়োগ চলত তার প্রসার ইতিমধ্যে বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। এগুলি সম্পর্কে ভারত সরকার যে নীতি প্রয়োগ করত সেটা এই যে, কোনও কোনও প্রদত্ত ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারগুলি কি কঠোর অর্থে ভারত সরকারের প্রতিনিধি ছিল বা তারা বাধ্য থাকত (হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা সংরক্ষিত করে রাখার ব্যাপারে নিম্নে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে) নিজস্ব কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিতে। এই নীতিটি প্রয়োগ করার ব্যাপারে প্রধান নির্ধারক কারণটি ইতিমধ্যে প্রয়োগ করা প্রতিনিধিত্বকরণের মাত্রা অনুযায়ী হবে না। যা শুধু সুবিধার উপরেই নির্ভর করে, বরং সেই কারণটি হবে একদিকে সমগ্র ভারতের স্বার্থ (অথবা যে-কোনও অবস্থায় একটি প্রদেশের স্বার্থের চেয়ে বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষেত্রে) অথবা অপর দিকে বিশেষভাবে অধিকতর জরুরি প্রদেশের স্বার্থগুলির বিচার-বিবেচনা।"

"বিচার্য বিষয়টি এই যে, কোনও প্রতিনিধিকে ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি হয়ত আগে থেকেই বেশ ব্যাপক অবস্থায় আছে, কিন্তু তাই বলে ঐ পরিস্থিতিটি প্রতিনিধিত্বকরণের ব্যাপারটিকে যেন আড়াল করে না রাখে বা এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না দেয় যে, প্রতিনিধির নিজস্ব সহজাত ক্ষমতা আছে।"

এই নীতিগুলির ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে, "যে ক্ষেত্রে প্রদেশ বহির্ভূত স্বার্থগুলির প্রধান হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে বিষয়টিকে গণ্য করতে হবে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে,"যখন

কি না—

“সেই সকল বিষয় যেখানে প্রদেশের স্বার্থগুলি বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়, সেগুলিকে হতে হবে প্রাদেশিক এবং (যেগুলির) ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নিজস্ব কর্তৃত্বাধিকারকে স্বীকৃতি (দিতেই) হবে।”

যেগুলি স্বীকৃতি লাভ করেছিল কৃত্য কমিটি (Function Committee) কর্তৃক, যার কাজ ছিল সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক বিষয়গুলির মধ্যে বিভাজন করা। এই কমিটির সুপারিশগুলি সামান্য সংশোধনের পর সন্নিবেশিত করা হয় তার মধ্যে যাকে বলা হয় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ৪৫-এ ধারার অধীন ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত বিধিনিয়ম, যা দায়িত্বশীল সরকারের নীতিকে রূপদান করেছিল এবং তা দেশের সাংবিধানিক আইনের একটা অংশ হয়ে উঠেছিল, যাতে করে তার ফলে প্রদেশগুলির উপর বর্তানো বিষয়গুলি সেইসব পরিষেবায় রূপান্তরিত হয় যার উপর প্রদেশগুলি **নিজস্ব স্বীকৃত কর্তৃত্বাধিকার** লাভ করেছিল, যা তারা ১৮৩৩ সালের আগে কখনো পায়নি। ক্ষমতা হস্তান্তরের এই বিধিনিয়ম অনুসারে নিম্নলিখিতগুলি ঘোষিত হতে চলেছিল এই নামে।

প্রাদেশিক বিষয়গুলি

১। **স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন**, অর্থাৎ ১৯১০ সালের সেনাবাস অধিনিয়মের (Cantonments Act) অধীনস্থ উদ্ভূত বিষয়গুলি বাদে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের জন্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত পৌরনিগম, উন্নতিবিধান ন্যাস (Improvement Trust), জিলা পর্ষৎ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খনি পর্ষৎ ও অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গঠন-বিন্যাস ও ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি, ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক আইন প্রণয়ন সাপেক্ষে এগুলি সম্বন্ধে—

(ক) প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে ছাড়া অন্য স্থান থেকে ঋণগ্রহণ করার মত কর্তৃত্বাধিকারের ক্ষমতা, এবং

(খ) করারোপণ করার অনুরূপ কর্তৃত্বাধিকার কর্তৃক কর আরোপ করার, যা তালিকাভুক্ত করসংক্রান্ত নিয়মাবলির দ্বিতীয় অণুসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়।

২। **চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত প্রশাসন**, যার মধ্যে হাসপাতাল, ঔষধালয় এবং আতুরাশ্রম এবং চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা।

৩। **জন-স্বাস্থ্য এবং অনাময় ব্যবস্থা (sanitation) এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিসংখ্যান**; ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যধি সংক্রান্ত ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক

আইনপ্রণয়ন সাপেক্ষে সেই পরিমাণে যা ভারতীয় বিধানমণ্ডলের কোনও অধিনিয়ম কর্তৃক ঘোষিত হতে পারে।

৪। ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে তীর্থযাত্রী

৫। শিক্ষা, এই শর্তে যে—

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাদ দিতে হবে, যথা:

(১) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঐ ধরনের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যা এই নিয়মাবলি প্রচলিত হবার পর গঠিত হবে, যেগুলি সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক কেন্দ্রীয় বিষয় বলে ঘোষিত হতে পারে এবং

(২) সেনাপতিদের কলেজ বা অন্য প্রতিষ্ঠান যার পোষকতা করতেন সপরিষদ বড়লাট সম্রাটের সৈন্যবাহিনী বা অন্যান্য সরকারি আধিকারিক বা ঐ ধরনের আধিকারিকদের সদস্যদের সন্তানের সুবিধার্থে; এবং

(খ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইনের অধীনে, যথা:

(১) প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং এই নিয়মাবলি চালু হবার পর গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠন-বিন্যাস এবং কাজকর্মের বিধিনিয়ম; এবং

(২) প্রদেশের বাইরে অবস্থিত কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিক্ষেত্রের সংজ্ঞা এবং

(৩) এই নিয়মাবলি চালু হবার তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গদেশ প্রেসিডেন্সিতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ।

৬। বাস্তুকর্ম নিম্নলিখিত খাতে অন্তর্ভুক্ত। যথা:

(ক) প্রদেশের ভবনগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, যেগুলি প্রদেশের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কোনও উদ্দেশ্যের জন্য অভিপ্রেত বা ব্যবহৃত হয়; ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলির যত্ন করা, ১৯০৪ সালের প্রাচীন নিদর্শনাবলির সংরক্ষণ অধিনিয়মের ধারা (২)(১)-এ নির্ধারিত প্রাচীন নিদর্শনাবলি বাদে, যেগুলি সাময়িকভাবে ঐ অধিনিয়মের ধারা ৩(১)-এর অধীনে সুরক্ষিত প্রাচীন নিদর্শনাবলি হিসাবে ঘোষিত; এই শর্তে যে সপরিষদ বড়লাট ভারতের ঘোষপত্রে (Gazette) বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ব্যতিক্রমের কার্যকারিতা থেকে ঐ ধরনের নিদর্শনগুলিকে বাদ দিয়ে রাখে;

(খ) সড়ক, সেতু, খেয়াপথ, সুড়ঙ্গ, রজ্জুপথ এবং বাঁধ ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম, এবং সামরিক গুরুত্ব আছে বলে সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক ঘোষিত যোগাযোগের মাধ্যমগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যে সব শর্ত আছে সেগুলির সাপেক্ষে, এবং সেগুলির সঙ্গে যুক্ত বিশেষ ব্যয়ের আপতন সংক্রান্ত, যা সপরিষদ বড়লাট নির্দেশ দেবেন;

(গ) পৌর এলাকার অন্তর্গত ট্রামলাইন; এবং

(ঘ) ক্ষুদ্র রেলপথ এবং শাখা রেলপথ এবং পৌর-এলাকা বহির্ভূত ট্রামলাইন যতদূর পর্যন্ত প্রাদেশিক আইন প্রণয়নের দ্বারা সেগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ততদূর পর্যন্ত; ভারতীয় বিধানমণ্ডলীর প্রণীত আইন সাপেক্ষে সেইসব রেলপথ ও ট্রামলাইন সম্পর্কে, যেগুলি মূল পথের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বা সংলগ্ন মূল পথ হিসাবে একই মাপে নির্মিত।

৭। **জল সরবরাহ,** সেচন ও খাল, জল নিকাশী ও বাঁধ, জল ভাণ্ডারভূতি (Storage) এবং জলশক্তি; আন্ত-প্রাদেশিক সংশ্লিষ্ট বিষয় অথবা প্রদেশের সঙ্গে অন্য যে কোনও অঞ্চলের সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে এমন বিষয়গুলি সম্পর্কে ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

৮। **ভূমি রাজস্ব প্রশাসন,** নিম্নলিখিত খাতে যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে, যথা:

(ক) ভূমি-রাজস্বের নির্ধার (Essessment) ও আদায়;

(খ) রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য জরিপ ও ভূমি নথিপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, খতিয়ান;

(গ) ভূমি রায়তিস্বত্ব সম্পর্কিত আইন, ভূস্বামী ও প্রজার সম্পর্ক, খাজনা আদায়;

(ঘ) প্রতিপাল্যাধিকরণ (Court of words), দায়বদ্ধ ও ক্রোক করা ভূসম্পত্তি;

(ঙ) ভূমি উন্নয়ন এবং কৃষি ঋণ;

(চ) উপনিবেশ স্থাপন এবং সম্রাটের ভূমির বিলিবন্দেজ এবং ভূমি রাজস্বের হস্তান্তরকরণ এবং

(ছ) সরকারি ভূসম্পত্তির পরিচালনব্যবস্থা।

৯। **দুর্ভিক্ষ ত্রাণ**

১০। কৃষি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পরীক্ষামূলক ও হাতে-কলমে শিক্ষামূলক খামার,

উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন, কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা, ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ ও প্রাণী-উদ্ভিদের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ ও গাছপালার অসুখ নিবারণ; ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ ও প্রাণী-উদ্ভিদ সম্পর্কিত ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইনসাপেক্ষে, সেই পরিমাণে যা ভারতীয় বিধান মণ্ডলের কোনও অধিনিয়ম কর্তৃক ঘোষিত হবে।

১১। **অসামরিক পশুরোগ সংক্রান্ত বিভাগ**, পশুরোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, গবাদি পশুর উন্নয়ন এবং পশুরোগ নিবারণের ব্যবস্থা সহ; পশু রোগ বিষয়ে ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে ততটা পরিমাণে যা ভারতীয় বিধানমণ্ডলের কোনও অধিনিয়ম কর্তৃক ঘোষিত হবে।

১২। **মীনক্ষেত্র**

১৩। **সমবায় সমিতি**

১৪। **বন-জঙ্গল**, তত্রস্থ শিকারের জন্তুর সংরক্ষণ সহ; সংরক্ষিত বনের নির্বনীকরণ সংক্রান্ত ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

১৫। **ভূমি অধিগ্রহণ**, ভারতীয় বিধান মণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

১৬। **অন্তঃশুল্ক** অর্থাৎ উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন, অধিকার ভোগ, পরিবহন, সুরাসার যুক্ত মদ ও উত্তেজক ঔষধের খরিদ ও বিক্রয়; ঐ জাতীয় পদার্থের উপর বা তদসংক্রান্ত অন্ত:শুল্ক ও অনুমতিপত্র মাসুল ধার্য করা, কিন্তু বাদ দেওয়া হয়েছে আফিম, চাষবাস নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন এবং রপ্তানীর জন্য বিক্রয়ের বিষয়গুলি।

১৭। **বিচার-ব্যবস্থার পরিচালনা**, প্রদেশের মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী অধিক্ষেত্রস্থ আদালতের গঠন-বিন্যাস, ক্ষমতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংগঠন সহ; উচ্চ-ন্যায়ালয়, প্রধান বিচারালয় এবং বিচারক কমিশনার এবং ফৌজদারি অধিক্ষেত্রগত যে কোনও আদালত সম্পর্কে ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

১৮। **প্রাদেশিক বিচারসংক্রান্ত প্রতিবেদন।**

১৯। **মহাপরিপালক এবং ন্যাসপাল**, ভারতীয় বিধান মণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

২০। **অ-বিচারিক প্রমুদ্রা** (Non-Judicial Stamp), ভারতীয় বিধান মণ্ডলের প্রণীত আইন সাপেক্ষে, এবং **বিচারিক-প্রমুদ্রা**, ভারতীয় বিধান মণ্ডলের আদিম অধিক্ষেত্রের অধীনস্থ উচ্চ ন্যায়ালয়ে মোকদ্দমা এবং ব্যবহারিক ক্রিয়া (proceed-ing) সম্পর্কে আরোপিত রসুমের (Court fees) পরিমাণের ব্যাপারে ভারতীয়।

বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

২১। **দলিল ও দস্তাবেজের নিবন্ধীকরণ,** ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

২২। **জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের নিবন্ধীকরণ; ভারতীয় বিধানমণ্ডল**; ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক নির্ধারিত সেইসব শ্রেণীর জন্য ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

২৩। **ধর্মীয় এবং দাতব্য উৎসর্জন** (endowment);

২৪। **খনিজ সম্পদের বিকাশ, যেগুলি সরকারি সম্পত্তি;** মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত বা প্রণীত নিয়মাবলী সাপেক্ষে, কিন্তু খনি প্রনিয়মগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়।

২৫। **শিল্পোন্নয়ন,** শিল্পসংক্রান্ত গবেষণা ও কারিগরি প্রশিক্ষণসহ।

২৬। **শিল্পসংক্রান্ত বিষয়াবলি,** নিম্নলিখিত খাত সহ, যথা:—

(ক) কারখানা;

(খ) শ্রম-বিরোধের মীমাংসা;

(গ) বিদ্যুৎ;

(ঘ) বয়লার, (Boilers)

(ঙ) ন্যাস;

(চ) ধূমোৎপাত (Smoke nuisance); এবং

(ছ) শ্রমিক কল্যাণ, ভবিষ্যনিধি, শিল্পবিমা (সাধারণ স্বাস্থ্য এবং দুর্ঘটনা) এবং আবাসন সহ:

ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত (ক), (খ), (গ), (ঘ) এবং (ছ) খাত সম্পর্কিত আইন সাপেক্ষে।

২৭। **ভাণ্ডার ও লেখ্য সামগ্রী; সপরিষদ** মন্ত্রী কর্তৃক অনুসারে আমদানিকৃত ভাণ্ডার ও লেখ্য সামগ্রী সম্পর্কে নির্ধারিত অনুরূপ নিয়মাবলি সাপেক্ষে।

২৮। **খাদ্য বস্তু ও অন্যান্য দ্রব্যের ভেজাল মিশ্রণ;** আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বিষয়ে ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

২৯। **বাটখারা এবং পরিমাপন,** সাধারণ মান অনুসারে ভারতীয় বিধানমণ্ডল

কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

৩০। **বন্দর**, শুধু সেইসব বন্দর বাদে যেগুলি সপরিষদ বড়লাটের প্রণীত নিয়মাবলি বা ভারতীয় আইন কর্তৃক বা তার অধীনে প্রণীত আইন দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসাবে ঘোষিত হতে পারে।

৩১। **অন্তর্দেশীয় জলপথ**; জাহাজ ও নৌ চলাচল সহ, যতক্ষণ পর্যন্ত সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক কেন্দ্রীয় বিষয় বলে ঘোষিত না হয়, কিন্তু বাষ্পচালিত জাহাজের ব্যাপারে ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

৩২। **পুলিশ**; রেলপুলিশ সহ; অধিক্ষেত্রের পরিসীমা সংক্রান্ত রেলপুলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেইসব শর্তাবলি এবং তার প্রতিপালনে রেলের খরচ বহন করার বিষয়টি যা সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক নির্ধারিত হলে তার সাপেক্ষে:

(ক) বাজি ধরা ও জুয়াখেলার প্রনিয়ম;

(খ) প্রাণী নির্যাতন নিবারণ;

(গ) বন্য পাখি ও প্রাণী সংরক্ষণ;

(ঘ) বিষ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ, ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে;

(ঙ) মোটর যানের উপর নিয়ন্ত্রণ, সারা ব্রিটিশ ভারতে বৈধ অনুমতিপত্র (licence) সম্পর্কে ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে, এবং

(চ) নাটক অভিনয় ও চলচিত্র সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ, প্রদর্শনের জন্য ফিল্মের ব্যাপারে অনুমতিদানের জন্য ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

৩৪। **সংবাদপত্র, গ্রন্থ্ এবং ছাপাখানার নিয়ন্ত্রণ**; ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

৩৫। **আশু-মৃত পরীক্ষক** (Coroner)।

৩৬। **বহির্ভূত অঞ্চল**।

৩৭। **অপরাধ-প্রবণ উপজাতি**, ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

৩৮। **ইউরোপীয় যাযাবরত্ব** (Vagrancy), ভারতীয় বিধান মণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

৩৯। **জেলখানা**; বন্দীগণ (সরকারি বন্দীরা বাদে) এবং সংশোধনাগার; ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

৪০। **খোঁয়াড়** এবং গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ নিবারণ।

৪১। **গুপ্তধন**।

৪২। **পাঠাগার** (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি বাদে) এবং **জাদুঘর** (ভারতীয় জাদুঘর, রাজকীয় সামরিক জাদুঘর এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলকাতা বাদে) এবং **চিড়িয়াখানা**।

৪৩। **প্রাদেশিক সরকারি ছাপাখানা**।

৪৪। **নির্বাচন** ভারতীয় ও প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলের জন্য, অধিনিয়মের ধারা ৬৪(১) এবং ৭২(ক) (৪) অনুসারে রচিত নিয়মাবলি সাপেক্ষে।

৪৫। **চিকিৎসাশাস্ত্র ও অন্যান্য পেশাগত যোগ্যতার ও মানসংক্রান্ত প্রনিয়ম**; ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

৪৬। **স্থানীয় তহবিল নিরীক্ষা**, অর্থাৎ স্থানীয় সংস্থাগুলি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত আয় ও ব্যয়ের ব্যাপারে সরকারি এজেন্সির মাধ্যমে নিরীক্ষা।

৪৭। ১০ নং নিয়মদ্বারা ব্যাখ্যাত **সর্ব-ভারতীয় ও প্রাদেশিক কৃত্যকগুলির সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ**, যারা প্রদেশের মধ্যে কর্মরত, এবং সর্বভারতীয় কৃত্যকগুলি বাদে প্রদেশের মধ্যে জনপালন কৃত্যকগুলি সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় বিধানমণ্ডলের প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

৪৮। **প্রাদেশিক বিত্তের উৎসসমূহ**, পূর্বতন খাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যদি

(ক) অনুসূচিত কর সংক্রান্ত নিয়মাবলীর অনুসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করগুলি, অথবা

(খ) ঐ অনুসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন করগুলি, যেগুলি প্রাদেশিক আইন প্রণয়নের দ্বারা বা তার অধীনে আরোপিত হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বড়লাটের অনুমোদন পেয়েছে।

৪৯। **অর্থ ঋণগ্রহণ** (কেবলমাত্র প্রদেশের আকলনে, স্থানীয় সরকারের (ঋণগ্রহণ) নিয়মাবলির শর্ত সাপেক্ষে।

৫০। আইনের মাধ্যমে শাস্তিদানের ব্যাপারে **জরিমানা, দণ্ডদান অথবা কারাদণ্ডের বিধান** করা যে কোনও প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধে প্রদেশের কোনও আইনকে বলবৎ

করার জন্য; এই নিয়মাবলির অধীনে আরোপিত অনুরূপ সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে যে কোনও বিষয়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইন সাপেক্ষে।

৫১। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলির আওতাভুক্ত হলেও যে-কোনও বিষয়কে প্রদেশের মধ্যে কেবলমাত্র স্থানীয় অথবা বেসরকারী বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন সপরিষদ বড়লাট।

৫২। কেন্দ্রীয় বিষয়ের অধিকারভুক্ত বিষয়গুলি, যে সম্পর্কে যে-কোনও আইনের মাধ্যমে বা তদ্‌দ্বারা স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে রাজস্বের উৎসগুলি বণ্টন করে দেওয়ার মত অপর গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ছিল তুলনামূলক ভাবে বেশ কঠিন। আইন কর্তৃক স্বীকৃত তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব অর্জন করা উচিত এই মর্মে যে প্রস্তাব উঠেছিল সেই ব্যাপারে ভারত সরকারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রদেশগুলিকে স্বাধীন করার মত প্রধানত যে সমস্যাটি উপলব্ধি করা হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবিধানিক সংস্কারসাধন বিষয়ক প্রতিবেদনের রচয়িতাদের পক্ষে এটা মনে করা স্বাভাবিক ছিল যে:

"আমাদের প্রথম লক্ষ্য.....হচ্ছে এমন কিছু উপায় খুঁজে বের করা যা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদগুলিকে প্রদেশের সম্পদ থেকে আলাদা করে রাখবে।"

অতএব এই ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপটি ছিল "বিভাজিত খাত" বা অংশীদারি রাজস্বের দ্বারা বাজেট রচনার পদ্ধতির বিলোপসাধন করা, কারণ সর্বসম্পতিক্রমে অভিমত এই ছিল যে, এই এজমালি পদ্ধতি, যে পর্যন্ত তা প্রদেশগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ করে দিত কেন্দ্রীয় সরকারকে, তা ছিল সঙ্ঘর্ষের একটা উৎস এবং প্রাদেশিক স্বাধীনতার পরিপন্থী। কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের ঐ ধরনের পদ্ধতি ছিল দুটি অসুবিধাযুক্ত। প্রথম অসুবিধাটি ছিল লভ্যাংশ খাতগুলির বণ্টন প্রসঙ্গে। ওটা কাদের হাতে তুলে দিতে হবে? যখন সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের পরিকল্পনাটি নিয়ে ভাবা হচ্ছিল তখন রাজস্বের যে খাতগুলি সকল বা কিছু কিছু প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত সেগুলি হল ভূমিরাজস্ব, প্রমুদ্রা, আয়কর এবং জলসেচন। সাংবিধানিক সংস্কার সাধন সম্পর্কিত প্রতিবেদনের রচয়িতারা প্রস্তাব[১] দিয়েছিলেন।

১। প্রতিবেদন পৃ: ১৬৫-৭

"..........যে প্রমুদ্রা শুল্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বকে পৃথক করতে হবে ইতিমধ্যে সুচিহ্নিত উপ-খাতে **সাধারণ** এবং **বিচারসংক্রান্ত** ; এবং প্রথমোক্তটিকে করা উচিত ভারতীয় এবং শেষোক্তটিকে প্রাদেশিক আয় হিসাবে ধরা। এই ব্যবস্থা বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রমুদ্রার বিষয়ে অভিন্নতা বজায় রাখবে, যেক্ষেত্রে তা সুস্পষ্টতাই বাঞ্ছনীয় হবে আনুপাতিক হারের ব্যাপারে বৈষম্য পরিহার করতে ; এবং তা প্রদেশগুলিকে স্বাধীনতাও দেবে রসুম (Court fee) প্রমুদ্রার ব্যাপারটি স্থির করতে এবং এইভাবে তারা তাদের সম্পদ বাড়াবার এক বাড়তি উপায় পাবে। বর্তমানে অন্তঃশুল্ক পূর্ণমাত্রায় বোম্বাই, বঙ্গদেশ এবং আসামে প্রাদেশিক খাত হিসাবে পরিচিত এবং আমরা কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না কেন এখন এটা সারা ভারতে প্রাদেশিক করা হবে না।.......সকল খাতের মধ্যে বৃহত্তম হিসাবে ভূমি রাজস্ব বর্তমানে সমভাবে বণ্টিত হয় ভারতীয় ও সকল প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে, ব্যতিক্রম শুধু ব্রহ্মদেশের ক্ষেত্রে যারা অর্ধেকেরও বেশি অংশ পায় এবং উত্তরপ্রদেশ তুলনায় কম পায়।.... যেহেতু তখন ভূমিরাজস্বের নির্ধার এবং আদায়ের বিষয়টি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে গ্রামাঞ্চলের সমগ্র প্রশাসনের সঙ্গে যে এটাকে প্রাদেশিক আয় হিসাবে গণ্য করলে বেশি সুবিধা যে পাওয়া যাবে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়.... এছাড়া দুর্ভিক্ষজনিত ব্যয় ও প্রধান প্রধান পূর্তকার্য সম্পর্কিত ব্যয় সঙ্গত কারণেই ভূমিরাজস্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধাবদ্ধ, এবং ঐ খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থকে যদি প্রাদেশিক গণ্য করা হয় তবে যুক্তিসঙ্গতভাবে এটাই ধরে নিতে হয় যে, প্রদেশগুলিকে দুর্ভিক্ষে ত্রাণ এবং সংরক্ষণমূলক কাজের গুরুভার তাদের নেওয়া উচিত।........

আমাদের বলা হয়েছে যে প্রদেশগুলিতে জনপ্রিয় সরকারের আরম্ভকালে ভাল হত যদি প্রাদেশিক সরকারকে শেষ উপায় স্বরূপ অবলম্বনের পন্থা হিসাবে ভারত সরকারের সমর্থন নিতে পারত (যেন তখনও পর্যন্ত যদি এই খাতের অর্থটি বিভাজিত হত, তবে তা করা সম্ভব হত) যে ক্ষেত্রে তার ভূমি রাজস্ব নীতির উপর আক্রমণ হত।[১] কিন্তু যেহেতু বিভাজিত খাতগুলিকে নিছক বিত্তীয় উপযোগিতা

১। সঠিকভাবেই হোক বা ভুল করেই হোক জননেতারা সবসময়ে সরকারের ভূমি রাজস্ব নীতিকে কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখতেন, এবং সব সময়েই আক্রমণের আশংকা থাকত। এই নীতিটিকে যে জনপ্রিয় প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলের, প্রাদেশিক বিষয় হিসাবে ভূমি রাজস্বকে যাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়েছে, তাদের অধীনে তা উলটে যেতে পারে এই আশংকায় ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বিধেয়ক সংরক্ষণ নিয়মাবলীর অধীনস্থ ধারা ১২(১) এর দ্বারা এটা বলা হয়েছিল যে—লাট শাসিত প্রদেশের লাট, ইতিপূর্বে বড়লাট কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া, যে কোনও বিধেয়ককে সংরক্ষিত করে রাখবেন বড়লাটের বিচার বিবেচনার জন্য। যা প্রদেশের বিধান পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ছোট লাটের কাছে পেশ করা হয়েছে তাঁর সম্মতি লাভের জন্য, যদি ছোটলাট মনে করেন যে বিধেয়কে কয়েকটি শর্ত আছে—

বলে গণ্য করা হয় না, কিন্তু দেখা হয়, এবং যতদিন টিকে থাকবে ততদিন দেখা হবে, প্রাদেশিক সরকারকে ভারত সরকারের তুলনায় হীনতর থাকার উপায় হিসাবে; এবং তাই আমরা নিশ্চিত ভাবেই মনে করি যে, এগুলি রদ করা উচিত। অতএব আমাদের প্রস্তাব এই যে জলস্রোতের সঙ্গে ভূমি রাজস্বকে এক করে সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক আয় হিসাবে গড়ে তোলা। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দুর্ভিক্ষে ত্রাণ এবং সংরক্ষণমূলক পূর্তকার্যের ব্যাপারে ব্যয়ের জন্য পুরোপুরি দায়ী হয়ে উঠবে প্রদেশগুলি।..... বাকি অপর খাতটি হল আয়কর। এটিকে ভারতের আয় হিসাবে গণ্য করার দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা দেখছি। প্রথমত সারা দেশে এক অভিন্ন হার বজায় রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আনুপাতিক হার বর্তমান থাকাটা যে অসুবিধাজনক, বিশেষ করে ব্যবসার জগতে, তা সুপরিস্ফুট। দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও বড় শহরে নিজেদের ব্যবসা কেন্দ্রে সহ উদ্যোগগুলির শাখা বিস্তার করার ব্যাপারে যে প্রদেশে কর দেওয়া হচ্ছে সেটা অপরিহার্যভাবে সেই প্রদেশ নয় যেখান থেকে আয় করা হয়েছে। আমাদের অবশ্যই এটা বলা হয়েছে যে, আয়কর নিছকই ভূমিরাজস্বের শিল্প অথবা পেশাগত পূরকমাত্র; এবং ভূমি রাজস্বের প্রাদেশিকীকরণ করতে দেওয়া, যখন কি আয়করের ভারতীয়করণ হচ্ছে, অর্থ হল সেই সব প্রদেশগুলিকে দেওয়া, যার সম্পদ উল্লেখযোগ্য ভাবে কৃষিভিত্তিক, যেমন যুক্তপ্রদেশ এবং মাদ্রাজ প্রাথমিকভাবে অগ্রাধিকার পেয়েছিল বোম্বাইয়ের মত প্রদেশের তুলনায়, যে প্রদেশটি বিশাল শিল্পগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থ আছে। অপর একটি অত্যন্ত কার্যকর যুক্তি এই যে করটি আদায় হয় প্রাদেশিক এজেন্সির মাধ্যমে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে যদি প্ররোচিত করা না হয়, যেমন আয় বা আদায়ের উপর দালালির অংশ হিসাবে, যা নিছকই ছদ্ম আবরণের আড়াল করা অংশমাত্র, তবে আদায়ের ব্যাপারে শৈথিল্যের প্রবণতা দেখা দেবে এবং তার ফলে আদায় কমে যাবে। আমরা স্বীকার করছি যে, এই যুক্তি বেশ জোরালো, কিন্তু রাজস্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের পথে তাদেরই অন্তরায় হতে দিতে রাজি নই আমরা। একটি প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের আচরণে সমতা থাকতেই হবে যতদূর পর্যন্ত

(ঙ) যা প্রদেশের ভূমিরাজস্বকে প্রভাবিত কর হয়:

(১) একটি সময়কাল অথবা একাধিক সময়কাল নির্ধারিত করা যার মধ্যে কোনও সাময়িকভাবে বন্দোবস্ত করা ভূসম্পত্তি বা ভূসম্পত্তিগুলির ভূমি-রাজস্বের পুনর্নিধার করা না যেতে পারে, অথবা (২) ঐ ধরণের ভূসম্পত্তি বা ভূসম্পত্তিগুলির ভূমি রাজস্বের নির্ধারের পরিমাণের সীমা নির্ধারিত করা বা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অথবা

(৩) এযাবৎকাল পর্যন্ত যে সাধারণ নীতির ভিত্তিতে ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত হত তার গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা, যদি ঐ ধরনের নির্দেশ, সীমাবদ্ধকরণ অথবা সংশোধনকে লাট মনে করেন যে তা প্রদেশের সরকারি রাজস্বকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

তা সম্ভব সামগ্রিক বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে, এবং রাজস্বের এক একটি খাতে সমতার নীতি সম্প্রসারিত করা সম্ভব নয়। যদি দেখা যায় যে আয় কমে যাচ্ছে তবে কর আদায় করার জন্য একটি সর্বভারতীয় এজেন্সি তৈরি করা দরকার হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু এটাকে একটা বিভাজিত খাত হিসাবে বজায় রাখাটাকে সুস্পষ্টভাবে বেশি পছন্দ করব আমরা। সংক্ষেপে, বর্তমানে যে ভাবে আছে সেই ভাবেই ভারতীয় ও প্রাদেশিক খাতগুলিকে ধরে রাখার প্রস্তাব করছি আমরা, কিন্তু প্রথমোক্তের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই আয়কর ও সাধারণ প্রমুদ্রাকে এবং শেষোক্তের সঙ্গে ভূমি রাজস্ব, জলসেচ, অন্তঃশুল্ক, আদালত সংক্রান্ত প্রমুদ্রা। তখন কোনও খাত আর বিভাজিত থাকবে না।

যাই হোক, যখন বর্তমান রাজস্বের সবকটি উৎসগুলি পূর্ণমাত্রায় প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। তখন এটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল যে ভারত সরকারের বাজেটে ঘাটতি দেখা দেবে। অতএব এই ঘাটতি কী ভাবে মেটানো হবে সেটা ছিল দ্বিতীয় অসুবিধা যার সঙ্গে জড়িত ছিল বিভাজিত পদ্ধতির স্থানে রাজস্বের পৃথক পৃথক খাত পদ্ধতিকে স্থাপন করার বিষয়টি। সাংবিধানিক সংস্কার সাধন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের রচয়িতাদের সামনে এই জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য বহু পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছিল। সমীক্ষা চালাবার সময় তাঁরা মন্তব্য করেছিলেন:[১]

"এটা পূরণ করার একটা পন্থা হতে পারে বর্তমান বন্দোবস্তগুলির মূলসূত্রগুলিকে বজায় রাখা, সেই সঙ্গে বিভাজিত খাতে তার অংশ রাখার পরিবর্তে ক্রমবর্দ্ধমান রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভারত সরকারকে বরাদ্দ করা। কিন্তু এই কৌশলটি প্রদেশগুলির মধ্যে বর্তমান সকল বৈষম্যগুলিকে গতানুগতিক করে দেবে, যেগুলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে কোনও কোনও প্রদেশে পর্যাপ্ত ছিল; সেই সঙ্গে তা ভারত সরকারের বিত্ত ব্যবস্থায় প্রচুর অনিশ্চয়তার উপাদান সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয়টি এই যে, আমাদের উচিত মাথা-পিছু ভিত্তিতে সর্বতোমুখী প্রদেয় অর্থ নেওয়া। কিন্তু প্রাদেশিক সম্পদ এবং প্রাদেশিক চাহিদাগুলির মধ্যে যে বৈষম্য আছে সে কারণে কর ধার্য করার হারে প্রদেশগুলির মধ্যে যে অবাঞ্ছিত তারতম্য আছে এই সুবিধাজনক কৌশলও তা পরিহার করতে পারবে না। তৃতীয় পরিকল্পনাটি ছিল মোট প্রাদেশিক রাজস্বের ভিত্তিতে প্রদেয় অর্থের সর্বতোমুখী আনুপাতিক হার মেনে নেওয়া। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটিও ছিল আপত্তির বিষয়ীভূত, এই কারণে যে,

১। প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ১৬৮

তা কয়েকটি প্রদেশকে বিশাল ঘাটতির মধ্যে ফেলে দিতে পারে। চতুর্থত, উদ্বৃত্ত আছে এমন প্রদেশগুলি সাময়িকভাবে অন্যদের সাহায্য করা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হয়েছিল সেটার সম্বন্ধে আমরা বিচার বিবেচনা করেছিলাম, কিন্তু বাতিল করেছি তা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ ও অসাধ্য বলে।"

প্রতিবেদনের রচয়িতারা যে পরিকল্পনা সুপারিশ করেছিলেন তা হল[১]

"মোট প্রাদেশিক রাজস্ব এবং মোট প্রাদেশিক ব্যয়ের যে পার্থক্য আছে তারই সমানুপাতিক অংশ হিসাবে প্রতিটি প্রদেশ ভারত সরকারকে যে অর্থ প্রদান করবে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা,

অন্যভাবে বলা যায় যে, দুর্ভিক্ষে ত্রাণ ও সংরক্ষণ মূলক জলসেচ সম্পর্কে খরচ সহ, প্রাক্‌কলিত স্বাভাবিক ব্যয়ের উপরে সকল বিভাজিত খাতগুলি পৃথকভাবে বরাদ্দ করা হয়, তখন প্রদেশের প্রাক্‌কলিত মোট রাজস্বের উদ্বৃত্তের উপর ধার্য করা কর। ১৯১৭-১৮ সালের বাজেটের সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে দেখা গিয়েছিল যে, বিভাজিত খাত পদ্ধতি বাতিল করার ফলে[২] ভারত সরকারের বাজেটে যে সম্ভাব্য

১। প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ১৬৯

২। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি কী ভাবে কার্যকর হবে তা জানা যায় প্রতিবেদনে, কলকাতা সংস্করণ (পৃষ্ঠা ১৩৪) প্রদত্ত নিম্নলিখিত সংখ্যাতত্ত্বে এবং ১৯১৭-১৮ সালের বাজেট সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে :—

(লক্ষ টাকায়)

প্রদেশ	মোট প্রাদেশিক রাজস্ব	মোট প্রাদেশিক ব্যয়	মোট প্রাদেশিক উদ্বৃত্ত	প্রদেয় অর্থ (৪ নং কলামের ৮৭ শতাংশ)	নিট প্রাদেশিক উদ্বৃত্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
মাদ্রাজ	১৩.৩১	৮.৪০	৪.৯১	৪.২৮	৬৩
বোম্বাই	১০.০১	৯.০০	১.০১	৮৮	১৩
বঙ্গদেশ	৭.৫৪	৬.৭৫	৭৯	৬৯	১০
উত্তরপ্রদেশ	১১.২২	৭.৪৭	৩.৭৫	৩.২৭	৪৮
পঞ্জাব	৮.৬৪	৬.১৪	২.৫০	২.১৮	৩২
ব্রহ্মদেশ	৭.৬৯	৬.০৮	১.৬১	১.৪০	২১
বিহার ও ওড়িশা	৪.০৪	৩.৫৯	৪৫	৩৯	৬
মধ্যপ্রদেশ	৪.১২	৩.৭১	৪১	৩৬	৫
আসম	১.৭১	১.৫০	২১	১৮	৩
মোট	৬৮.২৮	৫২.৬৪	১৫.৬৪	১৩.৬৩	২.০১

দ্রষ্টব্য : ৫নং কলামে পঞ্জাবের যে সংখ্যাতত্ত্ব আছে সেটা কমাতে হবে এবং ৬নং কলামে যা আছে তা প্রতিটি ক্ষেত্রে ৩১/২ লাখ করে বাড়াতে হবে অবিরাম ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য যা ১৯১৪ সালে তার উদ্বর্ত থেকে এক কোটি ভারত সরকারকে দেবার ফলে ফেরত পাওয়ার অধিকারী ছিল প্রতিটি প্রদেশ।

ঘাটতি দেখা গিয়েছিল সেই ১৩৬৩ লক্ষ টাকার ঘাটতি মেটাতে প্রাদেশিক উদ্বৃত্তের ৮৭ শতাংশ[১] আদায় করা প্রয়োজন।

এই সুপারিশগুলি করার সময় প্রতিবেদনের রচয়িতারা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে মন্তব্য[২] করেছিলেন :

"কাজটি মুলতুবি রাখার জন্য সতর্কীকরণ করতে আমরা বাধ্য। জরুরি অবস্থার উদ্ভব হলে ভারত সরকারের করের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি করে তার ব্যবস্থা করা যায় না; এবং সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে পথ খোলা থাকবে ব্যবস্থাগুলির উপর বিশেষ অনুপূরক অর্থ সংগ্রহ করার। এর সঙ্গে আমরা অবশ্যই যুক্ত করব যে, যেহেতু আমাদের প্রস্তাবগুলি যুক্তসংক্রান্ত সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত তাই অত:পর সেগুলির সংশোধনের পথ উন্মুক্ত থাকবে, কিন্তু অন্তত ছয় বছরের জন্য সেটা পরিবর্তন করা যাবে না, এবং মধ্যবর্তীকালীন আলোচনা এড়াবার জন্য ইতিমধ্যে প্রকল্পটিকে গণ্য করতে হবে প্রদেশগুলির সঙ্গে করা সাংবিধানিক চুক্তির অঙ্গ হিসাবে। পর্যায়ক্রমিক কমিশনের কর্তব্যগুলির মধ্যে এটাও অন্যতম হওয়া উচিত যেটা আমাদের প্রস্তাবও বটে, যে ঐ কমিশন নিযুক্ত হওয়া উচিত ভারত সরকারকে প্রদেশের পক্ষ থেকে প্রদেয় অর্থের প্রশ্নটি পুন:পরীক্ষা করার জন্য তৎকালীন কমিশন বা অনুরূপ কোনও সংস্থার কাজ করার দশ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলির উন্নতির বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য।"

প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে এই প্রস্তাবগুলি রাখা হয়েছিল তাদের অভিমতের জন্য। অন্য প্রদেশগুলির তুলনায় যে-সব প্রদেশকে খরচের বেশির ভাগ ভার বহন করতে হত বলে মনে হয় যে পরিকল্পনা মাফিক তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে আপত্তি তুলেছিল তারা স্বয়ং। আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হত যে মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশকে তাদের উদ্বৃত্তের ৪৭-৪ শতাংশ ও ৪১.১ শতাংশ দিতে হত ভারত সরকারকে, যখন কি বোম্বাই ও বঙ্গদেশ তাদের নিজ নিজ উদ্বৃত্ত থেকে যথাক্রমে ৯.৬ শতাংশ এবং ১০.১ শতাংশের বেশি না দিয়ে দায় এড়াতে পারত বলে মনে হয়। আচরণের এই বৈষম্য এতটাই সুস্পষ্ট বলে মনে হত যে, যে-সব প্রদেশের

১। খাজনার সম হার প্রদান করার প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কিছুটা বিস্ময়কর ছিল, কারণ প্রতিবেদনের ২০৬ নং অনুচ্ছেদে রচয়িতারা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে "অর্থপ্রদান করার ব্যাপারে সমতা বজায় রাখা অসাধ্য," ইত্যাদি। যৌথ প্রতিবেদনের ২০৬ নং অনুচ্ছেদ একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। তাতে অর্থপ্রদানের ব্যাপারে সমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়, যা তাতে গৃহীত হয়েছিল তার সুপারিশ অনুযায়ী।

২। প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ১৭০।

উপর অপেক্ষাকৃত গুরুভার চাপানো হত তারা তীব্র প্রতিবাদ জানাল। এই বিক্ষোভের ন্যায্যতা সম্বন্ধে ভারত সরকার এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে মন্ত্রীকে লিখিতপত্রে[১] সরকার বলেছিল :

"আমরা সুপারিশ করেছিলাম যে প্রথম প্রদেয় অর্থটিকে ধরে নিতে হবে সাময়িক এবং শর্তসাপেক্ষ হিসাবে, এবং প্রদেয় অর্থের একটি প্রামাণ্য এবং ন্যায্য ক্রম যথাসম্ভব শীঘ্র নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।....... সমগ্র বিষয়টির জন্য দক্ষতার সঙ্গে অনুসন্ধান চালানো দরকার; (অবস্থা সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি পূর্বাহ্নেই অনুমিত হয়েছিল প্রতিবেদনে এবং প্রথম বিধিসম্মত কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধানের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু) আমরা প্রস্তাব করছি যে, বিত্ত সম্পর্কীয় একটি কমিটি নিযুক্ত করা হোক, হয় আপনাদের দ্বারা বা আমাদের দ্বারা, এই বিষয়ে পুরামাত্রায় পরামর্শ দেবার জন্য, যাতে নতুন শাসন ব্যবস্থা চালু হবার আগে প্রতিটি প্রদেশ সঠিকভাবে নিজেদের অবস্থাটা বুঝতে পারে।"

এবং এই সুপারিশটি সমর্থিত[২] হয়েছিল সংসদের যৌথ অবর সমিতির দ্বারা, যার অধিবেশন বসেছিল সংস্কার বিধেয়ক নিয়ে আলোচনা করার জন্য সেই সুপারিশ অনুযায়ী মন্ত্রী লর্ড মেস্টনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন পরামর্শ দেবার জন্য এই ব্যাপারে :

(ক) যে অর্থ বিভিন্ন প্রদেশ কর্তৃক বিত্ত বৎসর ১৯২১-২২ এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত হবে;

(খ) সর্বভারতীয় ঘাটতির অবসান না হওয়া পর্যন্ত ন্যায্য বণ্টনের উদ্দেশ্যে তারপর প্রাদেশিক প্রদেয় অর্থের ব্যাপারে সংশোধন;

(গ) প্রাদেশিক ঋণখাতে ভবিষ্যতের অর্থ বিনিয়োগ, এবং

(ঘ) আয়কর থেকে সংগৃহীত রাজস্বের কোন অংশ বোম্বাই সরকারকে নিজের অধিকার রাখতে দেওয়া উচিত কি না।

প্রায় সাত সপ্তাহ অনুসন্ধান কার্য চালানোর পর কমিটি প্রতিবেদন পেশ করল।[৩] অনুসন্ধানের আওতায় আনীত বিষয়ের প্রকরণ (ক) সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে গিয়ে

১। তারিখ ৫ মার্চ, ১৯১৯ (অনুচ্ছেদ ৬১) ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্কার সাধন সম্পর্কিত প্রতিবেদনে উত্থাপিত প্রশ্ন সম্পর্কে, পৃষ্ঠা সি. এম. ডি ১৯১৯ সালের ১২৩।

২। ভারত বিষয়ক মন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির প্রতিবেদন, যার কাজ ছিল ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বিত্তীয় সম্পর্ক বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্য। সি. এম. ডি. ১৯১৯ সালের ৭২৪, তৃতীয় অধ্যায়।

৩। ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বিত্তীয় সম্পর্কের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারত বিষয়ক মন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা সি.এম.ডি ১৯১৯ সালের ৭২৪, অধ্যায় তৃতীয়।

বিভিন্ন প্রদেশের নিজ নিজ উদ্বৃত্ত থেকে কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরে নির্দিষ্ট সমানুপাতিক হারে অর্থ গ্রহণ করা সম্পর্কে যৌথ প্রতিবেদনে যে পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছে যে সম্বন্ধে কমিটি তার অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে। পরিকল্পনাটির বিরুদ্ধে প্রথম যে আপত্তি তুলে ধরা হয়েছে তাহল এই যে, কোনও কোনও প্রদেশে কোনও উদ্বৃত্ত থাকতে দেয় নি ঐ পরিকল্পনা এবং বাকি প্রদেশগুলিতে তাদের প্রদেয় অর্থের নিজ নিজ বরাদ্দের পরিমাণ দেওয়ার পর যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকত না। কমিটি মনে করেছিল এবং সঙ্গত কারণেই মনে করেছিল যে,

"কোনও ক্ষেত্রেই প্রদেয় অর্থের পরিমাণ এমন হবে না যাতে প্রদেশ বাধ্য হয় **এই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট** কোনও নতুন কর চালু করতে, যা আমাদের মতে পর্যাপ্ত সাধারণ সম্পদের নিছক প্রশাসনিক পুর্নবিন্যাসের এক অচিন্তনীয় পরিণামে পৌঁছে দেবে।"

অর্থপ্রদানের ব্যবস্থার ব্যাপারে এক নিয়ন্ত্রিত বিচার-বিবেচনার দ্বারা নিজেদের সংযত রাখা প্রয়োজন মনে করেছিল কমিটি, যার ফলে তারা বাধ্যতামূলক মনে করত "প্রতিটি প্রদেশকে এক ন্যায্য মুলধনী উদ্বৃত্ত দেওয়ার বিষয়টিকে",—যে উদ্বৃত্তকে কমিটি অগ্রাধিকার দিয়েছিল "প্রদেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থা এবং তার সম্পদগুলি সম্পর্কে আশু দাবিগুলির সঙ্গে কোনও কোনও সম্পর্কের ব্যাপারে যথা সম্ভব হিসাব করতে।"

প্রতিটি প্রদেশকে উদ্বৃত্তের ব্যাপারে ছাড় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাগুলিকে মেটাতে সমর্থ হবার জন্য এবং নতুন করে আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছাড়া নতুন পরিষদগুলির অভিষেক করার জন্য,"

কমিটি মনে করেছিল যে, সবচেয়ে ন্যায্য পরিকল্পনা হবে সেটাই যা সমপরিমাণ অর্থ গ্রহণ করবে না অথচ যে পরামর্শ[১] যৌথ প্রতিবেদনে দেওয়া হয়েছে, বরং

১। বিত্তীয়-সম্পর্ক কমিটির প্রতিবেদনে এই যুক্তি দেখান হয়েছে বলে মনে হয় যে, প্রদেয় অর্থ ধার্য করার পরিকল্পনা এবং যৌথ প্রতিবেদনে যা প্রস্তাবিত হয়েছিল তার মধ্যে পার্থক্যটি হল প্রদেয় অর্থের মূলসূত্রের পার্থক্য; এর মূল ভিত্তিটি হল "ব্যয় করার ক্ষমতার বৃদ্ধি," যখন কি যৌথ প্রতিবেদনের মূলভিত্তি ছিল "মোট প্রাদেশিক উদ্বৃত্ত"। বিত্তীয় সম্পর্ক কমিটি তীব্রভাবে সমালোচনা করেছিল "মোট প্রাদেশিক রাজস্ব এবং মোট প্রাদেশিক ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যের শতকরা হিসাব মত" প্রতিটি প্রদেশের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করার ব্যাপারে যৌথ প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত পদ্ধতিটির। ঐ প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্বের বণ্টনের নতুন ব্যবস্থার অধীনে প্রদেশগুলির বর্ধিত ব্যয় ক্ষমতা বলতে যা বুঝায় তার উপর সমানুপাতিক হারে ধার্যের বিষয় বিশিষ্ট কমিটির প্রকল্পের মধ্যে তেমন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। এই দুটি যে নির্ধারের বিভিন্ন মানদণ্ডের পার্থক্য সাধারণের মনে এই ধারণাই জন্মাত। (তুলনীয় মাননীয় রায় বাহাদুর বক্সী মোহনলাল-এর বক্তৃতা গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে; বিষয় কেন্দ্রীয় রাজস্বে প্রাদেশিক অর্থপ্রদান, বিধান পরিষদ বিতর্ক। খণ্ড তৃতীয়, সংখ্যা ৮, পৃষ্ঠা ৫০৮)। এটা অবশ্যই ভ্রান্ত ধারণা, কারণ মোট উদ্বৃত্তের নিছকই নামান্তর হল ব্যয় ক্ষমতা। সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের পরিবর্তে অসমহারে অর্থপ্রদানের প্রস্তাবের মধ্য দিয়েই পরিবর্তন চেয়েছিল কমিটি। নির্ধারের মানদণ্ডটি অপরিবর্তিতই রেখে দেওয়া হয়।

সেটা গড়ে উঠতে পারে প্রদেশগুলির উদ্বৃত্ত থেকে প্রদত্ত অসম হারে অর্থপ্রদান করার দ্বারা। নিজের পরিকল্পনাকে পূর্ণরূপ দান করার জন্য কমিটি এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, প্রাদেশিক উদ্বৃত্ত বাড়ানোটাই হবে জরুরি পদক্ষেপ। এটা বাদ দিলে, এর গৃহীত কর্মভার নিরর্থক হয়ে যেতে পারে। প্রাদেশিক উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি করার একমাত্র পথ হল ইতিমধ্যে প্রাদেশিকীকরণ করা হয়েছে এমন রাজস্বগুলির অতিরিক্ত রাজকীয় রাজস্বের অন্য কোনও উৎস নির্দিষ্ট করা। ''আয়করের প্রাদেশিকীকরণের ব্যাপারে, এর বিচার্য বিষয়ের প্রকরণ-তে অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি বিশেষ করে বোম্বাইয়ের ব্যাপারে। কমিটি যৌথ প্রতিবেদনের দর্শিত কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এবং তাই বিরোধিতা করা অত্যাবশ্যক মনে করেছিল। বিকল্প হিসাবে কমিটি সুপারিশ করেছিল **সাধারণ প্রমুদ্রা** প্রাদেশিকীকরণ হওয়া উচিত বলে প্রাদেশিক উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি করার উপায় হিসাবে **আদালত সম্পর্কিত প্রমুদ্রার** সঙ্গে একযোগে। সর্বভারতীয় তালিকা থেকে প্রাদেশিক তালিকায় **সাধারণ প্রমুদ্রা** এই হস্তান্তরের ফল ছিল প্রাদেশিক সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদ হ্রাস করা।

ঐ ঘাটতিটা কমিটি মেনে নিয়েছিল ১৯২১-২২ সালের ১০ কোটির পরিমাণ হিসাবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ভারত সরকার[১] কর্তৃক প্রাক্কলিত আগেকার ৬ কোটি, সেই সঙ্গে **সাধারণ প্রমুদ্রা** জনিত ক্ষতিবাবদ চার কোটি, যে রাজস্ব থেকে কমিটি প্রদেশগুলিকে দিয়েছিল। কিছু সমন্বয় সাধন[২] সাপেক্ষে এই পরিমাণ অর্থ। যা তখন করা হয়েছিল। তার ফলে জাজ্বল্যমান নিট ঘাটতি দেখা যায় ৯৮৩০৬ লক্ষ। যে নিয়ন্ত্রিত বিচার-বিবেচনাকে মান্য করা বাধ্যতামূলক বলে মনে করছিল তার প্রতি কঠোর আনুগত্য দেখিয়ে কমিটি নিম্নলিখিত অনুপাতগুলিকে নির্দিষ্ট করে দেয়। যে ক্ষেত্রে নয়টি প্রদেশের প্রত্যেককে অর্থ প্রদান করতে হবে ১৯২১-২২ সালের ঐ ৯.৮৩ লক্ষের মত ঘাটতি পরিপূরণ করতে:—

১। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজস্বের মধ্যে সীমানা নির্দেশ করা সম্পর্কিত ভারত সরকারের সুপারিশগুলি। সি. এম. ডি ১৯১৯ সালের ৩৩৪। বিবৃতি-৩।

২। ব্রহ্মদেশে সামরিক পুলিশ বাহিনীর ব্যাপারে এই সমন্বয় সাধনগুলি ছিল অবসর ভাতা ও ছুটি সংক্রান্ত ভাতা দেওয়ার জন্য। তুলনীয়, বিত্তীয় সম্পর্কে কমিটির প্রতিবেদন। অনুচ্ছেদ ১০।

প্রাথমিক প্রদেয় অর্থ (লক্ষ টাকায়)

প্রদেশ	রাজস্বের নতুন বন্টন পদ্ধতির অধীনে বর্ধিত ব্যয় ক্ষমতা	কমিটির কর্তৃক সুপারিশ করা প্রদেয় অর্থ	প্রদেয় অর্থ প্রদান করার পর বর্ধিত ব্যয় ক্ষমতা
মাদ্রাজ	৫,৭৬	৩,৪৮	২,২৮
বোম্বাই	৯৩	৫৬	৩৭
বঙ্গদেশ	১,০৪	৬৩	৪১
যুক্তপ্রদেশ	৩,৯৭	২,৪০	১,৫৭
পঞ্জাব	২,৮৯	১,৭৫	১,১৪
ব্রহ্মদেশ	২,৪৬	৬৪	১,৮২
বিহার ও ওড়িশা	৫১	শূন্য	৫১
মধ্যপ্রদেশ	৫২	২২	৩০
অসম	৪২	১৫	২৭
মোট	১৮,৫০	৯,৮৩	৮,৬৭

প্রাথমিক প্রদেয় অর্থের এই আনুপাতিক হারটি কোনও ভাবেই কমিটির অভিপ্রায় ছিল না "সেই আদর্শ ক্রমের প্রতীক স্বরূপ হতে যে সম্পর্কে প্রদেশগুলিকে ন্যায্য কারণে অর্থপ্রদান করতে বলা হতে পারত"। প্রাথমিক প্রদেয় অর্থের ব্যাপারে তার সুপারিশ করার সময় অবশ্যই কমিটি প্রদেয় অর্থের ন্যায্যতার ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ দিয়েছিল এবং বেশি দিয়েছিল।

"কর এবং ব্যয়ের ও বিধানিক এবং প্রশাসনিক প্রত্যাশাগুলির এবং অভ্যাসের প্রতিষ্ঠিত কর্মসূচীর উপর, যা গুরুতর ক্ষতিসাধন না করে হঠাৎ অর্থ প্রদানের এক নতুন ও অপেক্ষাকৃত ন্যায্য অনুপাতের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে না, যেগুলি অতীতের অনুপাতের তুলনায় অধিক মাত্রায় ভিন্নতর ছিল (ন্যায্য আনুপাতিক হার হিসাবে যা স্বীকৃত ছিল)। ফলে ঐ ধরনের ক্ষতিকে এড়াবার জন্য এটা অপরিহার্য ছিল যে প্রাথমিক প্রদেয় অর্থের আনুপাতিক হার তার সঙ্গে সামান্য সম্পর্কই রাখবে

যা আদর্শগত ভাবে ন্যায্য"। কমিটি এটারও স্বীকৃতি দিয়েছিল যে, এই ধরনের প্রাথমিক আনুপাতিক হারকে একমাত্র সমর্থন করা যায় অবস্থানান্তর প্রাপ্তির উপায় হিসাবে। এটা প্রয়োজনীয়, কিন্তু এটা প্রয়োজনীয় শুধু প্রদেশগুলিকে সময় দেবার জন্য নতুন অবস্থার সঙ্গে তাদের বাজেটের সমন্বয় সাধন করতে; এবং আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, একটি পরিমিত সময়ের মধ্যে ঘাটতির বোঝার অধিকতর ন্যায্য বন্টনের জন্য ব্যবস্থা করতে পারে না এমন কোনও অর্থ প্রদানের প্রকল্প সন্তোষজনক হতে পারে না।"

তাই এর পর কমিটি **প্রাথমিক** প্রদেয় অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী **নির্ধারিত মানের** প্রদেয় অর্থের বিষয়টি সম্বন্ধে বিবেচনা করতে অগ্রসর হয়েছিল, যেগুলি ছিল নিছক অবস্থানান্তর-কালীন। বোঝার ঐ ধরনের ন্যায্য বন্টনের জন্য অদর্শ মানদণ্ড কি হওয়া উচিত এসম্বন্ধে কমিটি নিশ্চিত ভাবে বুঝেছিল, কারণ কমিটি বলেছিল যে

"প্রদেশগুলির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হলে ভারত সরকারের কোষাগারে প্রতিটি প্রদেশের মোট অর্থ প্রদানের বিষয়টিকে অবশ্যই তাদের প্রদান করার ক্ষমতার অনুপাতে হওয়া উচিত।"

এই নীতিটিকে কার্যকর করার সঙ্গে দুটি প্রশ্ন জড়িত আছে। ভারত সরকারের কোষাগারে প্রদেশের মোট প্রদেয় অর্থের পরিমাণ কী হওয়া উচিত? দ্বিতীয়ত অর্থপ্রদানের ক্ষমতার পরিমাপটি কি? প্রথম প্রশ্নটির সম্বন্ধে কমিটি মন্তব্য করেছিল যে—

"ভারত সরকারের কোষাগারে প্রদেশের প্রদত্ত মোট অর্থের পরিমাণে মধ্যে থাকবে ভবিষ্যতে ঘাটতির ব্যাপারে এর প্রত্যক্ষ অর্থপ্রদানের বিষয়টি তৎসহ বহিঃশুল্ক, আয়কর, লবণ কর ইত্যাদির মাধ্যমে পরোক্ষ প্রদত্ত অর্থদ্বারা (যা বর্তমানে দেওয়া হয়ে থাকে)",

অন্যভাবে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপকারার্থে এর অধিক্ষেত্রের মধ্য থেকে প্রদত্ত করের চাপ। দ্বিতীয় প্রশ্নের ব্যাপারে কমিটি এই অভিমত পোষণ করে যে—

"অর্থ প্রদান করার ব্যাপারে প্রদেশের সামর্থ্য হল তার কর আরোপের সামর্থ্য। যা হল করদাতাদের আয়ের মোট পরিমাণ অথবা করদাতাদের গড় আয় গুণিতক তাদের সংখ্যা।"

এই ঘটনাটি অকপটে স্বীকার করে কমিটি যে, ভারত সরকারকে প্রদেশ কর্তৃক প্রদত্ত মোট নিট প্রদেয় অর্থের বা অর্থপ্রদান করার ব্যাপারে এর সামর্থ্যের প্রত্যক্ষ

গুণগত মূল্যায়নের পক্ষে যথেষ্ট উপায়ও সহজলভ্য নয় এবং এই অভিমত পোষণ করে যে, তা ছিল

"একটি সূত্র বিধিসম্মত ভাবে বর্ণিত করার চেষ্টা, স্থিরীকৃত পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে বছরের পর বছর স্ফূর্তভাবে প্রযোজ্য হবার সামর্থ্য, অর্থ প্রদানের নির্দিষ্ট মানের আনুপাতিক হারের ভিত্তি হিসাবে কাজ করার ব্যাপারে নিষ্ফল হওয়া।"

তৎসত্ত্বেও নির্দিষ্ট মানের অর্থপ্রদানের বিষয়টি নির্দিষ্ট করার জন্য যে আদর্শ মানদণ্ডটি কমিটি নির্বাচিত করেছিল তা কিন্তু বর্জন করে নি। কারণ কমিটি মন্তব্য করেছিল যে:

"যে-সব সংখ্যাতত্ত্ব উপলব্ধ হবে সেগুলি যাচাই এবং প্রতিটি প্রদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান চালাবার পর আমরা সমর্থ হব অর্থপ্রদানের নির্দিষ্ট অনুপাত সুপারিশ করতে যা আমাদের মতে যে-কোনও ঘাটতির বোঝার নির্দিষ্ট মান এবং ন্যায্য বন্টনের প্রতিভু স্বরূপ হবে। এই অনুপাতের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গিয়ে আমরা বিবেচনা করেছি ভারত সরকারের কোষাগারে প্রদেশগুলির পরোক্ষ অর্থপ্রদানের বিষয়টিকে, এবং বিশেষ করে বহিঃশুল্ক ও আয় করের পশ্চাদ্‌ভারকে (Incidence)। আমরা প্রদেশগুলির কৃষি ও শিল্প সম্পদ এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অন্য সকল প্রাসঙ্গিক অনুঘটনাগুলির, যার মধ্যে বিশেষ করে অন্তর্ভুক্ত থাকে দুর্ভিক্ষের দায় দায়িত্ব, এগুলির আলোকে তাদের সম্পর্কিত কর দানের সমর্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি আমরা।

এ কথা বলা দরকার যে, আমরা তাদের কর দেওয়ার সামর্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি, তাদের বর্তমান অবস্থারই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু নয়, অথবা আশু ভবিষ্যতে তাদের যে সামর্থ্য থাকবে তার পরিপ্রেক্ষিতেও নয়। বরং কৃষি ও শিল্প ব্যাপারে তাদের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রদেশের সামর্থ্যের দৃষ্টিকোণের বিচারে এবং খনিজ পদার্থ ও বন জঙ্গলের মত অসম্পূর্ণভাবে বিকশিত পরিসম্পতের ব্যাপারেও। প্রতিটি প্রদেশের জন্য সুনিশ্চিত করা হবে এমন বর্তমান রাজস্বের খাতগুলির স্থিতিস্থাপকতা এবং কর আরোপ করার মত সম্পদের প্রাপ্যতা সম্বন্ধেও আমরা বিচার-বিবেচনা করেছি।"

কমিটির তার সামর্থ্যের যথাসম্ভব প্রয়োগ করে হিসাব-গণনা করার পর এই পরিস্থিতিগুলির প্রত্যেকটির উপর যে গুরুত্ব দেওয়া দরকার তার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারের সুপারিশ করেছিল, যেগুলি ভারত সরকারের বাজেটের ঘাটতি মেটাবার জন্য প্রদেশগুলির আপেক্ষিক অর্থপ্রদানের জন্য ন্যায়সঙ্গত মানদণ্ডের প্রতীক:—

প্রামাণ্য প্রদেয় অর্থ

প্রদেশ	ঘাটতির ব্যাপারে অর্থপ্রদানের শতকরা হার
মাদ্রাজ	১৭
বোম্বাই	১৩
বঙ্গদেশ	১৯
যুক্তপ্রদেশ	১৮
পঞ্জাব	৯
ব্রহ্মদেশ	৬½
বিহার ও ওড়িশা	১০
মধ্যপ্রদেশ	৫
অসম	২½
মোট	১০০

এই প্রামাণ্য আনুপাতিক হার অনুসারে অর্থ প্রদানের জন্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে আহ্বান তাদের জানানোর পূর্বে এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের বাজেট যাতে প্রদেশগুলি খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ হয় তার জন্য যথেষ্ট সময়ের অবকাশ দেওয়া উচিত।[১] কিন্তু কমিটি এটাও চিন্তা করেছিল যে খাপ খাইওয় নেওয়ার জন্য যে অবকাশ দেওয়া হবে সেটা যেন অযথা দীর্ঘায়ত না হয়।

"প্রাথমিক আনুপাতিক হার", কমিটি বলেছিল, "যা আমরা প্রস্তাব করেছি তার এক ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ন্যায্যতার প্রশ্নে তাদের যা দেওয়া উচিত যদি এই আনুপাতিক হার নিয়মের অধীনে প্রদেশগুলিকে অর্থপ্রদান করতে বলা হয় তবে প্রাদেশিক বাজেট যাতে বিকল না হয়ে যায় তার জন্য যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি বা অধিকতর সময়কালের জন্য ঐ বোঝা তাদের বহন করতে বলা উচিত নয়।"

অতএব কমিটি প্রস্তাব করছে:

১। প্রামাণ্য আনুপাতিক হার সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য বিত্তীয় সম্পর্কের কমিটি কর্তৃক গৃহীত মানদণ্ডের উপযুক্ত এক সমালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সংস্কার কমিশনারকে রায় বাহাদুর কে. ভি. রেড্ডির এক বিদ্বেষপূর্ণ চিঠির ১২নং অনুচ্ছেদ, সিমলা, ১৯২০ সালের সি, এম. ডি ৯৭৪, পৃষ্ঠা ৫৮।

"অর্থ প্রদানের সপ্তম বছরে যে ঘাটতি দেখা দিতে পারে তার জন্য প্রামাণ্য আনুপাতিক হারের ব্যাপারে অর্থপ্রদান করা উচিত এবং প্রাথমিক থেকে প্রামাণ্য আনুপাতিক হারে উত্তরণের প্রক্রিয়াটিকে অব্যাহত রাখতে হবে অর্থ প্রদানের দ্বিতীয় বছরের আরম্ভকাল থেকে এবং বার্ষিক সমান ছয়টি পদক্ষেপে এগোতে হবে"।

কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সাত বছরের জন্য অর্থপ্রদানের প্রাথমিক। মধ্যবর্তীকালীন এবং চূড়ান্ত আনুপাতিক হারগুলিকে নিম্নলিখিত সারণিতে দেখা যেতে পারে:—

পরপর সাত বছরের ঘাটতিতে প্রদেয় অর্থের শতকরা হার অর্থ প্রদানের প্রথম বছর থেকে শুরু

(এমন কি অর্ধাংশ পর্যন্ত সুসম্পন্ন করা)

প্রদেশ	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর	৬ষ্ঠ বছর	৭ম বছর
মাদ্রাজ	৩৫½	৩২½	২৯½	২৬½	২৩	৩০	১৭
বোম্বাই	৫½	৭	৮	৯½	১০½	১২	১৩
বঙ্গদেশ	৬½	৮½	১০½	১২½	১৫	১৭	১৯
যুক্তপ্রদেশ	২৪½	২৩½	২২½	২১	২০	১৯	১৮
পঞ্জাব	১৮	১৬½	১৫	১৩½	১২	১০½	৯
ব্রহ্মদেশ	৬½	৬½	৬½	৬½	৬½	৬½	৬½
বিহার ও ওড়িশা	শূন্য	১½	৩	৫	৭	৮½	১০
মধ্যপ্রদেশ	২	২½	৩	৩½	৪	৪½	৫
আসাম	১½	১½	২	২	২	২	২½
মোট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

এই সুপারিশগুলি মেনে নিয়েছিল ভারত সরকার ও মন্ত্রী। কিন্তু এইগুলি যে নিয়মাবলির মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল সেগুলি যখন ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রণীত খসড়া নিয়মাবলির সংশোধনের জন্য নিযুক্ত সংসদের যৌথ প্রবর সমিতির সামনে এসেছিল বিচার-বিবেচনার জন্য। তখন কমিটি কিছু রদ-বদল করে প্রদেশের রাজস্ব ও প্রদেয় অর্থের বরাদ্দের ব্যাপারে। প্রতিবেদনে[১] যৌথ কমিটি স্বীকার করেছিল।

"সমস্যাটির যে জটিলতা নিয়ে বিত্তীয় সম্পর্কের কমিটির ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ছিল, এবং প্রায় অসম্ভাব্যতার পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া অসুবিধার সমাধানে আসার বিষয়টি সকল স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রায় স্বীকৃত হয়েছিল। তারা বিশ্বাস করত যে প্রস্তাবগুলি যে ধরনের অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে তা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে সম্পদ বন্টন করার ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী ও ঐতিহাসিককরণের ফলশ্রুতি হিসাব অপরিহার্য, এবং বৈষম্যগুলিকে কলমের এক আচড়ে দূর করা যে অসম্ভব এটার খেয়াল তারা করে নি।" "তৎসত্ত্বেও", কমিটি চেয়েছিল, "নীতির কারণে বিধি-নিষেধের দ্বারা ব্যর্থতার পরিমাণ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে, যা অর্থ প্রদানের পদ্ধতিটি প্রদেশগুলি কর্তৃক তাদের রাজস্বের প্রয়োগের উপর আরোপিত হয়েছিল। বোঝা কমাবার উপায় হিসাবে কমিটি প্রস্তাব করেছিল:

"(১) আয়গুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর আরোপিত কর থেকে রাজস্বের যে বৃদ্ধি হবে তার কিছু অংশ সকল প্রদেশগুলিকে দেওয়া উচিত যতদূর পর্যন্ত ঐ বৃদ্ধি আরোপণীয় হবে নির্ধারিত আয়ের পরিমাণের বিবর্ধনের উপর।

"(২) কোনও ক্ষেত্রেই কোনও প্রদেশের প্রদেয় প্রাথমিক অর্থপ্রদানের পরিমাণে বাড়ান চলবে না। কিন্তু বিত্তীয় সম্পর্কের কমিটির সুপারিশ করা তত্ত্বগত মানদণ্ডে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হওয়া উচিত মোট প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস করা।"

সেইজন্য অধিকারের পুনঃপ্রাপ্তির নিয়মাবলিতে এই ব্যবস্থার কথা আছে যে:

(১৫) ১৯১৮ সালের ভারতীয় আয়কর অধিনিয়মের অধিক্ষেত্রের অধীনে আদায়ীকৃত আয়করের একটা অংশ প্রতিটি স্থানীয় সরকারকে ভাগ করে দেওয়া হবে। এই ভাবে ভাগ করে দেওয়া অংশটি হবে ঐ অধিনিয়মের অধীনে আশা নির্ধারের প্রতি টাকায় ৩ পাই হিসাবে, যে নির্ধায় অনুযায়ী নির্ধারিত আয়কর সংগৃহীত

১। ভারত শাসন আইনের অধীনে প্রস্তুত খসড়া নিয়মাবলির জন্য নিযুক্ত যৌথ কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ১৭২, ১৯২০ সালের, পৃষ্ঠা ২-৩।

হবে। পাইয়ের যে সংখ্যা সুস্পষ্ট ভাবে নির্ধারিত হবে তার হিসাব এমন ভাবে করতে হবে যে যাতে শুরুতেই স্থানীয় সরকারগুলির আয় যৌথভাবে হবে প্রায় ৪০০ লক্ষের[১] যত কাছাকাছি হতে পারে ততটা। এবং যে,

(১৭)। ১৯২১-২২ বিত্ত বছরে অর্থপ্রদান করা হবে সপরিষদ বড় লাটকে স্থানীয় সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত হারে:—

প্রদেশের নাম	প্রদেয় অর্থ (লক্ষ টাকায়)
মাদ্রাজ	৩,৪৮
বোম্বাই	৫৬
বঙ্গদেশ	৬৩
যুক্তপ্রদেশ	২,৪০
পঞ্জাব	১,৭৫
ব্রহ্মদেশ	৬৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২২
অসম	১৫

(১৮) ১৯২২-২৩ বিত্ত বৎসর থেকে শুরু করে ৯.৮৩ লক্ষ টাকা বা সপরিষদ বড় লাট কর্তৃক নির্ধারিত আরও কম পরিমাণ অর্থ মোট প্রদেয় অর্থ হিসাবে যা

---

১. অধিকার পুন:প্রাপ্তি নিয়ম নং ১৫-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল:—

(২) এই বন্টনের বিচারে, প্রতিটি স্থানীয় সরকার সপরিষদ বড়লাটকে এক নির্দিষ্ট বার্ষিক (রাজস্ব)নিয়োগ দেবে যা সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক নির্ধারিত হবে সেই অর্থের সমপরিমাণে যা ১৯২০-২১ সালে স্থানীয় সরকারের নামে জমা হবে (উক্ত বৎসরে বিশেষ আয়কর প্রতিষ্ঠানের খরচের প্রাদেশিক অংশ বাদ দেবার পর) যে বৎসরে পাই-এর হার নির্দিষ্ট করা হয়েছিল অধি-নিয়ম (১) অনুসারে যা উক্ত বৎসরের জন্য প্রযোজ্য ছিল, কর আদায়ের ব্যাপারে অস্বাভাবিক দেরি যদি হয় তার জন্য উপযুক্ত অধিদের দিয়ে।

(৩) বিশেষ আয়কর প্রতিষ্ঠানের খরচ বহন করবে স্থানীয় প্রদেশে নিযুক্ত সরকার এবং সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক যথাক্রমে ২৫শতাংশ এবং ৭৫ শতাংশ হারে।

(৪) নির্দিষ্ট (রাজস্ব) নিয়োগ এবং বিশেষ আয়কর প্রতিষ্ঠানের খরচ সম্পর্কে অধিনিয়ম (২) এবং (৩)—এর অধীনে স্থানীয় সরকার কর্তৃক যে-কোনও বিত্তীয় বছরে প্রদেয় মোট অর্থের পরিমাণ যদি প্রদেশের জন্য অধি-নিয়ম এর অধীনে নির্ধারিত আয়করের অংশের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তবে উক্ত বছরের জন্য নির্দিষ্ট (রাজস্ব) নিয়োগটিকে এমন ভবে ধরতে হবে যাতে মনে হয় ঐ ধরনের আধিক্যের পরিমাণ বাদ দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী নিয়মে বলা আছে সেই ভাবে স্থানীয় সরকারগুলি দেবে সপরিষদ বড়লাটকে। পূর্ববর্তী বছরের জন্য প্রদেয় অর্থের চেয়ে যদি প্রদেয় অর্থের মোট পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম অর্থ সপরিষদ বড়লাট যখন কোনও বছরের জন্য নির্দিষ্ট করে। তখন একমাত্র সেই সব স্থানীয় সরকারগুলির প্রদেয় অর্থের পরিমাণ কমানো হবে, যাদের বিগত বছরের বার্ষিক প্রদেয় অর্থ মোট প্রদেয় অর্থ হিসাবে নির্ধারিত অর্থ নিম্নবর্ণিত অনুপাতের চেয়ে বেশি হয়; এবং ঐভাবে কমানোর বিষয়টি ঐ ধরনের অতিরিক্ত পরিমাণের আনুপাতিক হবে:

মাদ্রাজ	১৭/৯০ অংশ
বোম্বাই	১৩/৯০ অংশ
বঙ্গদেশ	১৯/৯০ অংশ
যুক্তপ্রদেশ	১৮/৯০ অংশ
পঞ্জাব	৯/১০ অংশ
ব্রহ্মদেশ	(৬/১)/৯০ অংশ
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৫/১০ অংশ
অসম	(২ ১/২)/৯০ অংশ

১৯। জরুরি অবস্থার সময়ে মন্ত্রীর অনুমতি ক্রমে সপরিষদ বড়লাট যে-কোনও প্রদেশের স্থানীয় সরকারকে বাধ্য করতে পারে পূর্ববর্তী নিয়মাবলি অনুসারে উক্ত বছরের জন্য যে-কোনও বিত্ত বছর বিষয়ে অতিরিক্ত পরিমাণের অর্থ সপরিষদ বড়লাটকে দেবার ব্যাপারে।

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বিত্তের মধ্যে পৃথকীকরণের বিষয়টি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ মাত্রায় করার জন্য আরও দুটি বিষয়ের মীমাংসা করা দরকার। এই দুইটি পুঁজি-বিনিময়ের সঙ্গে যুক্ত। একটি হল প্রাদেশিক ঋণ হিসাবের বিষয়। এই হিসাব সেই তহবিলের নিদর্শ-স্বরূপ যা থেকে প্রাদেশিক সরকার কৃষিঋণ, ঋণগ্রস্ত ভূস্বামীকে প্রদত্ত, ঋণ পৌরসভাও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাগুলি ইত্যাদিকে দাদন দেয়। ভারত সরকার প্রয়োজন মাফিক পুঁজি সরবরাহ করে এবং পরিশোধ করার পর আবার ফেরৎ দেয়। প্রতি

বছর গড়ে যে পরিমাণ পুঁজি অনাদায়ী থাকে তার উপর সুদ প্রদেশ সরকার দেয় ভারত সরকারকে, উচ্চতর হারে সুদ নিয়ে নিজের ক্ষতিপূরণ করে। যা অনাদায়ী ঋণের ব্যাপারে তার ক্ষতিপূরণ করবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সাধারণ ভাবে এব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছিল যে, সংস্কার সাধনের প্রকল্পের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি এই ছিল যে, প্রদেশগুলি ভবিষ্যতের জন্য তাদের নিজস্ব ঋণ হিসাবের ব্যয়ভার বহন করবে, এবং ভারত সরকার ও তাদের মধ্যে এই ধরনের যে যৌথ হিসাব আছে তা যথা সম্ভব শীঘ্র গুটিয়ে ফেলবে। বিষয়টি বিচার বিবেচনার জন্য পেশ করা হয় বিত্ত সম্পর্কিত কমিটির কাছে এবং এ ব্যাপারে কমিটির সুপারিশগুলির ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিধিনিয়মের ২৩নং বিধিনিয়মে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল যে:

"যে-কোনও প্রদেশের প্রাদেশিক ঋণ হিসাব থেকে দাদন হিসাবে ১৯২১ সালের ১ এপ্রিল তারিখে যে-সব অর্থ সপরিষদ বড়লাটকে দিতে বাধ্য থাকবে, সেগুলিকে গণ্য করা হবে ভারতের রাজস্ব থেকে স্থানীয় সরকারকে প্রদত্ত দাদন হিসাবে, এবং এই হিসাব সংক্রান্ত ব্যাপারে ৩১ মার্চ ১৯২১ তারিখ পর্যন্ত সপরিষদ বড়লাটের কাছে যে মোট অর্থের পরিমাণ ঋণ আছে তার উপর ধার্য গড় হারের ভিত্তিতে হিসাব করে যে হার দাঁড়ায় সেই হারে সুদ দিতে হবে। সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক নির্ধারিত তারিখগুলিতে সুদ দিতে হবে। এছাড়া, দাদন বাবদ আসল টাকা ফেরৎ দেওয়ার জন্য প্রতি বছর একটি করে কিস্তি দেবে স্থানীয় সরকার সপরিষদ বড়লাটকে, এবং এই এমন ভাবে স্থির করতে হবে যাতে বিশেষ কারণে সপরিষদ বড়লাটের অন্য কোনও রকম নির্দেশ না থাকলে মোট দাদনের অর্থ বারো বছর অতিক্রান্ত হবার আগে শোধ করতে হবে। স্থিরীকৃত কিস্তির পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ যে কোনও বছরে যে-কোনও স্থানীয় সরকারের শোধ দেবার অধিকার থাকবে।

অপরটি হল জল সেচন কর্মে পুঁজি ব্যয় করার দায়িত্বের প্রশ্নটি। প্রাদেশিক ঋণ হিসাবের মত এই ব্যাপারেও ঐকমত্য হয়েছিল যে, জল সেচন কর্মের নিয়ন্ত্রণভার প্রাদেশিক ঋণ হিসাবের হাতে অর্পণ করার এবং তার জন্য যে ব্যয় হবে সেই পুঁজি হস্তান্তরের জন্য প্রাদেশিক বিত্তকে দায়ী করার সঙ্গে প্রাদেশিক বিত্তের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের প্রকল্পটির অসংগতি থাকবে। অতএব নিয়মটি [১] এই যে:

(১) স্থানীয় সরকারগুলির পরিচালকবর্গের হাতে মাঝে মাঝে তুলে দেওয়া ঋণ তহবিল থেকে অর্থলগ্নী করা অন্যান্য কাজকর্ম এবং উৎপাদনশীল ও সংরক্ষণশীল

১। অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিয়ম নং ২৪।

জলসেচন কাজকর্মের ব্যাপারে নানা প্রদেশে যে সব নির্মাণ কার্য হবে তার জন্য সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক খরচ করা পুঁজির পরিমাণকে ধরে নেওয়া হবে ভারতের রাজস্ব থেকে স্থানীয় প্রদেশগুলিকে প্রদত্ত দাদন হিসাবে। ঐ ধরনের দাদনগুলির জন্য নিম্নহারে সুদ দিতে হবে, যথা:

(ক) ১৯১৬-১৭ বিত্ত বৎসরের শেষ পর্যন্ত খরচের ক্ষেত্রে, ৩.৩২৫২ শতাংশ হারে।

(খ) ১৯১৬-১৭ বিত্ত বৎসরের পরে করা খরচের ক্ষেত্রে, খোলা বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণের উপর উক্ত বছরের অবদানের পর থেকে, সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক গড়পড়তা সুদের হার অনুসারে।

(২) সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া তারিখে সুদ দিতে হবে।

এই ভাবে যে বিত্তীয় ও প্রশাসনিক রজ্জু প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল তা ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সরকারের প্রবর্তন বাধা প্রাপ্ত হয়। এর ফলে প্রদেশগুলি "নিজেদের যে স্বীকৃত কর্তৃত্ব" অর্জন করে তাদের জন্য নির্ধারিত করা কৃত্যকও উৎসগুলির উপর তা থেকে দেখা যায় যে, নিজেদের নামে ঋণ গ্রহণ করার স্বাধীনতা তাদের থাকা উচিত ছিল। যা এযাবৎকাল পর্যন্ত তাদের দেওয়া হয় নি। এর ফলে সংস্কার সাধন অধিনিয়মের অধীনে সৃষ্ট স্থানীয় সরকার ঋণগ্রহণ বিধি-নিয়মাবলির[১] দ্বারা ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে কয়েকটি নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে:[২]

"নিম্নলিখিত যে-কোনও উদ্দেশ্যে একটি প্রাদেশিক সরকার তার জন্য নির্ধারিত রাজস্বের প্রতিভূতির ভিত্তিতে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে, যথা:

(ক) যে কোনও কাজের নির্মান কার্য বা অধিগ্রহণের (ভূমি অধিগ্রহণ, নির্মান কার্য চলার সময় রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাজ সরঞ্জাম সহ), অথবা দীর্ঘস্থায়ী জন-কল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রয়োজনীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থায়ী পরিসম্পতের জন্য পুঁজি ব্যয়ের ভার বহন করতে এই শর্তে যে:

(১) প্রস্তাবিত ব্যয়ের পরিমাণ এতই বেশি যে চলতি রাজস্ব থেকে পরিমিত ভাবে বহন করা যাবে না, এবং

১। ভারত শাসন আইন, ১৯১৯,- এবং উপধারা ২(২)- এর অধীনস্থ নিয়ম।

২। বিধি-নিয়মগুলিরর জন্য আবশ্যক ছিল যে:

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(২) যদি সপরিষদ বড়লাটের মনে হয় যে প্রকল্পটি বড়লাট কর্তৃক মাঝে মাঝে নির্দেশ জারি করে যে শতকরা হার নির্ধারিত করে দেবেন তার চেয়ে কম লাভ দিতে সক্ষম হবে না। তবে ঋণ প্রতিপূরক নিধি স্থাপন পূর্বক চুকিয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করতে হবে;

(খ) অধিনিয়মটি পাশ হবার আগে যে-সব নিয়ম বলবৎ ছিল সেই অনুসারে জলসেচন সম্পর্কিত যে-কোনও ধরনের ব্যয় করা হবে ঋণ তহবিল থেকে;

(গ) দুর্ভিক্ষ অথবা দুষ্প্রাপ্যতার সময় সাহায্য দান এবং ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা ও তা বজায় রাখার জন্য;

(ঘ) প্রাদেশিক ঋণ হিসাবে অর্থ লগ্নী করার জন্য; এবং

(ঙ) এই নিয়মাবলি অনুসারে সংগ্রহ করা ঋণ পরিশোধ করা অথবা একত্রীভূত করা অথবা সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক প্রদত্ত দাদন পরিশোধ করার জন্য।"

বিত্তীয় এবং প্রশাসনিক বন্ধন ছিন্ন করার পর একমাত্র বিধানিক বন্ধনটিই থেকে গিয়েছিল যা এতকাল পর্যন্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ক্রমোন্নতিতে বাদ দিয়ে এসেছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এই বিধানিক বন্ধনটি ভারত সরকারের পূর্বানুমোদন এবং পরবর্তীকালীন সম্মতির প্রয়োজনের নীতির ভিত্তিতে কাজ করত। সংস্কার সাধন অধিনিয়মের অধীনে প্রস্তুত নিয়মাবলির দ্বারা একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল প্রদেশগুলির বিধানিক ক্ষমতা অবাধে প্রয়োগ করার জন্য, যে-ক্ষেত্রে ঐ নীতিটিকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল। কর সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রটি সম্পর্কে এই ব্যবস্থা[১] করা হয়েছিল যে:

"বড়লাটের পূর্বানুমোদন ছাড়াই। একটি প্রদেশের বিধান পরিষদ ১নং তফসিলে অন্তর্ভুক্ত যে-কোনও কর স্থানীয় সরকারের কাজের জন্য আরোপ করার ব্যাপারে যে-কোনও আইন রচনা বা তাই নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে পারে।"

---

(১) সপরিষদ বড়লাটের অনুমতি ব্যাতিরেকে(ভারতে সংগৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে) বা সপরিষদ মন্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে (ভারতের বাইরে সংগৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে) কোনও স্থানীয় সরকার ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে না। এবং ঋণ সংগ্রহ করার জন্য অনুমতি প্রদানে সপরিষদ বড়লাট বা সপরিষদ মন্ত্রী, যে ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন, বিচার্য অর্থের পরিমাণটি বা ঋণ গ্রহণ করার যে-কোনও বা সকল শর্ত সুনির্দিষ্ট করে দিতে পারে।

(২) মন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রেরিত প্রতিটি আবেদনপত্র সপরিষদ বড়লাটের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ধারা ১০(৩) (ক)-এর অধীনে নিয়মাবলি, অনুসূচিত কর সম্পর্কিত নিয়মাবলি।

এই তফসিলে করের নিম্নলিখিত খাতগুলি আছে:

১। কৃষিকর্ম বাদে অন্য যে কোনও কাজে ব্যবহৃত ভূমির উপর কর।

২। যৌথ পরিবার উত্তরজীবীদের দ্বারা উত্তরাধিকার বা সম্পত্তি অর্জনের উপর কর।

৩। আইনানুমোদিত যে কোনও ধরনের বাজি ধরা বা জুয়াখেলার উপর কর।

৪। বিজ্ঞাপনের উপর কর।

৫। বিনোদন কর।

৬। যে-কোনও বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা বিলাস উপকরণের উপর কর।

৭। নিবন্ধভুক্তকরণের জন্য প্রদেয় ফি।

৮। যে-সব শুল্কের পরিমাণ ভারতীয় বিধানমণ্ডল কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেগুলি বাদে প্রমুদ্রা শুল্ক।

করসংক্রান্ত নয় এমন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে বিধি-নিয়ম কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি ছিল সামান্য ভিন্নতর। কর-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের নিয়মাবলিতে বলা হয়েছিল যে কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন প্রয়োজন নয়। কর-সংক্রান্ত নয় এমন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে বিধি-নিয়মের জন্য আবশ্যক ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বানুমোদন প্রয়োজন।

পূর্বানুমোদনের[১] নিয়মাবলির জন্য প্রয়োজনের ব্যাপারে এই পার্থক্যের প্রভাব ছিল এই যে, কর সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার কেবল মাত্র কিছু উল্লেখিত কর ধার্য করতে পারত ও কর সংক্রান্ত নয় এমন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার যা ইচ্ছে তাই করতে পারত এই শর্তে যে, সেগুলি যেন কিছু নির্দিষ্ট আইন উল্লঙ্ঘন না করে। এই পার্থক্যের কারণগুলি খুবই সুস্পষ্ট। প্রাদেশিক করের ভিত্তিভূমিটি বিস্তৃত করার অর্থ হল রাজকীয় করের জন্য ক্ষেত্রটিকে সঙ্কুচিত

১। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ধারা ১০ (৩) (এল)-এর অধীনে নিয়মাবলি, স্থানীয় বিধানমণ্ডল পূর্বানুমোদন বিধি-নিয়ম। এ কথা অবশ্যই লক্ষ রাখা উচিত যে, প্রাদেশিক বিধেয়কটি যদি এমন হয় যে তার জন্য পূর্বানুমোদনের দরকার পড়বে না, তবে তা থেকে একথা ধরে নেওয়া যাবে না যে, উপরোক্ত বিধি-নিয়ম অনুসারে তা আইন হয়ে উঠতে পারবে না। কারণ তা প্রদেশের প্রণীত আইনসমূহের সম্মতি পেয়েছে। কারণ, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ধারা ১২(১)- এর অধীনে কৃত অপর এক প্রস্থ নিয়মাবলির যাকে বলা হয় বিধেয়ক সংরক্ষণের নিয়মাবলি, ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন নেই এমন বিধেয়কের ক্ষেত্রেও সেটাকে আইন হিসাবে ঘোষণা করার আগে কিছু বিধেয়ককে অবশ্যই সংরক্ষিত ও অন্যান্য বিধেয়ককে ইচ্ছ করলে সংরক্ষিত করে রাখতে পারবে প্রদেশের ছোটলাট বড়লাটের উত্তরকালীন সম্মতির জন্য।

করা। কর-সংক্রান্ত নয় এমন আইন প্রণয়নের ব্যাপারে এই ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব সরকারকে আপ্লুত করতে পারে না, প্রদেশগুলির সংক্রান্ত নয় এমন বিধানিক ক্ষমতা যত পর্যাপ্তই হোক না কেন। অতএব প্রদেশগুলিকে কর আরোপ করার ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি আরও কঠোর ভাবে পরিলিখিত করতে হবে বিধানিক ক্ষমতা প্রদানের চেয়ে। তৎসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, পূর্বানুমোদন সংক্রান্ত বিধিনিয়মগুলি বিধানিক বন্ধনকে যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল করে দিয়েছিল যাতে প্রদেশগুলি তত্ত্বগত ভাবে ও সেই সঙ্গে কার্যত স্বায়ত্ত শাসনের অনুমতি পেতে পারে।

এই স্বায়ত্ত শাসন সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে প্রদেশগুলির নতুন বাজেট পদ্ধতিতে। পুরাতন শাসন ব্যবস্থার কালে প্রাদেশিক বাজেটকে অতি অবশ্যই ভারত সরকারের বিত্ত বিভাগ কর্তৃক পাশ করাতে হত। হিসাবের তত্ত্বাবধান করত ভারত সরকারের মহাগাণনিক (Accountant General) এবং নিয়মক ও মহা নিরীক্ষক এবং উপযোজন সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করা হত ভারত সরকারের বিত্ত বিভাগে। এ সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছিল নতুন শাসন ব্যবস্থায়। ভারত সরকারের বিত্ত বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হবার পরিবর্তে প্রাদেশিক বাজেট রচিত হত সংস্কার সাধন অধিনিয়ম[১] অনুসারে প্রতিটি প্রদেশে গঠিত বিত্ত বিভাগ দ্বারা এবং প্রাদেশিক বিধান মণ্ডলের ভোট নেওয়া হত দফাওয়ারি[২]। ভারত সরকারের আধিকারিকদের দ্বারা প্রদেশগুলির হিসাবের তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষা অব্যাহত ছিল তখনও[৩]; কিন্তু নতুন শাসন ব্যবস্থার অধীনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা প্রাদেশিক স্বাধীনতার উৎকর্ষ নির্দেশক ছাপ, সেটা হল এই যে, ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের কাছে পাঠানোর পরিবর্তে উপযোজন প্রতিবেদনগুলি এখন থেকে পাঠানো হচ্ছে প্রাদেশিক বিধান মণ্ডলের সদস্যদের মধ্যে থেকে নেওয়া ব্যক্তিদের দিয়ে গঠিত সরকারি হিসাবরক্ষক কমিটির কাছে, যা প্রতিবেদনের জন্য বাজেট অনুমোদন করত এই বলে যে, বিধান মণ্ডল কর্তৃক সমর্থিত অর্থ খরচ হয়েছে বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের কার্যক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে।

১। প্রদেশগুলির বিত্তবিভাগের গঠন তন্ত্র ও কাজকর্মের জন্য দ্রষ্টব্য ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ১নং ধারার অধীনে রচিত অধিকার হস্তান্তর সংক্রান্ত বিধিনিয়ম নং তৃতীয়।

২। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ধারা ১১(৫) অনুসারে রচিত প্রাদেশিক বিধান পরিষদের জন্য কার্য-প্রণালীর বিধিনিয়মের ২৫ থেকে ৩২ নং বিধি-নিয়ম দ্রষ্টব্য।

৩। ভারত শাসন আইনের ধারা ৯৫ ডি(১)-এর অধীনে গঠিত বিধিনিয়মাবলি।

এই ভাবে ভারতের শাসন পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্ষেত্রটির সীমা নির্দেশের কাজটি সম্পাদিত হয়েছিল। বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত রয়্যাল কমিশনের সামনে এ কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল এবং তাঁর রাজনৈতিক ইচ্ছাপত্রে প্রয়াত মি: গোখলেও সেকথা জোরের সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন, যে ইচ্ছাপত্র তিনি মৃত্যুর আগে সম্পাদন করে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই সব প্রকল্পগুলি ছিল অসময়োচিত এবং ভারতীয় সংবিধানের আইনগুলি না বদলানো পর্যন্ত সেগুলিকে কার্যকর করা যায় নি। এবার যখন ঐ ধরনের পরিবর্তন ঘটানো গেছে তখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আদর্শস্বরূপটি আশা দিচ্ছে বাস্তব সম্মত হয়ে ওঠার। কিন্তু এই গবেষণার সমাপ্তি ঘটানোর আগে এর সাফল্য মণ্ডিত কার্যপদ্ধতির পরিবর্তনগুলির মূল্যায়ন করা উপযোগী হতে পারে।

অধ্যায়-১২

পরিবর্তনের সমালোচনা

এটা সুস্পষ্ট যে দক্ষ প্রশাসন নির্ভর করে উন্নত বিত্তের উপর; কারণ বিত্ত হল সমগ্র প্রশাসনিক যন্ত্রের জ্বালানি''। তাই সংস্কার সাধনের প্রকল্পের অন্য সব দিকের চেয়ে অনেক বেশি সুসঙ্গত এবং অনেক বেশি আগ্রহ সহকারে গবেষণা করার দাবি রাখে বিত্ত বিষয়ক পরিকল্পনাগুলি। যা দিয়ে প্রশাসনের নতুন পদ্ধতি শুরু হয়। এই ধরনের পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে আরও বেশি তার কারণ সংস্কার সাধন প্রকল্পের এই দিকটি সম্বন্ধে জনসাধারণ বা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তুলনামূলক ভাবে অনেক কম বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা পেয়েছে।

প্রথম বিচার্য বিষয়টি এই যে, এই নতুন বিত্তীয় পরিকল্পনাকে কি প্রশাসনিক ভাবে সহজসাধ্য বলা যেতে পারে কি? অপরের উপর নির্ভর না করে নিজেদের আপন আপন সম্পদ থেকে পূর্ণমাত্রায় নিজেদের আর্থিক সঙ্গতি যাতে মিটিয়ে নিতে পারে এই শর্তে প্রশাসনিক সংগঠনগুলিকে স্বাধীন করার বিষয়টিকে অবশ্যই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা বলে গণ্য করা উচিত এক নতুন বিত্তীয় পরিকল্পনা উদ্ভাবনের সময়। এ কথা সত্য যে, সব সময়ে এই অভীষ্ট পূরণে সাফল্য লাভ করা যায় না, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে তাদের কাজকরার সহায়ক হয়ে উঠতে পারে যদি প্রশাসনিক সংগঠনগুলিকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করা যায় কারণ অন্তত সরকারি বিত্ত বিষয়ক ব্যাপারে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠার পরিবর্তে হয়ত এক সম্ভাব্য উপায় হয়ে উঠতে পারে সহযোগিতা ও শক্তির। তৎসত্ত্বেও প্রতিটি প্রশাসনিক সংগঠনের জন্য বিত্ত বিষয়ক স্বাধীনতা দাবি করা যেতে পারে যেখানে যেখানে তা সম্ভব। ও বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই দৃষ্টিকোণের বিচারে অর্থপ্রদানের পদ্ধতিটি অনেক বেশি ভাল বিভাজিত খাত পদ্ধতির চেয়ে। তার অর্থ এই নয় যে বিভাজিত খাত পদ্ধতির নিন্দা করা হচ্ছে। কয়েকটি সমবর্তী (Concurrent) এবং অধিক্রমণকারী (Overlapping) কর অধিক্ষেত্রের অস্তিত্ব অবশ্যই অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যখনই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ কর অধিক্ষেত্র গুলির মধ্যে রাজস্বের বিভিন্ন উৎসগুলি বন্টন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে প্রত্যেককে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থদেবার জন্য। কারণটি এই যে, রাজস্বের উৎসগুলির এই বন্টন কেবলমাত্র পর্যাপ্ততার বিচারে

নিয়ন্ত্রিত হবে না। বরং তা নিয়ন্ত্রিত হবে উপযোগিতার বিচারে। "কর আরোপ করার দক্ষতার সমস্যাটি", অধ্যাপক সেলিগম্যানের বক্তব্য অনুসারে।:[১]

"স্বাভাবিক ভাবেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি প্রকল্প যতই সুপরিকল্পিত হোক না কেন, বা ন্যায়বিচারের বস্তুনিরপেক্ষ নীতিগুলির সঙ্গে তা যতই সামঞ্জস্য পূর্ণ হোক না কেন, যদি প্রশাসনিক দিক দিয়ে কর কার্যকর না হয় তবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।"

বিভাজন করা হবে এমন রাজস্বের উৎসগুলির মধ্যে এমন কোনও উৎস আছে কি যা একটি কর অধিক্ষেত্রের পরিবর্তে অন্যটিতে স্বাভাবিক ভাবে সদ্ব্যবহারের জন্য অধিকতর উপযোগী তা নির্ভর করে করের ভিত্তিটি কি ধরনের তার উপর। যদি করের ভিত্তিটি সংকুচিত হয় তবে অধিকতর সংকুচিত কর অধিক্ষেত্রে কর্তৃক তার সদ্ব্যবহারের অনুকূলে যে যুক্তি দেখান হবে তা অনুরূপ ভাবে অধিকতর সুদৃঢ় হবে। যদি এর ভিত্তি প্রসারিত হয় তবে পাল্লার ভার বেশি হবে অধিকতর প্রসারিত কর অধিক্ষেত্র কর্তৃক তার সদ্ব্যবহারের অনুকূলে। কিন্তু উপযুক্ত তার নিয়মটি কঠোরভাবে পালন করার ফলে বিভাজন করা সব সময়ে সম্ভব হবে না যাতে প্রতিটি প্রশাসনিক সংগঠনকে তাদের কাজের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব দেওয়া যাবে। কারণ এমনও তো হতে পারে যে, যখন কোনও এক বিশেষ কর একটি অধিক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। যখন তা থেকে প্রাপ্ত আয় অন্য কোনও অধিক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজন হতে পারে, যে অধিক্ষেত্রটি কর আরোপের পক্ষে অনুপযুক্ত, অথবা উভয় অধিক্ষেত্রের জন্যই তা আংশিকভাবে প্রয়োজনীয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে কী ভাবে পর্যাপ্ততার মূল উদ্দেশ্যটির উন্নতিকল্পে সহায়ক হবে? এদের প্রতিবিধানের দুটি পথ আছে। একটি হল বিভাজিত খাত প্রথা মেনে নেওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল কতিপয় অঙ্গীভূত রাজ্যের মধ্যে ঘাটতি ন্যায্যভাবে ভাগ করে নেওয়া এবং ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে তাদের বাধ্য করা।[২]

বিভাজিত খাতে পদ্ধতি অবশ্যই ভারতীয় রাজকোষ সংক্রান্ত পদ্ধতির পক্ষে বিচিত্র ছিল না। অন্যান্য বহু দেশে তা কোনও না কোনও রূপে গৃহীত হয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইংল্যান্ডে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কর নির্ধারিত হত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক, কিন্তু

১। কর আরোপ সংক্রান্ত প্রবন্ধমালা (৮ম সংস্করণ, ১৯১৩), দ্বাদশ অধ্যায় । "রাষ্ট্রও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিত্ত সম্পর্ক।"

২। এটা লক্ষ করতে হবে যে, নতুন ভারতীয় পদ্ধতিটি যদিও প্রধানত অর্থদানের একটি পদ্ধতি। তবুও আয়করের ক্ষেত্রে বিভাজিত খাত পদ্ধতির সংমিশ্রণ বাদদিয়ে নয়।

তার একটা অংশ দেওয়া হত স্থানীয় সরকারকে। ঐ একই পদ্ধতি ইংল্যান্ডে অন্য কয়েকটি কর সম্বন্ধেও সত্য ছিল। সম্রাটের শাসনাধীন জার্মানিতে কয়েকটি পরোক্ষ কর থেকে প্রাপ্ত আয় ভাগ করে দেওয়া হত যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে। একথা সুবিদিত যে, কানাডাতে প্রাদেশিক রাজস্বের একটা বড় অংশ পাওয়া যেত কর থেকে প্রাপ্ত আয় থেকে যা ধার্য করত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।

রাজস্বের বিভাজিত খাত পদ্ধতির বিরুদ্ধে ভারতে যে প্রতিকূল ধারণা ছিল তা বিশেষভাবে দুঃখজনক, কারণ তা গড়ে উঠেছিল এই ধারণার ভিত্তিতে যে, এই পদ্ধতি রাজস্বের পৃথকীকরণ নীতির বিরোধী। যে-সব মানুষ এর বিরোধিতা করত তাদের বক্তব্য[১] ছিল এই যে, এর সঙ্গে জড়িত আছে ব্যয়ের বিভাজিত খাতগুলি, যা প্রদেশগুলির ব্যয় করার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল এবং তা ভারত সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছিল প্রদেশগুলির বাজেট প্রাক্‌কলনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার এবং প্রদেশগুলির "প্রতিটি পাই-পয়সার উপর নিজের অধিকার বজায় রাখার"। বিভাজিত খাতের পদ্ধতির নিঃসন্দেহে এইসব আপত্তিকর উপাদানের বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু ব্যয়ের বিভাজন রাজস্ববিভাজনের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক অঙ্গ নয়। বা তা এর প্রয়োজনীয় অনুঘটনাও নয় যে, যে-প্রশাসনিক সংগঠন কর থেকে প্রাপ্ত আয়ের অংশ নেয় অথচ তার পরিচালন ভার হাতে রাখেনা। তার উচিত নয় প্রাপ্য আয়ের প্রাক্‌কলনের হিসাব-নিকাশে হস্তক্ষেপ করা। এর ক্ষতিকারক উপাদানগুলিকে কিছু কিছু করে ছেঁটে ফেলার পর রাজস্বের বিভাজিত খাত পদ্ধতি যা হয়ে ওঠে তার অপর নামটি হল, অধ্যাপক সেলিগম্যানের ভাষায়[২] 'উৎসের পৃথকীকরণ পদ্ধতি ও প্রাপ্ত আয়ের বিভাজন।' এর পদ্ধতিটির মূল উপাদানটি বিদ্যমান আছে একটি কর অধিক্ষেত্র কর্তৃক একটি বিশেষ রাজস্বের উৎসের একান্তভাবে নিজস্ব (রাজস্ব) নিয়োগের মধ্যে, যার সঙ্গে অবশ্য যুক্ত থাকে অপর এক কর অধিক্ষেত্রের সঙ্গে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশের ভাগ নির্ণয় (Apportionment)। রাজস্বের বিভাজিত খাত পদ্ধতিটি কেবল মাত্রপ্রাপ্ত আয়ের বিভাজনের জন্য উৎসগুলির পৃথকীকরণের পদ্ধতি রূপে যে থাকতে পারে না তা নয়। বিভাজিত খাত পদ্ধতির মত পদ্ধতিতে এক ধরনের পৃথকীকরণ থাকে কারণ করের নির্ধারটি স্বতন্ত্র হিসাবে রাখা হয়— যা পৃথকীকরণের মূলসূত্র, সম্পূর্ণ ভাবে একটি কর অধিক্ষেত্রের হাতে, এবং প্রাপ্ত আয়ের বিভাজন এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে তাকে প্রকৃত পৃথকীকরণের সঙ্গে সুসঙ্গত হতে এমন কোনও

১। বিকেন্দ্রীকরণের রয়্যাল কমিশন, সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, খণ্ড ৬, প্রশ্ন ২৫০১৭-২৫০২০; খণ্ড ৮, প্রশ্ন: ৩৫৫৩১, ৩৫২২৫-২৯।

২। পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থের অধ্যায় ১১, "রাষ্ট্র ও স্থানীয় রাজস্বের পৃথকীকরণ।" বিশেষ করে পৃষ্ঠা ৩৬৫-৬৬।

বাধ্যবাধকতা নেই।

অর্থ প্রদানের পদ্ধতিটি তাই করে বিভাজিত খাত পদ্ধতি যা করতে চায়। বিভাজিত খাত পদ্ধতির মত এটাও উপযুক্ততার এবং সেইসঙ্গে পর্যাপ্ততার যাচাইয়ের ব্যাপারে উত্তীর্ণ হতে পারে সবচেয়ে যোগ্য অধিক্ষেত্রের দ্বারা পরিচালিত হতে দিয়ে এবং পর্যাপ্ততার ব্যাপারেও কর আরোপ করার ক্ষমতাহীন অধিক্ষেত্রকে কর আরোপ করার ক্ষমতা বিশিষ্ট অধিক্ষেত্র কর্তৃক কিছু পরিমাণ অর্থ হস্তান্তরিত করে। মূলত বিভাজিত খাত পদ্ধতি এবং অর্থ প্রদান পদ্ধতি সমধর্মী। দুটির মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল এই যে, যখন লব্ধ অর্থের ভাগ নির্ণয়ে ব্যাপারে একটি হল দফাওয়ারি বন্দোবস্ত, যখন কি অপরটি হল থোক দেওয়ার বন্দোবস্ত। অতএব এই দুটি বন্দোবস্তের মধ্যে প্রকৃত অর্থে বাছাবাছির তেমন কোনও প্রশ্ন নেই। অতএব এটা একেবারেই এমন একটি ঘটনা নয় যে একটি আস্থাহীন পদ্ধতিকে শুধু অন্য নাম এই আশায় দেওয়া হচ্ছে যে, এটা আরও শ্রুতিমধুর লাগতে পারে। বিভাজিত খাত পদ্ধতির সঙ্গে তুলনায় অর্থপ্রদান পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে একটি মাত্র বিচার্য বিষয় আছে। এটা শুধু নির্ধারের পৃথকীকরণকেই অনুমোদন করে তা নয় সেই সঙ্গে বিভাজিত খাত পদ্ধতি যা করে তার চেয়েও বড় আকারে পৃথকীকরণ করতে পারে। বিভাজিত খাত পদ্ধতির অধীনে গ্রহীত পক্ষ (Receiving Party) করের নির্ধার ও আদায়ের ব্যাপারে তবুও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন থাকে রাজস্বগুলির বিভাজিত খাতের পরিচালন ব্যবস্থায় কোনও রকম শৈথিল্যের জন্য যা এর স্বার্থগুলিকে বিষমভাবে প্রভাবিত করতে বাধ্য, এবং তাই কর সম্পর্কিত পরিচালন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার দাবি জানাতে পারে। কিন্তু অর্থপ্রদান পদ্ধতিতে ঐ ধরনের সম্ভাবনার কোন স্থান নেই। তার নির্দিষ্ট নির্ধারিত অংশের আশ্বাস পেয়ে গেলেই কর নির্ধার করা এবং আদায় করার কাজ থেকে সরে দাঁড়ায়। এই ভাবে বিভাজিত খাত পদ্ধতির অধীনে যতটা থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি। পৃথকীকরণের ব্যবস্থা থাকে অর্থপ্রদান পদ্ধতিতে।

নতুন বিত্ত পরিচালনার ন্যায়পরতাকে যখন আমরা বিশ্লেষণ করতে বসি, আমরা দেখতে পাই যে, অর্থপ্রদান পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচুর আপত্তি ওঠান হয়। কিন্তু এই আপত্তিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ভ্রান্তধারণার ভিত্তিতে করা। এ কথা স্মরণ করা যাবে যে, ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদেশগুলির অর্থ প্রদানের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের ব্যয় ক্ষমতা অনুসারে। অন্য ভাবে বলা যায় যে, এটা হল ঘাটতি মেটানোর ব্যাপারে ব্যয় করার পদ্ধতি কর্তৃক ভাগ নির্ণয়। এই পদ্ধতিটি যে পর্যাপ্ততার মূল লক্ষ্যের অভীষ্ট সাধনের সহায়ক সেটা অবশ্যই সুস্পষ্ট। কিন্তু যেটা সুস্পষ্ট বলে মনে হয় না, অথচ তৎসত্ত্বেও অর্থপ্রদান পদ্ধতির এক মহৎ গুণ, সেটা হল এই যে কর

অধিক্ষেত্র প্রদান ও গ্রহণের মাধ্যমে সঞ্চয় বাড়ে; কারণ অর্থ প্রদানকারী কর অধিক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতা সঙ্গে সঙ্গে এর বোঝা বাড়িয়ে দেয়, যখন কি অর্থ গ্রহণকারী কর অধিক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতা সরাসরি প্রতিফলিত হয় প্রদেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে। তৎসত্ত্বেও প্রতিবাদ সত্ত্বেও অর্থপ্রদানের বিষয়টি ন্যায্য নয়, কারণ সেগুলি জনসংখ্যা, বা এলাকা, বা সম্পদ, বা প্রদেশের প্রদান-ক্ষমতার ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হয় না। এমন অভিযোগও করা হয়েছে যে, ব্যয়-ক্ষমতার অনুপাতে হবে অর্থপ্রদান পদ্ধতি, এটাও বিজ্ঞজনোচিত নয়, কারণ তা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল প্রদেশগুলিতে বঞ্চিত ব্যয়গুলির ব্যাপারে বাধা দিতে উদ্যত হয়। অবশ্যই শেষোক্তটি সাধারণ রূপে অর্থপ্রদানের ব্যয় পদ্ধতির দ্বারা নির্ধারিত ভাগ নির্ণয় সম্বন্ধে সত্যিকারের আপত্তি। অন্যদিকে একথাও বলা যেতে পারে যে, প্রথম ক্ষেত্রে বঞ্চিত লক্ষের জন্য অধিকতর ব্যয়ের বোঝা বহন করতে যদি কোনও অধিক্ষেত্র ইচ্ছুক থাকে। তবে অর্থপ্রদানের ব্যাপারে পরিমাণ বৃদ্ধির ফলস্বরূপ যে সামান্য বাড়তি বোঝা হবে তা একে আদৌ বাধা দিতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, যদি দেখা যায় যে অর্থপ্রদানের বিষয়টি ঐ ধরনের পরিণাম এনে দিচ্ছে তবে প্রয়োজন বলে গণ্য হতে পারে এ রকম কিছু কিছু ব্যয়কে বাদ দেওয়ার সহজ কৌশল অবলম্বন করে তা পরিহার করা সম্ভব হতে পারে। এই ব্যয়গুলি কী ধরনের হওয়া উচিত তা হবে শুধু সমন্বিত করার ব্যাপার যা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। অর্থপ্রদানের মাত্রা ধার্য করা সম্পর্কিত ব্যয় পদ্ধতির দ্বারা ভাগ নির্ণয় পদ্ধতির সুফলগুলি এখনও অক্ষুণ্ণ রাখা যেতে পারে, এবং এর স্বতঃস্ফূর্ত লক্ষণ বৈশিষ্ট্যগুলি সমপরিমাণে ভাল ভাবে কাজ করবে যদি সবকটি ব্যয়ের পরিবর্তে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ব্যয়কে হিসাব নিরূপণের ভিত্তি হিসাবে বেছে নেওয়া হয়।

এই আপত্তিটি অবশ্য জোর করে উত্থাপন করা যাবে না অর্থপ্রদানের ভারতীয় পদ্ধতির বিরুদ্ধে। প্রথম ক্ষেত্রে, অর্থপ্রদানের ব্যাপারে অঙ্কের পরিমাণে তারতম্য হয় না। যেটা অন্যান্য দেশের বিত্তীয় পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রদেশগুলিকে অর্থপ্রদান করতে হয়। তাই একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রদেশগুলি কেন্দ্রীয় ঘাটতির সমগ্র পরিমাণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না। তা সেই ঘাটতি বছরে বছরে যাই হোক না কেন। অপর দিকে সাধারণ বছরগুলিতে প্রদেশগুলি কেবল মাত্র বাধ্য থাকে অর্থ প্রদান করতে সেই ঘাটতি মেটাবার জন্য যাকে বলা হয় ৯.৮৩ লাখ টাকার প্রামাণ্য কেন্দ্রীয় ঘাটতি। ব্যাপারটি তাই হওয়ার জন্য প্রদেয় অর্থগুলি প্রাদেশিক বাজেটে তা অনিশ্চয়তার উপাদান হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বিত্তীয় বন্দোবস্তের স্থায়ী লক্ষণ

বৈশিষ্ট্য নয় এই অর্থ প্রদানের বিষয়টি। অর্থপ্রদানের বিষয়টি আরোপ করার কথা যা চিন্তা করা হয়েছিল তা ছিল পরিবর্তনসূচক, যা ভারত সরকারকে সুযোগ দিত আর্থিক ব্যাপারে পরিত্রাণ পাবার পন্থা স্থির করার। এবং ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব অর্থপ্রদানের প্রথার বিলোপ সাধন করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করবে। সর্বশেষ, যে-কোনও প্রদেশের প্রামাণ্য রাজস্ব অথবা ব্যয়-এর অনুকূলে অর্থপ্রদানের আনুপাতিক হার এত বিপুল পরিমাণের হবে না যাতে তাদের বিত্তীয় পদ্ধতির উপর পীড়াদায়ক ভারের চাপ পড়ে এবং পরিমাণে তারতম্য না থাকার ফলে এটা বলা যেতে পারে না যে তা প্রদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত উপযোগী ব্যয়ের ব্যাপারে বাধা দেবে।

বস্তুত, অর্থপ্রদানের বিষয়টি ধার্য করার ব্যয় পদ্ধতি কর্তৃক ভাগ নির্ণয়ের ব্যাপারে যেসব দোষ ত্রুটি আছে তার বিরুদ্ধে যাই বলা হোক না কেন পদ্ধতিটি যে, ন্যায়পরতার দাবিগুলির প্রধান পূরক এ কথা অস্বীকার করা কষ্টসাধ্য। এই প্রথা নিশ্চিতভাবে বোঝার ন্যায্য[১] বন্টন অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে, অন্যান্য পদ্ধতির অধীনে যা সম্ভব তার তুলনায়। এটা যুক্তি সম্মত ভাবে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, ব্যয়গুলি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির প্রকৃত সামর্থের সঙ্গে অতিমাত্রায় প্রায় অনুরূপ হয়, এলাকা বা দেশের জনগণের[২] তুলনায়। নীতিটি যে আপনা থেকেই ন্যায়বিচার পূর্ণ তা নয়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এর প্রয়োগে ন্যায় বিচার করার জন্য সযত্ন প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। কারণ আমরা জানি যে, প্রদেয় অর্থগুলি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত যাতে ধনী অথবা দরিদ্র প্রদেশগুলিকে ব্যয় করার ক্ষমতার সংচিতি (Reserve) দেওয়া হবে যাতে তারা তাদের জরুরি চাহিদাগুলিকে মেটাতে সমর্থ হয় যা প্রামাণ্য ব্যয়ের সংখ্যাতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নাও হয়ে থাকতে পারে। অসম অর্থপ্রদানের অনুকূলে সমপরিমাণ অর্থপ্রদানের বিষয়টিকে বাতিল করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা যে যাতে অর্থপ্রদানের বোঝাটি কোনও প্রদেশকে বাধা না দেয় সেই ধরনের অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে যা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে অর্থপ্রদানের অন্য কোনও পদ্ধতিকে অধিকতর ন্যায়পরতার ভিত্তিতে ভারতীয় পদ্ধতির চেয়ে ভাল বলে বিবেচনা করা যায় না বলা যায়।

নতুন বিত্তীয় বন্দোবস্ত প্রশাসনিক ভাবে কার্য্যসাধনোপযোগী এবং ন্যায্য কিনা তা এযাবৎকাল পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখেছি আমরা। যা আমরা দেখি নি তা এই যে,

---

১। তুলনীয় সেলিগম্যান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৬০।

২। সম্রাটের শাসনাধীন জার্মানীতে রাজ্যগুলি থেকে প্রদেয় অর্থ দেশের জনগণের সংখ্যা অনুসারে ভাগ নির্ণয় কার হত। সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও তাই।

এই বন্দোবস্তটি কি নিজেকে আর্থিক ব্যাপারের বিচারে পর্যাপ্ত প্রমাণ করতে পেরেছে? এ কথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিত্ত সম্পর্কগুলি সংক্রান্ত কমিটির অভিমতে এই যে, দেশে সাধারণ সম্পদের প্রাচুর্য আছে, এবং প্রত্যেকটি প্রদেশকে যথেষ্ট পরিমাণে বেশি "ব্যয় করার ক্ষমতা" অথবা উদ্বৃত্ত প্রদানের জন্য বন্টনের সুবিবেচিত পরিকল্পনাই শুধু দরকার। কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা পরিকল্পনাটির উপর নির্ভর করা হয়েছিল যে উদ্দেশ্যে সেটাকে নির্বিচারে স্বীকার করে নিতেই হবে। কিন্তু সংস্কার সাধনের প্রবর্তনের পর থেকে বিভিন্ন প্রদেশের বাজেটগুলির যদি বিশ্লেষণ আমরা করি তবে দেখতে পাব যে ফলাফলটি সত্যই হতাশাজনক (দ্রষ্টব্য নিম্নলিখিত সারণি)।

(হাজার টাকায়)

প্রদেশ		প্রামাণ্য সংখ্যাতত্ত্ব	সংশোধিত	বাজেট
			১৯২১-২২	১৯২২-২৩
মাদ্রাজ	রাজস্ব	১৪,৯৮,০২	১৫,৫৮,৫৯	১৬,৭৬,৫০
	ব্যয়	১৪,০৭,২০	১৭,১৫,৯৩	১৭,১৮,৫৫
	উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি	৯০,৮২	–১,৫৭,৩৪	–৪২,০৫
বোম্বাই	রাজস্ব	১২,০৯,৭০	১৩,৬৭,১৩	১৪,৯৩,৬
	ব্যয়	১১,৫৫,০৩	১৬,৫২,৮০	১৫,৪২,১৭
	উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি	৫৪,৬৭	–২,৮৫,৬৭	–৫০,১১
বঙ্গদেশ	রাজস্ব	৮,৫৫,২৮	৮,৮৬,৫৩	১০,৫৫,৮৬
	ব্যয়	৮,৬১,১৩	১১,১০,৬০	১০,৩৬,৯০
	উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি	–৫,৮৫	–২,২৪,০৭	১৮,৯৬
যুক্তপ্রদেশ	রাজস্ব	১২,২৯,৮৮	১৩,৩৪,৩১	১৩,৫৮,৬৭
	ব্যয়	১২,০৬,৫৬	১২,০৬,৫৬	১৩,৮৫,৬৫
	উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি	১,২৩,৩২	১,২৩,৩২	–২৬,৯৮
পঞ্জাব	রাজস্ব	৯,৭৩,৫১	১০,৭৩,৭৬	১১,৩৮,২৬
	ব্যয়	৯,১০,৬৯	১২,২৩,২৪	১২,৬৮,৪৪
	উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি	৬২,৮২	–১,৪৯,৪৮	–১,৩০,১৮
ব্রহ্মদেশ	রাজস্ব	৮,২৪,২৮	৯,৯৯,৩৩	১০,০০,৫৭
	ব্যয়	৭,৮৪,৭৮	১০,২৭,৫১	১১,৯০,৭০
	উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি	৩৯,৫০	–২৮,১৮	–১,৯০,১৩

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিহার ও ওড়িশা	রাজস্ব	৪,৩০,৩৯	৪,৪৬,১৫	৪,৬২,৬৫
	ব্যয়	৪,২০,৭০	৪,৮৫,৯৭	৫,১৩,৮০
	উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি	৯০,৬৯	–৩৯,৮২	–৫১,১৫
মধ্যপ্রদেশ	রাজস্ব	৪,৩৫,৩৭	৫,১৪,৮০	৫,৩৫,২৩
	ব্যয়	৪,৩৮,৮০	৫,৪১,৭৬	৫,৭২,১৭
	উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি	–৩,৪৩	–২৬,৯৬	–৩৬,৯৪
অসম	রাজস্ব	১,৮১,৪৬	২,০১,১২	২,০৮,০৬
	ব্যয়	১,৭৮,২৫	২,১৯,৪৫	২,২২,৫৮
	উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি	৩,২১	–১৮,৩৩	–১৪,৫২

১৯২২-২৩ সালের জন্য নয়টি প্রদেশের প্রাক্‌কলিত রাজস্ব এবং ব্যয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিলে চলতি রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য দেখা যায় মাত্র দুটি ক্ষেত্রে, ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গদেশ, এবং শেষোক্ত প্রদেশটির ক্ষেত্রে ১৪০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার জন্য পূর্ব-নিরূপিত কর আরোপ কর্মসূচি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদেয় তার বার্ষিক অর্থপ্রদানের ব্যাপারে সাময়িক অব্যাহতি[১] না দিলে এই ফল পাওয়া সম্ভব হত না। বাকি প্রদেশগুলিতে বছরের ঘাটতির মোট পরিমাণ ছিল ৭.৭৪ লক্ষের মত বিশাল অঙ্কের টাকা। এই বিপুল ঘাটতি মেটাতে অর্থের জোগান দিয়েছিল নতুন[২] কর ব্যবস্থা। যার পরিমাণ ছিল ৩.৫২ লাখ, এবং ঘাটতির বাকি পরিমাণ মেটানো হয় উদ্বৃত থেকে টাকা তুলে এবং জনসাধারণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু মন্ত্রী তাঁর প্রেরিত সংবাদে[৩] যা উল্লেখ করেছিলেন তা হল এই—

"অতীতের সঞ্চিত রাজস্ব উদ্বৃর্ত্তগুলি থেকে আংশিক ভাবে প্রাদেশিক ঘাটতিতে অর্থ সরবরাহ করার প্রক্রিয়াটির এবার কার্যত অবসান হবে এবং ঐ ধরনের উদ্বর্তগুলি বর্তমান বিত্ত বছরের শেষে নিশেষিত হয়ে যাবে এমনিতেই। প্রদেশগুলির আর্থিক অবস্থার স্থিতিশীলতাকে যদি দুর্বল করতে না হয়, যা করলে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারকেই বিপন্ন করা হবে, তবে সরাসরি জনগণের কাছ থেকে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে অনুক্রমিক প্রাদেশিক ঘাটতিগুলির জন্য অর্থ সরবরাহ করার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কথা চিন্তা করা অসম্ভব।"

১। **বিধান পরিষদ বিতর্ক**, খণ্ড তৃতীয়, সংখ্যা ৮।

২। তুলনীয়, ভারত সরকারের বিত্ত বিভাগের পত্র, সংখ্যা ১৩, ১৩ জুলাই ১৯২২, মন্ত্রীকে লেখা।

৩। তুলনীয়, মন্ত্রী (বিত্ত) কর্তৃক উপরোক্ত চিঠির উত্তরে প্রেরিত সংবাদ। সংখ্যা ১৭, ৯ নভেম্বর ১৯২২।

এর প্রতিবিধান কী হবে? "কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রদেশগুলির মধ্যে বিত্ত বিষয়ক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করার জন্য" ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে সিমলায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে একথা প্রকাশ[১] করা হয়েছিল যে, এক সুদৃঢ় ও নিরাপদ অবস্থায় প্রাদেশিক বিত্তকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সঠিক সমাধানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ও প্রদেশগুলি বিভক্ত করা হয়েছিল। সংস্কার সাধন অধিনিয়ম কর্তৃক প্রবর্তিত বিত্ত বিষয়ক ব্যবস্থায় সংশোধন করে তাদের সম্পদগুলিকে বাড়ানোর প্রস্তাব-দিয়েছিল প্রদেশগুলি। অপর দিকে, ভারত সরকারের মুখপাত্র হিসাবে মন্ত্রী দাবি জানিয়েছিলেন যে,

"ভারসাম্য রক্ষা করার ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে কেবলমাত্র ব্যয় কমিয়ে এবং সেই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে যা রাজস্বের পরিমাণ বাড়াতে পারবে।"[২]

এই অধিনিয়মের ফলে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তার সংশোধনের জন্য প্রদেশগুলি যে-সব প্রস্তাব করেছিল সেগুলি অবশ্য সর্বজন সম্মত হয় নি। বোম্বাই সরকারের মত কেউ কেউ আবার বিভাজিত খাতে "পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিল। যখন কি অন্য প্রদেশগুলি ছিল এর বিরোধী। তবে অধিকাংশই ছিল অর্থপ্রদানের বিষয়টি বাতিল করার মাধ্যমে সাহায্য নিশ্চিত করার পক্ষে। নতুন বিত্তীয় বন্দোবস্তের প্রতি প্রদেশগুলির এই মনোভাবটি আপাতদৃষ্টিতে একটি অত্যন্ত অযৌক্তিক মনোভাব। সেগুলি বিভাজিত খাত পদ্ধতি এবং অর্থপ্রদান পদ্ধতি উভয়েরই বিরোধী ছিল। এটা হল দুদিক দিয়েই পাওয়ার চেষ্টা এবং তারা অবশ্যই এটা পেতে পারত যদি দেশের বর্তমান সম্পদগুলি সঠিক ভাবে মিতব্যয়িতার সঙ্গে পরিচালিত হত। বিত্তের অপ্রতুলতা সবসময়ে রাজস্ব সম্পদের পরিমাণের স্বল্পতার ফলশ্রুতি নয়। জাতীয় সমৃদ্ধি একটা বড় ব্যাপার হতে পারে এবং জাতীয় সম্পদের ক্রমবর্ধমানতা ও বৃদ্ধি অপ্রতিহত ভাবে এগোতে পারে। যদি এই ধরনের পরিস্থিতিতেও যথেষ্ট রাজস্ব পাওয়া না যায়, তবে তার জন্য সামাজিক আয়কে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। বরং সেটা সরকারের দোষ, যে সম্বন্ধে জোর করে বলা যায় যে, সরকার ব্যর্থ হয়েছে সরকারি রাজস্বের ব্যাপারে জাতীয় সম্পদকে সুসংগঠিত এবং ভাল ভাবে পরিচালিত করতে। এ কথা কিছুটা পরিমাণে ভারত সরকার সম্বন্ধেও সত্য।

দেশের জাতীয় সম্পদের সমীক্ষা করে এটা প্রত্যক্ষ করা যায় যে, এমন দুটি উৎস ছিল যা সরকার সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে সমর্থ হয় নি। তার মধ্যে

১। মন্ত্রীর পূর্বোক্ত প্রেরিত সংবাদ, পৃষ্ঠা ২৫৭।

৪। এই সম্মেলনের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত সারের জন্য দ্রষ্টব্য ভারত সরকারের উপরিউক্ত পত্র, পৃষ্ঠা ২৫৭।

একটি হল ভূমি রাজস্ব। মন্দ অর্থে এটা সর্বজনবিদিত যে ভারত সরকারের সর্ববৃহৎ সম্পদ হল ভূমি রাজস্ব। ভূমি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে প্রতিটি ভূস্বামী বাধ্য ছিল অর্থ প্রদান করতে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নির্ধারের হারটি পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হত না। অপর দিকে, বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য অংশ নির্ধারের হার স্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত ছিল। তারফলে ভারতের সেই সব অংশে যেখানে তারা দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী সরকার থাকায় সুফল ভোগ করত এবং তার ফলে পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধির জন্য, সেখানে তারা সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্নতি লাভ করেছিল অন্য অংশের তুলনায়, সেখানে ভূমি রাজস্বের আয় আদৌ বাড়ে নি; প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত আয়বিশিষ্ট ভূস্বামীরা সরকারের আর্থিক বোঝার বৃদ্ধির ব্যাপারে কিছুই দিত না। লর্ড ক্যানিং-এর সময় থেকে জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সর্বরোগহর ওষুধ মনে করা হত। ১৮৬০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর তৎকালীন ভাইসরয় ও ভারতের বড়লাট ভারতের সকল অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্প্রসারিত করার সুপারিশ করেন। স্যার জন (পরে লর্ড উপাধিতে ভূষিত) লরেন্স এই সুপারিশ সমর্থন করেন এবং ভারত বিষয়ক দুই মন্ত্রী স্যার চার্লস উড এবং স্যার স্টাফোর্ড নর্থকোট প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। দেশের ভাগ্য ভাল ছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সর্বজনীন করার প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত ১৮৮৩ সালে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সন্দেহ নেই যে, কেউ কেউ এটাকে দুভার্গ্যজনক বলে মনে করেছিলেন, এবং তার পরেও দীর্ঘকাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থনে বিক্ষোভ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু ঐ বিক্ষোভে যদি প্রকৃত কোনও শক্তি থেকে থাকে তবে তা আহৃত হয়েছিল এক বিদেশি ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আমলাতন্ত্রের বিত্ত সম্পদের উপর এক সীমারেখা টানার উদ্দেশ্য থেকে। সে সময়ে যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে বিক্ষোভ দেখিয়ে ছিল তারা সম্ভবত এটা বুঝতে পারে নি যে, একদিন না একদিন এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আমলাতন্ত্র তার জায়গা ছেড়ে দেবে জনগণের এক দায়িত্বশীল সরকারকে এবং আমলাতন্ত্রের সীমাহীন ক্ষমতাকে সংযত করে রাখার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন চেয়েছিল তাই হয়ে উঠবে সুনিয়ন্ত্রিত প্রগতির পথে প্রবেশ করার ব্যাপারে জনগণের সরকারের স্বাধীনতার পায়ে বেড়ির বন্ধন। এক অসৎ সরকার তার বিত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে। কিন্তু নিজের বিত্ত ক্ষমতার উপর কঠোর প্রতিবন্ধকতা আরোপিত থাকলে কোনও সরকার সৎ সরকার হয়ে উঠতে পারে না। অতএব সারা ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষতিকারক দিকটিকে ছড়িয়ে দেবার অনুমতি না দেওয়াটা ভালই হয়েছে। তবে আরও ভাল হতে পারত যদি এই নতুন বিত্ত ব্যবস্থা পরিকল্পিত হত ভূমি রাজস্বপদ্ধতির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমিক বন্দোবস্ত পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠা করার ভিত্তিতে

সেটা ছিল দেশের সাধারণ সম্পদগুলিকে বাড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ পন্থায় যার দ্বারা সব সংশ্লিষ্ট সরকারগুলিকে প্রাচুর্য দেওয়া যেতে পারত, এর পরিবর্তে বিত্ত ব্যবস্থাকে এমনভাবে কল্পনা করা হল যাতে তা—

"চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা প্রদেশগুলিকে আর্থিক চাপের অধীনস্থ না করে। যার বাস্তব পরিণতি হত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষয়টিকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করা।"[১]

যদি তা করা হত তবে তা সকলের উপকারার্থে সাধারণ সম্পদের বৃদ্ধি ঘটাত। কিন্তু যা ঘটেছিল তা এই যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বজায় রাখার অনুকূলে শুধু ব্যবস্থা গ্রহণই নয়, সেই সঙ্গে চিরস্থায়ী ভাবে বন্দোবস্ত করা সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভূস্বামী বিশিষ্ট বঙ্গদেশ সরকারকে পরবর্তী কালে ভারত সরকারকে অর্থপ্রদানের ব্যাপার থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল, যা অন্য উপায়ে নিজের ঘাটতি মিটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

অতএব ভূমি রাজস্ব এমন একটা উৎস যা নতুন বিত্ত ব্যবস্থাকে পর্যাপ্ততা দেবার স্বার্থে সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারত। অপর যে উৎস থেকে সরকার অর্থ সংগ্রহ করতে অস্বীকার করেছিল তা হল বহি:শুল্ক রাজস্ব। যে ধরনের সরকারি রাজস্ব নীতি প্রাক্-বিদ্রোহ- কালে গৃহীত হয়েছিল তা ছিল নিজেই নিজের সর্বনাশ করার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একথা বিদ্রোহ-পরবর্তী কাল সম্বন্ধেও সত্য। বিদ্রোহের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভারত সরকার কখনও বহিঃশুল্ক রাজস্বকে সেই সম্পদ হিসাবে দেখে নি যা সরকারের জরুরি প্রয়োজনগুলি মেটাতে ব্যবহার করা যেতে পারত, এবং যখন তা ব্যবহার করা হল, সেটা করা হল অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে, এবং তা কখনও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা হয় নি, সেই সব পরিস্থিতির কথা উল্লেখ না করাই ভাল। যখন সরকার তার অর্থভাণ্ডারে[২] প্রচণ্ড অভাব থাকা সত্ত্বেও এই উৎস থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে কমিয়ে দিয়েছিল। ঐ ধরনের রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির সমর্থনে যে লোক-দেখান কারণ দেখান হয়েছিল তা হল এই যে, বহি:শুল্ক রাজস্ব নীতিগত ভাবে ভুল ছিল। সকলেই জানে যে, ভারতে বহি:শুল্ক রাজস্ব আদায় করা হত কারণ আশংকা ছিল যে এর অধীনে ভারতীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষিত করা যাবে ইংরেজদের শিল্পগুলির বিরুদ্ধে। ইংরেজ প্রস্তুতকর্তাদের স্বার্থের নির্দেশেই যে ভারতের সব নীতি নির্ধারিত হয়েছিল এ বিষয় সন্দেহের অবকাশ নেই, এবং এর কারণ

১। যৌথ প্রতিবেদন। পৃষ্ঠা ১৭১।

২। ১৯৮০-৮১ সালের বিত্তীয় বিবরণ, অনুচ্ছেদ ৭৪।

অনুসন্ধানে বেশি দূর অগ্রসর হতে হবে না। ভারতের সর্বোচ্চ নির্বাহিক ভারত বিষয়ক মন্ত্রী প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ ভোটদাতাদের কাছে দায়ী থাকতেন, যে ভোটদাতাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেখা যে তাদের বিক্রি করার বাজার যেন বন্ধ করে দেওয়া না হয়। বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে সংরক্ষণের নীতি ভাল না খারাপ সেটা অন্য প্রশ্ন। বর্তমানে এটুকু লক্ষ করাই যথেষ্ট যে, ভারত সরকারকে তার রাজস্ব সম্বন্ধীয় ক্ষমতার উপর এক মারাত্মক ক্ষতিকারক ধরনের সীমাবদ্ধতার অধীনস্থ করে রাখা হয়েছে, যা তাকে রাজস্বের সেই উৎসটিকে কাজে লাগানো থেকে বাধা দেয়, যে উৎসটি অন্য সব জায়গায় অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক ও প্রচুর আর্থিক সম্পদ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলি যদি না থাকত তবে খুব সম্ভব এই আর্থিক অনটন আদৌ সৃষ্টি হত না, এবং তাহলে বিভাজিত খাত পদ্ধতি গ্রহণ করা বা বাধ্যতামূলক কর অরোপ করার আদৌ কোনও প্রয়োজন হত না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় দেশের কর আরোপ যোগ্য সম্পদের উপর এই প্রতিবন্ধকতাগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে ঘাটতি অপরিহার্য। এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য কোনও এক পদ্ধতি গ্রহণ কার অত্যন্ত জরুরি, এবং সন্দেহ নেই যে গৃহীত পদ্ধতিটি তার পরিবর্তে স্থাপিত পদ্ধতির চেয়ে অনেক ভাল। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সংস্থানের বর্তমান পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক করকে অবশ্যই স্থিরীকৃত বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বা একথাও বলা যাবে না যে, বাধ্যতামূলক কর রদ করলেই প্রদেশের আর্থিক অবস্থার স্থায়িত্ব ফিরে আসবে। নিঃসন্দেহে এটাই ছিল প্রাদেশিক সরকারগুলির এবং বে-সরকারি রাজনীতিবিদদেরও প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯২২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় বিধান পরিষদে পেশ করা উত্থাপিত প্রস্তাবটি ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গির উপর অধিস্থাপিত ছিল যে, যদি ভারত সরকার কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক করকে বর্জন করে তবে তা প্রদেশগুলির আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারবে।। এই বিশ্বাস আরও জোরদার হয়েছিল এই অনুমানের দ্বারা যে, সবকটি প্রদেশের প্রকাশিত প্রাক্কলিত মোট ঘাটতির পরিমাণ ১৯২২-২৩ বিত্ত বছরে ছিল ৩৫২ লক্ষ টাকা; এবং রাজকীয় সরকারকে প্রদত্ত প্রদেশগুলির মোট বাধ্যতামূলক করের পরিমাণ ছিল ৯৮৩ লক্ষ টাকা, এই পরিমাণ অর্থ রেহাই দিলে প্রদেশের বাজেটে ঘাটতি দূর করার চেয়েও বেশি কিছু হবে। অবশ্য একথাও বলতে হবে যে, ৩৫২ লক্ষ টাকার ঘাটতি প্রদেশগুলির প্রকৃত অবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে না। যে অবস্থাটি জানা যায় অধিনিয়ম কর্তৃক সৃষ্ট বিত্ত ব্যবস্থা থেকে। নতুন ব্যবস্থা থেকে ফলস্বরূপ উদ্ভূত প্রদেশগুলির প্রকৃত অবস্থা যদি আমাদের অনুমান করে নিতে হয় তবে আমাদের অবশ্যই লক্ষ করতে হবে নতুন

কর আরোপ করা এবং রাজকীয় রাজস্ব দপ্তরে বাধ্যতামূলক কর রেহাই করার মাধ্যমে বঙ্গদেশের কি লাভ হয়েছিল সেই বিষয়টিকে। এগুলির সমন্বয়-সাধন করার পর বাধ্যতামূলক কর ছাড়া প্রদেশগুলির কি অবস্থা হতে পারত তা দেখা যাবে নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে:—

প্রদেশগুলির আর্থিক অবস্থা ১৯২২-২৩

(হাজার টাকায়)

প্রদেশ	রাজস্ব	ব্যয়	উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি
	টা:	টা:	টা:
মাদ্রাজ	১৫,৯৯,০০	১৭,১৮,৫৫	–১,১৯,৫৫
বোম্বাই	১৪,৩২,০৬	১৫,৪২,১৭	–১,১০,১১
বঙ্গদেশ	৯,১৫,৮৬	১০,৯৯,৯০	–১,৮৪,০৪
উ:প্রদেশ	১৩,৫৮,৬৭	১৩,৮৫,৬৫	–২৬,৯৮
পঞ্জাব	১১,৩৮,২৬	১২,৬৮,৪৪	–১,৩০,১৮
ব্রহ্মদেশ	১০,০০,৫৭	১১,৯০,৭০	–১,৯০,১৩
বিহার ও ওড়িশা	৪,৬২,৬৫	৫,১৩,৮০	–৫১,১৫
মধ্যপ্রদেশ	৫,৩৫,২৩	৫,৭২,১৭	–৩৬,৯৪
অসম	২,০৫,০৬	২,২২,৫৮	–১৭,৫২
মোট ঘাটতি	...	...	–৮,৬৬,৬০

এই হিসাব নিরূপণ অনুয়ায়ী প্রদেশগুলির সর্বমোট ঘাটতি হওয়া উচিত ছিল প্রায় ৮৬৭ লক্ষ। কিন্তু এই হিসাবে আরও কিছু সমন্বয় সাধন অবশ্যই করতে হবে আমাদের। প্রদেশগুলিতে অন্ত:শুল্কের বৃদ্ধি থেকে প্রাপ্ত অর্থ কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলির রাজস্ব থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলির ১৯২২-২৩ সালের রাজস্বের মধ্যে পূর্বতন বছরগুলির মুলতুবি রাখা রাজস্বের আদায় অন্তর্ভুক্ত আছে। যদি এই ধরনের সমন্বয় সাধনগুলি করা হত তবে প্রদেশগুলির সর্বমোট ঘাটতি এমন এক সংখ্যাতত্ত্ব সঞ্জাটিত করাত, যা বাধ্যতামূলক করের রেহাইও সামান্য মেটাতে পারতো। অতএব আমরা অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব যে, বাধ্যতামূলক করের রেহাই বড় জোর অত্যন্ত অপ্রতুল ব্যবস্থা হত প্রদেশগুলির গুরুতর আর্থিক চাপ দূর করার ব্যাপারে। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে ঐ

ধরনের রেহাই-এর জন্য উদ্ভূত অতিরিক্ত ঘাটতির ব্যাপারে অর্থসাহায্যের সমস্যাটিকে উপেক্ষাও করতে হত।

প্রাদেশিক বিত্তের ব্যাপারে উদ্ভূত কঠিন পরিস্থিতির উন্নত সাধন যদি বাধ্যতামূলক কর রেহাইও করতে না পারে, তবে বিষয়টির মূল উৎসে আমাদের যেতেই হবে এবং অনুসন্ধান করতে হবে কোন্ কোন্ কারণে ঐ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। প্রদেশগুলির স্বাভাবিক ব্যয়কে কমগুরুত্ব দেওয়াই কি কারণ? অথবা প্রদেশগুলির স্বাভাবিক রাজস্বকে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া? এর জন্য আমাদের প্রথমে নির্ণয় করতে হবে প্রদেশগুলির জন্য বন্টন করা রাজস্বগুলি তাদের স্বাভাবিক চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ছিল। নিম্নলিখিত সারণিটি প্রামাণ্য আয় ও ব্যয়কে তুলনা করে এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দাদন বহন করার জন্য তাদের মধ্যে অতিরিক্ত অংশ থাকে তা দেখায়।

প্রামাণ্য রাজস্ব এবং প্রামাণ্য ব্যয়

প্রদেশ	প্রামাণ্য রাজস্ব	প্রামাণ্য ব্যয়	প্রামাণ্য ব্যয়ের অতিরিক্ত প্রামাণ্য রাজস্বের দোষত্রুটি অথবা অতিরিক্ত অংশ
	টা:	টা:	টা:
মাদ্রাজ	১৪,৯৮,০২	১৪,০৭,২০	৯০,৮২
বোম্বাই	১২,০৯,৭০	১১,৫৫,০৩	৫৪,৬৭
বঙ্গদেশ	৮,৫৫,২৮	৮,৬১,১৩	–৫,৮৫
উ: প্রদেশ	১২,২৯,৮৮	১১,০৬,৫৬	১,২৩,৩২
পঞ্জাব	৯,৭৩,৫১	৯,১০,৬৯	৬২,৮২
ব্রহ্মদেশ	৮,২৪,২৮	৭,৮৪,৭৮	৩৯,৫০
বিহার ও ওড়িশা	৪,৩০,৩৯	৪,২০,৭০	৯,৬৯
মধ্যপ্রদেশ	৪,৩৫,৩৭	৪,৩৮,৮০	–৩,৪৩
অসম	১,৮১,৪৬	১,৭৮,২৫	৩,২১

এ থেকে এটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দুটি প্রদেশের ব্যাপার ছাড়া অন্যত্র সবক্ষেত্রে প্রামাণ্য রাজস্ব যথেষ্ট অতিরিক্ত অংশ রেখেছিল প্রামাণ্য ব্যয়ের অতিরিক্ত। একমাত্র বঙ্গদেশ ও মধ্যপ্রদেশে কোনও অতিরিক্ত অংশ ছিল না, এই কারণে যে এখানে প্রামাণ্য ব্যয় কিছুটা বেশি ছিল প্রামাণ্য রাজস্বের চেয়ে। কিন্তু এই

ত্রুটি পূর্ণমাত্রায় সংশোধিত হয়েছিল বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদেয় বাধ্যতামূলক কর রেহাই দিয়ে, এবং মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য রাজস্বের চেয়ে প্রামাণ্য ব্যয়ের আধিক্য অবশ্যই খুব সামান্য ছিল। এছাড়া অন্য প্রদেশগুলিতে যে অতিরিক্ত অংশ দেওয়া হত তার পরিমাণ যথেষ্ট ছিল। এবার প্রকৃত সংখ্যাতত্ত্বগুলির ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া যাক এবং প্রামাণ্য সংখ্যাতত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা যাক। প্রথমত, প্রাদেশিক বাজেটের রাজস্বের দিকটিকে নেওয়া যাক। আদায়কৃত রাজস্ব কি প্রামাণ্য রাজস্বের চেয়ে কম পড়েছিল? নিম্নলিখিত সারণিতে নতুন অধিনিয়মের অধীনে কৃত বিত্ত বন্টনে স্বাভাবিক বলে গণ্য প্রামাণ্য সংখ্যাতত্ত্বের সঙ্গে প্রদেশগুলির আদায়ীকৃত আয়ের তুলনা করা হয়েছে:—

প্রাদেশিক বিত্ত [১]

প্রদেশ	প্রামাণ্য রাজস্ব	+ প্রামাণ্যের চেয়ে বেশি – প্রামাণ্যের চেয়ে কম	
		১৯২১-২-এর জন্য	১৯২২-৩-এর জন্য
	টা:	টা:	টা:
মাদ্রাজ	১৪,৯৮,০২	৬০,৫৭	৪০,৪১
বোম্বাই	১২,০৯,৭০	১,৫৭,৪৭	২,২২,৩৬
বঙ্গদেশ	৮,৫৫,২৮	৩১,২৫	৬০,৫৮
উ: প্রদেশ	১২,২৯,৮৮	১,৬৪,৪৩	১,২৮,৭৯
পঞ্জাব	৯,৭৩,৫১	১,০০,১৫	১,৬৪,৭৫
ব্রহ্মদেশ	৮,২৪,২৮	১,৭০,০৫	১,৭৬,২৯
বিহার ও ওড়িশা	৪,৩০,৩৯	১৫,৭৬	৩২,২৬
ম: প্রদেশ	৪,৩৫,৩৭	৭৯,৪৩	৯৯,৮৬
অসম	১,৮১,৪৬	২২,৬০	২৩,৬০

উপরিউক্ত সারণি এই তথ্যটিকে সুপরিস্ফুট করে যে, আদায়ীকৃত রাজস্ব কোনও ক্ষেত্রেই প্রামাণ্য রাজস্বের চেয়ে কম হয় না। যদিও এই তথ্যটিকে সহজে মেনে নেওয়া হয় না। একথা অবশ্য জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, আদায়ীকৃত রাজস্বে বৃদ্ধি কি প্রদেশগুলির প্রামাণ্য রাজস্ব এবং প্রামাণ্য ব্যয়ের মধ্যে বন্টন ব্যবস্থায় অনুমোদিত

১। নতুন কর বাদে।

অতিরিক্ত অংশের সমান? প্রশ্নটির সেই দিকটির উপর আলোকপাতের ব্যাপারে নিম্নলিখিত সারণিটি বেশ চিত্তাকর্ষক:—

প্রাদেশিক রাজস্বের সম্প্রসারণ

প্রদেশ	প্রামাণ্য অতিরিক্ত অংশ	প্রামাণ্য অতিরিক্ত অংশের উর্ধ্বে আদায়ীকৃত অতিরিক্ত অংশের ত্রুটি অথবা আধিক্য	
		১৯২১-২-এর জন্য	১৯২২-২৩-এর জন্য
মাদ্রাজ	৯০,৮২	–৩০,২৫	–৫০,৪১
বোম্বাই	৫৪,৬৭	১,০২,৮০	১,৬৮,১৯
বঙ্গদেশ	–৫,৮৫	২৫,৪০	৫৪,৭৩
উ: প্রদেশ	১,২৩,৩২	–১৮,৮৯	৫,৪৭
পঞ্জাব	৬২,৮২	৩৭,৩৩	১,০১,৯৩
ব্রহ্মদেশ	৩৯,৫০	১,৩৫,৫৫	১,৩৬,৭৯
বিহার এবং ওড়িশা	৯,৬৯	৬,০৭	৯২,৫৭
ম: প্রদেশ	৩,৪৩	৭৬,০০	৯৬,৪৩
অসম	৩,২১	১৯,৩৯	২০,৩৯

এই সংখ্যাতত্ত্বগুলি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে শুধু মাদ্রাজের ব্যাপার ছাড়া আদায়ীকৃত অতিরিক্ত অর্থ কোনও ক্ষেত্রেই প্রামাণ্য অতিরিক্ত অর্থের চেয়ে কম হয় নি। প্রামাণ্য অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ ছাড়িয়ে অতিরিক্ত যা আদায় হত তা প্রচুর। অতএব একথা বলা যায় না যে, প্রদেশের আর্থিক ঘাটতির কারণ এ নয় যে প্রাদেশিক রাজস্ব অনুমিত স্বাভাবিক মাত্রায় পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। অপর দিকে প্রদেশগুলির স্বাভাবিক ব্যয় মেটানোর পক্ষে রাজস্বগুলি অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন ছিল। সঙ্গত ভাবে একমাত্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তা হল এই যে, প্রাদেশিক ঘাটতিগুলির মূলে ছিল প্রদেশগুলির ব্যয়ের ক্ষেত্রে এক অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।[১] এই ধারণার সমর্থনে নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সরবরাহ করছে:—

১। এই প্রকৃত তথ্যের সংক্ষিপ্ত সমীক্ষার জন্য ভারত সরকারের পত্রে এর সংক্ষিপ্তসারে দেখান। পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

প্রদেশ	প্রামাণ্য ব্যয়	+প্রামাণ্যের পরিমাণ ছাড়িয়ে বৃদ্ধি –প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে হ্রাস	
		১৯২১-২-এর জন্য	১৯২২-৩-এর জন্য
মাদ্রাজ	১৪,০৭,২০	৩,০৮,৭৩	৩,১১,৩৫
বোম্বাই	১১,৫৫,০৩	২,৯৭,৭৭	৩,৮৭,১৪
বঙ্গদেশ	৮,৬১,১৩	২,৪৯,৪৭	১,৭৫,৭৭
উ: প্রদেশ	১১,৫৬,৫৬	৩,৪৩,৩১	২,৭৯,০৯
পঞ্জাব	৯,১০,৬৯	৩,১২,৫৫	৩,৫৭,৭৫
ব্রহ্মদেশ	৭,৮১,৭৮	২,৪২,৭৩	৪,০৫,৯২
বিহার এবং ওড়িশা	৪,২০,৭০	৬৫,২৭	৯৩,১০
ম: প্রদেশ	৪,৩৮,৮০	১,০২,৯৬	১,২৩,৩৭
অসম	১,৭৮,২৫	৪১,২০	৪৪,৩৩

ব্যয় হ্রাস করা এবং কর বৃদ্ধি করাই প্রাদেশিক বিত্তকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার একমাত্র পথ মন্ত্রীর এই অভিমতেরই অতএব আমাদের বশবর্তী করা হচ্ছে।

নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অতি প্রয়োজনীয় ব্যয়ের হ্রাস ও করের বৃদ্ধিকরার দায়িত্ব ভার যে প্রদেশগুলি নেবে তার কতটা সম্ভাবনা আছে? এই প্রসঙ্গে অর্থ-বিশেষজ্ঞ মি: জেমস উইলসনের অনুশাসনবাক্য স্মরণ করা ভাল, যিনি একদা বলেছিলেন:

"বিত্ত নিছক অঙ্কশাস্ত্র নয়; বিত্ত এক মহান নীতি। বলিষ্ঠ অর্থনীতি ছাড়া সুদৃঢ় সরকার সম্ভব" না। সুদৃঢ় সরকার না হলে বলিষ্ঠ অর্থনীতিও সম্ভব না।

এই বক্তব্যের মধ্যে যদি কোনও সত্য থাকে তবে প্রাদেশিক সরকারগুলি ব্যয়সংকোচের নীতি গ্রহণ করবে অথবা করভার বাড়ানোর দায়িত্বের মুখোমুখি হবে তা নির্ভর করবে সংস্কার সাধন অধিনিয়ম কর্তৃক প্রদেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত প্রশাসন পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি কিনা। এবার দেখা যাক সংস্কার সাধন অধিনিয়মের অধীনে প্রদেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারের গঠনতন্ত্র কেমন ছিল? চলতি কথায় পদ্ধতিটি দ্বৈতশাসন নামে পরিচিত। এই শাসনপদ্ধতির অধীনে প্রদেশের নির্বাহিকরা, আগের মত শুধু সপরিষদ ছোটলাটকে নিয়ে গঠিত হওয়ার পরিবর্তে এখানে বিভক্ত হয়েছে সপরিষদ ছোট লাট এবং মন্ত্রিমণ্ডলী সহ ছোটলাট এই দুইভাগে। এর অধীনে

বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় থেকে প্রাদেশিক রূপে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করে তাদের আরও ভাগ করা হয়েছে "সংরক্ষিত" এবং "হস্তান্তরিত" বিষয়রূপে প্রথমোক্তটির দায়িত্বভার ছিল সপরিষদ ছোট লাটের হাতে এবং শেষোক্তটির মন্ত্রিমণ্ডলী সহ ছোটলাটের হাতে। প্রাদেশিক নির্বাহিকদের এই অংশগুলির মধ্যে সংরক্ষিত" বিষয়গুলির ভারপ্রাপ্ত পরিষদ তখনও আগের মত প্রাদেশিক বিধান মণ্ডলের কাছে দায়িত্বহীন ছিল, এবং বিধান মণ্ডলের ক্ষমতা ছিল না ঐ পরিষদকে অপসারিত করার এবং সেই অর্থে এটা ছিল অসংসদীয় নির্বাহিক। প্রাদেশিক নির্বাহিকের অন্য অংশটি। অর্থাৎ "হস্তান্তরিত" বিষয়গুলির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিয়োগ করা হত প্রাদেশিক বিধান মণ্ডলের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে। যাদের প্রাদেশিক বিধান মণ্ডলের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হত। যে বিধান মণ্ডল মোটামুটি জনগণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হত, এবং তৎকর্তৃক অপসারণযোগ্যও ছিল, এবং সেই অর্থে এটা ছিল সংসদীয় নির্বাহিক।

প্রাদেশিক নির্বাহিকের এই দুটি অংশের ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারা ছিল প্রাদেশিক বিধানমণ্ডল। শুধু আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতাই যে ছিল তা নয়, সেই সঙ্গে বাধা দেওয়ার অবাধ পূর্ণ ক্ষমতাও ছিল। প্রাদেশিক বাজেট সম্পর্কে ভোট দেওয়ায় এবং অনুমোদন করার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, যদিও সংস্কার সাধন অধিনিয়মে[১] এমন ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল যা অনুমতি দেয় যে—

"যে-কোনও দাবি (অর্থ অনুদানের জন্য) সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা থাকবে কাজ করার, এটা ধরে নিয়ে যে, সম্মতি দেওয়া হয়েছে যদিও ঐ ধরনের সম্মতি স্থগিত রাখা বা তাতে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা (প্রাদেশিক বিধান মণ্ডল কর্তৃক), যদি ঐ দাবি কোনও সংরক্ষিত বিষয় সম্পর্কিত হয় (যা স-পরিষদ ছোটলাটের অধিকার ভুক্ত করে রাখা হয়) এবং ছোটলাট নিশ্চিত ভাবে জানান যে, দাবি জন্য বরাদ্দ করা ব্যয় ঐ বিষয়টির জন্য তাঁর দায়িত্ব পালনের পক্ষে অপরিহার্য।"

বলিষ্ঠ অর্থনীতির সমস্যার মোকাবিলা কি ঐ ধরনের সরকার করতে পারে? এই দ্বৈতশাসন বিশিষ্ট নির্বাহিকদের দুটি অংশের মধ্যে একটি অর্থাৎ সপরিষদ ছোটলাটের কর বৃদ্ধি করা অথবা ব্যয় হ্রাস করার ব্যাপারে অতি নগণ্য মাত্রায় উদ্বেগ থাকবে এটা সুস্পষ্ট। এটা তার নির্দেশ পায় সংসদ থেকে এবং সে কারণে যে-কোনও নীতি গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীন যেটা সমর্থিত হয়েছিল করদাতাদের সর্বাধিক হিতের ব্যাপারে কোনও রকম দৃকপাত না করে ছোটলাটের শংসাপত্র প্রদানের ক্ষমতার দ্বারা। যৌথ প্রতিবেদনের রচয়িতারা দেখেছিলেন যে, বিধান মণ্ডলের আশা-

১। ভারত শাসন আইন। ১৯১৯, বিভাগ দ্বিতীয় (২) (ক)

আকাঙ্খাগুলিকে অগ্রাহ্য করার এই শংসাপত্র দানের ক্ষমতা স-পরিষদ ছোটলাটকে দায়িত্ব হীন অমিতব্যয়িতার দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং স-মন্ত্রীপরিষদ ছোট লাটকে সমতারক্ষাকারী ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিল যে ক্ষমতা প্রথমোক্তকে সংযত করে রাখার জন্য কাজ করবে। ঐ ক্ষমতা সন্নিবেশিত হবার কথা ছিল অনুবিধিতে, যাতে বলা ছিল যে, মন্ত্রিমণ্ডলীর[১] সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও প্রদেশে "সংরক্ষিত" বিষয়গুলির স্বার্থে কোনও কর আরোপ করা যাবে না। অপর্যাপ্ততার কারণে সংস্কার-সাধনের বিষয়গুলি যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভারতের এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ অর্থাৎ চরমপন্থীরা অনুবিধিটিকে অপছন্দ করেছিল এই জন্য যে, সেটি ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয়েছিল মন্ত্রীদের অপরের দুষ্কর্মের ভারবাহী করার জন্য এবং জনগণের কাছে তাদের অপদস্থ করাতে। কিন্তু এদের প্রতিদ্বন্দ্বী "মধ্যপন্থীরা", যারা এখন নিজেদের "উদারপন্থী" বলছে— কেন বলছে তার কোনও কারণ নেই—এরা কিন্তু সুস্পষ্টভাবে অনুবিধির তাৎপর্যটি বুঝতে পেরেছিল। এটা যদি কার্যকর করা হয়ে যেতো, তবে সন্দেহ নেই যে, মন্ত্রিমণ্ডলী পরিষদকে উপদেশ প্রদানকারী নিছক বহিরাগত হয়ে থাকতে হত না। যে উপদেশ গৃহীত অথবা প্রত্যাখ্যাতও হতে পারত, কিন্তু বাজেট স্থির করার ব্যাপারে মত প্রকাশের জোরালো অধিকার পেত। সংরক্ষিত বিষয়গুলির সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট হওয়া বিষয়গুলি সহ বাজেট প্রস্তাবকে সমর্থন করার মত অবস্থায় না থাকলে কোনও মন্ত্রীই যে বিধান মণ্ডলকে নতুন কর প্রস্তাবে রাজি করানোর আশা করবে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে "সংরক্ষিত" বিষয়গুলির উপর অর্থাৎ পরিষদের উপর মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রভাব যে নিঃসন্দেহে মিতব্যয়িতা এবং ছাঁটাইয়ের লক্ষে অগ্রসর হবে এটা অবধারিত। অনুবিধি সম্বন্ধে তাদের নিজেদের ব্যাখ্যা এবং এমন কি নতুন করের[২] বোঝায় দেশকে ভারাক্রান্ত করার বিনিময়েও ক্ষমতা অর্জনের জন্য তাদের জোরালো দাবির ব্যাপারে মধ্যপন্থীরা সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল। কিন্তু মতবিরোধের উত্তেজনায় এবং সংস্কার সাধনের সারবত্তার ব্যাপারে জনগণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করানোর ইচ্ছার ফলে মধ্যপন্থীরা এমন অত্যন্ত মজার চিত্রধর্মী বর্ণনা দেন কী ভাবে অনুবিধির আশ্রয় নিয়ে মন্ত্রীরা পরিষদকে কোণ ঠাসা করে রাখতে সমর্থ হবে। এর ফলে আমলারা সশঙ্কিত হয়ে উঠল, যারা সোচ্চারে এই দাবি জানাল যে "সংরক্ষিত" বিষয়গুলির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব মন্ত্রীদের করুণার উপর ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক ব্যাপার হবে, যে মন্ত্রীরা উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বাজেটে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা

১। যৌথ প্রতিবেদন, অনুচ্ছেদ ২৫৬।

২। ভিনবার্গ কানাডায় সরকার এবং স্থানীয় রাজস্বগুলির পৃথকীকরণ পৃষ্ঠা ১৩, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, স্বেচ্ছায় খরচ বহন করে কানাডাতে সামরিক ক্ষমতার পত্তন করা হয়েছিল।

রাখার বিষয়টিকে অস্বীকার করলে যে পরিণাম হবে তার জন্য তারা দায়িত্ব নেয় না। যৌথ প্রতিবেদনের[২] রচয়িতারা এই যুক্তির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, এবং স্বীকার করেছিলেন যে, ঐ ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করত সেগুলি বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে কার্যকর করিয়ে, যারা যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতেই নিজেদের পরিচালিত করবে। "সংরক্ষিত" বিষয়গুলির যথোচিত পরিচালনার জন্য পরিষদের অভিমতে যা অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় তা বহন করার জন্য হয় কর আরোপ করে নয় তাদের দাবি কমানোর ব্যাপারে মন্ত্রীরা যে সহযোগিতা করবে না এটা অনুমান করে নিতে অস্বীকার করে তারা সম্ভবত ঠিক কাজই করেছে। মধ্যপন্থীদের কর্তব্য নির্ণয়ে শক্তিহীন এই আনন্দোচ্ছ্বাস আমলাদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল, এবং তারা জোর দিয়ে বলেছিল যে, এমন কি বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও মাঝে মাঝে, সরল বিশ্বাসেই অন্য বিচক্ষণ ব্যক্তির সঙ্গে সহমত হন না বিশেষ করে যদি সেটা কাজের জন্য সরবরাহের ব্যবস্থার প্রশ্ন হয়, যখন এক পক্ষ তার নিরাপদে রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিবিধানের জন্য দাবি থাকে তখন অন্য পক্ষ কেবলমাত্র চিন্তা করে টাকা-পয়সার একটা অংশ পাবার ব্যাপারে। এর অভিমতে এমন পরিস্থিতির কথা কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে যেখানে যৌক্তিকতার আধিপত্য নাও থাকতে পারে। ধরা যাক এই যুক্তি দেখান হয়েছিল যে, সপরিষদ ছোটলাট দেখলেন যে, কিছু সংরক্ষিত বিষয় সম্পর্কে নতুন ও গুরুভার ব্যয় জরুরি হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার জন্য নতুন কর আরোপ করা বা তাদের বিষয়গুলি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত কম অর্থ মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানাতে মন্ত্রীদের তিনি প্ররোচিত করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমী ক্ষমতা বলে ছোটলাট জোর করতে পারেন পরবর্তী বাজেটে ব্যয় সম্পর্কিত বরাদ্দ করাতে, এবং যার পরিণাম হল নিজেদের হস্তান্তরিত বিষয়গুলির জন্য মন্ত্রীদের অত্যন্ত অপ্রতুল অর্থ দেওয়া। এ থেকে কি হতে পারে? আপাতদৃষ্টিতে নিজেদের প্রয়োজনের জন্য মন্ত্রীরা কি বাধ্য হবে কর বাড়াতে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পরিষদ তাদের প্রয়োজনগুলি কমাতে অস্বীকার করে মন্ত্রীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে প্রয়োজনের সৃষ্টি হয়েছিল? দেখান হয়েছিল যে ঐ ধরনের কার্য-প্রণালী অতীব কুটিল, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এবং অসমর্থনযোগ্য হয়ে উঠবে। আবার ধরা যাক প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার জন্য মন্ত্রীরা সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু বিধান মণ্ডল তাদের রাজস্ব সংক্রান্ত গৃহীত ব্যবস্থা অনুমোদন করতে অস্বীকার করেছিল। আস্থা হারানোর ফলে মন্ত্রীদের কি পদত্যাগ করা উচিত? যৌথ প্রতিবেদনের রচয়িতাদের সামনে আর একটা বিভ্রান্তিকর সমস্যা তুলে ধরেছিল আমলারা। মন্ত্রীরা তাদের কোনও নিজস্ব উদ্দেশ্যে নতুন করের প্রবর্তন করেছিল। পরবর্তী বাজেটে

২। যৌথ প্রতিবেদন। অনুচ্ছেদ ২৫৭।

কয়েকটি নতুন আবশ্যকতার জন্য সংরক্ষিত উপকরণের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ যুক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না ছোটলাটের এবং ফলে "হস্তান্তরিত" বিষয়গুলির উপকরণ ছাঁটাই করা হয়। মন্ত্রীরা কার্যত দেখল যে, তাদের আরোপিত নতুন কর থেকে প্রাপ্ত আয় এমন কিছু উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যার জন্য তারা দায়ী নয়, এবং প্রকৃত পক্ষে সেগুলি তারা অনুমোদন নাও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি? এই সব অসুবিধা পরিহার করার জন্য অনুবিধিটি পরিত্যক্ত হয় এবং তার পরিবর্তে অধিকার হস্তান্তর সংক্রান্ত বিধি-নিয়মে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করা হয়েছিল:—

কর আরোপণ এবং ঋণগ্রহণ

৩০। যে-কোনও প্রদেশের রাজস্বের ব্যাপারে কর বৃদ্ধি করার অথবা অর্থ ঋণ নেওয়া সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব ছোটলাট শাসিত প্রদেশের মতই বিবেচিত হবে নির্বাহিক পরিষদ ও তৎসহ মন্ত্রীদের বৈঠক সহ ছোটলাট কর্তৃক, কিন্তু তারপর সিদ্ধান্তে উপনীত হবে সপরিষদ ছোটলাট বা ছোটলাট ও মন্ত্রী বা মন্ত্রীরা, সপরিষদ ছোটলাট বা ছোটলাট ও মন্ত্রীবর্গের তরফ থেকে উদ্ভূত প্রস্তাব অনুসারে।

হস্তান্তরিত বিষয়গুলির পরিচালনার জন্য রাজস্বের বন্টন

৩১। সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়গুলির পরিচালনার জন্য ব্যয় প্রাথমিক ভাবে দায়বদ্ধ করে রাখবে সাধারণ রাজস্ব এবং প্রতিটি প্রদেশের উদ্বর্তগুলিকে এবং হস্তান্তরিত ও সংরক্ষিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি রচনা করার ব্যাপারটা হবে সরকারের সেই অংশ যা হস্তান্তরিত বিষয়গুলির পরিচালন ব্যবস্থার জন্য দায়ী এবং সেই অংশ যা সংরক্ষিত বিষয়গুলির পরিচালন ব্যবস্থার জন্য দাবি থাকে তাদের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে।

ঐকমত্য হতে ব্যর্থ হবার পর কার্যপ্রণালী

৩২। (১) যদি বাজেট প্রস্তাব করার সময় ছোটলাট নিশ্চিন্ত হন যে, সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিভাগগুলির নিজ নিজ ক্ষেত্রের মধ্যে ভাগ নির্ণয় করার ব্যাপারে একদিকে তার নির্বাহিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও অন্যদিকে মন্ত্রীদের মধ্যে একটা পরিমিত সময়ের মধ্যে ঐকমত্য হবার কোনও আশাই নেই। তবে ছোটলাট লিখিতভাবে নির্দেশ দিয়ে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রদেশের রাজস্ব ও উদ্বর্তগুলি বন্টন করে দিতে পারে রাজস্ব ও উদ্বর্তগুলির ভগ্নাংশ সমন্বিত অনুপাত সুনির্দিষ্ট করে, যা বিষয়গুলির প্রতিটি শ্রেণীকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে।

(২) এই নিয়ম অনুযায়ী বন্টন করার নির্দেশ ছোটলাট দিতে পারে হয় নিজের

খেয়াল-খুশি মত বা ছোটলাটের আবেদনক্রমে এই ব্যাপারে বড়লাট কর্তৃক নিযুক্ত একটি কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে।

বন্টন করার নির্দেশের সময়-কাল

৩৩। ঐ ধরনের প্রতিটি নির্দেশ (অনতিবিলম্বে বাতিল না হলে) বলবৎ থাকবে নির্দেশে উল্লিখিত সময়-কালের জন্য, যা তৎকালীন বিধান পরিষদের স্থিতিকালের চেয়ে কম হবে না, এবং তার স্থিতিকালের চেয়ে এক বছরের বেশি হবে না: এই শর্তে যে ছোটলাট যে-কোনও সময়ে, যদি তার নির্বাহিক পরিষদও মন্ত্রীরা চায়, তবে বন্টন করার নির্দেশ বাতিল করতে অথবা তাদের সম্মতিক্রমে যে অন্য কোনও ধরনের বন্টন করতে পারে:

এই শর্তে যে, এ ছাড়া বড়লাট কর্তৃক নিযুক্ত এক কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন অনুসারে বাতিল করার প্রস্তাব সমন্বিত নির্দেশটি অনুমোদিত হয়ে যায়, তবে তা বাতিল করার জন্য ছোটলাটকে বড়লাটের সম্মতি নিতে হবে।

বন্টনের নির্দেশের শর্ত

৩৪। এই নিয়মাবলি অনুসারে বন্টন সংক্রান্ত প্রতিটি নির্দেশে এই ব্যবস্থা থাকবে যে, নতুন কর আরোপ করার ফলে নির্দেশের সময়কালের মধ্যে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তবে ঐ বৃদ্ধি বিধানমণ্ডল অন্য কোনও নির্দেশ না দিয়ে থাকলে তা সরকারের সেই অংশের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হবে, যে সরকারের উদ্যোগে ঐ কর আরোপ করা হয়েছিল।

বন্টনের নির্দেশ সম্পর্কে ঐকমত্য না হলে বাজেটের প্রস্তুতি

৩৫। যদি কোনও বাজেটের প্রস্তুতির সময় এই বিধিনিয়মগুলিতে যে ভাবে বিবেচিত হয়েছে সেই অনুসারে কোনও ঐকমত্য অথবা বন্টন সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে থাকে, তবে বাজেট প্রস্তুত করা হবে সেই সব মোট অনুদানের ভিত্তিতে যা শেষ হতে চলেছে এমন বছরের বাজেটে সংরক্ষিত হস্তান্তরিত বিষয়গুলির জন্য যথাক্রমে যোগানো হয়েছে।

পরিস্থিতিগুলি যখন প্রায়ই অপরিহার্য ভাবে উত্তেজক হয়ে ওঠে, তখন যুক্তিযুক্ততার উপর নির্দ্বিধায় নির্ভর করার পরিবর্তে এই বিধিনিয়মগুলি ফলপ্রসূ সতর্কতা অবলম্বন করে "সংরক্ষিত" বিষয়গুলির জন্য অর্থ বন্টনের ব্যাপারে অনুমোদন দিতে অস্বীকারকারী মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে ছোটলাটকে সেই ধরনের বন্টনে অনুমতি দিয়ে যা নির্বাহিকদের উভয় অংশের উপর বাধ্যতামূলক হবে এবং সেই সঙ্গে প্রাদেশিক

বিধানমণ্ডলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষমতা প্রদান করে ছোটলাটকে, তিনি প্রয়োজন বোধ করলে, সংরক্ষিত বিষয়ে বাজেট অনুদানকে পুনরাধিষ্ঠিত করতে দিয়ে, যদি তা প্রাদেশিক বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত বা কমানো হত, যে বিধান মণ্ডলের অধিকার আছে প্রাদেশিক বাজেট চূড়ান্ত করার এবং তৃতীয়ত, নিজের দায়িত্ব থাকা বিষয়গুলির উন্নয়নের জন্য নতুন কর আরোপ বা নতুন ঋণ গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রী পরিষদ ছোটলাট ও সপরিষদ লাটকে সমান ক্ষমতা দিয়ে। এর ফল এই হল যে, এই দ্বৈত শাসন-বিশিষ্ট নির্বাহিকের একটা অংশ যেমন সপরিষদ ছোটলাটের তেমন কোনও কারণই থাকতে পারে না ব্যয় সংকোচের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হওয়ার বা করের পরিমাণের দ্বারা প্রয়োজনাতিরিক্ত চাপ পড়ার ব্যাপারে। এর সরবরাহের ব্যাপারটি নিশ্চিত থাকায় প্রাদেশিক বিত্তের স্থিতিশীলতা সম্বন্ধে এর সম্পর্কটিকে অত্যন্ত পরোক্ষ বলে গণ্য করতেই হবে। অতএব আর্থিক ব্যাপারটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য সমস্যা মোকাবিলা করার পূর্ণ দায়-দায়িত্ব পড়ত "হস্তান্তরিত" বিষয়গুলির ভার প্রাপ্ত স-মন্ত্রীপরিষদ ছোটলাটের উপর। কারণ বন্টন এবং শংসাপত্র দানের ক্ষমতা অনুসারে "হস্তান্তরিত" বিষয়গুলি তাদের যে অর্থের প্রয়োজন সেটা ছাড়াই চলতে হবে এবং যাঁরা ঐ বিষয়গুলির ভারপ্রাপ্ত যথা মন্ত্রীরা, তাদের অবশ্যই ব্যয় সংকোচের ভারটি বহন করতে হবে অথবা প্রদেশগুলির আর্থিক ব্যাপারে ভারসাম্য আনার জন্য নতুন করের সাহায্য নিতে হবে। কারণ বিশেষ করে যখন সপরিষদ ছোটলাটের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা বিষয়গুলির জন্য অর্থ সরবরাহের অন্য প্রচুর পথ খোলা থাকে তখন এটা সন্দেহজনক যে সপরিষদ ছোটলাট নতুন কর বসাবার বা ব্যয় সংকোচ করার মত কষ্টকর দায়িত্বভার নেবেন কেন। সরকারের অপর অংশ অর্থাৎ স-মন্ত্রীপরিষদ ছোটলাট ব্যয়সংকোচ করার ব্যাপারে সম্মতি দেবেন বা প্রয়োজন বোধে নতুন করের বোঝা গ্রহণ করবে কি? এটা সুস্পষ্ট যে তা নির্ভর করে বিধান মণ্ডলের মেজাজের উপর।

প্রথমেই এটা লক্ষ করতে হবে যে, বিধানমণ্ডল বর্দ্ধিত করের পরিকল্পনাগুলিকে সহজে প্রশ্রয় দেবে। বার্কের মন্তব্য[১] অনুসারে, এ কথা সত্য যে, "তারা তাদের সরকারি সম্পত্তির জীর্ণাবস্থা প্রাপ্তি থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এ কথা জনগণকে বলা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং অত্যন্ত অপমানজনক প্রতারণা। জনগণের রাজস্বের সর্বনাশের ফলে তারা যে অব্যাহতি পেয়েছিল তার জন্য নিজেদের যে মূল্যায়ন কূটনীতিবিদরা করেছিলেন তা করার আগে তাঁদের উচিত ছিল সমস্যাটির সমাধানের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া। যথেষ্ট পরিমাণে প্রদান করা, এবং সেই অনুপাতে লাভ করা; অথবা

১। ফ্রান্সে বিপ্লব সংক্রান্ত অনুচিন্তন।

সামান্য কিছু লাভ করা অথবা কিছুই না পাওয়া এবং সবরকমের বাধ্যতামূলক কর থেকে ভারমুক্ত হওয়ার মধ্যে জনগণের কোনটি সবচেয়ে লাভজনক?"

এই প্রশ্নের উত্তর দার্শনিকরা যাই দিন না কেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, করের বোঝা বহন করার মত অতি নগণ্য সামর্থ বিশিষ্ট ভারতের মত দরিদ্র দেশে, করের বোঝা বাড়ানোর প্রস্তাবটি নিষ্ঠুর না হলেও সব সময়েই অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এছাড়া, নির্বাচনে বিধায়কদের (Legislatives) সাফল্যের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই আশংকায় অতিরিক্ত করের প্রস্তাব বর্জন করা হবে। যতদিন পর্যন্ত বিধান মণ্ডলে আসন পাওয়ার সাধারণ প্রণালী হিসাবে মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়টি থাকবে। ততদিন নির্বাচকদের প্রতিকূল ধারনার কথা খেয়াল করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ঐ আসনটিকে নির্বাচকদের উপহার হিসাবে গণ্য করা হবে ততদিন পর্যন্ত বিধান মণ্ডলের প্রার্থীর সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম হবে, যদি ঐ প্রার্থী নির্বাচকের পকেটে হাত দেন, এমন কি নতুন করগুলি যদি আনুপাতির সুযোগ-সুবিধার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু সুফল দেয়। এ ছাড়া প্রচুর কর আরোপ করার অভিযোগ এনে কোনও রাজনৈতিক দল যদি আমলাতন্ত্রের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়েও নিয়ে থাকে তবুও ঐ একই নীতি অব্যাহত রেখে তারা তাদের মর্যাদা হানি করতে সম্মত হবে না। বিধান মণ্ডলের তরফ থেকে করারোপ করার ব্যাপারে এই সহজাত বিরূপতা আরও জোরদার হয় "সংরক্ষিত" ও "হস্তান্তরিত" বিষয়গুলির প্রতি বিধানমণ্ডলের বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা। "সংরক্ষিত" বিষয়গুলি হল সেই সব বিষয় যা প্রধানত জড়িত থাকে শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে। যখন কি হস্তান্তরিত বিষয়গুলি প্রধানত জড়িত থাকে অগ্রগতির সঙ্গে। কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সংস্কার সাধনের পূর্বে আমলাতন্ত্রের নীতি রচিত হয়েছিল শৃঙ্খলার বিনিময়ে অগ্রগতিকে বলিদান দিয়ে। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, সংশোধিত সংবিধানের অধীনে জনপ্রিয় বিধান মণ্ডলগুলির উচিত যে-সব বিষয় অগ্রগতির সহায়ক সেগুলির দিকে বেশি ঝোঁকা। কর বৃদ্ধির প্রতি অনীহা এবং হস্তান্তরিত বিষয়গুলির প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব তাদের অনুকূলে যাবে সংরক্ষিত বিষয়গুলির জন্য নির্ধারিত তহবিল অতিমাত্রায় কমিয়ে দেবার ব্যাপারে মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলিকে স্বাগত জানাতে। হস্তান্তরিত বিষয়গুলির সুবিধার্থে সংরক্ষিত বিষয়গুলির ব্যাপারে মন্ত্রীরা কী পরিমাণ ব্যয় সংকোচ করতে পারবেন তারই উপর প্রধানত নির্ভর করবে তাদের মনোভাব। এই ভাবে রাজস্বের তেমন কোনও বিরাট আকারের বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকলে নির্বাহিকদের দুটি অর্ধ, বন্টন ও শংসাপত্র প্রদানের ক্ষমতা বিশিষ্ট সপরিষদ ছোটলাট এবং জনপ্রিয় বিধান মণ্ডলের সাধারণ বাজেট রচনার ক্ষমতা সমর্থিত স-মন্ত্রীপরিষদ ছোটলাট

পরস্পরের উপর জোর করে মিতব্যয়ের বিষয়টি চাপিয়ে দিয়ে নিজ নিজ বিষয়গুলির উন্নতিসাধনে প্রতিযোগিতা চালাবে। কর আরোপ বিধানমণ্ডল অনিচ্ছুক হওয়ায় ছাঁটাই প্রতিহত করার অধিকারী হিসাবে সপরিষদ ছোটলাট এবং স-মন্ত্রীপরিষদ লাট সম্প্রসারণ করতে উদ্বিগ্ন হওয়ায়, প্রাদেশিক বিত্তের ব্যাপারে দ্রুত ভারসাম্য আনার সম্ভাবনা অত্যন্ত কমে যায়।

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, প্রদেশগুলিতে সুদৃঢ় আর্থিক ব্যবস্থা না থাকার মূল কারণ হল দ্বৈতশাসনতন্ত্র শাসনব্যবস্থার ভাল তন্ত্র (Form) নয়। এবার দেখা যাক কেন দ্বৈতশাসন তন্ত্র শাসন ব্যবস্থার ভাল তন্ত্র নয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সরল। দ্বৈতশাসনতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার এক মন্দ তন্ত্র কারণ তা যৌথ দায়িত্বের নীতি-বিরোধী। প্রশাসন যন্ত্রকে অবশ্যই মসৃণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে কাজ করতে হবে। কিন্তু যাতে তা ঐ ভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য তাকে প্রশাসনিক কাজের অবিভাজ্যতার নীতিকে এবং নিজেদের কর্ম সম্পাদনে প্রশাসকদের যৌথ দায়িত্বকে স্বীকৃতি অবশ্যই দিতে হবে। নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সরকারের কাজগুলিকে অবিভাজ্যতা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে কারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরকারের কাজ-কর্মগুলি বিভাজিত হতে পারে এবং সাধারণত বিভাজিত হয়েও থাকে, যেমন হয়ে থাকে স্থানীয় সংস্থাগুলির মধ্যে বিভাগগুলির মধ্যে। তৎসত্ত্বেও এটা সত্য যে, একটি সাধারণ যোগসূত্র সবগুলির মধ্যে বর্তমান থাকে: সরকারের কোনও কাজকর্মই **শূন্যতার মধ্যে** কাজ করে না; প্রতিটি কাজ অন্য কোনও কাজের উপর প্রতিক্রিয়া করে, এবং বিভিন্ন কাজকর্মগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারে এমন কোনও শক্তি না থাকলে শৃঙ্খলাবদ্ধ অগ্রগতি আনতে কাজকর্মগুলি আদৌ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে না। অন্যথায় একটি বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত একটি নীতি ফলপ্রসূ হতে ব্যর্থ হতে পারে অন্যান্য বিভাগের তরফ থেকে সহায়ক ব্যবস্থাগ্রহণের অভাবে। ঐ সামঞ্জস্য সৃষ্টিকারী শক্তি কেবল মাত্র পাওয়া যেতে পারে যৌথ দায়িত্বের নীতিতে। এটা ঠিক তাই, যা হার্ন (Hearn) উল্লেখ করেছিলেন:[১]

"সমগ্র সংস্থার অনুসন্ধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে প্রতিটি মন্ত্রী তাঁর নিজস্ব বিভাগে কাজ করবেন ঐ বিশেষ বিভাগে তাঁর সহকর্মীদের স্বীকৃত প্রতিনিধি হিসাবে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যেখানে কোনও অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেখানে কেবলমাত্র বিচক্ষণতা নয়। সম্মানের উদ্দেশ্যেও প্রতিটি মন্ত্রী মন্ত্রিসভার অভিমত গ্রহণ করেন। পূর্বাহ্ণিক সতর্কতা অবলম্বন করা হলে ঐ গৃহীত ব্যবস্থাটি মন্ত্রিপরিষদের

১। ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্র, পৃ : ২০৪

সাধারণ অধিনিয়মে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে।"

ঠিক অথবা ভুল যাই হোক না কেন একটি সাধারণ সু-সমন্বিত নীতি আছে যা একটি ঐক্যবদ্ধ সরকারকে পথ-নির্দেশ দেয় যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে। শাসনব্যবস্থার কাজে বিভাজন করার ফলে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, দ্বৈতশাসন তন্ত্র নির্বাহিকদের মধ্যে এক বিভাজিত দায়িত্বের একটা উপাদানকে প্রবর্তিত করেছে। এ কথা ঠিক যে বিভাজনটি সমান্তরাল বা উল্লম্ব ছিল না। এবং এটাও ঠিক যে, দুটি অংশকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে দুটি পৃথক নির্বাহিকদের জন্য দুটি পৃথক বিধান মণ্ডল রাখার ব্যবস্থা করা হয় নি; অথবা এমন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় নি যাতে প্রত্যেকে নিজেদের আইন প্রণয়ন করবে। নিজের বিত্ত নিয়ন্ত্রণ করবে, নিজের বাজেট রচনা করবে, নিজস্ব কর আরোপ করবে এবং নিজস্ব ঋণ সংগ্রহ করবে; অথবা প্রত্যেকে তার জন্য নির্দিষ্ট করা বিষয়গুলির পরিচালনার জন্য পৃথক কর্মচারী মণ্ডল থাকবে এবং এর পরিষেবাগুলির জন্য বেতন ও উত্তর বেতনের এবং কর্মী নিয়োগের নিজস্ব পদ্ধতি থাকবে; যাতে করে এই দুই কর্তৃপক্ষ প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ নিজেদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে পেতে পারে। এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যমূলক দ্বৈত নির্বাহিকের এই আনুষঙ্গিকগুলির সবকটি না হলেও অন্তত কয়েকটিকে প্রদেশগুলির সরকার পরিচালনার্থে দ্বৈতশাসনতন্ত্রীয় পদ্ধতি একটা অংশকে গ্রহণ করা উচিত এই প্রস্তাবও করেছিল ভারত সরকার। দেশের সৌভাগ্যক্রমে নতুন সংবিধানের রচয়িতাদের অভিমত:[১]

"বিভিন্ন অপরিহার্য অংশের প্রত্যেকটিকে তার নিজস্ব সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি দিয়ে সুসজ্জিত করা এবং তাদের কক্ষপথ পর্যাপ্ত পরিমাণে দূরে অবস্থান করার জন্য সংঘর্ষ যে এড়ানো যাবে সে বিষয়ে আস্থা রাখার মধ্যে নয়। বরং যৌথভাবে কাজকরার অভ্যাসটি যাতে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে ঐ দুটি প্রয়োজনীয় উপকরণকে পরস্পরের সংস্পর্শে আনার জন্য প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগানোর বিষয়টি ছিল প্রাজ্ঞতার লক্ষণ।" যৌথ প্রতিবেদনের[২] রচয়িতারা লিখেছেন, যে এই ভাবে গঠিত সরকার এবং কাজকরার এই বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সহ তাদের একটি সরকারের আওতা থেকে মুক্ত করবে", এবং যে "প্রাদেশিক বাজেট সমগ্রভাবে নির্বাহিক সরকার কর্তৃক রচিত হওয়া উচিত"।[৩]

১। যৌথ প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ১৯৯।

২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৮৮।

৩। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২০৭।

নিঃসন্দেহে দ্বৈতশাসনতন্ত্রের কর্মপদ্ধতিকে সংশোধন করা ভাল ছিল, তাকে দুটি নীতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শর্তাধীন করে, নীতি দুটির মধ্যে একটি হল বিভাজনের যা সরকারের দুটি অংশের এবং সঙ্ঘের দুটি অংশের কতিপয় দায়-দায়িত্বের যথা সম্ভব সুস্পষ্ট একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করার জন্য এবং ঐ অংশগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যগুলি ও নীতির মধ্যে সম্মেলন ঘটানোর জন্য। নির্বাহিকের প্রতিটি অংশকে একটি পৃথক প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে সুসজ্জিত করার বিষয়টি চরম দুর্দশা ছাড়া আর কি হতে পারে। কিন্তু যেহেতু একটা বোঝাপড়া ছিল যে, যখন মন্ত্রীরা হস্তান্তরিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোনও কাজ করবেন। তখন পরিষদের সদস্যরা তাঁদের উপদেশ দেবেন এবং যখন সংরক্ষিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরিষদের সদস্যরা কাজ করবেন তখন মন্ত্রীরা তাঁদের উপদেশ দেবেন, তখন দ্বৈতশাসনতন্ত্র যে বিভাজিত দায়িত্বেরই একটি পদ্ধতি এই সত্যটির স্বরূপ পাল্টায় না। এটা এমন কোনও একটা পদ্ধতি নয় যা সরকারে কাজকর্মকে একটি সাধারণ নীতির অনুসারে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হওয়ার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করে। অপর দিকে এটা এমন একটা পদ্ধতি যা সংগঠিত বিবাদে পরিপূর্ণ। দ্বৈতশাসনতন্ত্র এবং অরাজকতার মধ্যে বিভাজন রেখাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ। যদি ঐ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিদীর্ণ হয়ে না থাকে তবে তার কারণ হল দুটি অল্পকালস্থায়ী পরিস্থিতি। এই ধরনের একটি পরিস্থিতি হল এই যে, প্রাদেশিক বিধান মণ্ডল রাজনৈতিক মতদ্বৈধতার ফলে তার অন্তর্নিহিত শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে যাওয়া। অপরটি হল এই যে মন্ত্রীদের কার্যকাল বিধান মণ্ডলের ইচ্ছানুসারে নির্ধারিত না হয়ে, হয়ে থাকে বিধানমণ্ডলের অস্তিত্বের স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত এবং তারা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকতেন ছোটলাটের ইচ্ছানুসারে। বিধানমণ্ডল কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিদের মন্ত্রী হিসাবে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে বিধানমণ্ডল কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে মন্ত্রী বেছে নেওয়ার ক্ষমতা ছোটলাটকে দেওয়ার বিষয়টি দায়িত্বশীল সরকারের নীতি থেকে গুরুতর ভাবে সরে আসা বুঝায়, যা ছিল সংস্কার সাধন অধিনিয়মের সর্বজনস্বীকৃত লক্ষ। একজন মন্ত্রী, যার উপর ছোটলাটের আস্থা আছে এবং একজন মন্ত্রী যার উপর বিধানমণ্ডলীর আস্থা আছে—এ দুটিই সম্পূর্ণ ভিন্নতর বস্তু। দক্ষ সরকারের ক্ষেত্রে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য কতটা তা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। যার বিরুদ্ধে সমগ্র ইংল্যাণ্ডের সাংবিধানিক ইতিহাস একটা অসাধারণ প্রতিবাদ তার ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা পদ্ধতিকে গ্রহণ করা উচিত ছিল বললে একেবারে অযৌক্তিক হবে না। যে আপাত প্রতীয়মান কারণ উপস্থাপিত[১] করা হয়েছিল,

১। যৌথ প্রতিবেদন পৃষ্ঠা ১৮১।

তা এই যে বিধানমণ্ডলের—

"মন্ত্রীদের বরখাস্ত করার ক্ষমতা সম্বন্ধে অথবা ঐ ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করলে পরিণামে কি ফল হতে পারে তার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রতিনিধিত্বমূলক বিধানসভার ইচ্ছানুসারে পদের কার্যকাল কর্তৃক আরোপিত দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে এখনও ভারতে কেউ সুবিদিত নয়। একমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া এই শিক্ষা লাভ করা যায় না.... (বিধান মণ্ডলের) নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করার পরিকল্পনার দ্বারা এবং তাঁদের আসন অধিকার করে রাখার ব্যাপারে তাদের পদের কার্যকালকে শর্তাধীন করার দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব সম্পর্কিত কিছু ব্যবস্থার আয়োজন (হয়ে যায়) তাঁদের নির্বাচকদের কাছে দায়িত্বের আকারে এবং এই ভাবে সাধারণ কাজকর্মের পরিবেশটির অবলুপ্তি ঘটে, যে পরিবেশ প্রশাসনের ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল যাদের উপর তাঁরা তাঁদের নির্বাচকদের কাছে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন হয়ে ওঠেন, যারা তাদের (বিধান মণ্ডলে) নির্বাচিত করেছিল।"

এই ধরনের যৌক্তিকতার অকার্যকারিতায় বিশ্বাস করা কঠিন। অভিজ্ঞতা ছাড়া কিছুই শেখা যায় না, এই যুক্তিও একেবারে অসার। ব্যক্তিবিশেষ বা দলবদ্ধ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সঠিক আচরণের জন্য যা প্রয়োজন তা হল প্রকৃত বিষয়গুলির মর্ম ও মূল্য সঠিক ভাবে জানা। তা করার জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বিধানমণ্ডলকে অভিজ্ঞতার দ্বারা শেখার জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে প্রারম্ভেই মন্ত্রীকে অপসারিত করার পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞাত আছে এ বিশ্বাস রাখতে হবে আবার। মন্ত্রীরা তাদের নির্বাচকদের দায়ী থাকেন এই কারণে পদ্ধতিটি কম দায়িত্বহীন এরকম যুক্তি পণ্ডিতীপনার এক অগভীর জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। নিঃসন্দেহে ইংল্যান্ডের সংবিধান সম্বন্ধে অস্টিনের[১] এই যুক্তি যে, ইংল্যান্ডের লোকসভা ছিল "সেই সংস্থার নিদ্রক এক ন্যাসরক্ষক (Trustee) যার দ্বারা তারা নির্বাচিত ও নিযুক্ত হন।" এ কথা সত্য যে, রাজনৈতিক ভাবে নির্বাচকরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এমন কি আমরা এ কথাও বলতে পারি যে, বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার যেহেতু সরকারের প্রত্যেকটি প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি অনুসারে তাদের ইচ্ছাই চূড়ান্ত আনুগত্য পাবার অধিকারী। কিন্তু অধ্যাপক ডাইসি উল্লেখ করেছেন,[২]—

"যে-কোনও শব্দ-সমষ্টি যা সংসদের নির্বাচকদের বৈধ ভূমিকা প্রদান করে আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় সেগুলি সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ হয় নির্বাচকের আইনগত অবস্থা

১। আইন-বিজ্ঞান খণ্ড ১, ৪র্থ সংস্করণ। পৃষ্ঠা ২৫৩।

২। সংবিধানের আইন, ৮ম সংস্করণ, ১৯১৫। পৃষ্ঠা ৫৭।

সম্বন্ধে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে। ইংল্যান্ডের সংবিধানের অধীনে (ভারতের সংবিধানের ক্ষেত্রেও তা সত্য) নির্বাচকদের একমাত্র বৈধ অধিকার হল সংসদের সদস্য নির্বাচন করা। সংসদের প্রণীত আইন সম্পর্কে উদ্যোগী হওয়া। অনুমোদন করা বা বাতিল করার কোনও আইনগত সাধনোপায় নেই। নির্বাচক মণ্ডলীর মতামতের বিরোধী হওয়ার ফলে আইনটি বাতিল করা হবে এই যুক্তি মুহূর্তের জন্যেও বিবেচনা করবে না কোনও আদালত": এবং এটা ভারতীয় নির্বাচকদের প্রকৃত অবস্থাকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করে। এই ধরনের নগণ্য ব্যক্তিদের কাছে মন্ত্রীকে দায়ী করার অর্থ হল কার্যত দায়িত্বহীন করে রাখা। মন্ত্রীদের নিয়োগ করার এই বিশেষ প্রণালীটির প্রস্তাব দেবার সময় সংবিধানের রচয়িতারা যে, এই কারণগুলি সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন না এ কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর। বরং এই সম্ভাবনাই বেশি ছিল যে, মন্ত্রী নিয়োগের এই বিশেষ প্রণালীটি গৃহীত হয়েছিল এই কারণে যে তা এর ফলে এমন একজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা যেত যার পক্ষে সংরক্ষিত বিষয়গুলির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সহযোগিতা করার সম্ভাবনা বেশি এবং যিনি বিধানমণ্ডলী কর্তৃক অপসারণ যোগ না হওয়ায় তার ইচ্ছার দ্বারা কম প্রভাবিত হবেন। কিন্তু এই মন্ত্রীরা সম্পূর্ণরূপে বিধানমণ্ডলের কোপমুক্ত হয়ে থাকতে পারতেন না। পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্কের উন্নতিসাধন করতে এবং বিধানমণ্ডলের অনুগ্রহ লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, মন্ত্রী তার অবস্থার সঙ্গে জড়িত বিপদগুলি বাজেটের সময় মূর্ত হয়ে ওঠে অপরিহার্যভাবে। বাজেটে সন্নিবেশিত মন্ত্রীর প্রস্তাবগুলি বিধান মণ্ডলের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট বাতিল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মন্ত্রী নিজে বা ছোটলাট হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এর প্রতিবিধানের জন্য মন্ত্রীর কাছে একমাত্র যে পথটি খোলা থাকে তা হল পদত্যাগ করা।

বলতে গেলে এ কথা বলা যায় যে, এই পরিস্থিতিগুলি যা দ্বৈতশাসনতন্ত্রকে ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা করেছিল সেগুলি ছিল ক্ষণস্থায়ী। রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা এক ক্ষণস্থায়ী পর্ব ছাড়া আর কিছু না এবং পুনর্গঠিত বিধানমণ্ডলের দ্বিতীয় দফার মন্ত্রীরা এর বশবর্তী হয়ে উঠবেন: যাতে করে শক্তিগুলিকে আগের তুলনায় আরও ভাল ভাবে শীঘ্র সংগঠিত করা সম্ভব হবে, যখন দ্বৈতশাসনতন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বর্ণসঙ্কর নির্বাহিক, বিভাজিত দায়িত্ব, কাজকর্মের বাঁটোয়ারা, ক্ষমতার সংরক্ষণ এক দক্ষ সরকার গঠনের সহায়ক নয়। এবং যেখানে সরকার পরিচালনার দক্ষ পদ্ধতি নেই, সেখানে আর্থিক ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতির আশা খুবই কম। এর প্রাথমিক সমাধান এই যে যৌথ দায়িত্ব সম্পন্ন এক অবিভক্ত সরকার থাকতে হবে। এবং সেটাও পাওয়া যেতে পারে একমাত্র তখনই, যখন সমগ্র সরকার তার আইনগত

আদেশগুলি পাবে একটি মাত্র সাধারণ উৎস থেকে। এই ধরনের সুসম্পূর্ণতা যথা সম্ভব শীঘ্র লাভ করা উচিত সেটাই আন্তরিক ভাবে কামনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে এটা জানলে উৎসাহিত হওয়া যায় যে, দ্বৈতশাসনতন্ত্র একটি উত্তরণকালীন পদ্ধতি। প্রশ্ন একটাই এবং তা হল এই যে, এই উত্তরণের কালটি কত দীর্ঘ ও কতকাল প্রলম্বিত হবে। দ্বৈতশাসনতন্ত্রের মত সরকার প্রবর্তন করার সপক্ষে যুক্তি হল এই যে তা এই অনুমানের ভিত্তিতে গঠিত যে বর্তমানে ভারত পরিপূর্ণ মাত্রায় দায়িত্বশীল প্রশাসন ব্যবস্থার পদ্ধতিটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত নয়। ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী একটা সময়ে তাদের প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে বিচক্ষণতার সঙ্গে হয় সূত্রবদ্ধ করতে বা তাদের প্রতিনিধিদের উপর আইনগত নির্দেশ কার্যকর ভাবে চাপিয়ে দিতে ব্যর্থ হবে, এবং শিক্ষিত শ্রেণীদের বদ্ধমূল সামাজিক কুসংস্কারগুলির জন্য চরম বিপদের আশংকা থাকবে জনসাধারণকে শোষণ করার ব্যাপারে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের। এরূপ অভিমত পোষণ করা হয়েছিল যে, এই মৌলিক কারণটি দায়িত্বের প্রণালী ও মাত্রার মধ্যে অবশ্যই প্রভেদ নির্ণয় করবে, যা গোড়া থেকেই চালু করা যাবে সেখান থেকে যা নতুন পদ্ধতির চরম পরিণাম স্বরূপ ফলশ্রুতি হয়ে উঠবে এবং এই ব্যাপারটির সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব অবশ্যই আরোপিত হবে এইজন্য যে, যাতে যে শক্তিগুলি বর্তমানে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে সেগুলি সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে না তাদের জায়গায় সন্তোষজনক পরিবর্ত তৈরি হয়ে ওঠার আগে। অপর দিকে একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে,[১] মৌলিক কারণটির অবলুপ্তির জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কারণ—

"সকল দেশে প্রথম দিকে দায়িত্বভার সমর্পিত হয়েছে জনগণের একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশের উপর, এবং সরকার পরিচালনার ভার থাকত ক্ষুদ্র শিক্ষিত সংখ্যালঘিষ্ঠদের হাতে, যারা স্বভাবতই যত্নশীল থাকত শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণকে এবং তার পরিণামী ভোটাধিকারের সম্প্রসারণকে মুলতুবি রেখে অশিক্ষিত জনগণের স্বার্থের ব্যাপারে।"

এটাই ছিল অবশ্য যুক্তির প্রচলিত ধারা, যা সাধারণত ভারতের রাজনৈতিক চরমপন্থী এবং সমাজের সংরক্ষণশীল রাজনীতিকরা পেশ করত। ভারতে উচ্চ শ্রেণীবর্গ জনসাধারণের সঙ্গে যে কঠোর, নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ করত সেই হৃদয় বিদারক কাহিনী একপাশে সরিয়ে রাখি যদিও বাস্তব সত্য তাদেরই পক্ষে ছিল, তার কারণ এই যে, প্রতিটি দেশেই এমন নিপীড়িত সম্প্রদায় আছে যারা সামাজিক অত্যাচার ও সামাজিক অবিচারের শিকার হত, অথচ এই ব্যাপারে কোনও দেশই রাজনৈতিক

১। তুলনীয়, ভারত শাসন বিধেয়ক সম্পর্কে যৌথ প্রবর সমিতির সম্মুখে মাননীয় ভি. জে. পটেল এবং শ্রী মাধব রাওয়ের প্রদত্ত সাক্ষ্য। ইংল্যান্ডের লোকসভার বিবরণী। ১৯১৯ সালের ২০৩ নং, পৃষ্ঠা ১০৬।

ক্ষমতা বিহীন হয়ে থাকতে পারত না। কিন্তু যারা এই যুক্তি দেখায় তারা ভুলে যায় যে, নিগ্রো সহ আমেরিকা এবং হিটা সম্প্রদায় সহ জাপানের মত অন্যান্য দেশও যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা পেতে পারে প্রথমেই সামাজিক অসাম্য দূর না করে। তবে তা হয়েছে এই কারণে যে, তাদের হাতে সামরিক ক্ষমতা ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার দুটি প্রধান উপকরণ হল সামরিক শক্তি এবং নৈতিক শক্তি, এবং যে দেশ প্রথমোক্তটির মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করতে না পারে তাদের অবশ্যই শেষোক্তটির উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। এইভাবে ভারতে রাজনৈতিক সমস্যাটি ছিল পুরোপুরি একটি সামাজিক সমস্যা এবং এর সমাধান বিলম্বিত করা প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটিকেও বিলম্বিত করে দেয়, যখন ভারত একমাত্র নিজের দেশবাসী ছাড়া অন্য কারও অনুজ্ঞা সাপেক্ষে এক স্বাধীন সরকার পেতে পারবে।

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : একাদশ খণ্ড

অনুবাদে

- **অতীন্দ্র মোহন ঘোষ**—কলকাতা প্রধান ন্যায়ালয়ের সঙ্গে যুক্ত অনুবাদক এবং অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক; প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও আইনজীবী; বহু গ্রন্থ রচয়িতা।

অনুমোদনে

- **আশিস সান্যাল**—বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, শিশু সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও অনুবাদক। বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত। বাংলা ও ইংরেজিতে পঞ্চাশের বেশি গ্রন্থের লেখক।

গ্রন্থপঞ্জি

যে সমস্ত গ্রন্থ, পত্রিকা এবং প্রতিবেদনের সাহায্য নিয়েছিলেন লেখক এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ রচনার জন্য, তার তালিকা

দ্বিতীয় অংশ : ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক বিত্তের বিবর্তন
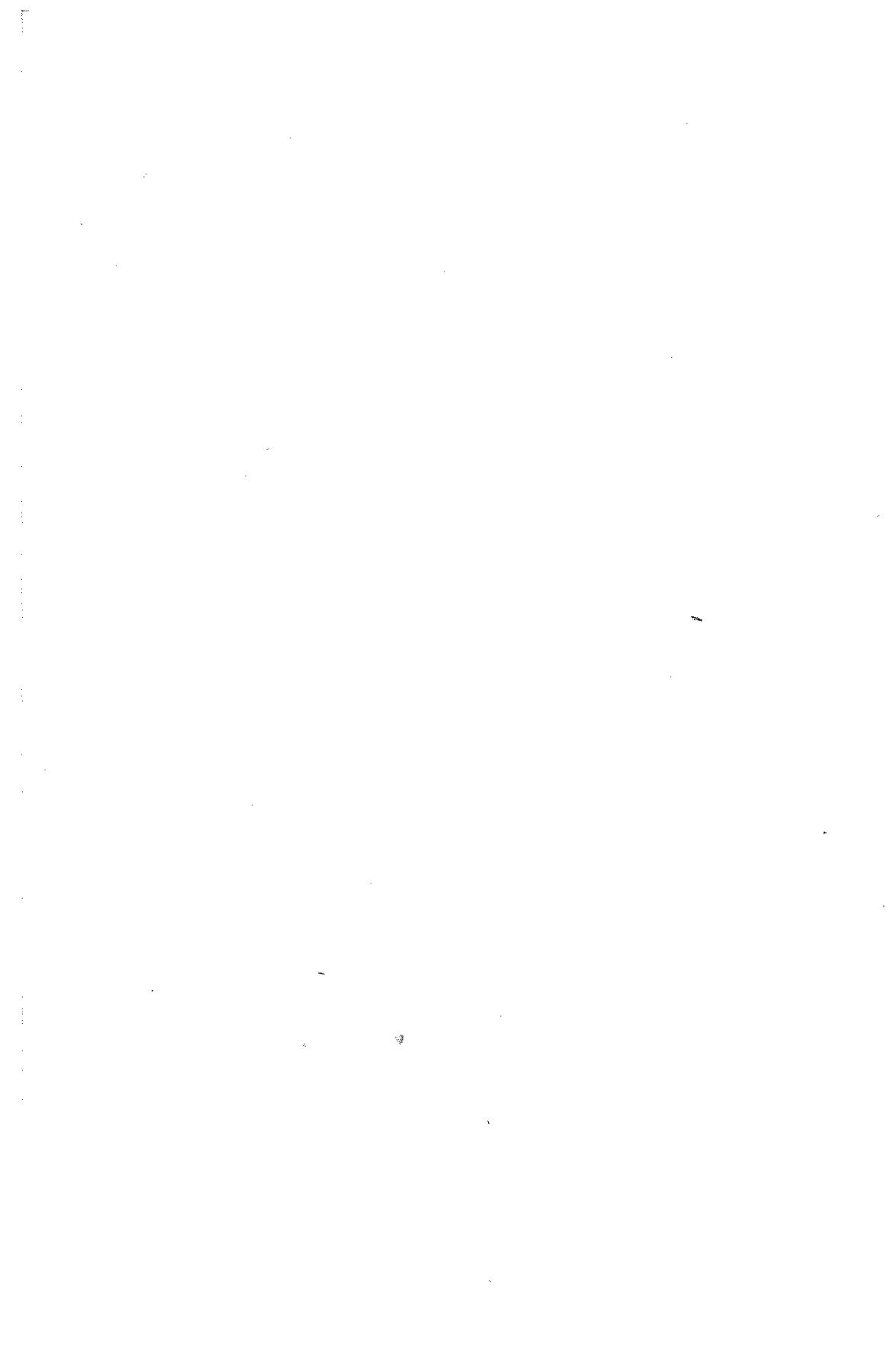
Austin : *Jurisprudence,* Vol. I (4th Ed.)
Bryce, Jmes : *The Americn Commonwealth,* 1910.
Buchnn, Dr. Frncis : *Journey from Mdrs,* Vol. II.
Burke, Sir Edmund : *Reflections on the Revolution in Frnce.*
Calcutta Review, Vol. XVI, 1851.
Cowell, Herbert : *The History of the Constitution of Courts and Legislative Authorities in India,* Calcutta.
Dicey, A. V. : *Law of Constitution,* (8th Ed.) 1915.
Fisher, H..L. : *The Empire nd the Future,* 1916.
Frere Sir B. : *Minutes, Papers etc.* on the extension of Financial Powers to Locaal Governments, 1868.
Ghose, N. : *Comparative Administrative Law,* 1918.
Halsbury : *Laws of England.*
Haughton, Benard : *Bureaucratic Government.*
Hearn : *The Government of England.*
Hendricks : *Parliamentary Committee on Trade,* 1821.
Hunter W. W. : *Life of Mayo,* Vol. I.
Kelkar N. C. : *The Case for Indian Home Rule.*
Low, Sir Sidney : *The Governance of England,* 1914
Mansfield, Sir W. R. : *Minutes, Papers etc. on the extension of financial Powers to Local Governments,* 1967.
Martin M. : *Eastern India,* 3 Vols.
Raghuvaiyangar : *Progress of the Madras Presidency,* 1893.
Redlich J. : *Parliamentary Procedure.*
Seligman, Prof. E. R. A. : *Essays on Taxation,* (8th Edition), 1913.
Strachey Hon. John : *The Adm. of the Earl of Mayo as Voceroy and Governor General of India ;* Govt. Printing Press, Calcutta, 1872.
Strachey, Col. R. : *Note in Finley's History of Provincial Financial Arrangements,* 1867.
Sykes, Colonel : *Past, Present and Prospective Financial Condition of British India,* Journal of the Royal Statistical Society, Vol. XXIII, 1859.
Temple, Sir Richard : Papers etc. on the extension of Financial Powers to Local Governments, 1867.
Thornton (Ed.) : *Statistical Papers Relative to British India,* 1953.
Travelyan : *System of transit and town duties in the Bengal Presidency.*
Venkatramaiah, Y. : Accountant's Manual, Madras, 1866.
Vineberg : *Separation of State and Local Revenues in Canada.*
Webb, S. : *Grants-in-Aid,* 1911.

West : *Sir Charles Woods Administration.*
Report of the Civill Finance Committee on Native Establishment at the Three Presidencies, 1830.
Report of the Royal Commission on Decentralisation in British India, 1909.
Report of the Committee on the affairs of the East India Company, 1852.
Report of the Committee on Indian Constitutional Reforms, 1918.
Report of the Joint Select Committee on the Government of India Bill, 1919.
Report of the Committee appointed by Secretary of State for India to advise on the question of the Financial Relations between the Central and Provincial Governments in India.
Report and Evidence of the Committee on East India Produce, 1846.
Royal Commission on Local Taxation in England, Vol. I, Minutes of evidence, 1898.
Second Report of the Joint Committee appointed to revise the rules made under the Government of India Act, 1920.
Report of Major General Hancock, on the reorganisation of the Indian Army.
Report of the Civil Finance Committee on Native Establlishment at the three Presidences.
House of Commons : Return 33 of 1860, 307 of 1861, 326 of 1874, 202 of 1919.
Hansard's Parliamentary Debates 1868.
Annual Financial Statements for the Official Years 1860-1 to 1873-4, Calcutta, 1873.
Financial Statements of Government of India, 1879-80, 1902-03.
Annual Finance and Revenue Accounts of Government of India
Llegislative Assembly Debates, Vol. III
Madras Manual : Vol I.
Civil Account Code.
Moral and Material Progress report for 1882-3.
Parliamentary Papers 1859 : *Report of Major-General Hancock on the Reorganization of the Indian Army.*

নির্ঘণ্ট